বিদ্রোহ বিপ্লব স্বাধীনতা

ডঃ নীরদবরণ হাজরা

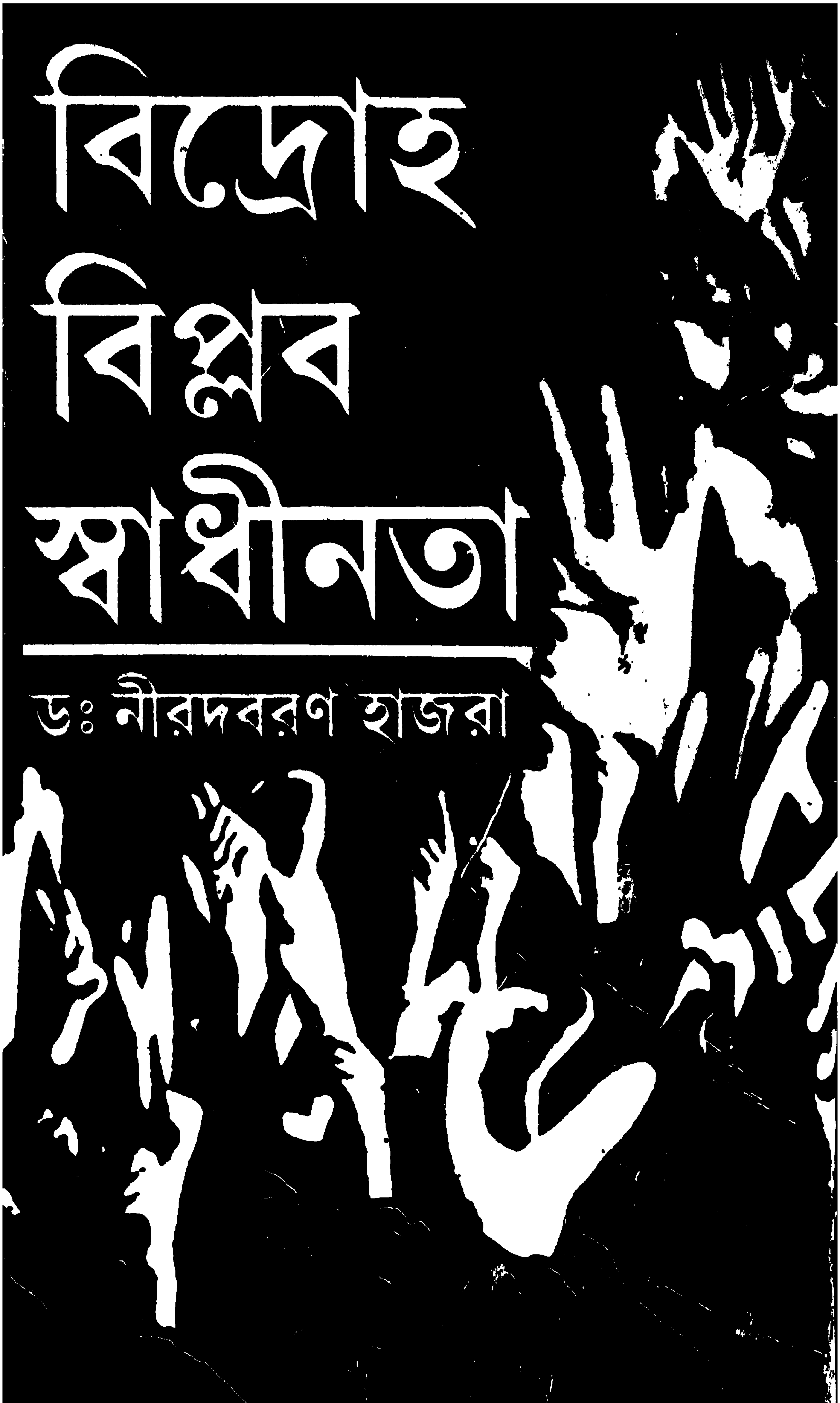

বিদ্রোহ
বিপ্লব
স্বাধীনতা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ডঃ নিমাইসাধন বসু-র
ভূমিকা সম্বলিত।

ডঃ নীরদবরণ হাজরা

84749
AGARTALA, TRIPURA

মণ্ডল অ্যান্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

BIDRAHA-BIPLAB-SWADHINATA
[The story of the freedom-movement in India.]

প্রথম প্রকাশ :
২১ আশ্বিন, ১৩৫৯
১০ অক্টোবর, ১৯৫২

প্রকাশক
সুধীরকুমার মণ্ডল
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

মুদ্রাকর
সত্যনারায়ণ মণ্ডল
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শৈশবে

যাঁকে আমি চোখে দেখিনি

অথচ যাঁর গল্পে প্রেরণা পেয়েছি

রাজাবাজার বোমার ফ্যাক্টরীর সেই নায়ক

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত

আমার পরম আত্মীয়

বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক)-র

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার শ্রদ্ধাতর্পণ।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের এক গৌরবময় ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে শতাধিক দেশ পৃথিবীর নানা প্রান্তে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের প্রত্যেকটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত করেছে। দেশে-বিদেশে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে আগ্রহ, পড়াশোনা এবং গবেষণা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান ভারতের কিশোর-কিশোরী ও যুব-ছাত্রদের নিজের দেশের এই গৌরবময় ইতিহাস ও সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার সুসংহত এবং সুপরিকল্পিত তেমন কোনো চেষ্টা হয়নি। কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত করে লেখা গ্রন্থের সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। ডঃ নীরদবরণ হাজরা সেই অভাব দূর করতে তাঁর 'বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বাধীনতা' বইটি লিখেছেন। এই জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা সহজসাধ্য নয়। এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের এত দিক আছে, এত বৈচিত্র্য আছে, এত ভিন্নমুখী ধারা ও আদর্শ আছে, এত মহান মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের সমাবেশ আছে যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজভাবে ও সহজ ভাষায় সেই ইতিহাস ব্যক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। ডঃ নীরদবরণ হাজরার গ্রন্থ সেই বিচারে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

যাদের জন্য লেখা সেই কিশোর-কিশোরী পাঠকরা বইটির সমাদর করলে তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ডঃ হাজরার গ্রন্থটির দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হল চিত্র সংগ্রহ। অন্যটি হল পরিশেষে গ্রন্থে উল্লেখিত সমস্ত ব্যক্তির বর্ণানুক্রমিক জীবনতথ্যমূলকসূচী। উভয় সংযোজনই গ্রন্থটির মূল্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সারা দেশের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য করার প্রস্তুতি চলেছে। স্বদেশপ্রেমিক ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল মানুষ এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ হাজরার এই গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা তাঁর অনুরূপ চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর বহন করে।

ডঃ হাজরা শুধুমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায়, গান্ধীজির অহিংস আদর্শে ও পথে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার কথাই লেখেননি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন, গণ-সংগ্রাম প্রভৃতির উজ্জ্বল কাহিনীগুলিও তুলে ধরেছেন। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করেছে।

আমি গ্রন্থটির প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সমাদর কামনা করি।

নিমাইসাধন বসু

ইতিহাসের বিচারে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরকে এক পুরুষ ধরা হয়। সেই হিসেবে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা প্রায় দুই-পুরুষকাল অতিক্রম করলাম। এতদিন পর আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে এমন একটি ব্যাপক ও বৃহৎ গ্রন্থের পরিকল্পনা কেন করা হয়েছে তা বলা দরকার।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বাঙলা ভাষাতেও কম নয়। কিন্তু এগুলির কোনটিকেই আমার উদ্দেশ্য সাধক বলে মনে হয় নি। কতকগুলি গ্রন্থে লেখক গবেষকের নিষ্ঠায় ইতিহাসের মূল্যায়ণ করেছেন। এ সব গ্রন্থ জাতীয় সঞ্চয়। কিন্তু এগুলিতে পণ্ডিতের আকর্ষণ থাকলেও কিশোর-কিশোরী বা সাধারণের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। একদল গ্রন্থ স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। এগুলিতে বহু খুঁটিনাটি অজানা তথ্য পাওয়া গেলেও, সেগুলি সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপট চিত্রিত করতে পারে না। স্মৃতিকথা না হয়েও আরও একদল গ্রন্থে সংকীর্ণ প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়। শেষ দল সম্পর্কে আমার ধারণা আরও তীব্র। সে গ্রন্থগুলি পূর্ণতঃ একদেশদর্শী।

দুই.

এ গ্রন্থে ইউরোপীয়দের ভারত বিজয় এবং তাদের শাসন থেকে আত্মশাসনের প্রবর্তনাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই কাল-জুড়েই রয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্জনের বিপুল সংগ্রাম।

তার্কিকেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, আর্যদের ভারতজয় কি ভারতের স্বাধীনতা হরণ নয়। মুসলমান বিজয়কে কি পরাধীনতা বলা যায় না! এসব প্রশ্ন যে অবান্তর বা অযৌক্তিক, তা আমি বলছি না, বলবার ধৃষ্টতাও আমার নেই। তবে, ইংরেজদের ভারত বিজয় ছাড়া অন্য কোন বিজয়কে যে গোটা ভারতবর্ষ তার পরাধীনতা বলে গ্লানিবোধ করেনি, এ কথাও তো ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

এই পরাধীনতার কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে ইংরেজদের ভারত জয়ের কয়েক শতাব্দী আগে থেকে–ইউরোয়পীদের ভারতবর্ষে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে আর সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম, তথা স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ভাস্কো-ডি-গামা

যেদিন ভারতের মাটিতে পা দিলেন (২০. ৫. ১৪৯৮) সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল, হত্যা-লুণ্ঠন ও অত্যাচার আর তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা (২৩. ৬. ১৮৫৭) তারিখের পলাশীর যুদ্ধে। এই সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশি কাল ধরে শুধু ইউরোপীয় পদসঞ্চার। এই ইতিহাসকে আমরা প্রায় সূত্রাকারে এক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করে প্রাধান্য দিয়েছি পলাশীর যুদ্ধের কাহিনীকে।

তিন.

'বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বাধীনতা' গ্রন্থে দু'টি সংযোজন অংশ আছে। এগুলিকে সংযোজিত অংশ না বলে সম্পূরক অংশ বলা বোধ হয় আরও ভাল। প্রথম সংযোজনে আমি আমার সম্ভবমত সর্বভারতীয় নেতা ও শহীদদের প্রতিকৃতি, বহু বিখ্যাত ঘটনার ফটোগ্রাফ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিদেশী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এমন কতকগুলি ব্যঙ্গচিত্রের সংকলন করেছি।

আর, দ্বিতীয় সংযোজন হচ্ছে সর্বভারতীয় নেতা ও শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবন-তথ্য। গ্রন্থের মূল অংশে ঘটনা প্রবাহের গতিতে সকলের সামগ্রিক পরিচয় ধরা যায় নি। অথচ, ঐ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার অনিবার্য কৌতূহল থাকতে পারে। এ জন্যই এই তথ্য সমৃদ্ধ সংকলন।

আমি এ গ্রন্থকে ইতিহাস গ্রন্থ বলি নি। এটি ইতিহাস নয়ও। ইতিহাস আমার অবলম্বন। ইতিহাসকে ধরে আমি একদিকে যেমন সংগ্রামের সত্য রূপরেখার বিশ্বস্ত পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছি, অন্যদিকে সংগ্রামীদের অনন্য-সাধারণ ত্যাগ, সুদৃঢ় সঙ্কল্প, এবং আত্মদানের ব্যক্তিত্বের স্পর্শটিকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছি। এ জন্য অসংখ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে ঔপন্যাসিক কৌশলে সজ্জিত করে গল্পরস আমদানী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সব জায়গায় আমি সার্থক হয়েছি এমন নয়। তবু কত ত্যাগ, কত আত্মদানে ও দহনে যে আমাদের এ স্বাধীনতা এসেছে তা যদি আমার গ্রন্থের কিশোর পাঠক পাঠিকা উপলব্ধি করতে পারেন তবেই আমার শ্রমকে সার্থক জ্ঞান করব। ইতি।

অঙ্গনাপল্লী। কৃষ্ণনগর। নদীয়া।

নীরদবরণ হাজরা

সূচীপত্র

এক. রূপকথা নয় ইতিহাস : ১—১০

ভারতের স্বাধীনতা হারান ও পুনঃপ্রাপ্তির রূপক গল্প

প্রথম পর্ব

দুই. কালিকট থেকে পলাশী : ১৩—২৫

ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যপদ্ধতি ॥ ভাস্কো-ডি-গামার যাত্রা ও ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি·· মোঘল রাজত্ব ॥ জাহাঙ্গীর ও ব্রাইটন ॥ সিরাজ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ॥ ক্লাইভ ও পলাশীর যুদ্ধ ॥ সিরাজের মৃত্যু ॥

তিন. পলাশী থেকে বক্সার : ২৬—৩৩

পলাশীর জয়ের পর কোম্পানীর লোকেদের মানসিকতা ॥ নতুন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ॥ মীর কাশিমের রাজ্যলাভ । অপব্যয়বোধ-আয়বাড়ান । নেপাল জয় প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা । ইংরেজদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ॥ পর-পর চার যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় ॥ মীরকাশিমের মৃত্যু ॥

চার. সন্ন্যাসী বিদ্রোহ : ৩৪—৪২

ইংরেজদের দেওয়ানী ও অত্যাচার ॥ বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ॥ জাতধর্ম—নির্বিশেষে বিদ্রোহ ॥ বিদ্রোহের কাহিনী—ঢাকার বিদ্রোহ—সারণ জেলার মেলা—ক্যাপ্টেন টমাসের অভিযান—ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের অভিযান—বিদ্রোহীদের নৌবাহিনী বিদ্রোহীদের ক্রমিক পরাজয় ।

পাঁচ. বারাণসী বিদ্রোহ : ৪৩—৪৮

অযোধ্যাঅধিকার ॥ চৈতসি-এর চুক্তি ॥ ইংরেজদের

নতুন দাবী। বন্দী চৈত সিং। প্রজা বিদ্রোহ॥ চৈতসিং-এর সঙ্কট। চৈত সিং-এর যুদ্ধ ও পরিণতি॥

ছয়. মহীশূরের প্রতিরোধ : ৪৯—৬২

মহীশূরের সমৃদ্ধি—দূরদর্শী হায়দার আলি॥ হায়দারের রাজ্য লালসা॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিক নয়—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হায়দার মারাঠা দ্বন্দ্ব : ইংরেজদের অনুপ্রবেশ। হায়দারের মৃত্যু। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি। টিপুর দূত যাত্রা॥ শ্রীরঙ্গ পট্টমের চুক্তি। আকস্মিক আক্রমণ···টিপুর মৃত্যু।

সাত. বাঁশের কেল্লা : ৬৩—৬৮

ইংরেজদের অজগর নীতি। অসংখ্য গণ-বিদ্রোহ। ওয়াহেবী আন্দোলন ও শরীয়ৎ-উল্লা, দুদুমিয়াঁ॥ তিতুমীর॥ ডেভিসের সঙ্গে লড়াই। আলেকজেণ্ডার ও তিতু॥ নদীয়ার কালেক্টরেটের লড়াই। তিতুর শেষ যুদ্ধ॥

আট. সাঁওতাল বিদ্রোহ : ৬৯—৭৪

সাঁওতাল শোষণের রীতি॥ ভাগনাডিহির সিধু-কানু॥ প্রথম সংঘর্ষ॥ বিদ্রোহের বিস্তার॥ পাঁচকোটির বাজার॥ মেজর বরোজের পরাজয়॥ পত্র-পত্রিকার মতামত॥ কানুর বন্দীত্ব॥ বিদ্রোহের স্তিমিতভাব॥

নয়. নীল-বিদ্রোহ : ৭৫—৭৯

নীলচাষ॥ চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস॥ বিদ্রোহের ব্যাপ্তি॥ হরিশ মুখার্জি ও শিশির ঘোষ॥ রেণী কাদের মোল্লা—নীলদর্পণ॥ গড়াই নদীতে গ্রাণ্ট॥ রহিম উল্লার লড়াই॥ বঙ্কিমচন্দ্র॥ নীলকমিশন – জার্মান নীল॥

দশ. মহাবিদ্রোহের সূচনা : ৮০—৯৫

ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি॥ সকল শ্রেণীর মানুষের

ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ॥ নানাসাহেব ও আজিমুল্লা ॥ এনফিল্ড রাইফেল ॥ রাণীগঞ্জ—ব্যারাকপুর—আম্বালায় আগুন ॥ বহরমপুরে ক্যাপ্টেন মিচেল ॥ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ ॥ চাপাটি বিতরণ ॥ মিরাটে কর্ণেল স্মাইদ ॥ বিদ্রোহের আরম্ভ ॥ বাহাদুর শাহ ॥ মেটকাফ ও ফ্রেজারের মৃত্যু ॥ অস্ত্রাগারের লড়াই—দিল্লীর গণ বিদ্রোহ ॥ দিল্লী পুনরুদ্ধার অভিযান ॥ ব্যবসায়ী ও ধনীদের ভূমিকা ॥ বিদ্রোহীদের দুর্বলতা—ইংরেজদের আত্মসমর্পণ ॥ শাহজাদা হত্যা ॥ বাদশাহের শাস্তি ও মৃত্যু ॥

এগার. ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ : ৯৬—১০৮

ঝান্সির পরিচয় ॥ গঙ্গাধর রাও এর মৃত্যু ॥ ইংরাজদের জুলুম ॥ সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ॥ ইংরেজদের পলায়ন ॥ পোইস ও ঝান্সির ইংরেজ নিধন ॥ এরস্কিনের জবাব ॥ লক্ষ্মীবাঈ-এর তৎপরতা—সমর সজ্জা ॥ ঠাকুর সিং-এর বিদ্রোহ ॥ ঝান্সি আক্রমণ—প্রতি ইঞ্চির জন্য লড়াই। ঝান্সির পতন ॥ রাণীর পলায়ন। গোয়ালিয়র দখল। কল্পির লড়াই ॥ রাণীর মৃত্যু ॥

দ্বিতীয় পর্ব

বার. ঘুমভাঙ্গানোর গান : ১০৯—১১৮

রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য গ্রহণ ॥ দরবারে লর্ড ক্যানিং-এর ঘোষণা ॥ ভারত শোষণের প্রয়োজন ॥ ধর্মঘটের সূচনা ॥ রামমোহনের চিন্তা ও প্রেরণা ॥ ডিরোজিও—মধুসূদন—ঈশ্বরগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র—বিবেকানন্দ ॥

তের. অগ্নিযুগের শুরু : ১১৯—১২৬

তিলকের তৎপরতা ॥ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ॥ র‍্যাণ্ডের অত্যাচার ॥ চাপেকার ভাই-এর দল ॥

চোদ্দ. মুণ্ডা বিদ্রোহ : ১২৭—১৩৯

ভারতের অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ॥ কোল—মুণ্ডা অসন্তোষ ॥ বিদ্রোহের সূচনা ॥ আলোচনা দ্বারা বিদ্রোহের উপসম ॥ প্রতারিত হবার উপলব্ধি ॥ বিরশার নব চেতনা ॥ প্রলয়ের দিন ॥ পুলিশী অত্যাচার ও বিরশাকে গ্রেপ্তার ॥ মুক্তি —দুর্ভিক্ষ—নতুন বিদ্রোহ ॥ খুন্তিয়ায় যুদ্ধ—বিরশার বন্দীত্ব ও মৃত্যু ॥

পনের. সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য : ১৪০—১৪৬

ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি—বেঙ্গলব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন—মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন—বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন ॥ দাদাভাই নৌরাজীর প্রতিষ্ঠান ॥ পুণা সার্বজনীন সভা। লিণ্টনের কাজকর্ম ॥ বাঙলা-নাটক— সঞ্জীবনী সভা—হিউমের প্রচেষ্টা ॥ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ॥

ষোল. বিদ্রোহী মণিপুর : ১৪৭—১৫৮

মণিপুরে ব্রিটিশ বাহিনী ॥ চন্দ্রকীর্তি—শূরচন্দ্র— টিকেন্দ্রজিৎ ॥ টিকেন্দ্রের বিদ্রোহ ॥ কুইটনের সঙ্গে বিরোধ —মিমাংসা চেষ্টা—ষড়যন্ত্র ॥ প্রাসাদ আক্রমণ—রেসিডেন্সি আক্রমণ—গণ বিদ্রোহ ॥
নৃশংসতা—আত্মসমর্পণ—টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গালের ফাঁসি ॥

সতের. বঙ্গ-ভঙ্গের ধাক্কা : ১৫৯—১৭১

অরবিন্দ ঘোষ ॥ বাঙলাদেশে স্বদেশ মন্ত্রের উত্তেজনা। নানা পত্র-পত্রিকা বাঙলা নাটক ও নাট্যশালা—বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ॥ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু—১৬ অক্টোবরের ঘটনাক্রম—শিক্ষা কাউন্সিল ॥ বিপ্লবী সংস্থা—হেমচন্দ্র দাস ॥ বোমা তৈরী—বন্দেমাতরম মামলা—সুশীল সেন ॥ ফুলার হত্যা চেষ্টা ॥ কিংসফোর্ড হত্যা—প্রফুল্ল চাকী—ক্ষুদিরাম ॥

আঠারো. মাণিকতলা বোমার মামলা : ১৭২—১৮০

পুলিশের তৎপরতা—নরেন গোঁসাই ॥ নরেন হত্যা পরিকল্পনা ॥ কানাইলাল—সত্যেন্দ্রনাথ ॥ বোমার মামলার শেষ কথা ॥

উনিশ. আত্মদানের পর্ব : ১৮১—১৯২

ইণ্ডিয়া-হাউস—দি ইণ্ডিয়ান সোসিয়ালজিস্ট ॥ উইলি কার্জনের তৎপরতা ॥ মদনলাল ধিংড়া—সাভারকর ॥ উইলি হত্যা—ধিংড়ার ফাঁসি ॥ অনন্ত লক্ষণ কানহেরে ॥ জ্যাকসন হত্যা ॥ সেনকোট্টা ওয়াঞ্চিআয়ার ॥ অ্যাশ হত্যা ॥ সাভারকারের বন্দীত্ব—পলায়ন—পুনঃ গ্রেপ্তার—দণ্ড।

কুড়ি. বিপ্লবের স্বপ্ন : ১৯৩—২০০

বিপিন পাল ও চিদাম্বরম পিল্লাই। রাসবিহারী—হার্ডিঞ্জ হত্যা চেষ্টা—নরেন্দ্র গার্ডেন ষড়যন্ত্র ॥ আমীরচাঁদ-অবোধবিহারী-বালমুকুন্দ—বসন্ত বিশ্বাস ॥ শচীন-সান্যাল ॥ সৈন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা ॥ রাসবিহারীর পলায়ণ ॥

একুশ. রক্তাক্ত বুড়িবালাম : ২০১—২০৮

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বৈপ্লবিক সংগঠনে যোগদান ॥ আশুতোষ বিশ্বাস ও সামশুল আলম হত্যা জার্মানে যতীন্দ্রনাথের দূত ॥ রডা-কোম্পানীর অস্ত্র লুট ॥ তিন জাহাজ অস্ত্র—পুলিশী হানা—সম্মুখ যুদ্ধ। বুড়িবালামের তীরে লড়াই—আত্মদান ॥

বাইশ. সত্যাগ্রহের সত্য : ২০৯—২২০

শাসন সংক্রান্ত অধিকার। গান্ধীজির পূর্ব ইতিহাস ॥ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজি ॥ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ॥ সত্যাগ্রহ আশ্রম—চম্পারণ-সত্যাগ্রহ ॥ কাপড়

কল ধর্মঘট ॥ রাওলাট বিল ও খেলাফৎ আন্দোলন ॥ সর্বভারতীয় প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ॥ পাঞ্জাব আন্দোলন ও জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ॥ গান্ধীজির নেতৃত্বে বেসরকারী কমিশন ।..

তেইশ. পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঃ ২২১—২২৭

১৯১৮ সালের শাসন সংস্কার ॥ নাগপুর অধিবেশন—বয়কট প্রস্তাব ॥ আলি ভ্রাতৃদ্বয় ॥ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন ॥ চৌরিচৌরার ঘটনা ॥ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ॥

চব্বিশ. মোপলা বিদ্রোহ ঃ ২২৮—২৩১

মোপলা ইতিহাস ॥ আলি মুজালিয়র ॥ তিরুরাজার বিদ্রোহ ॥ স্বাধীন-মোপলা রাজ্য ॥ বিদ্রোহ দমন ॥

পঁচিশ. নাগাবিদ্রোহ ও রাণী গাইদিলিউ ঃ ২৩২—২৪২

নাগা জাতি ইতিহাস ॥ আসাম রাজসভার গোলযোগ ॥ যাদুনাগ-এর সংগঠন । গাইদিলিউ-এর যোগদান ॥ আকস্মিক বন্দীত্ব—যাদুনাগের ফাঁসি ॥ গাইদিলিউ-এর বিদ্রোহ ॥ ক্যাপ্টেন লাউজলি ॥ রাণীর বন্দীত্ব—মুক্তি ॥

ছাব্বিশ. বিদ্রোহ দিকে দিকে ঃ ২৪৩—২৬২

গোপীনাথ সাহা ॥ চন্দ্রশেখর আজাদ ॥ শচীন সান্যাল । আসফাকউল্লা ॥ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ॥ রামপ্রসাদ বিসমিল ॥ ভকৎ সিং ॥ যতীন দাস ।

সাতাশ. বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ ২৬৩—২৭৪

মদনলাল ধিংড়া । বিনয় বাদল দীনেশ—অলিন্দযুদ্ধ ।

আটাশ. লবণ-সত্যাগ্রহ ঃ ২৭৫—২৭৯

'স্বাধীনতা-দিবস' উদযাপন ॥ গান্ধী আরউইন-চুক্তি ॥ দণ্ডী অভিযান । গ্রেপ্তার ॥

ঊনত্রিশ. পেশোয়ারের অভ্যুত্থান : ২৮০—২৮৬

পেশোয়ারে জনসমাবেশ ॥ জননেতা গ্রেপ্তার বিদ্রোহ ॥ সৈনিকের নিপীড়ন ॥ বিদ্রোহ দমন ॥

ত্রিশ. শোলাপুর ও সীমান্ত অভ্যুত্থান : ২৮৭—২৯১

শোলাপুরে শোভাযাত্রা—গণবিদ্রোহ—ব্যারিকেড—ইংলণ্ডীয় শ্রমিকদের প্রতিবাদ ॥ বিদ্রোহের অবসান ॥ রেডসার্ট দলের অভিযান—বিদ্রোহ দমন।

একত্রিশ. বিদ্রোহী মেদিনীপুর : ২৯২—৩০৪

বিদ্রোহের ইতিহাস। চেটুয়ার হাট—কাঁথাই অভিযান প্যাডি—ডগলাস—বার্জ হত্যা ॥

বত্রিশ. চট্টলের বিদ্রোহ ৩০৫—৩২২

সূর্য সেন। রিভোল্ট গ্রুপ। পরিকল্পনা প্রস্তুতি ;। ১৮ এপ্রিল বিদ্রোহের সূচনা। সাফল্য—প্রতিরোধের শুরু ॥ জালালাবাদের যুদ্ধ। কালারপোলের যুদ্ধ। প্রতিলতার আক্রমণ ॥ সূর্যসেনের ফাঁসি ॥

তেত্রিশ. গোলটেবিলের বিষ : ৩২৩—৩৩১

সাইমন-কমিশন—বয়কট ॥ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবী ॥ মহম্মদ আলি জিন্না ও দ্বিজাতি তত্ত্ব ॥ গোলটেবিল—নানা ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

চৌত্রিশ. দিল্লী চলো : ৩৩২—৩৩৮

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ ॥ সুভাষচন্দ্রের বন্দীত্ব ॥ সুভাচন্দ্রের পলায়ন ॥ স্টালিন—হিটলার ॥ জাপানে সুভাষচন্দ্র ॥ রাসবিহারীর সঙ্গে মিলন ॥ নেতাজীর জন্ম ॥ আজাদ হিন্দ্ সরকার ॥ বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ॥ সুভাষচন্দ্র কি মৃত ?

পঁয়ত্রিশ. ভারত ছাড়ো : ৩৩৯—৩৪৬

ক্রীপ্‌স কমিশন ।। ভারত ছাড়ো আন্দোলন । মাতঙ্গিনী হাজরা ।। মেদিনীপুর জাতীয় সরকার ।

ছত্রিশ. ত্রিপুরার বিদ্রোহ : ৩৪৭—৩৫৫

ত্রিপুরার 'পর্ত বস্ত কর বন্ধ' আন্দোলন ।। খগেন্দ্র চৌধুরী — রতনমণি । বিদ্রোহ । বিদ্রোহের সমাপ্তি ।

সাঁইত্রিশ. নৌ-বিদ্রোহ : ৩৫৬—৩৬২

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কৃতিত্ব ।। বিক্ষোভ ।। বিদ্রোহের সূত্রপাত ।। বিদ্রোহের বিস্তার ।। ভারতীয় নেতৃমণ্ডলীর নির্দেশ ।। সমাপ্তি ।।

আটত্রিশ. মুক্তির লগ্ন : ৩৬৩—৩৭৩

ওয়াভেল প্রচেষ্টা—মুসলিম লীগের দাবী । এটলীর ঘোষণা ।। কেবিনেট কমিশন ।। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ।। স্বাধীনতা লাভ ।।

বিশেষ সংযোজন : ৩৭৫ – ৪৪০

সর্বভারতীয় শহীদ ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্ণানুক্রমিক ব্যক্তিপরিচয় ।

স্বাধীনতা হারাবার কাল

ভাস্কো-ডি-গামা

রবার্ট ক্লাইভ

সিরাজউদ্দৌল্লা

মির কাশিম

টিপু সুলতান

মহাবিদ্রোহের কাল

নানা সাহেব

তাঁতিয়া তোপী

ঝাঁসির রাণী

নবজাগরণের যুগ

দেশনায়ক রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

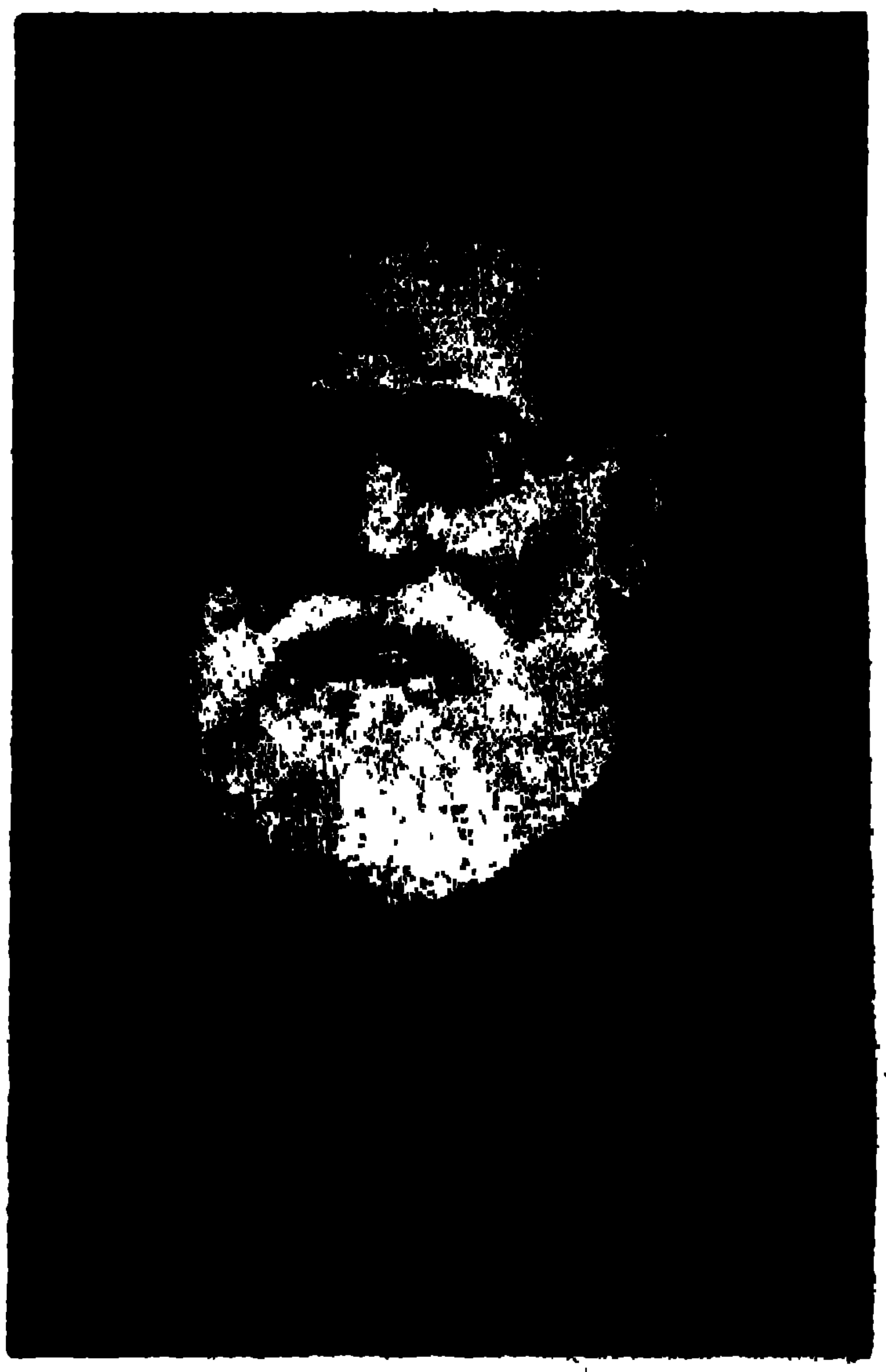

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

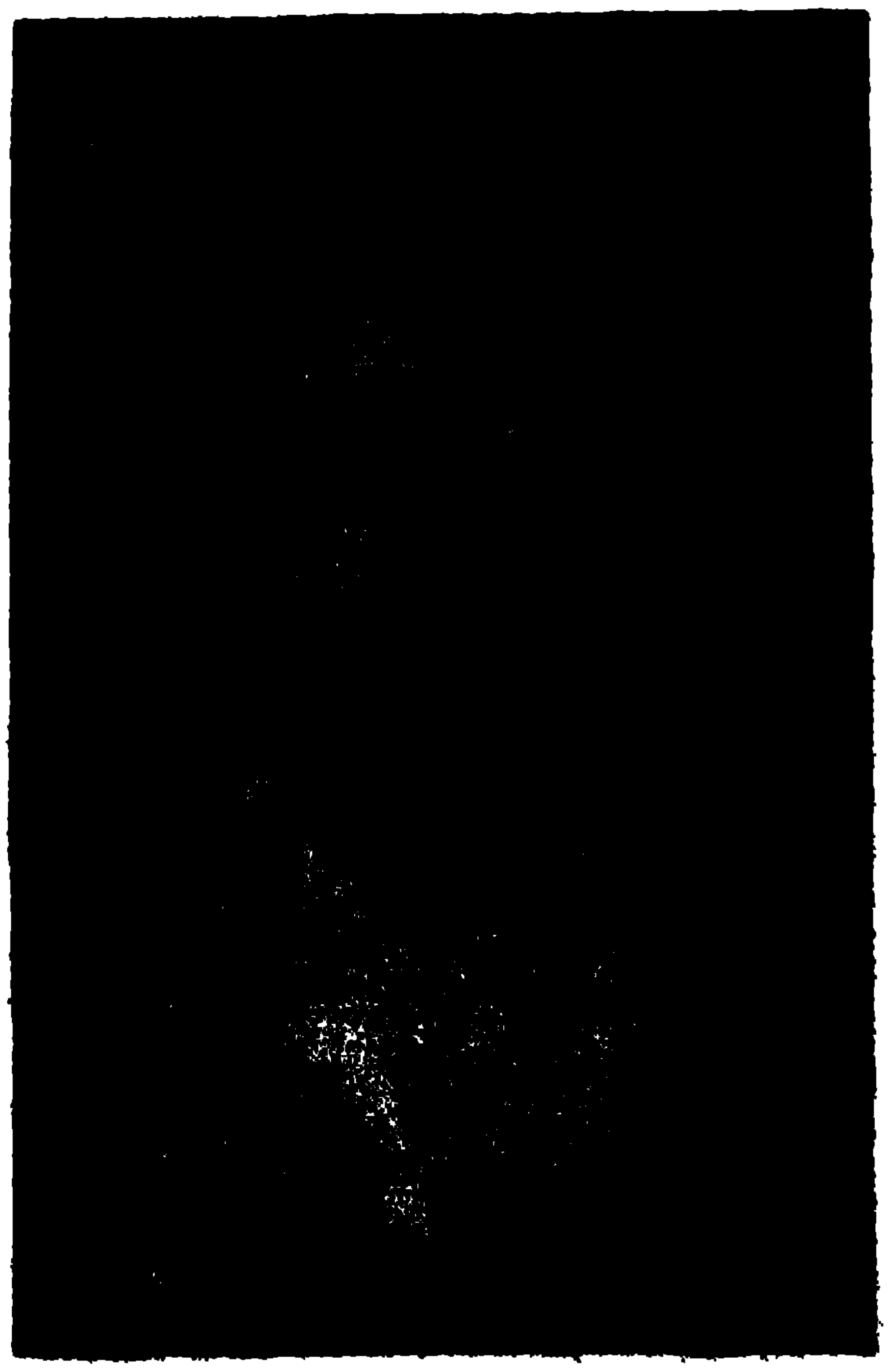

দেশনায়ক বালগঙ্গাধর তিলক

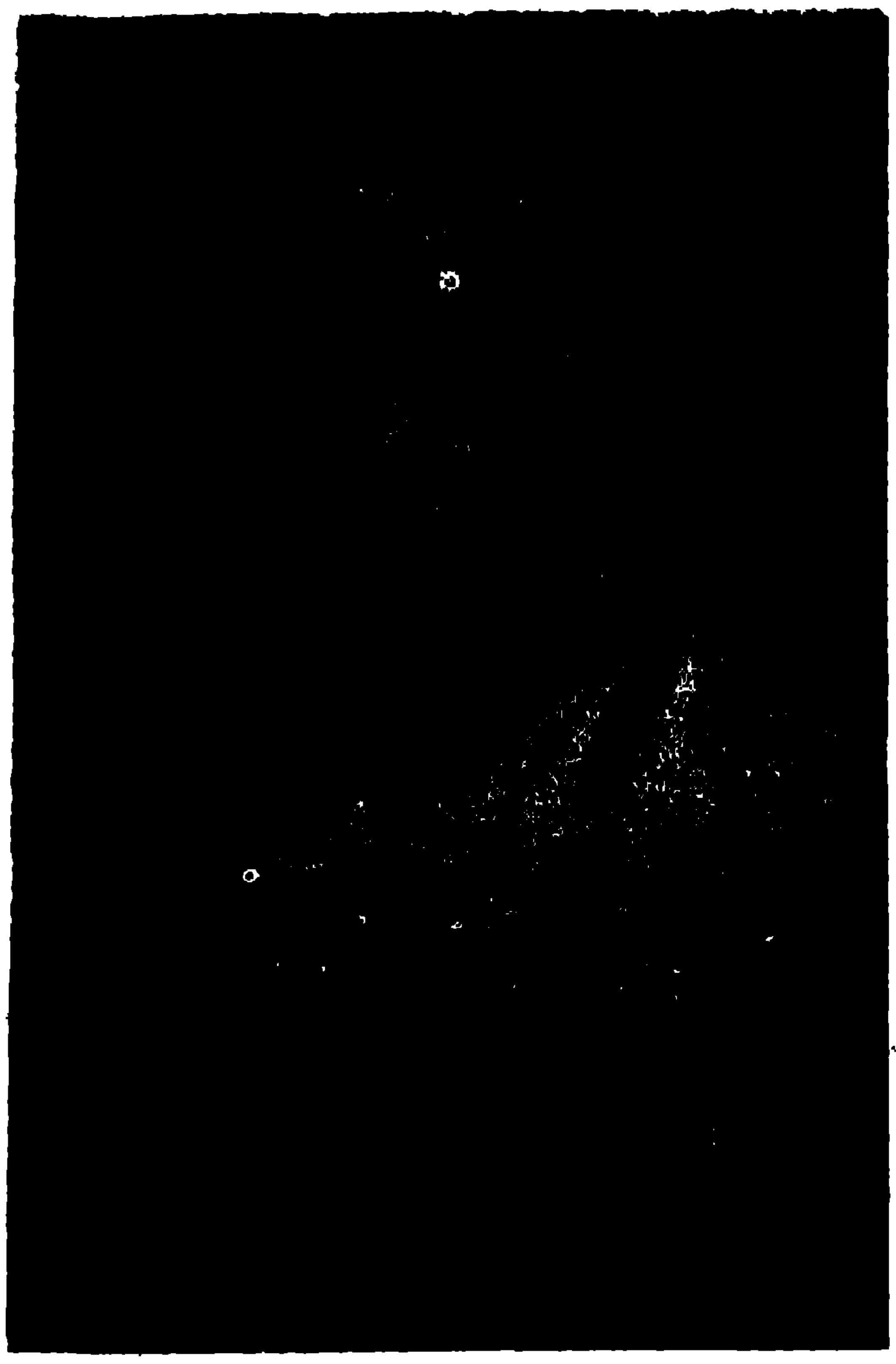

দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল

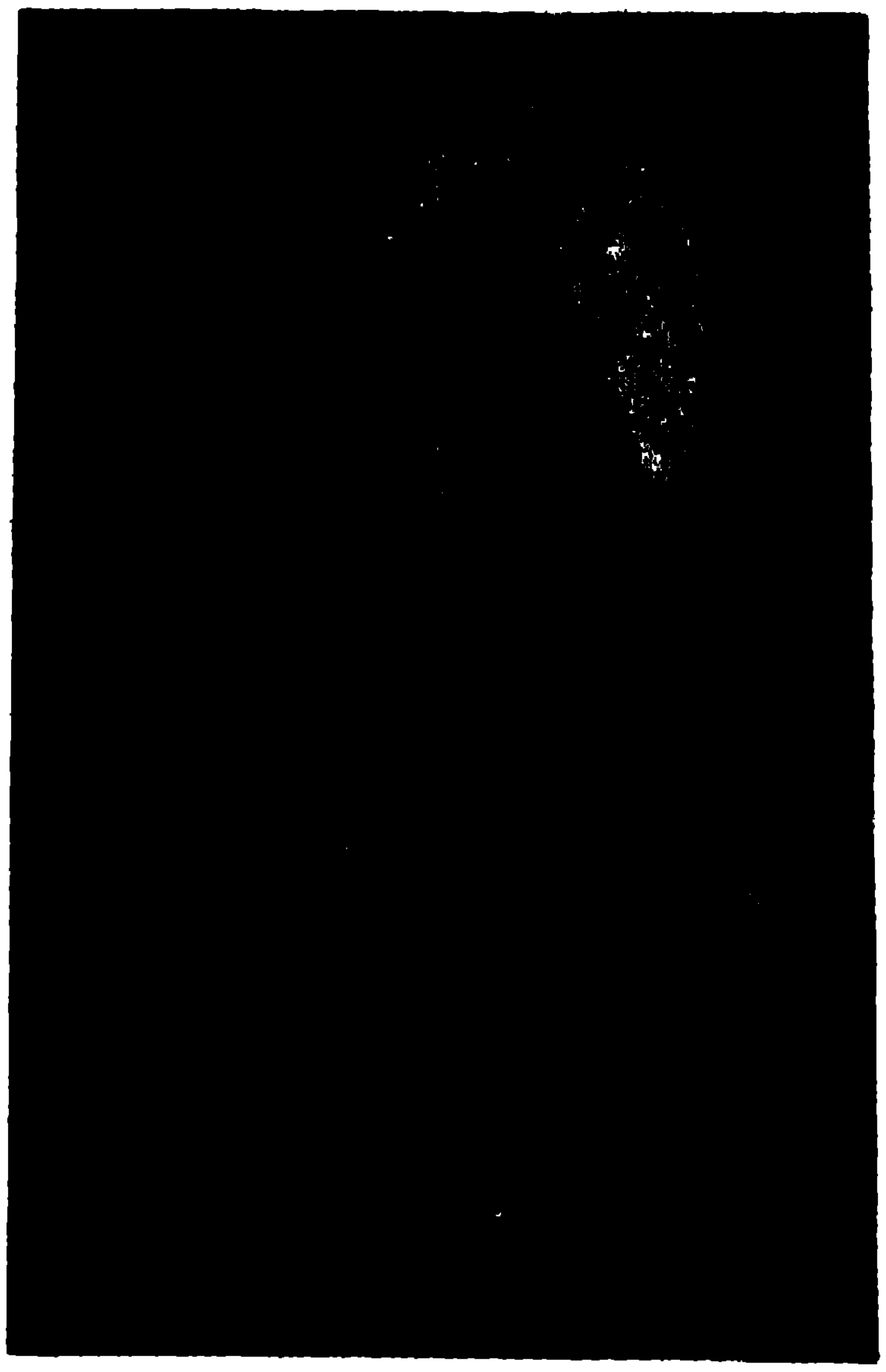

দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়

দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলে

দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত

দেশনায়ক আবদুল রসুল

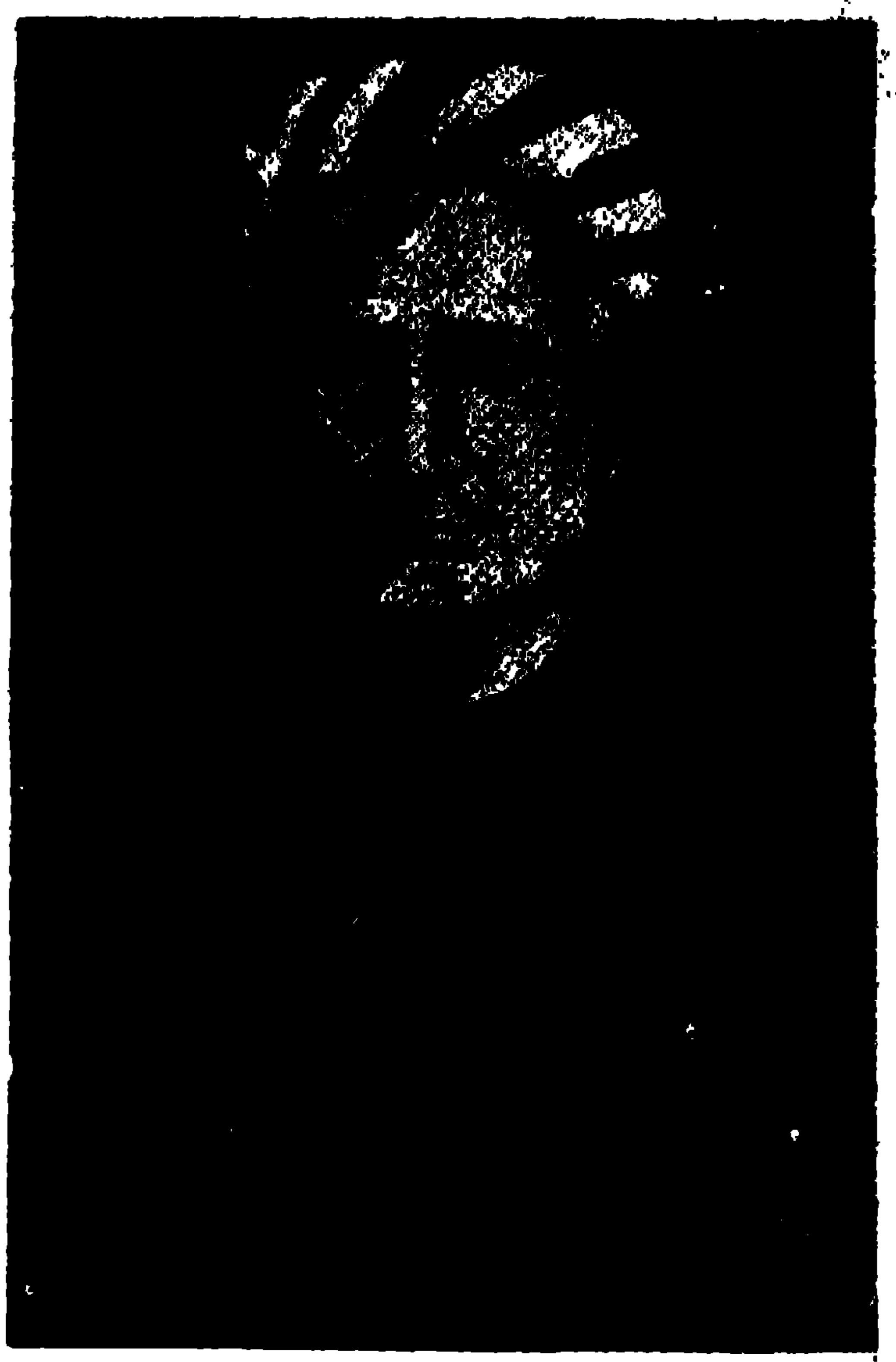

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবীনায়ক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

বিপ্লবীনায়ক প্রমথনাথ মিত্র

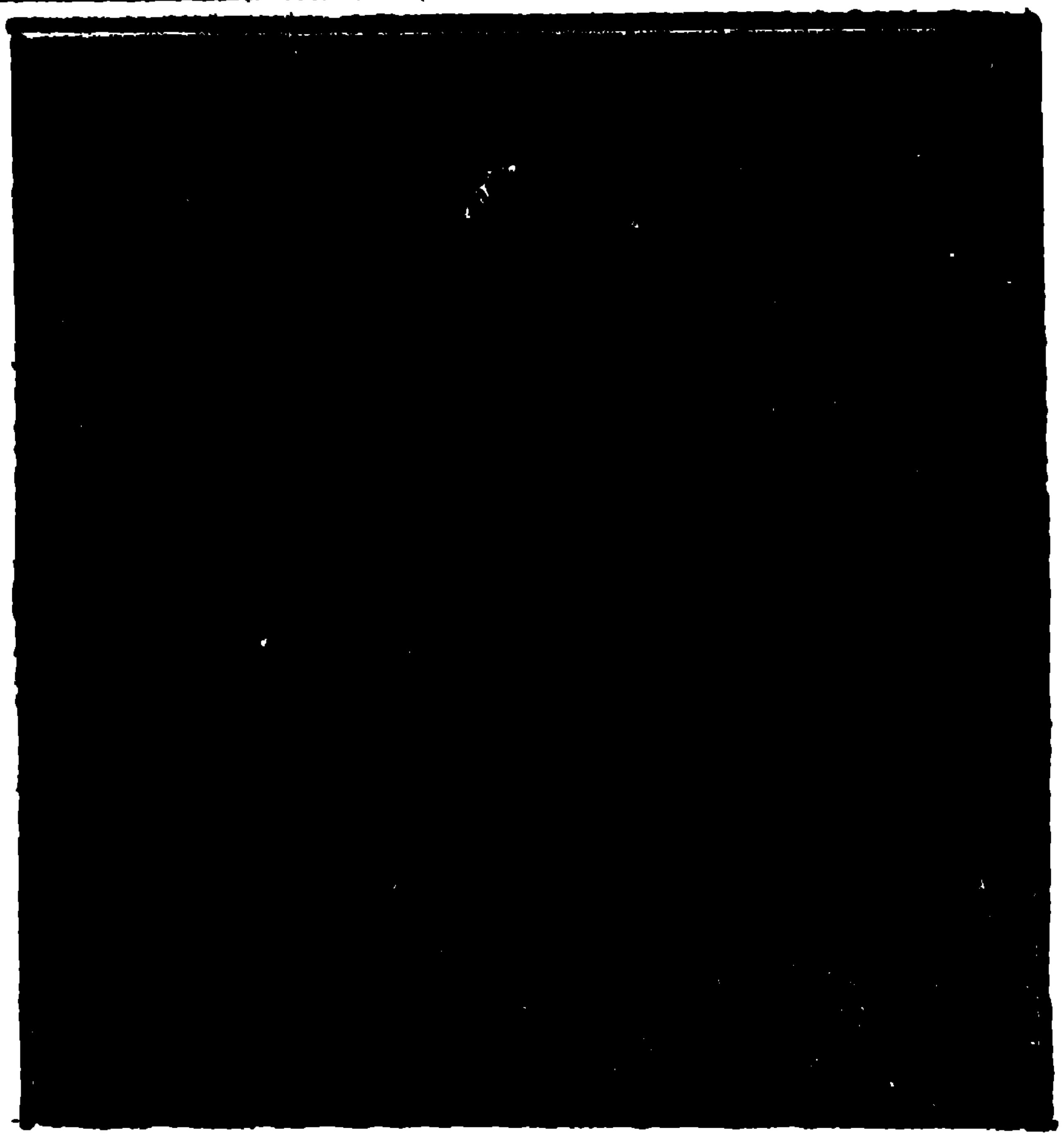

মিঃ চার্চিল আমি বোধহয় অনধিকার প্রবেশ করছি

ব্রিটিশ স্বর্ণে দুর্ভাবনা

রাণী ভিক্টোরিয়া (সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতি) এডোয়ার্ড, একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ তো, এখনও ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী আছি কি না!

এক. রূপকথা নয় ইতিহাস

গল্পটা এমনি করেই শুরু করা যাক—

এক যে ছিল দেশ। তার উত্তরে মস্ত উঁচু পাহাড়—দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি নিজেই যেন রক্ষা করত সে দেশটাকে। তার বনে বনে ফুটত ফুল, ফলত ফল। পাখিরা গান গাইত, ময়ূর পেখম তুলে নাচত। বর্ষায় হত প্রচুর বৃষ্টি। তাতে মাঠে মাঠে ফলতো প্রচুর ধান। নদীতে ছিল অনেক মাছ। দেশটায় কোন অভাব ছিল না। লোকগুলো খাটত দিনভর—সন্ধ্যায় গান গাইত, শাস্ত্র আলোচনা করত। চাষ ছাড়াও কেউ কেউ করত শিল্পচর্চা কেউ বা বিদ্যাচর্চা। অন্য দেশে যখন মানুষ কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খেতে জানত না, তখন সে দেশের লোক করত আয়ুর্বেদের চর্চা। তারা জানত পশুবলের চেয়ে অনেক বড় মনের বল। অস্ত্রের চেয়ে অনেক বড় বুকের ভালবাসা। তাই সে দেশের লোক ভাবত কি করে অন্যের মঙ্গল করা যায়, দূর করা যায় রোগ-শোক—কি করে সকলকে ভাই-এর মত বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখা যায়।

দেশটার সুখ-ঐশ্বর্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অভাবী দেশ থেকে লোক আসতে লাগল সে দেশে। তারা দেশে ফিরে সেই গল্প বলল, তাতে আরও লোক আসা বাড়ল। দূর দূর দেশের লোক যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। তারা প্রতিজ্ঞা করল এমন দেশে যাবই। পাহাড় ডিঙ্গুতে গিয়ে মরল কত—সমুদ্র পার হতে গিয়ে ডুবল জলে—তবুও থামল না।

এমনই দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এল একদল মানুষ। তাদের দিকে তাকিয়ে সে দেশের মানুষ বিস্মিত হ'ল। কি বিচিত্র তাদের দেহের রং। না, ঠিক সাদা নয়, যেন রক্তাভ। সূর্যের কিরণ দিয়ে যেন গড়া ওদের দেহ। ওদের বসন ভিন্ন রকম। আচার-বিচারও ভিন্ন—ভাষা ত' বটেই। সে দেশের মানুষ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কোথা থেকে এলে গো তোমরা! তোমাদের দেশ থেকে কেন এলে আমাদের দেশে!

ওরা বলল, সোনার দেশ তোমাদের! কত সুখ! কত ঐশ্বর্য!

সে দেশের লোকেরা ভাবল, ওদের দেশ বুঝি খুবই গরীব। হয়ত খেতে পায় না ওদের দেশে। কত সমুদ্র কত নদী পার হয়ে তাই এসেছে এদেশে। আহা! থাক! সুখে থাক বিদেশীরা। ওরা নিজেরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল রাজবাড়িতে।—রাজ দরবারে। রাজা সব শুনে রাজপ্রাসাদের পাশেই থাকতে দিলেন ওদের।

কিন্তু রাত্রে বীভৎস চিৎকারে চমকে গেল দেশের মানুষ। কে যেন চেনা কণ্ঠে চিৎকার করছে বাঁচাও বাঁচাও।

প্রভাতের আলো ফুটতে যে ছবি ফুটে উঠল তাতে আরও চমকে গেলওরা। কোথায় সেই আশ্রিত মানুষেরা! কোথায় তাদের চোখে মুখে সেই অসহায় ভাব! বরং তারাই যে রাজবাড়ির সর্বেসর্বা, এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।

রাজা প্রতিদিন ভোরে প্রজাদের দর্শন দিতেন। তাই সকলেই কাজ শুরুর আগে জমত রাজবাড়ির সামনে। আজও জমল। রাজা

দর্শনও দিলেন। কিন্তু এ কি! এ কে রয়েছে রাজবেশে! উনি তো রাজারই পরমাত্মীয়—

জনতা চিৎকার করে উঠল, আমাদের পুরোন রাজা কৈ?

নতুন রাজা বললেন, বড়ই দুঃখের কথা। তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই বিদেশীরা তা ধরিয়ে দিয়েছে। তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে সিংহাসনে বসেছি। তোমরা সিংহাসনের প্রতি যে সম্মান দেখাও বিদেশীদের প্রতিও সেই সম্মান দেখাবে।

জনতার একাংশ চিৎকার করে উঠল, আমাদের রাণীমা কোথায়! আমাদের রাজপুত্রেরা!

নতুন রাজা বললেন, রাণীমা বন্দী আছেন। তার সব সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর জন্য চিন্তা করো না। তবে রাজপুত্রেরা পালিয়েছে। হয়ত তারা তোমাদের মধ্যেই মিশে আছে। আমাদের চরেরা তাদের খুঁজছে। তাদের আমরা চাই!

কিন্তু কেন? জনতা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল।

রাজা কি বলতে গেলেন। কিন্তু কে যেন তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। বিদেশী প্রহরী ঝরকা বন্ধ করে দিল।

ক'দিন পরেই রাজার ঝরকা দর্শনে গিয়ে আবার চমকে উঠল সে দেশের জনতা। একি নতুন রাজাও আর নেই! তার বদলে এসে দাঁড়িয়েছে বিদেশী সেনাপতি। সে হাত তুলে জনতাকে বরাভয় দিচ্ছে। বলছে, তোমাদের বর্বর রাজার অন্যায়ের শাসন আজ থেকে বন্ধ হ'ল। আজ থেকে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাজা-প্রজা সব এক আইনের অধীন!

একদল জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। অন্যেরা তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের দেহে বিদেশীদের পোষাক। তাদের মুখে বিদেশীদের বুলি। ওরা নতজানু হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকল, হে আমার প্রভু! তোমরা মঙ্গলের জন্য এ দেশে এসেছ। আমাদের

মঙ্গলের জন্য শাসন দণ্ড গ্রহণ করেছ। আশীর্বাদ কর আমরা যেন তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

দেশী লোকেরা ভাবতে থাকল, তাই ত'! এরা বলে কি! আমাদের রাজা আমাদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আর এই বিদেশীরাই করবে আমাদের মঙ্গল। হবেও বা। আমরা মুর্খ মানুষ। চাষ করি, তাঁত বুনি, চাক্ ঘুরাই। জানিই বা কতটুক! ওরা পণ্ডিত—বিদেশী ভাষা শিখেছে। কত জেনেছে! ওরা যা বলছে তা হবেও বা সত্যি!

পরদিন থেকে দৈত্যরা ছড়িয়ে পড়তে থাকল দেশের দিকে দিকে। বশ করা লোকগুলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্বদেশীদের ওপর। কেড়ে নিচ্ছে তাদের ফসল, তাদের বোনা বস্ত্র বা তৈরী করা শিল্প সামগ্রী। না দিলে বন্দী করছে। চাবুকের ভয়ে গোটা দেশটাকে ক্রীতদাসের মত কাজ করাচ্ছে। আর বশ করা লোকগুলো চিৎকার করছে। আহা প্রভু কি দয়ালু! আমাদের সভ্য করবার জন্য কি চেষ্টাই না করছেন! এদিকে দিনকে দিন রাজপ্রসাদে যতই সোনার স্তূপ জমছে, ওরা চিৎকার করছে, উন্নতি উন্নতি উন্নতি!

কিন্তু কি যেন এক ব্যথা গুমরে গুমরে কাঁদে। অন্ধকার কারাগারে বসে সে কান্না শুনতে পান রাণী। একদিন রাতের বেলা কারাগারের গারদের ফাঁক দিয়ে যখন ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাণী, তখন সহসা একটা সর-সর হিলহিল শব্দে চমক ভাঙ্গল তাঁর। তিনি দেখলেন রাজপ্রাসাদের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন নতুন রাজা। তার কাছ থেকে শত সহস্র ফণাধর সাপের মত প্রায় অসংখ্য নল বেরিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে। সেগুলি গিয়ে এঁটে যাচ্ছে ঘুমন্ত প্রজাদের বুকে। রাজা তখন সেই নল থেকে টেনে টেনে রক্ত খাচ্ছেন—দিচ্ছেন অনুচরদের। আর গোটা দেশ জুড়ে ওঠছে একটা হু হু করা বুকফাটা অস্ফুট কান্না। রাণী কপাল

চাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন. হা ঠাকুর ! এ জন্যই আমার প্রজারা দিন দিন হয়ে পড়ছে নিরক্ত—নির্জীব—মৃতপ্রায় ।

রানী কারাগারের অন্নজল ত্যাগ করলেন। বসলেন তপস্যায়। বলতে থাকলেন, কি পাপ আমরা করেছি ঠাকুর ! আমাদের দেশ জুড়ে কেন এ অত্যাচার ! কেন ঐ শ্বেতদৈত্যদের এত শক্তি। কবে আমরা এদের হাত থেকে বাঁচব। কি ভাবে হবে আমাদের দেশের মুক্তি !

দিনের পর দিন যায়। রাণী তাঁর প্রশ্নের উত্তর পান না। তিনি আরও নিবিড় ভাবে ঢেলে দেন তাঁর মন। এমন সময় হঠাৎ একদিন আলোকিত হয়ে উঠল অন্ধকার কারাগার। আকাশ থেকে নেমে এসেছেন যেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি রাণীকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেও না। হতাশ হয়ো না। দৈত্যের কাল বেশি দিনের নয়। তুমি মুক্ত হবে। তোমায় মুক্ত করবে তোমার সন্তানেরা।

রাণী প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কিভাবে তা হবে দেবতা ! ওদের কত সৈন্য। কত অস্ত্র ওদের। শত শত গুপ্তচর দেওয়ালে কান পেতে আছে। অন্যদিকে আমার সন্তানেরা নিরক্ত—মনে বল নেই, হাতে নেই অস্ত্র। এদেশের একদল ওদের অনুগত. একদল দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যেরা ভীত। ওরা নিজেরা নিজেদের সন্দেহ করে। কি করে ওরা দৈত্যদের পরাজিত করে আমাকে মুক্ত করবে ?

ঈশ্বরের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাসের বলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করে। তোমার সন্তানদের বুকে যেদিন জেগে উঠবে স্বাধীনতার স্বপ্ন, যেদিন সে আর অত্যাচার সইতে চাইবে না ; যে দিন রাগে আর প্রতিজ্ঞায় তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠবে, সেদিন আপনা থেকেই তাদের হাতে অস্ত্র এসে যাবে। ওদের হাড় আপনা থেকেই বজ্রে পরিণত হবে।

রানী বললেন, কিন্তু দৈত্যরা তো থেমে থাকবে না প্রভু !

দেবতা বললেন, না। দৈত্যেরাও ক্ষেপে যাবে। আরও প্রবল অত্যাচার করবে। হত্যা করবে, ফাঁসি দেবে, পাঠাবে দ্বীপান্তরে। কিন্তু জানবে—ওদের মার যত শক্ত হবে, তোমার সন্তানদের শক্তিও তত বাড়বে। পালাতে ওদের হবেই।

শুনতে শুনতে রাণীর বুক আশ্বাসে ভরে গেল। তিনি মাথা নত করে প্রণাম করলেন। মাথা তুলতে দেখলেন, দেবতা আর নেই। কারাগার অন্ধকার। শুধু দূর আকাশে ধ্রুবতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

তবে কি দেবতা আসেন নি? তবে কি সবটাই রাণীর জাগ্রত স্বপ্ন! একি তাঁর উত্তপ্ত চিন্তার ফসল! সন্দেহে আকুল হলেন রাণী। কিন্তু পর মুহূর্তেই রাণী অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরটা কি এক মধুর গন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন তাঁর সন্তানেরা সংঘবদ্ধভাবে তাড়া করেছে দৈত্যদের। দৈত্যরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। রাণী আনন্দে আবেগে দু হাতে বুক চেপে ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

আশ্চর্য! মরার মত কঙ্কালসার মানুষগুলো অত্যাচারিত হতে হতে হঠাৎ একদিন রুখে দাঁড়াল! না—সবাই নয়। রুখে দাঁড়াল দু'চার জন। কিন্তু দৈত্যের সৈন্যেরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের মেরে ফেলল। অন্যেরা ভীত হল। কিন্তু অবাক হয়ে ওরা দেখল মৃত বিদ্রোহীদের জায়গায় রুখে দাঁড়িয়েছে আর এক দল। মরছে, মারছেও। কিন্তু দলে ত' কমছে না বিদ্রোহীরা! আসছে কোথা থেকে!

হঠাৎ জনতা দেখল, তাদের পাশ থেকেই ছুটে চলেছে একজন বিদ্রোহ করতে। সবাই ওর হাত চেপে ধরল। মরতে চাও নাকি?

সে বলল, মরি তাও ভাল। এ-অত্যাচার আর সহ্য নয় না।

স্ত্রী-কাঁদল। পুত্র জড়িয়ে ধরল। আটকান গেল না তাকে।

বৃদ্ধের দল শেষবারের মত বোঝাল, পরের জন্য বিদ্রোহ করবে ভাল কথা। কিন্তু এর ফলটা ভেবেছ কি? ওদের কত অস্ত্র, কত আয়োজন। তোমার হাতে কি আছে?

ক্রোধে হাত মুঠো করল বিদ্রোহী। হঠাৎ বিস্ময়ে অনুভব করল তার হাতে অস্ত্র এসে গেছে। বিদ্রোহী চিৎকার করে বলল, আর ভয় নেই ভাই! আমাদের হাতে অস্ত্র এসে গেছে। একবার বিশ্বাসে আর প্রতিজ্ঞায় হাত মুঠো কর, দেখবে অস্ত্র তোমার করায়ত্তে!

সে চিৎকার শুনে কারাগারে চমকে উঠলেন রাণী! কে বলে এ-কথা! সেই দেবতা কি? দেবতা কি নেমে এসেছেন সন্তানদের মধ্যে!

এদিকে ভীতরা তাকিয়ে রইল বিদ্রোহীর দিকে। দেখা গেল বিদ্রোহীর দিকে ছুটে আসছে দৈত্যের সৈন্যরা। বিদ্রোহী তাদের দিকে অস্ত্র ছুঁড়ল। বিস্ফোরণে উড়ে গেল ওদের দুর্গ। কিন্তু ওরা চেপে ধরল বিদ্রোহীকে। তাকে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসির দড়িতে নির্বাক জনতার সামনে।

দেখতে দেখতে হায় হায় করে উঠল জনতার বুক। ওরা বেদনায় বুক চাপড়াতে থাকল। সে বেদনায় ওদের বুকের হাড় যেন পাঁজর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকল। ওরা বিস্ময়ে অনুভব করল ওদের হাত আপনা থেকেই মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। সে মুষ্টিবদ্ধ হাতে এসেছে অস্ত্র। সে অস্ত্র আর কিছু নয়—তাদেরই পাঁজরের হাড়। প্রত্যেক হাড় দুঃখের আগুনে পুড়ে হয়েছে প্রতিজ্ঞার বজ্র।

ওরা প্রহরীদের বাধা অতিক্রম করে ছুটল রাজপ্রাসাদের দিকে। দেশের নামে, দেশমাতার নামে তারা জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

প্রহরীরা গর্জে উঠল, থাম!

ওরা থামল না। ক্রুদ্ধ প্রহরীরা বাণ মারল। ওদের ভেতর থেকে লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন। কিন্তু অন্যেরা ভ্রূক্ষেপও করল না। শত সহস্রজন ছুটতে থাকল। একি! এরা মৃত্যুকেও ভয় পায় না! কেন? প্রহরীরা ছুটল রাজাকে খবর দিতে।

রাজা নিভৃত গবাক্ষ থেকে নিজেই দেখছিলেন সব। প্রহরী আসতেই তিনি বললেন, আর চিন্তা করো না, পিছনের দরজা দিয়ে পালাও।

প্রহরীরা বিস্মিত হ'ল।

রাজা বললেন, ওদের বুকে স্বপ্ন জেগেছে। ভয় দূর হয়ে গেছে। ওদের হাতে এসেছে অস্ত্র। এতদিন আমরা মেরেছি, এবার ওদের মারের পালা। বাঁচতে চাও ত' পালাও।

সৈন্যেরা বলল মহারাজ! আপনি!

রাজা হাসলেন। বললেন, আমার কাজ শেষ হলে আমিও যাব। আমার জন্য চিন্তা করো না।

প্রহরীরা চলে গেল। রাজা সিংহদ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন।

জনতা যখন ছুটে এল, তখন প্রাসাদ ফাঁকা। বৃদ্ধরাজা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, এসো বীরের দল। নিজের রাজ্য বুঝে নাও।

থমকে গেল জনতা। দৈত্য-রাজার মুখে একি কথা? সে কি বিনা রক্তপাতে রাজ্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত! এ ত শত্রুর মত কথা বলে না।

রাজা যেন অন্তর্যামী। বললেন, না। আমি তোমাদের শত্রু নই। যতদিন তোমরা যোগ্য না হয়েছ, ততদিন তোমাদের হয়ে রাজ্য রক্ষা করেছি। এবার তোমরা রাজ্য বুঝে নাও।

পুরানো রাজার ছেলেরা বলল, বেশ বেশ।

জনতার একদল দাবী করল, রাজা হ'ক বড় পুত্র। আর একদল বলল, না রাজা হবে ছোট পুত্র। বড় পুত্রের রাজ্যে আমরা টিকতে পারবো না।

মুহূর্তে বিবাদ বেধে উঠল।

দৈত্যরাজ হাত তুলে থামালেন ওদের। বললেন, বিবাদ করো না। পিতৃরাজ্যে সবার সমান অধিকার। রাজ্য দুভাগ হবে। দু' অংশে দুজন রাজা হবে। কে কোন অংশ পাবে তা স্থির করে দেব আমি। দুজনকেই তা মেনে নিতে হবে।

একদল চিৎকার করে উঠল, কি ন্যায় বিচার! সাধু! সাধু! তোমাকে এতদিন অকারণে ভুল বুঝেছি রাজা।

দৈত্যরাজ মধুর হেসে বললেন, শেষ পর্যন্ত যে ভুল ভেঙেছে, এতেই আমি খুশি। তবে তোমরা দুই রাজপুত্রের অভিষেকের আয়োজন কর।

হল আয়োজন। সে কি সমারোহ। সে কি উল্লাস। দৈত্যরাজ অভিভাবকের মত হাতে ধরে দুই রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসালেন, যেমন করে রাজাকে মেরে বসিয়েছিলেন তার বংশবদ রাজ-আত্মীয়কে। কামান দাগা হ'ল। বাজি পোড়ান হ'ল। হল নাচ-গান-খাওয়া দাওয়া।

শেষে সবাই মিলে দৈত্যরাজকে তার জাহাজে তুলে দিলেন। বললেন, বিদায়।

রাজপুত্রেরা বললেন, তোমার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে!

কারো কারো কানে বন্ধুত্ব কথাটা কেমন লাগলেও রাজা কৌশলে তা স্থায়ী হতে দিলেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমাদের বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক।

রাজপুত্রদের সঙ্গে জনতাও সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, আমাদের বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক!

রাজা আবার হাসলেন। জাহাজ ছেড়ে দিল। জনতা মন্ত্র মুগ্ধের মত সে দিকে তাকিয়ে রইল যেন কোন পরমাত্মীয়কে বিদায় জানাতে এসেছে সব!

সেই আবেশ কাটিয়ে এক পাগল হা হা করে হেসে চিৎকার করে বলল, এখনও ওর জাদু কাটে নি। সাবধান! সাবধান। এখুনি রানীকে খুঁজে বের কর। রাণীর বন্দীত্ব কি ঘুচেছে!

তাই তো! সকলের মনে পড়ল রাণীর কথা। কিন্তু রাণী কোথায়? সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া মানুষের দল খুঁজতে বের হ'ল

রাণীকে। অবশেষে তাকে পাওয়া গেল অন্ধকার পাতালের এক কারাগারে।

বাইরে এসে রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন রাণী। দুই রাজপুত্রের দেহে রাজবেশ কেন? মাথায় কেন দুই মুকুট, হাতে কেন রাজদণ্ড!

জনতা বলল, যাওয়ার আগে দৈত্যরাজ নিজেই দুই রাজপুত্রকে দুই অংশে রাজা করে দিয়ে গেছে। সব বিবাদ দূর করে দিয়ে গেছে।

রাণী ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। বললেন, বিবাদ দূর করে দিয়ে গেছে, না বিবাদের মূল পুঁতে রেখে গেছে? দেশকে টুকরো করার অর্থ জান?

জনতার মাথা ঘুরে গেল। যেন চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। তারা চেঁচিয়ে উঠল, সর্বনাশ!

সেই সময়েই পাগলটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, সর্বনাশ যদি বুঝে থাক তবে প্রতিকার কর। সবাই মিলে একত্রে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। বাইরের ভাগ কিছু নয়। মনটাই সব। মন প্রস্তুত ত' সব প্রস্তুত।

রাণী চমকে উঠলেন। কে বললে একথা! এ যে দেবতার কথারই প্রতিধ্বনি। কোথায় সে!

নেই! পাগলকে আর খুজে পাওয়া গেল না।

*　　*　　*　　*

এটা কি রূপকথা? না। আদৌ নয়। বাইরে থেকে দেখতে রূপকথার মত মনে হলেও আসলে এটা আমাদের দেশেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপক। এর ভেতরেই রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হারাবার এবং অর্জনের ইতিহাসের রূপরেখা। শুধুই রূপ-কথার মত করে বলা। কিন্তু সেই খাঁটি ইতিহাসও রূপকথার মতোই চমকপ্রদ—সুখপাঠ্য। কি সেই ইতিহাসের গল্প? তাহলে শুরু করি—

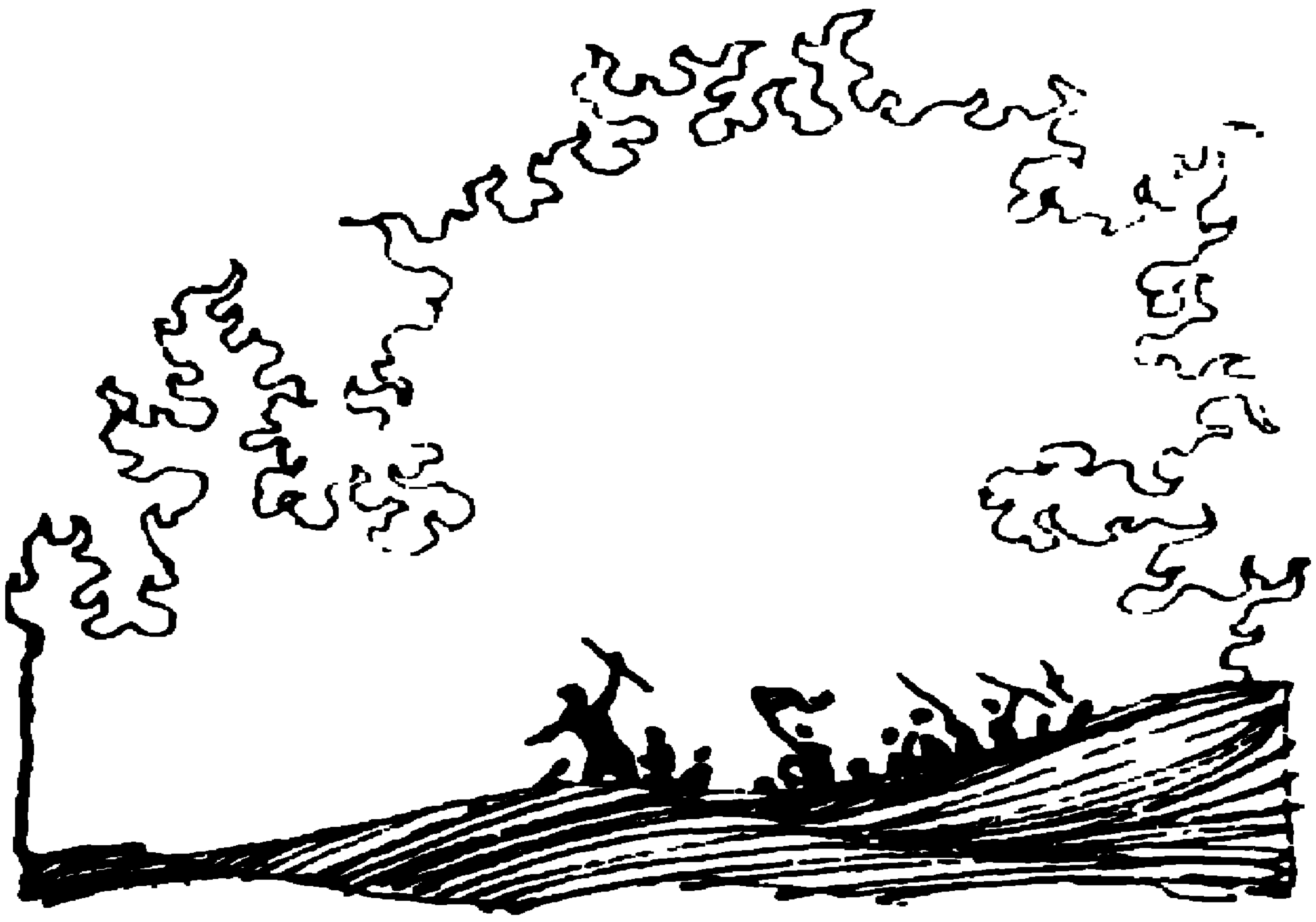

প্রথম পর্ব

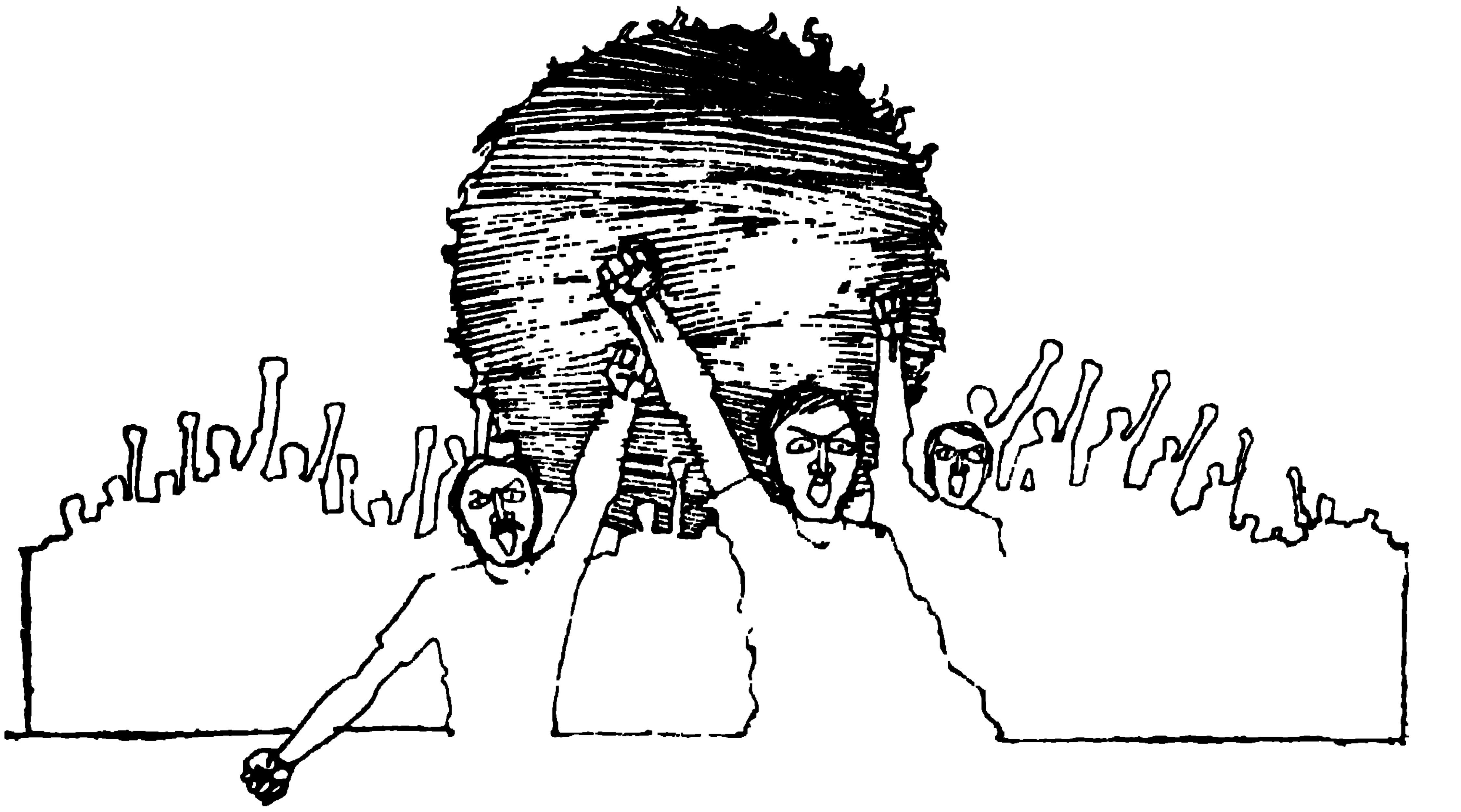

দুই

কালিকট থেকে পলাশী

আমাদের দেশ ভারত—ভারতবর্ষ—সত্যই ছিল সোনার দেশ। উত্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় যেন ভারতমাতার মাথার চূড়া। শত শত ঢেউ পাঠিয়ে অবিরাম মায়ের পা ধুইয়ে দিচ্ছে তিন তিনটি সাগর—বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর। শিরা-উপশিরার মত দেশ জুড়ে বইছে শত শত নদনদী আর তাদের শাখা নদী, উপ-নদীর দল। মাটির ওপর মায়ের স্নেহের মত ফলছে ফুল, ফল, ফলছে ফসল। মাটির তলায় অজস্র খনিজ সম্পদ। এদেশের লোক শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে সেই প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বিস্ময়। আজ থেকে কত বছর আগে থেকে যে ভারত সারা পৃথিবীতে বন্ধুত্বের বাণী পাঠিয়েছে তার হিসাব মেলানো দুষ্কর।

বহুকাল আগে থেকে স্থলপথে আফগানিস্থান হয়ে আরব-পারস্যের ভেতর দিয়ে ইউরোপে যেত ভারতবর্ষের মসলিন। তা না হলে সেদেশী রাজা-রাজড়াদের সম্মান থাকত না। এদেশের মসলারও নাম ছিল বিশ্বজোড়া। ইউরোপে তখনও চাষের উন্নতি

হয়নি। ওদের প্রধান খাদ্য মাংস। কয়েকদিন রেখে খেতে গেলেই মসলার গন্ধ দিয়ে চাপা দিতে হয় বাসী মাংসের বদ স্বাদ। তা না হলে রুচি আসে না। মসলা, কাপড় ইত্যাদি সবই যেত আরবীয় বণিকদের হাত ঘুরে ভারতবর্ষ থেকে।

ইউরোপীয় বণিকদের মাথায় প্রথম প্রশ্নটা জাগল। সেই সোনার দেশ ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি বস্ত্র মসলা-মণি-মুক্তা নিজের দেশে আনা যায় না? হটান যায় না আরব বণিকদের? আরব পারস্যের ভেতর দিয়ে না গিয়ে অন্য কোন পথে সরাসরি ভারতবর্ষে যাওয়া যায় না কি?

বণিকদের চিন্তাটা সমাজের আরও বহু মানুষের মাথায় ঢুকল— এমন কি কোন কোন রাজারও। কিছু বেপরোয়া নাবিক জলপথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রে। রাজারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। প্রথম নতুন দেশ আবিষ্কারে সফল হলেন কলম্বাস। তিনি ইউরোপের কাছে অজানা এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। নতুন দেশকে কলম্বাস ভারতবর্ষই ভেবেছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর সে ভুল ভাঙ্গল। সে দেশটা ছিল আজকের আমেরিকা।

কিন্তু ভারতবর্ষ! ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসবার পথ চাই যে! ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের অংশ পেতেই হবে।

সৃষ্টিছাড়া প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে যাত্রা করলেন ভাস্কো-ডি-গামা। এগারো মাস সমুদ্রে ভেসে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরের কাছে এসে তীরে নামলেন তিনি। অধিবাসীদের কাছে পরিচয় দিলেন, ব্যবসায়ী। এদেশে ব্যবসা করতে চাই।

কালিকটের রাজাকে জামোরিন বলা হয়। তখনকার জামোরিন ভাস্কো-ডি-গামাকে সাদরে বরণ করলেন। বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভারতবর্ষের কোন্ রাজা না চায়? তখন কালিকটের সমস্ত ব্যবসার সবটাই ছিল আরব বণিকদের হাতে। তারা এই নতুন প্রতিযোগীদের

ভাল চোখে দেখল না। তারা যতদূর সম্ভব বাধার সৃষ্টি করল। আর ভাস্কো-ডি-গামা তার শোধ নিল কালিকটে আগুন জ্বালিয়ে, কামান দেগে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ইউরোপের বণিক যে নির্ভেজাল বণিক নয় ভাস্কো-ডি-গামা তার প্রথম আগমনেই তা বুঝিয়ে ছাড়লেন।

এক বছরের মধ্যেই পর্তুগীজরা আবার ফিরে এল। এবার তারা আরও শক্তিমান। একদিকে কামান দেগে ধ্বংস করে, আর অন্য দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের জন্য। ইউরোপীয় বণিক যে কি জিনিস তা কালিকটের লোক বুঝল সবচেয়ে আগে। পর্তুগীজরা এসেই ভারতবর্ষের রাজরাজড়াদের ঘরোয়া বিবাদে অংশ নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল। আর নির্বোধ রাজবংশধরেরা নিজের লাভের স্বপ্নে ওদের ডেকে এনে ঘরে ঢোকার গোপন পথ দেখিয়ে দিতে থাকল। ভারতবর্ষের অধঃপতন শুরু হল।

এদিকে পর্তুগীজদের সাফল্যে, উৎসাহে ঈর্ষায় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও ভারতবর্ষে বাণিজ্যের হিড়িক পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে এল ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদি নানান জাতি। ইংরেজ বণিকরাতো দু-দুটো বণিক কোম্পানীই খুলে ফেলল। শেষে তারা মিলে মিশে হল এক। তার নাম হ'ল 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী'।

ইউরোপীয় সব জাতিই ভারতবর্ষে এল ব্যবসায়ীর বেশে। বলল, ব্যবসা করতে চাই, বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু সব জাতিই পর্তুগীজদের মতই সুযোগ বুঝে লুট করল, রাজদরবারে কূট ষড়যন্ত্র করল, ছোট-খাট রাজাদের বিবাদ বাধিয়ে সুযোগ বুঝে ছোট-খাট রাজ্যও গড়ে তুলতে লাগল। শুধু সুবিধে করতে পারল না ইংরেজ কোম্পানী। ইংরেজ কোম্পানী শেষ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ জয় করে রাজা হয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু তা করতে ওদের লেগেছিল প্রায় আড়াই শ' বছর।

মজার কথা হচ্ছে, এই আড়াই শ' বছরের প্রায় সবটাই মোঘল

রাজত্বের কাল। ভাস্কো-ডি-গামা ভারতবর্ষে পদার্পণের ত্রিশ বছরের মধ্যে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিল্লীর সিংহাসন দখল করলেন বাবর শাহ। একটু একটু করে বড় হতে থাকল মোঘল রাজত্ব। ক্রমে সারা ভারতবর্ষই এসে গেল তাদের শাসনে। কি অসাধারণ প্রতিপত্তি তাদের। তার সামনে বিদেশী কয়েকজন বণিকের সাধ্য কি মাথা তুলে দাঁড়ায়! মোঘল রাজত্বে তাই বিদেশী-দের দাপট কমেই রইল।

মোঘল রাজত্বের মাঝামাঝি কাল! বাবর-হুমায়ুণ আকবর বাদশার কাল কেটে গেছে। তখন সিংহাসনে আছেন জাহাঙ্গীর শাহ। তারই এক কন্যা পুড়ে গেলেন আগুনে। বাদশাহের চিকিৎসকেরা আয়ুর্বেদীয় বা হেকিমী মতে চিকিৎসা করে সুস্থ করতে পারলেন না তাকে। দুশ্চিন্তায় সম্রাটের ঘুম আসে না। সেই সময় এক উজীর বললেন, বাদশা, গুস্তাকী মাপ করেন ত' বলি।

বলুন।

ইংরেজদের চিকিৎসা পদ্ধতি না কি খুব ভাল। তাদের চিকিৎসককে বলে ডাক্তার। একবার—

বাদশা চিন্তায় পড়লেন। পর্দানশীন্ রাজকন্যাকে বিদেশীর সামনে বের করবেন? রোগী না দেখে তো চিকিৎসা সম্ভব নয়। তবে! অবশেষে জয় হ'ল পিতার। বাদশা বললেন, ডাক ডাক্তারকে।

ডাকা হ'ল। তখন দিল্লীতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে কজন কর্মচারী ছিল, তাদের চিকিৎসার জন্য ছিলেন ডাক্তার ব্রাইটন। সম্রাটের আহ্বানে রাজপ্রাসাদে এলেন তিনি। দয়ালু প্রভু যীশু তাঁর সামনে সুযোগ দিয়েছেন। যদি সম্রাটকে খুশি করা যায়! নিজের সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন ব্রাইটন।

না। ব্রাইটনের ওষুধ-পত্র যে খুব ভাল ছিল, তা বোধ হয় না।

তবে তাঁর আয়ত্তে ছিল নতুন শুশ্রূষা চিন্তা। ঘা-ধোয়ান, পরিষ্কার করা, দূষিত না হতে দেওয়া—এসব ভারতীয় চিকিৎসকেরা তেমন করে জানতেন না। ব্রাইটন অতি-নিষ্ঠায় রাজকুমারীর শুশ্রূষা করে চললেন। রাজকন্যা ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলেন। খুশি—সবাই খুশি। রাজকন্যা খুশি, তার খুশিতে খুশি সম্রাট। তিনি স্বয়ং ব্রাইটনকে ডেকে বললেন, তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই ডাক্তার।

ব্রাইটন বললেন, সম্রাট! আপনি খুশি হয়েছেন—এই তো আমার পুরস্কার। আমি আর কোন পুরস্কার চাই না।

কিছু চাও। কোন রাজপদ, জায়গীর বা—অন্যকিছু?

সম্রাটের আগ্রহে ব্রাইটন বললেন, যদি সম্রাট একান্তই দেবেন ত' আমার কোম্পানীকে একটু ব্যবসার সুযোগ দিন।

সম্রাট আরও মুগ্ধ হলেন। নিজের জন্য চায় না, নিজের কোম্পানীর জন্য চায়—নিজের প্রভুর জন্য চায়—এত বড় আত্মত্যাগী কর্মচারী ক'জন মেলে! সম্রাট বললেন, বল, তোমার কোম্পানীর জন্য কি সুবিধা চাও?

ব্রাইটন বললেন, আপনার সাম্রাজের পূর্ব-প্রান্তে বাঙলাদেশ। সেখানে আমাদের কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার দিন সম্রাট।

সম্রাট ব্রাইটনের প্রার্থনা পূরণ করলেন। তিনি শুধু ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার দস্তক দিলেন না, ব্রাইটনকেও পৃথকভাবে পুরস্কার দিলেন। ইংরেজরা চিৎকার করে উঠল, সম্রাট মহানুভব।

সম্রাটের এই মহানুভবতার মূল্য দিতে হয়েছিল গোটা দেশকে, দেশের সমস্ত মানুষকে! মীরকাশিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বটাতো বেঁধেছিল এই বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ব্যাপার নিয়েই। কিন্তু সে পরের কথা। সে-দিন আনন্দে সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে দস্তক নিয়ে এসে

বাঙলাদেশে জাঁকিয়ে বসেছিল ইংরেজরা। সোজাভাবে বাণিজ্য তারা কোন দিনই করেনি। জবরদস্তি আর অন্য লোককে ঠকান ছিল তাদের দস্তুর। এ'তে সাধারণ মানুষ ত' অতিষ্ঠ হয়ে উঠলই, এক সময় মোগল সম্রাটের অধীনে বাঙলাদেশের শাসকও এদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাড়িয়ে দিল তাদের—বের করে দিল বাঙলাদেশ থেকে। ওরা গিয়ে কেঁদে কেটে আছড়ে পড়ল তখনকার সম্রাট ঔরংজীবের পায়ে। সম্রাট তাদের ধমক-ধামক দিলেও অভয় দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন। ইংরেজরা তারই ফাঁকে সম্রাটের কাছ থেকে কাশিমবাজার আর কলকাতায় কুঠি তৈরীর অনুমতি নিয়ে ফিরে এল। সেটা ১৬৯০ সালের কথা।

সম্রাটের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করে নাকে খত দিয়ে এলেও ইংরেজরা বুঝে এলো মোঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। দক্ষিণে জেগেছে মারাঠারা। উত্তর-পশ্চিমে শিখ শক্তি। মগ-দস্যুদের আক্রমণও বন্ধ করতে পারছেন না ঔরংজীবের মত বাদশা। অতএব এ সময়ে নিজেদের এমনভাবে শক্ত করে তুলতে হবে যাতে চট্ করে আর কেউ ঘাঁটাতে না পারে। তারা বেশ আঁট-ঘাঁট বেঁধেই কাজে নামল।

বাঙলাদেশের শাসন ব্যবস্থাতেও তখন টাল মাটাল চলছে। এই সময় একটু অন্যায় করেই সিংহাসন দখল করলেন আলিবর্দ্দী খাঁ। তবে লোক তিনি জবরদস্ত। ঔরংজীবের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাধিকারী নাম-মাত্র সম্রাট। সারা দেশে দৌরাত্ম করে বেড়াচ্ছে মারাঠা দস্যুরা। শিবাজীর আদর্শ আর নেই তাদের মধ্যে। তবু এ অবস্থায় বাঙলাদেশ, বিহার-উড়িষ্যার শান্তির চেষ্টা করছেন আলিবর্দ্দী খাঁ। ইংরেজদের অভিসন্ধি এ নবাব বেশ বুঝতেন। অতএব যতদিন তিনি বেঁচে রইলেন মুখ-বুজে ব্যবসা করা ছাড়া ইংরেজদের সাধ্য রইল না।

কিন্তু ভাগ্য ভাল ইংরেজদের। মাত্র সাত বছর রাজত্ব করে

১৭৫৬ সালে মারা গেলেন আলিবর্দী। নবাব হলেন তাঁর আদরের বিশ বছরের নাতি সিরাজ-দৌল্লা। ইংরেজরা এই সুযোগে নবাবের অনুমতি না নিয়েই কলকাতায় এক দুর্গ তৈরী শুরু করে দিল।

বয়স কম হলেও সিরাজ দাদুর কাছ থেকে শিখেছিলেন অনেক। ইংরেজদের বাড়তে দেবার ইচ্ছে তাঁরও ছিল না। অতএব কাল-বিলম্ব না করে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন সিরাজ ইংরেজদের কাশিম-বাজার কুঠি দখল করে নিলেন। তারপর স-সৈন্যে আক্রমণ করলেন কলকাতা। নবাব আসছেন শুনে বেশির ভাগ ইংরেজ পালাল। যারা ছিল তারা নামমাত্র যুদ্ধ করল। নবাব কলকাতা দখল করে নিলেন। গুঁড়িয়ে দিলেন দুর্গ। কলকাতার নতুন নাম রাখলেন আলিনগর।

ইংরেজদের ব্যবসা তো বন্ধই—বাঙলাদেশ থেকে পাত্‌তাড়ি গোটাতে হবে। যখন এমন দশা—তখন ওদের মাদ্রাজ-কুঠি থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে এলেন এক সেনাপতি। তার নাম ক্লাইভ। লোকটার সাহসের সীমা নেই। যুদ্ধের রীতি-নীতিও বড় মানে না। বড় বড় হাম-বড়া কথা বলে। কিন্তু কাজও করে ফেলে বড় বড়। সে কলকাতায় এসেই ইংরেজদের মনোবল ফিরিয়ে আনল। একটু গুছিয়ে নিয়েই আক্রমণ করে বসল নবাবকে। ক'মাসের মধ্যেই সে এক সময় বন্দী করে ফেলল নবাবকে। সিরাজ ওদের কলকাতা ফিরিয়ে দিয়ে একটা চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। বাইরে শান্তি ফিরে এলেও ভেতরে ভেতরে রইল থমথমে ভাব। ইংরেজরা বুঝল নবাবের শক্তিও অন্তঃসার শূন্য।

সিরাজ বালকোচিত ব্যবহারে তার দরবারের লোকেদেরও উত্যক্ত করে ফেললেন। তারা মনে মনে এই বালকের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাইলেন। ইংরেজরা এই সুযোগ কাজে লাগাল। কাশিমবাজার কুঠিতে এক ভোজ সভায় মিলিত হয়ে ঐ সব উত্যক্ত

সভাসদেরা এক ষড়যন্ত্র করলেন। স্থির হ'ল সিরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেখানে বসান হবে সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর আলি খাঁকে। প্রকাশ্য দায়িত্ব ইংরেজদের। এজন্য রাজকোষ উজাড় করে তাদের টাকা দেওয়া হবে।

ষড়যন্ত্র পাকা হতেই ইংরেজরা উঠে পড়ে লাগল। যেন পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করবে তারা। সিরাজও বুঝলেন যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। তিনি বাধ্য হয়ে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলেন। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ আসবার জলপথের দুপাশে হুগলী, কাটোয়া আর অগ্রদ্বীপে সৈন্য মোতায়েন হ'ল। ফৌজদারের অনুমতি ভিন্ন ভাগিরথী দিয়ে বড় নৌকা বা জাহাজ চলা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে রাজধানী সংরক্ষিত করে সিরাজ নিজে সৈন্য নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করবেন স্থির হ'ল। ব্যবস্থার দিক থেকে আয়োজন হল ত্রুটিহীন।

কিন্তু হতভাগ্য নবাব জানতেন না যে ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। উদাহরণ দেওয়া যাক। হুগলীতে নদীর ওপর এ পাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত এক মস্ত লোহার শিকল টাঙ্গান থাকত। দু-পাশেই থাকত সৈন্যদল। স্বয়ং ফৌজদার অনুমতি দিলে তবে সে শিকল খুলে দেওয়া হত। কিন্তু ক্লাইভের জাহাজ অনায়াসে চলে গেল সেই পথে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা গল্প যে, শিকলের সামনে এসে জাহাজ থামতেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন ইংরেজ সেনাপতি। ক্রমে তার দেহ বড় হতে থাকল। সূর্য থেকে জ্যোতি নেমে এলো তার দেহে। হাতে এসে পৌঁছাল আগুনের মত এক তলোয়ার। সেনাপতি সেই অস্ত্র দিয়ে লোহার শিকলে আঘাত করতেই তা টুকরো হয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে। সেনাপতি আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেন। জাহাজ চলতে থাকল।

এ গল্প সেকালের লোক বিশ্বাস করলেও এ-কালের লোক বিশ্বাস

৪৭৭৫৩
২১-৪-৮৪

করে না। আজ সবাই বোঝে যে অস্ত্রে শিকল কাটা হয়েছিল তা হ'ল ফৌজদারের লোভ আর ইংরেজদের অর্থ। অর্থের বিনিময়ে ফৌজদার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

কাটোয়ার ফৌজদার তবু বাধা দিলেন ইংরেজদের। একটা লোক দেখান যুদ্ধও হয়েছিল। কিন্তু অগ্রদ্বীপে কোন বাধাই পায়নি ইংরেজ জাহাজ। আপাতঃভাবে ত্রুটিহীন ছিল যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা —সেখান দিয়েই দুশ বড় নৌকা নিয়ে ইংরেজরা এসে উপস্থিত হ'ল পলাশীতে। ওদিকে হাঁটা পথে আসছিল আর এক সৈন্যদল। তারাও এসে মিলল পলাশীর আমবাগানে। সিরাজ সেখানেই তাদের বাধা দেবেন বলে স্থির করলেন।

মীরজাফরই যে ষড়যন্ত্রের মূল এ সংবাদ পেয়েছিলেন সিরাজ। অতএব তিনি আগেই তাকে গ্রেপ্তার করবেন বলে স্থির করলেন। সংবাদ মীরজাফরের কাছেও পৌঁছাল। ভয়ে ভয়ে কাল কাটতে থাকল তার। বাড়ি থেকে বের হন না তিনি। যদি গুপ্তঘাতক হত্যা করে। সিরাজ নিজেই একদিন এসে হাজির হলেন মীর-জাফরের বাড়িতে। বললেন, দাদুর আমলের সম্মানিত সেনাপতি আপনি। আপনাকে আমি বন্দী করতে চাই না।

মীরজাফর আবেগে উছলে উঠলেন। কোরাণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করবেন। আনুগত্যের শপথ নিলেন মীরজাফর। সিরাজ খুশী মনে ফিরে এলেন।

২৩শে জুন ১৭৫৭ সাল। পলাশীর মস্ত মাঠের এক পাশে সামান্য সৈন্য নিয়ে নবাবের বিশাল বাহিনীর দিকে তাকিয়ে ক্লাইভের বুকও কেঁপে উঠল। মীরজাফর যদি সত্যি সত্যিই মত বদলান! যদি যুদ্ধ করেন। হায় রে! তবে যে গোটা ইংরেজ জাতটাই ভারতবর্ষ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে। শুধু ক্লাইভ নয়—প্রতিটি ইংরেজের মনই সংশয়ে দুলতে থাকল।

সকাল ঠিক আটটায় সিরাজের অন্যতম সেনাপতি মীরমদন কামান দেগে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁর কাছাকাছি আছেন ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে আর মোহনলাল। অন্যদিকে প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘিরে আছে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভের বিশাল বাহিনী। এই বিশাল সমাবেশ শুধু পায়ের চাপেই ইংরেজদের গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল মীরজাফর, ইয়ার লতিফ আর রায় দুর্লভের অধীনের পদাতিক, অশ্বারোহী আর হস্তীবাহিনী মোটেই যুদ্ধ করছে না। সিনফ্রে, মোহনলাল আর মীরমদনই ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করে তুললেন। এমন সময় বেলা এগারটা নাগাদ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। নবাবের তৎপর কর্মচারীরা ত্রিপল খুঁজেই পেলেন না! অধিকাংশ গোলা বারুদ বৃষ্টিতে ভিজে গেল। কিন্তু তবু অমিত বিক্রমে এগিয়ে চললেন মোহনলাল। মীরমদন আর সিনফ্রের সৈন্য দল চলেছে তার পাশে পাশে। দরকার নেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ আর রায় দুর্লভের সাহায্যের। জয় হাতের মুঠোয়।

ভাগ্য খারাপ নবাবের। হঠাৎ এক কামানের গোলা এসে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল মীরমদনকে। মীরমদন ভূমিশয্যা নিলেন। ক্ষণেকের জন্য থামলেন মদনলাল। বন্ধুর জন্য একবার বুঝি তার শোক জাগল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তো আবেগের স্থান নেই। আর তাছাড়া 'বীর শোক অশ্রু নহে অসির ঝঙ্কার'। এগিয়ে চললেন মোহনলাল আর সিনফ্রে। আর বড়জোর আধঘণ্টা। তারপরেই যুদ্ধ শেষ। ইংরেজদের তারপর ভারত ছাড়া করে তুলবেন নবাব।

বিপদ গুণলেন মীরজাফর। নবাব জিতলে তার সর্বনাশ। যেমন করে হোক যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে। মীরজাফর ছুটলেন নবাবের কাছে। শিগ্‌গির আজকের মত যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিন নবাব। আজকের

যুদ্ধের গতি ভাল নয়। নতুন করে সৈন্য সজ্জা করে আগামীকাল পুনরাক্রমণ করা হবে।

কিন্তু—

নবাব মীরজাফরের মুখের দিকে তাকালেন। না, ঐ বৃদ্ধের মুখে তো কোন অভিসন্ধি দেখা যাচ্ছে না। তবে কেন যুদ্ধ বন্ধ করতে বলছেন সেনাপতি। নবাবের জানা যুদ্ধ-নীতিতে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শকে সমর্থন করে না। তবে? বিশ বছরের সিরাজ ভাবল, তার অভিজ্ঞতা অল্প। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ সেনাপতি নিশ্চয় মঙ্গলের জন্যই এ পরামর্শ দিচ্ছেন। নবাব সেনাপতির হাতে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ নামা তুলে দিলেন। সিনফ্রে আর মোহনলালকে বিস্মিত করে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধের বাজনা বেজে উঠল।

বিস্মিত ইংরেজরাও। কে তাদের এত বড় বন্ধু যে এই সময়ে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিল! মরতে মরতে বেঁচে গেল ইংরেজরা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর ঠিক এই সময়েই ইংরেজ শিবিরে এসে হাজির হল মীরজাফরের দূত। তার হাতে চিঠি। লেখা হয়েছে, বহু কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করা গেছে। নবাব-সৈন্য অগোছাল। এই মুহূর্তে আক্রমণ কর নবাব শিবির।

ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করল আবার। মোহনলাল বা সিনফ্রে তার সৈন্যদল গোছাবার সময় পেলেন না। তাঁদেরও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে হ'ল। তা দেখে মীরজাফর নবাব শিবিরে গিয়ে তাঁকে পালাতে বললেন। সিরাজ জানতেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানর অর্থ চিরকালের মত পরাজয় বরণ করা। তবু পালাতে হ'ল তাঁকে। নইলে মনে হল তার সৈন্য দলই তাঁকে বন্দী করে তুলে দেবে ইংরেজদের হাতে। তাই মাত্র দু হাজার সৈন্য নিয়ে নবাব ফিরে চললেন রাজধানীর দিকে। রাজধানী থেকে আর একবার যুদ্ধের আয়োজন করা যেতেও পারে!

নবাব পালাতে ইংরেজদের বাধা দেবার কেউ রইল না। ক্লাইভ

এগিয়ে এসে মিশলেন মীরজাফর, ইরার লতিফ, রায় দুর্লভের সঙ্গে। কিন্তু সিরাজ কোথায়? পালিয়েছে জেনেই আগে তাকে গ্রেপ্তার করতে লোক পাঠালেন ক্লাইভ। আগে নবাবকে গ্রেপ্তার করা দরকার। আশ্চর্য। নবাব শিবিরের অত সোনাদানা পড়ে রইল। একজন ইংরেজ সৈন্যও লুট করল না। ছুটল পলাতক নবাবের পেছনে। এতবড় নিয়ম-নিষ্ঠা কর্তব্য পরায়ণতা ভারতীয় দলে ছিল না।

এ সংবাদ এসে পৌঁছাল নবাবের কানে। তখন মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদ অন্ধকার। বাতি জ্বালবার জন্য একজন দাসী-বাঁদীও অবশিষ্ট নেই—সব পালিয়েছে। এক কন্যা, স্ত্রী লুৎফান্নেসাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রায় চোরের মতই রাজধানী ত্যাগ করলেন সিরাজ।

রাজমহলের কাছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যাত্রা থামালেন সিরাজ। সামনে এক ফকিরের দরগা। সেখানে গিয়েই আশ্রয় চাইলেন তিনি। দুর্ভাগ্য তাঁর, দরগার দানশা ফকির তাঁকে চিনে ফেলল। খাবার সংগ্রহ করে আনার নাম করে গিয়ে সে ডেকে আনল সৈন্যদল। তারা এসে গ্রেপ্তার করল সিরাজকে।

ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে, ছ্যাকড়া ঘোড়ার টানা গাড়িতে বসিয়ে সিরাজকে ফিরিয়ে আনা হ'ল মুর্শিদাবাদে। কিন্তু তার আগেই ২৯শে জুন বিজয়ী ক্লাইভ প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে। সেদিন বাদশাহী সড়কের দু'পাশে যে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা শুধু হাতে আক্রমণ করলেও মাত্র সাত শ' সৈন্য আবরণের মধ্যের ক্লাইভ নিঃশেষ হয়ে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য! সিরাজ-বিজয়ী ক্লাইভকে তাঁরা দেখল ভয় আর বিস্ময়ের চোখে। স্বয়ং মীরজাফর এগিয়ে গিয়ে ডেকে আনলেন ক্লাইভকে—অভ্যর্থনা জানালেন। ক্লাইভও হাত ধরে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসালেন। রাজপ্রসাদে অনেক বাদ্য বাজল, বাজি পুড়ল কিন্তু মুর্শিদাবাদের একটি লোকও আনন্দে উল্লসিত হ'ল না।

বরং যেদিন সিরাজকে ফিরিয়ে আনা হ'ল মুর্শিদাবাদে, সেদিন সকলেই নীরবে প্রকাশ্যে অশ্রুপাত করল। ওরা বিদ্রোহ করবে না তো! অতএব তাড়াতাড়ি সিরাজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কে নেবে সেই দায়! দুর্ভাগ্য এই যে, এজন্য এগিয়ে এল সিরাজেরই অন্নে প্রতিপালিত একজন—নাম তার মহম্মদী বেগ। সিরাজ তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। এ দেশ থেকে বহু দূরে গিয়ে দরিদ্রের মত জীবন কাটাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শেষ পর্যন্ত একবার আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে চাইলেন। কিন্তু কিছুই করতে দিল না মহম্মদী বেগ। সে পশুর মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করল সিরাজকে।

বাঙলার তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সেই অস্ত গেল। সরাসরি সিংহাসনে না বসলেও বাঙলার শাসনের চাবিকাঠি রইল ইংরেজদের হাতে। বাঙলায় ঘাঁটি তৈরী করেই ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষ দখল করল। সে দিন প্রকাশ্য সিংহাসনে মীরজাফর বসলেও সেটা যে লোক দেখান, তা সাধারণ মানুষটিও জানত। তাই তারা প্রকাশ্যেই লোক শুনিয়ে মীরজাফরকে বলত 'ক্লাইভের গাধা'।

তিন

পলাশী থেকে বক্সার

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গেল বহুগুণ। ইচ্ছে করলে সেদিনই তারা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করে নিতে পারত। কিন্তু তা তারা নিল না, কারণ, তারা বেশ জানত, যে তা হলে দেশে যে বিপ্লব শুরু হবে তা সামলানোর ক্ষমতা তাদের নেই। অবশ্য সেদিন ইংরেজরা এভাবে চিন্তাও করেনি। রাজা আমাদের তাঁবে থাকুন আমরা সেই সুযোগে বেশ লুটে-পুটে নিই—এটাই ছিল তাদের ইচ্ছে। তাই দিল্লীতে সম্রাট, আর রাজ্যে রাজ্যে নবাবদের তারা সেলাম বাজাত আর ভঙ্গিটা দেখাত যেন তারাই সব।

এর কারণ অনেকগুলো। বহু রাজ্যেই রাজদরবারে নানা ষড়যন্ত্র করে ইংরেজরা বুঝে ফেলেছিল যে এদেশের সিংহাসনগুলোতে রাজাকে বসান-না বসানর ক্ষমতাটা তাদের হাতে এসে গেছে। আর এদেশে এমন কোন নবাব বা সম্রাট নেই যার সুশিক্ষিত

সৈন্যদল আছে। সৈন্যদল বিরাট কিন্তু তাদের শৃঙ্খলা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে লুট-পাট আর নইলে প্রাণ নিয়ে পালানই তাদের লক্ষ্য। সামান্য সুযোগের টোপ ফেললে সৈন্য থেকে সেনাপতি সব কেনা যায়।

এতদিনে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী শক্তিগুলিও হটে গেছে ভারতবর্ষ থেকে। গোটা ভারতবর্ষে যেন তাদের যদৃচ্ছ বেড়াবার আর লুটের জায়গা। অতএব ইংরেজ কর্মচারীরা দু' জাতের ব্যবসা শুরু করলেন। এক কোম্পানীর নামে, আর দুই প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এই মশা-মাছি কাঁচা-কাদার গরমের দেশে এসেছি তো বৃথা নয়। ক' বছর কষ্ট করে প্রচুর টাকা পয়সা জমিয়ে দেশে গিয়ে যদি নবাবী করতে না পারলাম তবে ম্যালেরিয়ায় মরা বা সাপের কামড়ে বা বাঘের পেটে যাওয়ার সম্ভবনার মাঝে এলাম কেন! পলাশীর যুদ্ধের পর পরই যে পরিমাণ অর্থ নিয়ে ক্লাইভ দেশে ফিরলেন—তা সকলের কাছেই আদর্শ হয়ে গেল। সকলেই এক একটা ক্লাইভ বনবার প্রত্যাশায় রইলেন।

কিন্তু সুযোগ কোথায়! বৃদ্ধ নবাব তো ভাঁড়ে মা ভবানী। ব্যবসা করে আর কতটুকু জমে। পলাশীর যুদ্ধের লেনদেন যারা কাছ থেকে দেখেছিলেন, ইংরেজদের সেই সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা একেবারে ছোঁক ছোঁক করতে থাকলেন। পলাশীর ষড়যন্ত্রের মত আর এক ষড়যন্ত্র করা যায় না!

দেশী মানুষদের মধ্যেও একজন ষড়যন্ত্রটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। লোকটা সেকালের পক্ষে পণ্ডিত। অর্থনীতিতে অত ঝানু লোক সেকালে বাঙলাদেশে ছিল বলে বোধ হয় না, লোকটি করিৎকর্মাও বটে। সিরাজের আমলে মানুষটি তার অনন্ত শক্তিকে কাজে লাগাবার কোন সুযোগ পায়নি। মানুষটি হলেন মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম।

ষড়যন্ত্রটার কথা জেনে তাঁর মন খুশিই ছিল। শ্বশুরের আমলে অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কার্যকালে মীরকাশিমের ভাগে ছিঁটে ফোঁটা পড়ল। বেশির ভাগ ক্ষমতা রইল ইংরেজদের হাতে—অবশিষ্টটুকু একা দখল করে মীরজাফরের পুত্র মীরন তড়পে বেড়াতে থাকলেন। মীরজাফর এখন আর শুধু ক্লাইভের গাধা নন্—তিনি মীরণেরও ভেড়া। মীরকাশিম সব দেখেন আর মনে মনে গুমরান।

এমন অবস্থায় দু-দুটো ঘটনা ঘটল। একবার বেশ কয়েকমাস মাইনে না পেয়ে মীরজাফরের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেলল রাজ-প্রাসাদ। এই বিপদ থেকে শ্বশুরকে রক্ষা করলেন মীরকাশিম। নিজে সৈন্যদলের মাইনে মিটিয়ে দিলেন। সৈন্যদলে জয়-জয়াকার পড়ে গেল মীরকাশিমের। সৈন্যদল অনেকটাই তার বশে চলে এলো। রাজদরবারে প্রতিপত্তি বেড়ে গেল তার। আর ঠিক এই সময়েই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হ'ল মীরণের।

আগে থেকেই নানা কারণে ইংরেজের সঙ্গে মীরকাশিমকে যোগাযোগ করতে হ'ত। এই সময়ে তখনকার ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে গাঢ় যোগাযোগ ঘটল। মীরকাশিমের মনে সিংহাসনের স্বপ্ন আর গভর্নরের মনে টাকার লোভ। মণিকাঞ্চন যোগ। আরও একটা ষড়যন্ত্র পেকে উঠল। আর তারই সূত্রে হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ইংরেজ সৈন্যরা ঘিরে ফেলল মীরজাফরের রাজ-প্রাসাদ। তার বিরাট সৈন্যদল মীরকাশিমের ইঙ্গিতে চুপ করে রইল। যার নুন খায় তার গুণ গাইবে না কেন? সৈন্যরাও তো মীরজাফরের চেয়ে মীরকাশিমের পক্ষপাতী। ঘুম থেকে উঠে নবাব দেখলেন তাঁর অবস্থা সিরাজের চাইতেও খারাপ।

অতএব বাক্য ব্যয় না করে ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে ডেকে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, দস্তক, কোষাগারের চাবি ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিয়ে মীরজাফর সিংহাসন ত্যাগ করলেন। এ সময়ে উপকারী বন্ধু ক্লাইভের

কথা স্মরণ করে তাঁর চোখ ভিজে এলো। তিনি বালকের মত আবদার ধরলেন তাঁকে বিলেতে ক্লাইভের কাছে পাঠিয়ে দিতে নতুবা, অন্ততঃ কলকাতায় তাকে বাসস্থান দিতে। মুর্শিদাবাদের মাটিতে তার ঘেন্না ধরে গেছে।

ইংরেজরা তার কলকাতা বাসের প্রস্তাব অনুমোদন করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। আর নিঃশব্দে রাজ্য জয় করে সিংহাসনে বসলেন মীরকাশিম। সিংহাসনে বসলেন না বলে সিংহাসন কিনলেন বলাই ভাল। কেনার মূল্য বাকী রাখলেন না মীরকাশিম। যত-খানি সম্ভব দিলেন নগদে আর বাকী অর্থের জন্য মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের এবং ভোগের দায়িত্ব দিলেন কোম্পানীকে। নবাবের সঙ্গে তাদের আর আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক রইল না।

এবার অর্থনীতির ছাত্র মীরকাশিম তার আর্থিক অবস্থাটা বুঝে নিতে চাইলেন। কোষাগার খোলা হ'ল। শূন্য। সব শূন্য। তার শ্বশুরের আমলে বেশিরভাগই নিয়ে গেছে ইংরেজরা। বাকী হয়েছে অপব্যয়। বাকী যা ছিল ঝেড়ে ঝুড়ে ইংরেজদের পাওনা মিটিয়ে তিনি মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এখন! এখন অর্থ পাওয়া যায় কোথায়?

মীরকাশিম জানতেন, To save is to earn. অনাবশ্যক অপচয় রোধ করলেও আয় বাড়ে। অতএব রাজদরবারের সব জাঁক-জমক কমিয়ে দিলেন মীরকাশিম। রাজপ্রসাদ ও রাজকোষে সোনা-রূপোর বাড়তি জিনিসপত্র দিলেন বিক্রি করে। কিন্তু খরচ কমলেও এতে তহবিল বাড়ল না। মীরকাশিম রাজস্ব বাড়ালেন না। তিনি ধনী ব্যক্তিদের কাছে সম্পত্তির হিসেব চাইলেন আর প্রায় কোন ধনী ব্যক্তিই সম্পত্তির প্রকৃত হিসেব দিতে পারলেন না। বেহিসেবী অংশ জমা হতে থাকল রাজকোষে।

এতে দ্রুত রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকল বটে, কিন্তু রাজ্যের

ধনী ব্যক্তিরা, আর এরাই ছিলেন প্রতাপশালী মানুষ,—এরা মীরকাশিমের ওপর, তলায় তলায় আক্রোশবদ্ধ হতে থাকলেন। একরোখা জীবের মত নবাব এ সব না ভেবে নিজের পরিকল্পনা মত এগুতে থাকলেন।

নবাব প্রথমেই মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন রাজধানী। মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গের স্থান হিসাবে সুরক্ষিত—নবাব দুর্গও তৈরী করলেন সুদৃঢ়। মুঙ্গেরে রাজধানী সরাবার সবচেয়ে বড় এবং গোপন কারণ ছিল। নবাব ইংরেজদের থেকে দূরে থাকতে চাইছিলেন।

মীরকাশিম বুঝেছিলেন ইংরেজদের শক্তির উৎস—তাদের সুশিক্ষিত সৈন্যদল আর সু-উন্নত অস্ত্রশস্ত্র। মুঙ্গেরে তাই বিদেশী নায়কদের অধীনে সৈন্য দল প্রস্তুত হতে থাকল আধুনিক রণনীতিতে. আর বসল অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরীর কারখানা। অল্প দিনের মধ্যেই সমরু আর মার্কার নামে দুই ইউরোপীয় সেনাপতির অধীনে বিশাল পদাতিক বাহিনী আর গুরগীন খাঁর অধীনে গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে উঠল।

মীরকাশিমের প্রস্তুতি সন্দেহ জাগাল ইংরেজদের মনে। মীরকাশিম জানালেন, রাজ্যের বড় অংশটাই তো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। রাজ্য না বাড়ালে রাজত্ব টেঁকাব কি দিয়ে! সৈন্য দিয়ে নতুন দেশ জয় করব।

কোন দেশ ?

মীরকাশিম জানালেন, নেপাল। আর সত্যি সত্যি নেপাল জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন নবাব। অনেক আগে একবার বক্তিয়ার খিলজি গিয়েছিলেন নেপাল আর তিব্বত জয় করতে। বিশাল বাহিনীর সর্বস্ব হারিয়ে কোন ক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি। পরাজিত মুখ আর কাউকে দেখান নি বক্তিয়ার। যে কটা দিন বেঁচেছিলেন যেন আত্মগোপন করে লুকিয়ে ছিলেন

রাজপ্রাসাদে। প্রায় আড়াইশ বছর পর মীরকাশিম গিয়েও তেমন পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে ফিরে এলেন।

আয় বাড়বার বদলে রাজকোষ আবার শূন্য হয়ে এল। ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত নবাব। সময় পেলে, তিনি যে তৎপরতা নিয়ে কাজ করতেন, তাতে সামলে উঠতে পারতেন। কিন্তু সে সময় পেলেন না নবাব। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে এলো।

আমরা আগেই বলেছি যে, ইংরেজরা মোঘল দরবার থেকে কোম্পানীর নামে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার যে অনুমতি পেয়েছিল, তাকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরাও নিজেদের ব্যবসার কাজে লাগাত। মীরকাশিম বললেন, এটি চলবে না। দস্তক অনুসারে কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করুক, কিন্তু ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসা শুল্কহীন হতে পারবে না। শুল্ক দাও—ব্যবসা কর।

ইংরেজ কর্মচারীরা সর্বনাশ গুনল। এর সঙ্গে ছোটবড় প্রায় সব ইংরেজ কর্মচারীই জড়িত। অতএব তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, কভি নেই। এতদিন বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে আসছি। এটা আমাদের অধিকার। নবাব শুল্ক চাইতে পারেন না।

নবাব বুঝলেন সোজা পথে ইংরেজরা শায়েস্তা হবে না। তিনি আর এক চাল চাললেন। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে বাণিজ্য করই তুলে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন শুধু ইংরেজরা নয় দেশী ব্যবসায়ীকেও কর দিতে হবে না। দেশী ব্যবসায়ীরা নবাবের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

কিন্তু সোনা ব্যাঙের ডাক সাপের কানেই আগে পৌঁছায়। তাই দেশী ব্যবসায়ীদের জয়ধ্বনি বড়ই তিক্ত হয়ে দেখা দিল ইংরেজদের কানে। আইনতঃ কর নেওয়া না নেওয়া নবাবের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু যে বিশিষ্ট অধিকার এতদিন শুধু ইংরেজরা ভোগ করছিল তা

হঠাৎ সকলের সামনে খুলে দেওয়ায় ইংরেজরা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাল। একে ইংরেজরা ভাবল চূড়ান্ত আপমান। এ অপমানের শোধ নিতে পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠে পাটনা শহর দখল করে নবাবের লোকজন সব তাড়িয়ে দিলেন।

সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ নবাব তখনই পাটনা উদ্ধারের আদেশ দিলেন। নবাবী ফৌজ পাটনা তো দখল করলই, ওদের পাটনার কুঠিও একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

আর নয়। মীরকাশিমের মধ্যে সিরাজের ভূতটাকে অনেকদিন ধরেই দেখছিল ইংরেজরা। ভ্যান্সিটার্ট যে মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে আনলেন—তা অনেকেই ভাল চোখে দেখেন নি। ইংরেজদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মীরকাশিম বিদ্বেষের কথা ভ্যান্সিটার্ট তার নবাব বন্ধুকে জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু গর্বিতস্বভাব মীরকাশিম নবাবী করলে মাথা উঁচু করে করবারই পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব এই উপলক্ষ্যে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সরাসরি যুদ্ধ বেধে উঠল। দু' পক্ষই বুঝলেন যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। নবাব তার প্রস্তুত সৈন্য দল আর অফুরন্ত গোলাবারুদ নিয়ে ইংরেজদের পিষে মারবার উদ্যোগ নিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের। মীরকাশিমের এত বড় আয়োজনও ব্যর্থ করে দিল কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক। কাটোয়া, উদয়নালা আর ঘেরিয়ার তিন তিনটে যুদ্ধে হারতে হারতেও জিতে গেল ইংরেজরা, নবাব পালালেন।

তবু ভাঙ্গলেন না নবাব। তিনি যোগাযোগ করলেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে। ইনি আবার ছিলেন দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের উজীর। তাঁর মধ্যস্থতায় বাদশাহ নিজেও মীরকাশিমকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। মিলিত বাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করল বক্সারে। এবার ইংরেজদের পরাজয় ছিল নিশ্চিত।

কিন্তু বিধি বাম। কিছুদিন আগে এক পলাতক ইংরেজ সৈন্যকে দুর্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন নবাব। সেদিন, সেই মুহূর্তে স্বদেশবাসীদের পরাজিত হতে দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সে গোপনে গিয়ে গোপন পথে ইংরেজদের ডেকে আনল দুর্গের ভেতরে। অতর্কিত আক্রমণে দুর্গের পতন ঘটল। বিশাল সম্মিলিত বাহিনীও পরাজিত হ'ল।

মীরকাশিম আবার পালালেন।

এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে ষোল আনা লাভ হ'ল ইংরেজদের। স্বয়ং-বাদশাও হয়ে দাঁড়ালেন ইংরেজদের হাতের পুতুল তাঁর কাছ থেকে বাঙলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। একটা বিদেশী কোম্পানী অন্য দেশে গিয়ে কার্যতঃ রাজপদে বসা—পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ঘটল। প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই শুরু হল ইংরেজ শাসন।

আর একদিন হঠাং ছিন্নভিন্ন অবস্থায় মীরকাশিমের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল দিল্লীর রাস্তায়।

চার

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
[১৭৬৩ – ১৮০০]

বাঙলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়ে ইংরেজরা অবাধে লুট-আরম্ভ করল। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল দুটি। প্রথমতঃ যত বেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা আর এদেশী বণিকদের যতদূর সম্ভব হটিয়ে দেওয়া। এসব কাজের জন্য তারা সীতাব রায়, দেবী সিংহ, মহম্মদ রেজা বা হরেরাম-এর মত গুণ্ডাদের ডেকে আনল।

এই তিন প্রদেশের লোকেদের খাজনা ইংরেজরা এক ধাপে তিন-চার গুণ বাড়িয়ে দিল। কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল তারা জোর করে কম-দামে নিতে লাগল—কখনও বা দামই দিত না। ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা মাল বেশি দামে কিনতে বাধ্য করত লোকেদের। ইংরেজ কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় জোর করে বেগার খাটাতে শুরু করল লোকেদের।

এই অত্যাচারে ইংরেজরা দেওয়ানী পাওয়ার এক বছরের মধ্যে বাঙলার গর্বের তাঁত বন্ধ হয়ে গেল। কোন কোন তাঁতি হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে তাঁত চালান ছেড়ে দিল। কেউ পালাল বনে। চাষীরা চাষ ফেলে পালাল। হাহাকার পড়ে গেল দেশে। দেশের কৃষি আর শিল্পের উৎপাদন উচ্ছন্নে গেল। তারই মধ্যে যেটুকু চাষ হ'ল সেই ফসল দেশের ধনী ব্যক্তিরা আর ইংরেজরা কিনে রাখল। ফলস্বরূপ বাঙলাদেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

লোকে ঝুলি নিয়ে বের হল ভিক্ষেয়। কিন্তু কে দেবে ভিক্ষে! চাষীরা গরু-লাঙ্গল বেচল। বীজ ধান খেয়ে ফেলল। ছেলে মেয়ে বিক্রি করল। গাছের পাতা, কুকুর-বেড়াল ইঁদুর কিনা খেল মানুষে! ফলে দেখা দিল মহামারী। ইংরেজদের হিসেবেই জানা যায় বাঙলা-দেশে মারা যায় এক কোটি লোক আর বিহারে এগার লক্ষ।

দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবল থেকে যারা বাঁচল তাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা হতে থাকল। খাজনা চাই-ই চাই। গ্রামে গ্রামে সৈন্য ঢুকে খাজনা আদায় করার নামে গৃহস্থের সর্বস্ব লুট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকল। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ইংরেজ গভর্নর হেস্টিংস ইংলণ্ডে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে গর্ব করে চিঠি লিখলেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী সত্ত্বেও আমাদের খাজনা আদায় বেড়েছে। অথচ ঠিক সেই সময়ে আর একজন ইংরেজ অবস্থা দেখে শিউরে উঠে লিখলেন, দেখে মনে হচ্ছে একটা রক্তপায়ী দানব তার শিকারকে মেরে ফেলে তার দেহে সবটুকু রক্ত শুষে নিচ্ছে।

ইংরেজদের এই দুর্বিসহ অত্যাচার বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলল। এদের কোন জাত-ধর্ম রইল না। কোন ভেদ বুদ্ধি রইল না। জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক, তাঁত নষ্ট হওয়া তাঁতি, নবাব-বাদশাদের ভেঙ্গে দেওয়া বিশাল বিশাল সৈন্য-বাহিনীর বরখাস্ত হওয়া সৈন্যদল—সব শুধু বাঁচবার তাগিদে কখনও

হিন্দু কখনও মুসলমান, কখনও বা শক্তিময়ী নারীর অধীনে সমবেত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—আক্রমণ করল। হাতে তাদের লাঠি, সড়কি, তরবারী আর কখনো-সখনো দু একটা বন্দুক। মজনু শাহ, অনুপনারায়ণ, ভবানী-পাঠক, দেবী চৌধুরানী, নুরুল ইসলাম, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস ইত্যাদি নামের নেতারা তাদের নেতৃত্ব দিলেন। ইংরেজরা এ বিদ্রোহের নাম দিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ছ'বছরের মধ্যে এ বিদ্রোহ ইংরেজদের ভিত কাঁপিয়ে তুলল। ইংরেজরা একে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বললেও এটা ছিল বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সাধারণ মানুষেরই বিদ্রোহ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দু'একটা গল্প বলা যাক।

যতদূর মনে হয় বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ করে ঢাকার ইংরেজ কুঠি। এই কুঠিকে কেন্দ্র করেই চলত ঢাকা অঞ্চলের যত অত্যাচার। ঢাকার যে মসলিনের নাম ছিল জগৎ-জোড়া—তা ইংরেজদের অত্যাচারে বন্ধ হতে চলেছে। বেশির ভাগ পুরানো বড় বড় তাঁতি পরিবার পালিয়েছে ঘর বাড়ি ছেড়ে। কেউ বা বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে নিজেকে তাঁত চালাবার অযোগ্য করে ইংরেজের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। কিন্তু তাতেও অব্যাহতি নেই। পেয়াদা গিয়ে ধরে আনে। কুঠিতে ধরে এনে মারে। দাদন নিতে হবে, কাপড় তৈরী করতে হবে এবং দিতে হবে ইংরেজদের বলে দেওয়া দামে—যার দশগুণ খরচ হয় একটা কাপড় বুনতে। অতএব সমবেত বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হ'ল ঢাকা ইংরেজ কুঠি।

কুঠির রক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারই ছিল। কিন্তু সে সব ভয় উপেক্ষা করে বিদ্রোহীরা জমায়েত হলো রমনা কালিবাড়ির মাঠে। পুরোহিত দেবী পূজা করে তাদের আশীর্বাদ দিলেন। এককালে বিদেশী গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একত্রিত করতে চাণক্য মন্ত্রণা দিয়েছিলেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আর সেদিন রমনা কালিবাড়ির পুরোহিত তাদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন,

বন্দেমাতরম্। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে বিদ্রোহীরা নিঃশব্দে চল্‌ল কুঠির দিকে, সহসা তারা ঘিরে ফেলল কুঠি। তারপর অতর্কিত আক্রমণে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সকলকে পরাস্ত করে বন্দী করে ফেলল।

কয়েকদিন ঢাকা অঞ্চল রইল বিদ্রোহীদের অধিকারে। কিন্তু এ অধিকার বজায় রাখতে গেলে যে শিক্ষা ও তৎপরতা দরকার বিদ্রোহীদের তা ছিল না। ফলে ইংরেজরা যখন সংগঠিত হয়ে এসে বড় সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করল তখন তাদের পরাজিত হয়ে পালান ছাড়া পথ রইল না।

এদিকে অনুরূপ বিদ্রোহ শুরু হয়েছে কুচবিহারে। সেখানে কুচবিহারের রাজা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিচ্ছেন। বিদ্রোহীরা সুবিধা করতে না পারলেও লড়ে যাচ্ছে। এমন সময় ঢাকার বিদ্রোহীরা গিয়ে যোগ দিল কুচবিহারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে। রাজা এবং ইংরেজদের মিলিত বাহিনী এবার পরাজিত হয়ে পালাল। বিদ্রোহীরা রাজবংশের একজনকে রাজপদে বসিয়ে দিল।

১৭৬৪ সাল। বিহারের সারণ জেলায় বসেছে এক বিরাট মেলা। দিক-দিগন্ত থেকে মানুষ এসেছে মেলায়। ইংরেজ দেওয়ান দেবীসিংহ আসছেন যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করতে। সংবাদটা শুনেই বিদ্রোহীরা স্থির করল এ অত্যাচারে বাধা দিতে হবে। বিদ্রোহী নেতা মজনু শাহ প্রায় পাঁচ হাজার অনুচর নিয়ে ছদ্মবেশে মিশে রইলেন যাত্রীদের মধ্যে। দেবী সিংহের লোকেরা এসে মেলা ঘিরে ফেলল। প্রায় হাজার পনের যাত্রী। কি আদায়টাই না হবে! আনন্দে উৎসাহে তাদের আর তর সইল না। তারা যাত্রীদের টানাটানি শুরু করল।

কিন্তু প্রথম যাত্রীর গায়ে হাত দিতেই এক আশ্চর্য বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে মজনু শাহের অনুচরেরা নিরীহ যাত্রীর বেশ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবীসিংহের সৈন্যদের ওপর। অপ্রস্তুত

সৈন্যদল বাধাও দিতে পারল না। তাদের রক্তে কাদা হয়ে গেল মেলার চতুর্দ্দিক। দেবীসিংহ কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

ইংরেজরা বিভীষিকা দেখতে থাকলেন। বিদ্রোহীরা ক্রমেই সংখ্যায় বাড়ছে। এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হল তারা সংখ্যায়। রাজশাহীতে হ'ল বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। সেখানে তৈরী হ'ল তাদের দুর্গ। দুর্গে তৈরী হতে থাকল কামান বন্দুক এবং সড়কি ঢাল। বিদ্রোহীদের সৈন্যদলের মত শেখান হতে থাকল যুদ্ধের কায়দা। বিদ্রোহীরা পরপর আক্রমণে রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চলের সব কুঠি একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। এবার বিদ্রোহীদের লক্ষ্য রংপুর।

কলকাতায় ইংরেজ গভর্নর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যায় খাজনা আদায় প্রায় বন্ধ, ব্যবসা বন্ধ, শোষণের কথাই ওঠে না। বাঙলাদেশে টেকা যাবে কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। গভর্নর বললেন, যেমন করেই হোক এ বিদ্রোহ দমন করতেই হবে।

মরিয়া হয়েই সে কালের সবচেয়ে দুঁদে সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাসকে বহু সৈন্য দিয়ে পাঠান হ'ল উত্তরবঙ্গে। ক্যাপ্টেন অনেক পরিকল্পনা করে গোপন পথে এগিয়ে চললেন।

টমাস বোঝেন নি যে দিন বদল হয়েছে। নিরীহতম যে বোকাসোকা মানুষটি হাঁ করে সৈন্যদের যাওয়া দেখছে, সেও যে গুণছে সৈন্যদলের সংখ্যা, কামানের সংখ্যা, ঘোড়ার সংখ্যা আর সৈন্যদল চোখের আড়াল হলেই সব তথ্য গিয়ে জানাবে বিদ্রোহীদের, এ কথা তাঁর জানা ছিল না। বাঘ যেমন অলক্ষ্যে শিকারীর গতিবিধি নজরে রাখে উপযুক্ত সময়ে আক্রমণের জন্য, বিদ্রোহীরাও তেমনি নজর রাখতে থাকল টমাসের ওপর। জাফরগঞ্জের কাছে হঠাৎ বিদ্রোহীদের দেখা পেলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল ইংরেজ সৈন্যদল। দু একটা কামান দাগতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকল বিদ্রোহীরা। মনে মনে হেসে ফেললেন টমাস। সামান্য

কটা গোলা সইতে না পেরে যারা পালায় তারা তাড়াবে ইংরেজদের ! তিনি সৈন্যদলকে নির্দেশ দিলেন বিদ্রোহীদের পিছন থেকে তাড়া করতে। সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে চল্‌ল। টমাস চিৎকার করে উঠলেন, দাগো কামান। ছোঁড় গুলি। একটি বিদ্রোহীও যেন পালাতে না পারে।

সৈন্যদল কামান দাগতে দাগতে, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে চল্‌ল। বন বনানীর ভিতর দিয়ে ছুটছে বিদ্রোহীরা। বেশির ভাগ গোলাগুলিই নষ্ট হচ্ছে। দু-একজন যে মারা পড়ছে-না এমন নয়। তাতেই ইংরেজদের উল্লাস।

কিন্তু একি ! হঠাৎ ইংরেজরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে তাদের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে গেছে আর মূল দল থেকে তারা চলে এসেছে অনেক দূরে। এবার বোধ হয় ফেরা দরকার।

ভাবতে ভাবতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। বন্ধ গোলাগুলি। ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্তে আসবার আগেই বিদ্রোহীদের কামান গর্জে উঠল। ক্যাপ্টেন পিছু হটতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে দিক থেকেও বিদ্রোহীদের কামান গর্জে উঠল। টমাস বিস্মিতভাবে দেখলেন বিদ্রোহীরা তাদের ঘিরে ফেলেছে। বুদ্ধিমান ক্যাপ্টেন এতক্ষণে বুঝলেন যে বিদ্রোহীরা পালাবার ছলে তাকে মরণ-ফাঁদে টেনে এনেছে। ক্যাপ্টেন টমাস সৈন্যদের বললেন, বন্ধুগণ ! সামনে মৃত্যু। মরবার আগে বিদ্রোহীদের একবার শেষ আঘাত দিয়ে যাও।

সৈন্যরা অমিত বিক্রমে লড়ল। সে যেন ঘাতকের হাতে মুরগির ছটফটানি। অনায়াস টিপুনিতেই সসৈন্য ক্যাপ্টেন টমাস সেখানে ভূমিশয্যা নিলেন (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর)। তাদের অসহায় মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দেবারও কেউ বেঁচে রইল না। রাজশাহী-দিনাজপুর-রংপুর সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের কবল-মুক্ত— স্বাধীন। বিদ্রোহীরা এবার বগুড়ার দিকে এগুতে থাকল।

এবার কলকাতায় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নরই শুধু নয়

ইংলণ্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টরাও চিন্তান্বিত হলেন। ইংলণ্ড থেকে নতুন ইউরোপীয় সৈন্যদল এলো। দায় গ্রহণ করলেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড। তিনি চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলেন।

কিন্তু কোথায় বিদ্রোহীরা! তারা যেন হাওয়া হয়ে গেছে। অথচ হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইংরেজ বাহিনীর ওপর। অসহনীয় ক্ষতি করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ঝটিকার গতিতে। এডোয়ার্ডস্ গোটা উত্তর বঙ্গ চষে ফেললেন, অর্ধেকের বেশি সৈন্য ক্ষয় হল – কিন্তু বিদ্রোহীদের কিছুমাত্র সন্ধান করতে পারলেন না।

এই সংশয় আর হতাশা নিয়ে বালুরঘাটের প্রান্তর পার হচ্ছিলেন এডোয়ার্ডস্। সহসা বিদ্রোহীরা চতুর্দিক থেকে বেরিয়ে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে। এডোয়ার্ডস্ চিৎকার করতে থাকলেন—ফায়ার। ফায়ার। সৈন্যরা দ্রুত কামান বন্দুক চালাল। কিন্তু মরেও থামল না বিদ্রোহীরা। অজস্র অস্ত্র, বারুদ নিয়েও শুধু বিদ্রোহীদের চাপে ইংরেজ বাহিনী নির্মূল হয়ে গেল। ইংরেজদের বিদ্রোহ-দমনের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল (১৭৭৩ খ্রীঃ, ১লা মার্চ)।

গোটা উত্তরবঙ্গ বিদ্রোহীদের হাতে। ইংরেজদের দু-দুটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ ব্যর্থ। বিদ্রোহীরা আনন্দে উন্মত্ত। পলাশীর যুদ্ধের শোধ নেবে বিদ্রোহীরা। বন্ধ করবে অত্যাচার আর শোষণ। ফিরিয়ে আনবে স্বাধীনতা। স্বপ্নে স্বপ্নে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের চোখ—তাদের মন।

বিদ্রোহীরা আবার পুরোদমে কামান বন্দুক তৈরী করতে থাকল। তৈরী করল গোলা-বারুদ। সেই সঙ্গে তারা তৈরী করল এক সুশিক্ষিত নৌ-বাহিনী।

এবার আর লুকিয়ে থাকা নয়। গেরিলা যুদ্ধ নয়—সম্মুখ সমর। সোজা আক্রমণ। মারো ইংরেজ। বিপদমুক্ত কর দেশ। বন্দেমাতরম্। বিদ্রোহীরা নৌ-পথে কলকাতার দিকে এগুতে থাকলেন।

সংবাদ পেয়ে ইংরেজ নৌ-বাহিনী বিদ্রোহীদের বাধা দিল গোয়ালন্দের কাছে। নৌ-যুদ্ধে বিদ্রোহীদের সেই প্রথম অংশগ্রহণ। কিন্তু হায়রে! সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাদলই সেদিন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আধ ঘণ্টার যুদ্ধে পরাজিত হ'ল ঢাকার বাহিনী। ঢাকার কুঠি ধুলোয় মিশিয়ে দিল বিদ্রোহীরা। কুঠির বড়-সাহেব লিস্টার কোন ক্রমে পালালেন। বহু অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য বিদ্রোহীদের হাতে এলো। গোটা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের অভিনন্দন জানাল।

ইংরেজরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল না। বহু কষ্টে বিদেশী প্রতিযোগীদের হটিয়ে ভারতীয় ব্যবসা একচেটিয়া করা গেছে। ভারতের নবাব-বাদশারাও এসেছে আয়ত্বে। এদেশ থেকে বাণিজ্যের নামে বহু বহু অর্থ পাঠান যাচ্ছে ইংলণ্ডে। সেখানে সেই অর্থে শুরু হয়েছে শিল্প-বিপ্লব। এমন সময় এ সোনার-খনি তো হাত-ছাড়া করা যায় না। তাহলে যে স্তব্ধ হয়ে যাবে স্বদেশের অগ্রগতি। তাই শুধু ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীই নয় গোটা ইংলণ্ড ভাবিত হয়ে উঠল। এলো আরও সৈন্য, আরও উন্নত অস্ত্র। মাদ্রাজ-পাটনা-কলকাতার সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজরা এবার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে নেমে পড়লেন।

তবু প্রথম তিন তিনটি নৌ-যুদ্ধে হেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ইংরেজরা। স্থলপথে সমস্ত উত্তরবঙ্গ চষে বেড়াতে থাকল কাউকে রেহাই নেই। হয় সংবাদ দাও বিদ্রোহীদের, নয় মর। গোটা উত্তর-বঙ্গ জনশূন্য হয়ে এল। ধরা পড়লেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণীর মত কয়েকজন বড় বিদ্রোহী নেতা (জুলাই, ১৭৮৭)। বগুড়ার কাছে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মজনুশাহ পালালেন বিহারেব দিকে। তিস্তার বুকে এক যুদ্ধে পরাজিত হলেন নৌ-সেনাপতি নরুল মহম্মদ, করোতোয়ার বুকে পরাজিত হলেন পীতাম্বর। তবু বিদ্রোহীদের সংবাদ না দেওয়ার জন্য ইংরেজরা সাধারণ মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতে থাকল।

বৎসর খানিক নিরুপদ্রবে কেটে গেল। একেবারে আত্মগোপন করে রইল বিদ্রোহীরা। ইংরেজরা যখন ভাবছেন, বিদ্রোহীরা বুঝি বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই আবার বিপুল উদ্যোমে আক্রমণ করল বিদ্রোহীরা। কয়েকটি জয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল বিদ্রোহীরা। আর সময় দেওয়া নয়। এবার আক্রমণ করতে হবে কলকাতা। নেতা মজনু শাহ আপত্তি করলেন। কে শোনে সে কথা। ছুটে চললেন বিদ্রোহী নেতা নুরুল মহম্মদ আর পীতাম্বর।

সংবাদ পেঁছাল ইংরেজদের কাছে। লেফ্টেন্যান্ট ম্যাক্ ডোলাণ্ড প্রচুর সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে। চর মারফৎ সঠিক সংবাদ সংগ্রহ হ'ল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানলেন বিদ্রোহীরা সংবাদের ধার ধারছে না। দ্রুত ছুটছে কলকাতা অভিমুখে। এটাই হ'ল ম্যাকডোল্যাণ্ডের সুযোগ। যশোরের কাছে মোগল হাটের মাঠে যখন বিদ্রোহীরা ঘুমিয়ে আছে, তখন শেষরাতে লেফ্টেন্যান্ট ম্যাক ডোল্যাণ্ড তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রস্তুত হবার আগেই গোটা বিদ্রোহী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই যুদ্ধেই শেষ হয়ে গেল বিদ্রোহীদের সব স্বপ্ন। মোগলহাট যেন আর এক পলাশী—আর এক বক্সার। এর পরেও বিদ্রোহী নেতারা পালিয়ে থেকেছেন—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সে সবই আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

এমনি করেই ব্যর্থ হয়ে গেল বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম অঞ্চলের কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রথম বিদ্রোহ। ব্যর্থ হ'ল বটে তবু এ বিদ্রোহ দিয়ে গেল সংগ্রামের প্রেরণা, আর দিয়ে গেল দেশভক্তি-মূলক রণধ্বনি 'বন্দেমাতরম্।'

ঐ প্রেরণা আর রণধ্বনি নিয়ে শুরু হ'ল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন পর্যায়।

পাঁচ

বারাণসী বিদ্রোহ

ইংলণ্ডে তখন প্রচণ্ড অর্থের চাহিদা। এজন্য ভারতবর্ষকে শুষে অর্থ পাঠানো ছাড়া ইংলণ্ডের মানুষের আর কোন পথ ছিল না। এদেশ উচ্ছন্নে গেলে কি আসে যায়। এদেশের মানুষ মরলেই বা কি! ইংলণ্ডে তখন ঐশ্বর্যের নিয়োগ আনছে মহান শিল্প-বিপ্লব আর কবি-সাহিত্যিকেরা গেয়ে চলেছেন মানবিকতার গান।

মীরকাশিমকে পরাস্ত করবার পর থেকেই ইংরেজদের নজর পড়ে ছিল বিহারের বারাণসী এবং অযোধ্যার দিকে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে সাহায্য করেছিলেন, এই অজুহাতে তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর আগে ইংরেজরা অযোধ্যায় খুব সুবিধা করতে পারেনি। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে ইংরেজরা

অযোধ্যা অধিকার করে নেয়। অযোধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীও তাদের হাতে আসে কারণ বারাণসী ছিল প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যারই আশ্রিত রাজ্য। ইংরেজরা বারাণসীর শাসনকর্তা বলবন্ত সিংকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার ছেলে চৈত সিং-এর ওপর শাসনভার দেয়। চৈতসিং বছরে বাইশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা ইংরেজদের দেবার অঙ্গীকার করলেন। বদলে তাঁর রইল টাকা তৈরী, সৈন্যদল গঠন আর বিচারের অধিকার। সব বিষয়েই তিনি ইংরেজদের পরামর্শ মত কাজ করতে বাধ্য থাকলেন।

চৈত সিং জানতেন যে বারাণসীর মত ছোট্ট রাজ্যের ওপর বছরে বাইশ তেইশ লক্ষ টাকা কর ছিল অতিরিক্ত চাপ। বাইশ তেইশ লক্ষ ইংরেজদের দিতে গেলে তাঁকে তুলতে হবে এর তিন গুণ। এসব বুঝেও চৈত সিং ইংরেজদের শর্ত মেনে নিলেন। ফলে সবটা চাপ গিয়েই পড়ল সাধারণ চাষীর চাষ এবং শিল্প বাণিজ্যের ওপর। দু' বছরের মধ্যে সমৃদ্ধ বারাণসীর চাষী, শিল্পী, বণিক সর্বস্বান্ত হয়ে অনাহারে মরবার দশায় দাঁড়াল।

কিন্তু এতেও মুক্তি পেলেন না চৈত সিং এবং বারাণসীর মানুষ। ইংরেজরা তখন দাক্ষিণাত্যে একদিকে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, অন্যদিকে টিপু সুলতানের সঙ্গে। বাঙলাদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফলে কর আদায় অনিশ্চিত বরং তাদের দমন করতে খরচ বেড়েছে। অতএব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে গভর্নর হেস্টিংস চৈত সিংকে এক বিনম্র পত্র লিখলেন, এখন থেকে চৈত সিংকে তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের বার্ষিক ব্যয় বাবদ আরও পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হবে। দেশী হিসেবে যার অর্থ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

চৈত সিং জানতেন এত টাকা তাঁর বা তাঁর রাজ্যের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তাই তিনি বিস্তারিত ভাবে লিখে ইংরেজ কোম্পানীর কাছে নানাভাবে অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন

ফল হল না। ইংরেজরা তাদের দাবী থেকে নড়লেন না। চৈত সিং বাধ্য হয়ে আরও করের বোঝা চাপালেন সাধারণ মানুষের ওপর। কিন্তু তিন-সেরী গরুর বাঁট থেকে শত টানলেও দশ সের দুধ বের হয় না। চৈত সিং বছরের শেষে বাড়তি পনের হাজার টাকা পাঠালেন।

বছর তিনেক এভাবেই চলল। কিন্তু সহসা আর এক বাড়তি দাবী এলো ইংরেজদের কাছ থেকে। নবাবকে নিজের খরচে হাজার পাঁচেক সৈন্য পুষতে বলা হ'ল। চৈত সিং এক বাক্যে জানলেন অসম্ভব।

সিংজীর জবাব শুনে ইংরেজরা ক্ষেপে লাল। এতবড় স্পর্দ্ধা যে তাদের নির্দেশ অমান্য করে! হেস্টিংস সঙ্গে সঙ্গে তার জরিমানা জারি করলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সসৈন্যে যাত্রা করলেন বারাণসীর দিকে। ঐ দেশী কুত্তাকে সমুচিত সাজা দিতে হবে।

এ কথা শুনে ভয়ে চৈত সিং অনুনয় বিনয় করে মার্জনা চেয়ে সন্ধি করতে চাইলেন। কুড়ি লক্ষ টাকা দিতেও চাইলেন কিন্তু হেস্টিংস্ অনড়। তিনি সসৈন্যে বারাণসীর উপকণ্ঠে এসে তাঁবু ফেললেন।

সেখান থেকে সিংজীর নামে পাঠান হ'ল এক দীর্ঘ অভিযোগ-পত্র। চৈত সিং সব অভিযোগ অস্বীকার করল। অস্বীকার পত্রটি হেস্টিংস-এর হাতে পৌঁছান মাত্র ক্রুদ্ধ গভর্নর সৈন্য পাঠিয়ে নবাবকে বন্দী করলেন। বন্দী নবাব নিজের প্রাসাদেই রইলেন! প্রাসাদ ঘিরে রইল ইংরেজ প্রহরী।

বেলা পড়ে যাওয়ার আগেই সংবাদটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল বারাণসী রাজ্যে। যে চৈত সিং দস্যুর মত শুষে কর আদায় করতেন. তিনিই বন্দী হয়েছেন জেনে ক্ষেপে গেল সাধারণ মানুষ। ঐ বিদেশী বণিকদের জন্যই তো নবাব দস্যুতে পরিণত হয়েছে। এখন সেই নবাবকেই বন্দী করা। যে যা অস্ত্র পেল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল

রাজপ্রাসাদের ওপর। বারাণসী শহরের লোকেরাও যোগ দিল তাদের সাথে। প্রহরীদের গুলিতে কিছু লোক মরল বটে কিন্তু প্রাসাদ ঘিরে রাখা ইংরেজ প্রহরীরাও বাঁচল না। বিজয়ী নাগরিক আর প্রজারা প্রাসাদ দখল করে দেখল তারা আসবার আগেই নিজের মাথার পাগড়ি জানলা থেকে ঝুলিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়ে নবাব পালিয়েছেন। বিদ্রোহী জনতা নবাবকে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কি করবে তারা স্থির করতে পারল না। নেতৃত্ব দেবার মতও কেউ নেই। অথচ ইংরেজ সৈন্যদের হারিয়ে দিয়ে জনতা তখন আনন্দে আত্মহারা। খানিক দূরে অসহায় গভর্নর হেস্টিংস্ যে প্রায় একা একা বসে আছেন, তাকে বন্দী করতে পারলেও যে ইংরেজদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে—এ কথাটাও তাদের মনে এল না। তারা এমন সময় সংবাদ পেল যে নবাব মাইল কয়েক দূরে রামনগরের প্রাসাদে গিয়ে উঠেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তারা নবাবকে বারাণসীতে ফিরিয়ে আনতে।

এসংবাদ পেয়ে হেস্টিংস হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দূত ছুটল চুণার, লক্ষ্ণৌ এবং কলকাতায়। সংবাদ পেঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে তিন জায়গা থেকেই সুসজ্জিত মস্ত মস্ত বাহিনী পাঠান হ'ল গভর্নরের সাহায্যের জন্য। তিন বাহিনী একত্রিত হলে তার একাংশ নিয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকেয়ার ১৭৮১ সালের ২০ আগস্ট চললেন রামনগরে চৈত সিংকে বন্দী করতে।

সংবাদটা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা ছিল না। তারা যে ইতঃমধ্যে নেতা নির্বাচন করে প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে পথের পাশে অপেক্ষা করছে একথাও জানা ছিল না ক্যাপ্টেন ম্যাকেয়ারের। দুপুরের দিকে এক আক্রমণে ম্যাকেয়ার সসৈন্যে নিশ্চিহ্ন হলেন। জয়ের আনন্দে উদ্বেল বিদ্রোহীরা এবার হেস্টিংসকে বন্দী করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

এ সংবাদ শুনে চৈত সিং মনে মনে অসহায় হয়ে পড়লেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে দু-একটা যুদ্ধে জয়ী হলেও বিদ্রোহীরা যে সত্যি সত্যি জয়ী হবে না এ বিশ্বাস তাঁর প্রবল। তিনি বিদ্রোহীদের সমর্থকও নন। তিনি মনে প্রাণে ইংরেজদের দলে। পাকচক্রে জড়িয়ে গেছেন বিদ্রোহে। কিন্তু এ কথা কি বিশ্বাস করান যাবে ইংরেজদের। যত ইংরেজ হত্যা হচ্ছে, ততই যে চৈতসিং জড়িয়ে পড়ছেন পাপে। যে জন্য তিনি দায়ী নন্, তারই দায় বইতে হবে তাঁকে। চৈতসিং মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর প্রকৃত মানসিকতা বিদ্রোহীদের সামনে গোপন করে তিনি সকলের অজান্তে হেস্টিংস-এর কাছে আপোসের জন্য আবেদন পাঠালেন। কিন্তু তার আবেদনের উত্তর আসবার আগেই বিদ্রোহী বাহিনী হেস্টিংসকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

হেস্টিংস এবার আপোসের আলোচনায় সম্মত হ'ল। কি থেকে কি হ'ল তা না বুঝলেও যখন চৈত সিং বললেন যে গভর্নর আপোস করতে চান, তখন বিদ্রোহীরা ধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল আর সেই সুযোগে তীরের বেগে হেস্টিংসকে নিয়ে সৈন্যদল বেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠল চুণার দুর্গে। বিদ্রোহীরা চুণার অবরোধের সিদ্ধান্ত নিল। চৈত সিং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের নায়ক হিসাবে অভিযানের সঙ্গে রইলেন। তাঁর নামেই আদেশাদি জারী হতে থাকল। তারা চুণারের কাছে শিকার নামক স্থানে এসে ঘাঁটি স্থাপন করল। তখন বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

এই বিশাল সংখ্যক বিদ্রোহীর সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য চুণারে ইংরেজ-বাহিনী প্রস্তুত হ'ল। হাল্কা কামান নিয়ে আচমকা আক্রমণে ঐ অপ্রস্তুত জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার পরিকল্পনা করল তারা। আর সত্যি সত্যিই যখন মেজর পপহাম্‌প তাদের আক্রমণ করলেন, তারা দিশেহারা হয়ে মশাল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। আদৌ রুখে আক্রমণ করতে পারল না।

পালিয়ে এসে বিদ্রোহীরা জমল চুণার থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পতিত নামে এক গ্রামে। সেখানেও তাড়া করে এলেন পপ.হাম্প। এখানকার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ভীষণ ক্ষতি হ'ল। সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে চৈত সিং পালিয়ে এলেন লতিফগতে। ইংরেজ বাহিনী সেখানেও গিয়ে হাজির হ'ল। পরাজিত বাহিনী এখান থেকে বিজয়গড়ের পার্বত্য আশ্রয়ে। দুর্ভাগ্য এ যুদ্ধেও পরাজিত হ'ল বিদ্রোহীরা। আর আশা নেই। বেঁচে থাকা বিদ্রোহীরা যে যার গ্রামে ফিরে গেল। সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে চৈত সিং কোন ক্রমে টিঁকে রইলেন সেখানে। পপ.হাম্পের বাহিনী ফিরে গেল।

চৈত সিংকে একেবারে শেষ করতে হবে এ যেন হেস্টিংস-এর প্রতিজ্ঞা। তিনি আবার শক্তিশালী দল পাঠালেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র পালালেন চৈত সিং। তাঁর মা এবং স্ত্রী স্বল্প অনুচর নিয়ে তীব্র যুদ্ধ করে পরাজিত হলেন। বারাণসীর বিদ্রোহ শুধু চৈত সিংহের দুর্বল মানসিকতাব জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল। চৈত সিং নিজেকেও রক্ষা করতে পারলেন না—দেশকেও নয়।

ইংরেজরা চৈত সিং-এর ভাগনেকে বারাণসীর রাজা বলে ঘোষণা করল। আর এবার বারাণসী থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হ'ল বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে ইংরেজদের হিসেব মত যে টাকা চৈত সিং বাকী রেখেছিলেন, তাও দিতে হ'ল বারাণসীর সাধারণ মানুষকে।

আর চৈত সিং! শোনা যায় তিনি বিজয়গড় থেকে পালিয়ে যান গোলাকুণ্ডায়—সেখান থেকে গোয়ালিয়রে। ইংরেজদের ভয়ে কেউই তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস পাননি। হতাশ চৈত সিং যে তারপর কোথায় হারিয়ে গেলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। কিন্তু তার পরাজয়ে ইংরেজ শক্তি যে অর্থের ভাণ্ডার হাতে পেল, তাতে তাদের পক্ষে সারা ভারত গ্রাস করা সহজ হয়ে গেল।

ছয়

দাক্ষিণাত্যেই বিদেশীরা এসেছিল আগে। পর্তুগীজরা ছোট-খাট কয়েকটা রাজ্য দখলও করে রেখেছিল। কয়েকটি ঘাঁটি গেড়েছিল ফরাসীরা—ইংরেজরাও। তবু সেখানে ইংরেজদের শক্ত হয়ে বসবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে ছিল মহীশূর রাজ্য।

মহীশূর অবস্থানের দিক থেকে ছিল দাক্ষিণাত্যের ঠিক মাঝখানে। প্রায় ত্রিভূজের মত। এ রাজ্যের পূব-পশ্চিমে ছিল দুটি পর্বতমালা—পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট। দক্ষিণে ছিল কাবেরী নদী। এজন্য সেকালে মহীশূর রাজ্যকে যেন প্রকৃতি নিজেই রক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সহজে কোন দিক থেকে শত্রু ঢুকতে পারত না।

দেশটায় ছিল বহু ছোট ছোট পাহাড়ী নদী। সেই নদীর জলে মহীশূরে ভাল চাষ হ'ত। ঐ চাষের অঢেল ফসলে মহীশূর সমৃদ্ধ ছিল। তার ওপর ঐ সব পাহাড়ী নদী বয়ে আনত লোহার আকর। চাষীরা নদী থেকে সেগুলি সংগ্রহ করত। তীরে তীরে ছিল অসংখ্য কাঁচা গাছ। সেই গাছ দিয়ে ছোট ছোট পুরানো রীতির উনুনে ঐ আকর জ্বালিয়ে তারা তৈরী করত লোহা। বার বার জ্বালিয়ে

লোহাকে ইস্পাত তৈরী করতেও শিখেছিল তারা। সারা ভারতে ঐ ইস্পাতের চাহিদা ছিল।

লোহা এবং ফসল ছাড়াও মহীশূরে নানা রকম কুটির শিল্প ছিল। একটু মোটা ধরণের কাপড় তৈরী হত মহীশূরে। গোটা দক্ষিণ ভারতেই তার চাহিদা ছিল। এ ছাড়াও তারা তৈরী করত কাঁচের চুড়ি, কাঁচের বাসন-পত্র, নানা ধরণের রং, বই বাঁধান, এবং লবণ তৈরীতেও তারা ছিল ওস্তাদ। এরকম হরেক রকম কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল মহীশূর।

শুধু প্রাকৃতিক কারণেই যে মহীশূর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এমন নয়। দক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে মোঘলদের লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল। ফলে ঐ রাজ্যগুলিতে শান্তি ছিল না। কিন্তু মহীশূর ঐ দ্বন্দ্বের বাইরে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধের গণ্ডগোল এবং খরচ এড়িয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নাম মাত্র খাজনা আদায় করে রাজা তৃপ্ত থাকতেন। প্রজারাও কর দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না।

এর আর এক অনিবার্য ফল হিসেবে মহীশূরের হিন্দুরাজ বংশ দুর্বল আর বিলাসী হয়ে পড়েছিল। ওদিকে যখন মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিম বাঙলার নবাব হয়ে বসেছেন তখনই মহীশূরের হিন্দু রাজাকে গদিচ্যুত করে, সেই সিংহাসন দখল করে নিলেন তাঁরই মুসলমান সেনাপতি হায়দার আলি।

আলি সাহেব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এদেশের ওপর যখন বিদেশীদের নজর পড়েছে, তখন দুর্বল শক্তি নিয়ে বাঁচা যাবে না। সেনাপতি হিসাবে তিনি আরও বুঝেছিলেন যে সেই মান্ধাতা আমলের যুদ্ধ-বিদ্যা দিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত। ঐ যে এক এক জনকে রাজ্যর এক এক অংশ জায়গীর দেওয়া হয়, আর তাকে বলা হয় সৈন্য পুষতে, যুদ্ধের সময় সেই সব সৈন্যদের এনে একটা বাহিনীতে পরিণত করা যায় না। রাজ্য যতগুলি জায়গীরে বিভক্ত সৈন্যদলও তত দলে ভাগ হয়ে থাকে। তার চেয়েও

বড় কথা সেই সৈন্যদল যতটা জায়গীরদারদের অনুগত হয়, রাজার অনুগত হয় না ততটা।

এ সব অসুবিধা দূর করে তিনি প্রথমেই তাঁর সৈন্যদল নতুনভাবে গড়ে তুললেন। জায়গীর প্রথা তুলে দিলেন। রাজ্যের সব সৈন্য রইল তার অধীনে। তিনি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ বহু বিদেশী অফিসার নিয়োগ করলেন। তারা তাঁর সৈন্যদলকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। আগে ভারতীয় যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্ব পেত অশ্বারোহী দল। হায়দার গুরুত্ব দিলেন পদাতিক বাহিনীকে। তাদের হাতে অন্য অস্ত্রের সঙ্গে তুলে দিলেন বন্দুক। নিয়মিত ষাট হাজার সৈন্যের অর্দ্ধেকটাই ছিল পদাতিক সৈন্য। হায়দার অশ্বরোহী বাহিনীকেও নতুন করে তুললেন। অশ্বগুলি হ'ল সরকারের। প্রত্যেক সৈন্য নিজের নিজের অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেল। এর ফলে তারাও আগের চেয়ে তৎপর হয়ে উঠল। ঘোড়া এবং সৈনিক মিলেমিশে এক হয়ে শক্তি বাড়িয়ে তুলল।

হায়দার গোলন্দাজ বাহিনীকেও শক্তিশালী করে তুললেন। তাদের যন্ত্রগুলি হ'ল হাল্কা, কর্মক্ষমতা বাড়ান হ'ল কামানগুলির। বাহিনী হ'ল তৎপর ও চটপটে। ব্যাপকভাবে পরিদর্শন ও মহড়া দিয়ে দিয়ে হায়দার তার সৈন্যদলকে ইংরেজ বাহিনীর সমকক্ষ করে তুললেন।

না, শুধু আত্মরক্ষার জন্য যে হায়দার এ পরিকল্পনা করেন নি, তা বোঝা গেল তার পরবর্তী বৎসরগুলির কাজের মধ্য দিয়ে। সিংহাসন দখল করেই হায়দার হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সেরা জেলাটি তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনে নেন। এই সমৃদ্ধ জেলাটি পেয়ে হায়দারের আর্থিক শক্তি বেড়ে যায়। তারপর তিনি আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য (হস্‌কোট, দড্ডা বালাহপুর, চিক বালাহপুর, নান্দিদুর্গ, গুড়িবাণ্ডা ইত্যাদি) দখল করে আরও শক্তিমান হয়ে উঠলেন।

এমন সময় হায়দারের নজর পড়ল বেদনোরের ওপর। রাজ্যটি ছিল পশ্চিমঘাট পর্বতে। মালাবার উপকূল, মালাবার বা কানাড় থেকে মহীশূরে আসবার পথ ছিল বেদনোরের ওপর দিয়ে। অথচ পশ্চিমঘাট পর্বত প্রাচীরের মত ঘিরে রেখেছিল রাজ্যটিকে। বেদনোরের দুর্গ ছিল সুরক্ষিত। ঐ সময়ে বেদনোরের সিংহাসন নিয়ে শরিকি বিবাদ চলছিল। হায়দার ঐ সুযোগ গ্রহণ করলেন। এক শরিকের নাম করে তিনি বিখ্যাত দুর্গটি অবরোধ করলেন। তার সৈন্য দলের কাছে হেরে গেল বেদনোর। বিপুল অর্থের সঙ্গে দুর্গটি তাঁর দখলে এল। তিনি বেদনোরের নতুন নাম দিলেন হায়দার নগর। এখানে গড়ে উঠল তাঁর অস্ত্রাগার।

হায়দারনগর হায়দারের সামনে সুযোগ খুলে দিল। তিনি প্রথমেই মালাবার উপকূলের হনাবার বন্দরটি দখল করে নিলেন। জয় করলেন পুরো বেদনোর রাজ্য এবং তার করদ রাজ্য সুন্দা। সাভানুরের নবাবকে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তাঁর। কিন্তু যুদ্ধে জয় হবেই এমন নিশ্চিন্ততা না থাকায় তিনি আর রাজ্যটি আক্রমণ করেন নি।

এত বড় রাজ্য গড়েও হায়দার কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সে কালের যে কোন বিজয়ীর মতই তিনি বিজীত রাজ্যটি লুঠ করতেন। অতিরিক্ত কর চাপাতেন। এর ফলে তাঁর জয় করা রাজ্যের প্রজারা সর্বদাই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকত। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত।

দু-তিন বছরের মধ্যেই হায়দারের প্রতিপত্তি বেশ চোখে পড়ার মত হল। মারাঠারা এত দিন তাকে উপেক্ষার চোখেই দেখে এসেছে। গোটা উত্তর ভারতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারা। না করেছে রাজ্য-গঠন—না অন্য কিছু। শুধু অত্যাচার করে চৌথ আর সরদেশমুখী আদায় করেই সন্তুষ্ট থেকেছে তারা। এর অনিবার্য ফল হিসাবে গোটা উত্তর ভারতে ঔরংজীবের মৃত্যুর পর একটা শক্তিশালী

রাজ্য গড়ে উঠল না। মারাঠারা জানলও না যে, প্রকারান্তরে তারা ইংরেজদের সাম্রাজ্য গড়বার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সেই অনিবার্য ফলের দিকে এগিয়ে তারা মহীশূর আক্রমণ করল ১৭৬৪ সালে।

হায়দার তার সেনাদল নিয়ে বাধা দিলেন মারাঠাদের। কিন্তু বহু যুদ্ধে বিজয়ী অভিজ্ঞ মারাঠাদের হারাতেও পারলেন না হায়দার। মারাঠারাও বুঝল হায়দারকে হারান অত সহজ হবে না। ফলে তারা হায়দারের কাছে থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরে গেল।

ক্ষতিগ্রস্ত হায়দারের অর্থ চাই। এমন সময় তাঁর নজর পড়ল বালাম জেলার ওপর। এ অঞ্চলে চাষ করত আরব থেকে আসা মপলা চাষীরা। বাণিজ্যও করত মপলা বণিকেরা। কিন্তু অঞ্চলটি ছিল নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের অধিকারে। ঐ সময় তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মপলারা বিদ্রোহ করে। নাম্বুদ্রিরা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ছ'হাজার মপলাকে হত্যা করে। এসংবাদ পেয়ে হায়দার মপলাদের রক্ষার নাম করে সে অঞ্চল আক্রমণ করেন। নাম্বুদ্রিরা পরাজিত হন। তাদের প্রভূত সম্পদ হায়দারের হাতে আসে। এরপর কয়েকটি যুদ্ধ এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটানর মধ্য দিয়ে হায়দার পুরো কালিকট অঞ্চল এবং মালাবার উপকূল দখল করে নেন।

এবার হায়দার নিজেকে রীতিমত শক্তিমান ভাবতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে এখন তার যে ঐশ্বর্য, যে সৈন্য সংখ্যা এবং তাদের যা অভিজ্ঞতা, তা অন্য কোন সৈন্যদলের নেই। তাই তিনি আক্রমণ করে বসলেন ত্রিবাঙ্কুর। এখানেই ভুল হ'ল তার। এই আক্রমণ ক্রমে হায়দ্রাবাদ-মারাঠা এবং ইংরেজকে একত্রিত করে দিল।

ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই ইংরেজরা বিভিন্ন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বা শান্তিচুক্তি করত। তখন ইংরেজ সৈন্যর খুব নাম-ডাক। এজন্য দেশীয় রাজারা ইংরেজদের কোন রাজ্য অংশ ছেড়ে

দিতেন অথবা নিয়মিত ভাতা দিতেন। এর বদলে ঐ রাজ্য আক্রান্ত হলে ইংরেজরা তাদের সাহায্য করতেন। মহীশূরের জয়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম, ইংরেজদের সঙ্গে আগেই এমন চুক্তি করে রেখেছিল। এর ফলে নিজামের রাজ্যের অংশ ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে হায়দারের যুদ্ধ বাধল।

সাঙ্গামা এবং ত্রিনোমালি নামে দুটি স্থানের যুদ্ধে হায়দারের দারুণ ক্ষতি হ'ল। তখন তিনি ভিন্ন কৌশল নিলেন। দ্রুত তিনি সৈন্যদল স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতেন। তার অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ দল ইংরেজদের পদাতিক বাহিনীর থেকে দ্রুত চলতে পারত। ফলে হায়দার তাদের দিয়ে এলোমেলো আঘাত করে প্রথম দিকে ইংরেজদের বিব্রত করে তোলেন।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে ইংরেজরা বোম্বাই এবং মাদ্রাজ দুদিক থেকেই আক্রমণ করল হায়দারকে। এদিকে বোম্বাই সৈন্যদের ভরসা পেয়ে মলোবারের অধিবাসীরা করল বিদ্রোহ। ফলে হায়দার বাধ্য হলেন সেখানে তার সৈন্যদল পাঠাতে। সেই অবসরে মাদ্রাজ সৈন্যের দল মহীশূরের প্রায় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল দখল করে নিল। হায়দার তৎপরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করে তার সেরা সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করলেন কর্ণাটক। এদিকে মাদ্রাজ-বাহিনী এত দ্রুত এগিয়ে এসেছিল যে মূল বাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগ ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিল খাদ্যাভাব। আর দু-পাশের গ্রামের সব কিছু পোড়াতে পোড়াতে এত দ্রুতই তাদের তাড়া করে গেলেন হায়দার যে ইংরেজ বাহিনী মাদ্রাজে না পৌঁছান পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পেল না। তারা বাধ্য হয়ে হায়দারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করল। যে যার বিজিত জায়গা দিল ফিরিয়ে। পরবর্তী সময়ে উভয়ে উভয়ের বন্ধু থাকবার প্রতিশ্রুতি দিল।

এ সময়ে ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি বেশ বুঝেছিলেন, তখন আর ভারতে ইস্ট-

ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধুমাত্র বণিক সংগঠন নয়—তা একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এমন কি তা একটা সাম্রাজ্যেও পরিণত হতে পারে। ক্লাইভের কালে কোম্পানী শুধু চেয়েছিল ইউরোপীয় অন্য বণিক দলের থেকে তাদের বেশি প্রতিপত্তি হোক। কেউ যেন তা'দের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। ঘটনাচক্রে বাঙলার নবাবী-তক্তের প্রকৃত মালিক হয়ে ছিল কোম্পানী। হেস্টিংসের আমল থেকে ঘটনাকে তেমনি করেই ঘটান হতে থাকল। অতএব হায়দারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হলেও ইংরেজরা বুঝলেন, সে শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে বাধা দিতে রয়েছে একমাত্র মহীশূর। অতএব মহীশূরকে খর্ব করার সঙ্কল্প রইল তাদের।

উল্টো দিকে হায়দারও চিনেছিলেন তার প্রধান শত্রু ইংরেজদের। অতএব শান্তি-চুক্তি হলেও শান্ত হলেন না হায়দার। শোনা যায় একদিন পুত্র টিপুকে ডাকলেন তিনি। বললেন, শোন টিপু। সামনে তোমার কোরাণ আর তরবারী। এক হাতে নাও কোরাণ অন্য হাতে তরবারি নাও। বল, এদেশ থেকে ইংরেজ বণিককে তাড়াবার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুও ঢেলে দেব।

শুধু পুত্র নয়, গল্প বলে, সেদিন হায়দার নিজেই ইংরেজদের প্রতি চিরঘৃণা এবং তাদের ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন।

এটা পুরোপুরি গল্প হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে পিতা-পুত্র যে মনে মনে ইংরেজদের প্রতি চিরঘৃণা পোষণ করতেন এবং আজীবন ধ্বংসের চেষ্টা করে গেছেন, তা ত' ইতিহাসই বলছে। অতএব এ ঘটনা গল্প হলেও—সত্য নির্ভর।

ইতঃমধ্যে ব্রিটিশদের সঙ্গে মারাঠাদের বিবাদ শুরু হয়েছে। শিবাজীর বিশাল রাজ্য তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ হয়ে গোয়ালিয়র আর ইন্দোরে দুই রাজবংশের সৃষ্টি হয়েছিল—সিন্ধিয়া আর হোলকার। ভাগ হলেও রাজা মাধব রাও-এর প্রভাব ছিল সকলের ওপর। তার মন্ত্রী নানা-ফড়নবিশের কৌশলে বিরোধের

মধ্যেও মিল ছিল। তবু সংসারে কাল সাপ ছিলেন মাধবের ভাই রঘুনাথ। উচ্চাভিলাষী এই যুবক মনে মনে রাজা হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। মাধব রাও দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থাকায় রঘুনাথের মনের ইচ্ছেটা বেশ পাকা হয়েই উঠেছিল। এমন সময় তুর্দ্দৈব, বংশে জন্মগ্রহণ করল মাধর রাও-এর পুত্র। জাঁক-জমক করে তার নাম করণ উৎসব হ'ল নারায়ণ রাও। খুশি সবাই। রঘুনাথও ভাইপোকে কোলে করে নাচালেন। কিন্তু তলায় তলায় তার কি সঙ্কল্প ঘনাল কে জানে! বছর কয়েক পর হঠাৎ গুপ্তঘাতকের হাতে মাধব রাও-এর মৃত্যু হ'ল। লোকে বলে সে গুপ্তঘাতক রঘুনাথই নিযুক্ত করেছিলেন।

যা হোক শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন নাবালক নারায়ণ রাও। নানা ফড়নবিশ যে এমন চাল চালবেন এ কথা রঘুনাথ কল্পনাও করেনি। এবার সে তার দাবী নিয়ে সহায় খুঁজতে লাগল। এমন ব্যাপারে নাক গলিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানতে হায়দারও কম ওস্তাদ ছিলেন না। কিন্তু তখন তিনি কুর্গ অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন নিয়ে ব্যস্ত। তিনি রঘুনাথকে একটু সময় নিতে বললেন।

রঘুনাথের তর সইল না। সে গিয়ে হাজির হ'ল সুরাট আর বোম্বাই-এর কাউন্সিলারদের কাছে। এঁরা সকলেই এক এক জন ক্লাইভ বা ভ্যান্সিটার্ট। নিজের পকেট শাঁসাল করবার স্বপ্ন সকলের। রঘুনাথ সকলের পকেটেই কিছু কিছু দিলেন। বাইরে ভিন্ন রকম চুক্তি হ'ল। কোম্পানী বেসিন, সলসেট ইত্যাদি বোম্বাই এর আশেপাশের কয়েকটি বন্দরের দখল পেল আর পরিবর্তে দিল ২,৫০০ ব্রিটিশ সৈন্য। এদের ভরণ পোষণের দায় রইল রঘুনাথের। অন্যের সম্পত্তি দান করে রঘুনাথ শক্তিমান হয়ে উঠল।

হলে! কি হবে, রঘুনাথের কীর্তিকলাপে সমস্ত মারাঠাই ছিল বিক্ষুব্ধ। তারা একত্রে বাধা দিল ইংরেজ বাহিনীকে। তারা সুবিধে করতে পারল না। হেস্টিংসও এ যুদ্ধ চাইছিলেন না। অতএব

ফড়নবিশের চেষ্টায় ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হ'ল পুরন্দর-এ। এতে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আদায় হ'ত এমন একটা অঞ্চল ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হল। রঘুনাথের চুক্তি দ্বীপগুলি রইল তার ভেতর। এ ছাড়াও তারা পেল ১২ লক্ষ টাকা। হেস্টিংস সৈন্যদের সরিয়ে নিতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু কে শোনে তার আদেশ। হেস্টিংস আছেন কলকাতায় আর সৈন্য রয়েছে বোম্বাই কাউন্সিলের দখলে। অতএব রঘুনাথ এদিক ওদিক থেকে কিছু যোগাড় যন্ত্র করে যেই কিছু তুলে দেয় অমনি কাউন্সিল সৈন্য পাঠায় মহারাষ্ট্রে।

একবার হ'ল কি, মহাদাজী সিন্ধিয়া পুনা থেকে কুড়ি কিলো-মিটার দূরে উরগাঁওয়ে ঘিরে ফেললেন ব্রিটিশ সৈন্যদের। ওরা প্রাণের দায়ে নারায়ণ রাওকেই পেশোয়া বলে স্বীকার করল, প্রতিজ্ঞা করল বন্দী করে রঘুনাথকে পেশোয়ার হাতে তুলে দেবে বলে এবং ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত যে সব রাজ্য পেশোয়ারের হাতে ছিল, সেগুলি ছেড়ে দিতে চাইল। একেবারে ভিজে বেড়ালের অবস্থা। সিন্ধিয়ার কাছে এই মর্মে লিখে দিয়ে কাউন্সিলাররা যেতে চাইল। সিন্ধিয়া যেতে অনুমতি দিলেন। নিরাপদ স্থানে পৌঁছেই কাউন্সিলাররা লিখে পাঠাল, ও চুক্তি মানি না। ক্ষমতা থাকে আবার বন্দী কর।

এর ফলে মারাঠা নিজাম আর মহীশূর একত্রিত হ'ল। ওদিকে ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে চলছিল ইংরেজদের যুদ্ধ। ফলে ভারতে ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে যুক্ত হ'ল। সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের চূর্ণ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করল।

১৭৮০ সাল। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে হায়দার কর্ণাটক অঞ্চল আক্রমণ করলেন। সৈন্যদের এক অংশ হায়দারের নেতৃত্বে আক্রমণ করল পোর্টোনোভো বন্দর। বন্দর কর্তৃপক্ষ বুঝে উঠবার আগে বন্দী হলো অনেকেই। বন্দর এল হায়দারের অধীনে।

টিপু আক্রমণ করলেন আর্কট। আর্কটের রাজা দীর্ঘকাল

ইংরেজদের আশ্রিত। সপ্তগড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্ণেল বেইলি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। এই বীরপুরুষ টিপুকে বাধা দিলেন পেরাম্বাকমের কাছে। কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে তিনি সৈন্যদল সহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। কাঞ্জিভরমে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান হেক্টর মনরো টিপুর ধাক্কায় উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালেন মাদ্রাজে। আর্কটের পতন ঘটল। এমনি করে পুরো কর্ণাটক মহীশূরের অধিকারে এল। ইংরেজদের অবস্থা টলমল হয়ে উঠল।

বাঙলা-দেশ থেকে হেস্টিংস দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন ক্যাপ্টেন কূটকে। কূট এসেই কূট চাল চলিতে থাকলেন। প্রথমেই তিনি হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। তাকে কূট ফিরিয়ে দিলেন গুন্টুর প্রদেশ। বিনিময়ে চাইলেন যে নিজাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বে না। না লড়ে এত বড় রাজ্য লাভে প্রলুব্ধ নিজাম জোট ছেড়ে দিলেন।

অন্য দিকে অকস্মাৎ এক রাত্রে আক্রমণ করে মহাদাজীর গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করে নিল ইংরেজরা। সিন্ধিয়ার কাছে দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য বলে মনে হ'ত। সেই দুর্গের পতনে সিন্ধিয়া এত ভীত হলেন যে এক চুক্তিতে সন্ধি করলেন ইংরেজদের সঙ্গে। তারা সিন্ধিয়াকে স্বাধীন বলে স্বীকার করল। পরিবর্তে মারাঠারা জোট থেকে বেরিয়ে এল। রইলেন একা হায়দার।

হায়দারের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজরা সব সময়েই একটা মজার খেলা খেলত। তারা হায়দারের সদ্য বিজিত রাজ্যগুলির অসন্তুষ্ট প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলত। ফলে হায়দারকে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতে হত। এবারেও সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কিন্তু হায়দার সহজেই তাদের দমন করলেন।

এদিকে হায়দারের সঙ্গে ফরাসীদের ছিল প্রবল বন্ধুত্ব। এই বিপদের দিনে মরিসাস থেকে তার সাহায্যের জন্য একটা বিরাট ফরাসী নৌবহর আসছিল। কিন্তু স্থলভাগ থেকে ক্যাপ্টেন কূট

আর জলভাগ থেকে অ্যাডমিরাল হিউজ তাদের এমন আক্রমণ করলেন যে, তারা স্থলে নামতে পারল না। এমন অবস্থায় আর এক ফরাসী অ্যাডমিরাল সুফ্রেন মাদ্রাজের কাছেই আক্রমণ করল হিউজকে। হিউজের রণক্লান্ত সৈন্যরা হেরে গেল।

অন্যদিকে মাদ্রাজের কাছে আঙ্গুতিতে কর্ণেল ব্রেথওয়েলের সৈন্য দলকে ঘিরে ফেললেন টিপু। তারা নিহত হ'ল। দুই যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদের আর আক্রমণ করবার ক্ষমতা রইল না।

এমন সময় দীর্ঘ রোগ ভোগের পর হায়দার মারা গেলেন। টিপু এতদিন পিতার সহযোগী হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। এবার হলেন স্বয়ং সুলতান। অন্যান্য ক্ষেত্রে পিতার নীতি অনুসরণ করলেও বেদনোর নিয়ে তিনি এক মারাত্মক খেলা খেললেন। বেদনোরের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন শেখ আয়াজ। তাকে হায়দার যেমন ভালবাসতেন, টিপু তেমনি ঘৃণা করতেন। সুলতান হয়েই তিনি আয়াজকে গুপ্ত হত্যার নির্দেশ দিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে নির্দেশটি গিয়ে পড়ল আয়াজের নিজেরই হাতে। আয়াজ বিপদ বুঝে ইংরেজদের দলে যোগ দিল। সে গিয়ে আশ্রয় নিল বোম্বাইতে ইংরেজদের দপ্তরে। জেনারেল ম্যাথুস সঙ্গে সঙ্গে এসে বেদনোর দখল করলেন। একটিও গুলি খরচ না করে ইংরেজরা এমন গুরুত্বপূর্ণ শহরটি দখল করল। সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল এই যে সমুদ্র উপকূল থেকে মহীশূরের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে যাবার পথটি ইংরেজদের দখলে চলে গেল।

ম্যাথুসের দুর্বলতায় এতবড় সুযোগ হাতে আসাতেও তার সদ্ব্যবহার করল না ইংরেজরা। বেদনোরের অতুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে ইংরেজ সৈন্যরা যখন স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে—যা অন্য কোন সেনাপতি হলে কখনই করতে দিতেন না—তখন টিপু ঘিরে ফেললেন তাদের।

ক্রমে শহরে খাদ্যাভাব দেখা দিল। নিদারুণ বুভুক্ষা। কোন দিক থেকে এক ফোঁটা খাদ্যের আশা নেই। তখন ম্যাথুস সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

এর ফলে লাভ হ'ল টিপুর। তিনি হতাশ এবং হীনবল ইংরেজদের হাত থেকে বোম্বাই-এর কাছের সবচেয়ে শক্ত ইংরেজ ঘাঁটি মাঙ্গোলোর অবরোধ করেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন বুঁসির নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে আর এক নৌবাহিনী এসে পোঁছায়। তার সাহায্যে টিপু এবার ইংরেজদের পিষে মারবার আগ্রহে উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

এমন সময়ে ঘটল দুর্দৈব। ইউরোপে ব্রিটিশ ফরাসী যুদ্ধ থামল। সন্ধি হ'ল তাদের মধ্যে। সে সংবাদ এদেশে পৌঁছালে ফরাসী বাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইল না। এমন কি যে সব ফরাসী অফিসার টিপুর সেনাবাহিনীতে কাজ করছিলেন তারাও আর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। নিরুপায় টিপু ঘটনাচক্রে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ১৭৮৪ সালের ১১ই মার্চ মাঙ্গালোরে সন্ধি স্বাক্ষর হ'ল। ইংরেজরা টিপুকে ছেড়ে দিল মালাবার উপকূল—টিপু ওদের ছেড়ে দিলেন কর্ণাটক। দু পক্ষই যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দেয়। দু পক্ষের মনেই বাইরে শান্তি দেখা যায়। কিন্তু দু পক্ষই জানত—এ শান্তি সাময়িক।

এ জন্য দু-দলই নিজের নিজের শক্তি সংগ্রহে মেতে উঠল। টিপু তার দূতের দল পাঠালেন ফ্রান্সে। তাদের ভার্সাইতে বিপুল সংবর্দ্ধনা দেওয়া হ'ল। কিন্তু ফ্রান্সের নিজের দেশেই তখন বিপ্লবের অবস্থা। অতএব সংবর্দ্ধনা নিয়েই ফিরে আসতে হ'ল তাদের। কনস্ট্যান্টি-নোপলের মুসলমান শাসকের কাছে গেল টিপুর দূত। কিন্তু তুরস্ক তখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। অতএব তার নিজেরই দরকার ইংরেজদের সাহায্য। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিপুকে সাহায্য দেওয়া তুরস্কের পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

উল্টো দিকে মালাবার আর কুর্গে বারংবার বিদ্রোহ ঘটাতে থাকল ইংরেজদের প্ররোচনায়। ব্রিটিশ সাহায্য নিয়ে কুর্গে ১৭৮৯ তে একটা অভ্যুত্থানই ঘটে গেল। জয়ী হলেন বটে টিপু—কিন্তু তার রাজ্যের মধ্যে গৃহশত্রু রয়েই গেল।

ইতিমধ্যে হেস্টিংস গিয়ে গভর্নর হয়ে এসেছেন কর্ণওয়ালিস্। তিনি গোপনে নিজাম এবং পেশোয়ার সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। কুর্গ, মালাবার কোচিন অঞ্চলের ছোট রাজাদের সঙ্গেও কর্ণওয়া-লিসের চুক্তি হ'ল। টিপুকে উচ্ছেদ করাই হ'ল সকলের লক্ষ্য। টিপু উচ্ছেদ হলে ব্রিটিশ বন্ধু হিসাবে সকলেই কিছু কিছু সুবিধা পাবেন বলে স্থির হ'ল। টিপু চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়লেন।

এবার আক্রমণের পরিকল্পনা স্থির হ'ল। তিন দিক থেকে ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণ করল টিপুকে। অরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে লুট-পাট করে চল্‌ল মারাঠা আর নিজাম সৈন্যদল। টিপু বাঙ্গালোরে প্রবলভাবে অবরোধ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য সে অবরোধ চূর্ণ করে মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টম অবরোধ করল।

অবরুদ্ধ টিপু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। আমৃত্যু যুদ্ধই তার পণ। কিন্তু কর্ণওয়ালিস তৎক্ষণাৎ টিপুর পতন চাইছিলেন না। মরাঠা এবং নিজাম শক্তিকে বশে রাখতে টিপুকে তার দরকার ছিল। তিনি শুধু টিপুর শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন। ঠিক এই সময় তার মাল বহনকারী পশুগুলি কি এক রোগে মারা যেতে থাকল। সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহই অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। এই অবস্থায় কর্ণওয়ালিস টিপুর সঙ্গে সন্ধি করলেন।

১৭৯২তে শ্রীরঙ্গপট্টমে সন্ধি হ'ল। কর্ণাটক বোম্বাই অন্য যে কোন উপকূল থেকে মহীশূরে যাবার সবগুলি রাস্তা কেড়ে নেওয়া হল টিপুর হাত থেকে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা দিতে বলা হল তাকে। টিপু যতদিন তা শোধ না করবেন,

ততদিন তার দুই পুত্রকে জামিন রাখল ইংরেজরা। মোট কথা হৃতবল হৃতভাগ্য টিপু শুধু নাম নিয়ে বেঁচে রইলেন।

টিপুর এই হতাশা কয়েক মাসের মধ্যেই কেটে গেল। তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগলেন। নানাভাবে তিনি রাজ্যের আয় বাড়ালেন। সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন, অস্ত্র তৈরীর কারখানা তৈরী করলেন। দশ বছরের মধ্যে এত খরচ করেও ইংরেজদের দেয় টাকা শোধ করলেন। পুত্রেরা মুক্ত হ'ল।

এবার আবার বন্ধু খুঁজতে থাকলেন টিপু। ফ্রান্স, মিশর, আফগানীস্থান, মরিশাস—কোথায় না দূত গেল তাঁর! অযোধ্যার উত্তরে রোহিলা খণ্ডের রোহিলাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন টিপু। কিন্তু বৃথা -তাঁর বন্ধু জুটল না। বরং তিনি যে আবার শক্তি সংগ্রহ করছেন এ কথা ভেবে নতুন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি টিপুকে শেষ করে দেবার পরিকল্পনা করলেন।

টিপুর দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে এখানে অনেক মীরজাফর জুটে গেল। যাদের ওপর নির্ভর করেছিলেন টিপু, তারাই ডেকে আনল ইংরেজদের পথ দেখিয়ে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল অতর্কিত ভাবে ব্রিটিশ আক্রমণ করল শ্রীরঙ্গপট্টম। বীরের মত যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন টিপু। কয়েকদিন ধরে শ্রীরঙ্গপট্টমে লুণ্ঠন চালাল ব্রিটিশ সৈন্য।

সারা ভারত জয়ে বাধা দিতে ব্রিটিশদের সামনে আর কেউ রইল না।

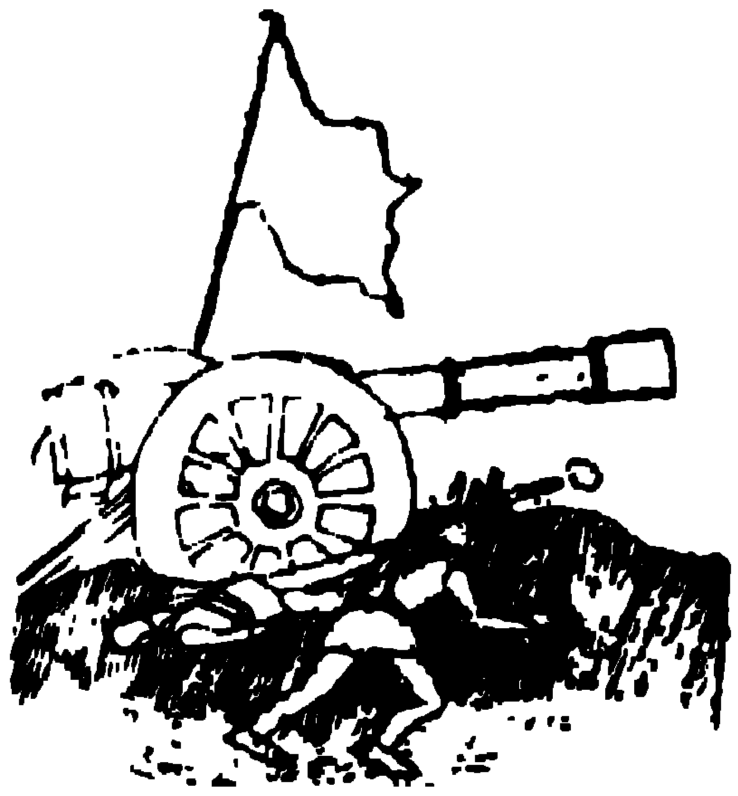

সাত

বাঁশের কেল্লা

ইংরেজরা ছলে-বলে কৌশলে একটার পর একটা রাজ্য অজগরের মত তাদের মুখের মধ্যে ভরছিল, আর ভরেই সেই অঞ্চলের সর্ব সাধারণের ওপর অত্যাচার আর লুটপাট শুরু করেছিল। এতে ভারতবর্ষের শান্ত, নির্বিরোধী নিরীহ মানুষেরাও ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করছিল তাদের—তারা বিদ্রোহ করেছিল। মনে হয় ব্রিটিশ রাজত্বের একটা দিনও ইংরেজরা নিশ্চিন্তে ভারতবর্ষে কাটাতে পারেনি।

কত বিদ্রোহের নাম বলব? কোন অঞ্চল বাদ থেকেছে? হিমালয়ের কোল থেকে সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত জাত-ধর্ম নির্বিশেষে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। সকলের চোখে এক স্বপ্ন—ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে হবে। বন্ধ করতে হবে অত্যাচার।

দু-একটা বিদ্রোহের নাম না বললে কৌতূহল মিটবে না অনেকের। ধারণাও স্পষ্ট হবে না। সন্ন্যাস বিদ্রোহ শেষ হবার আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজমহল পাহাড়ের আদিবাসীরা। ১৭৯৮ সালে শুরু হয় বাঁকুড়ার চোয়াড় বিদ্রোহ। এর বছর কুড়ি পর উড়িষ্যায় পাইক

বিদ্রোহ ও খোন্দা বিদ্রোহ। সে সময় দাক্ষিণাত্যও শান্ত ছিল না। ভিজিনিয়া, তামিলনাড়ু, মালাবার, অন্ধ্র-উপকূল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুরে বারবার বিদ্রোহ ঘটেছে। পশ্চিম সৌরাষ্ট্রে একটানা ষোল বছর বিদ্রোহ চলেছে। হরিয়ানায় জাঠ বিদ্রোহ, বিলাসপুর আলিগড় ও জব্বলপুরের বিদ্রোহ চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ব্রিটিশদের! কবি সুকান্তের কথায়।

"এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।"

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে এসব বিদ্রোহই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজরা যেকোন ভাবে হোক, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করেছি। তবে একটি বিদ্রোহ অন্য বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুলেছে। পরের বিদ্রোহীরা ভেবেছেন, ত্রুটিমুক্ত হতে পারলে জয়ী হবই। এসেছে আর এক বিদ্রোহ।

এমনি এক বিদ্রোহ বাঙলা দেশে, ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। আসলে এ আন্দোলনটা ছিল ধর্ম বিষয়ে। মুসলমান ধর্ম সংস্কার করতে হবে এই ছিল এর মূল কথা। কিন্তু মক্কায় প্রায় ত্রিশ বছর কাটিয়ে ফরিদপুরের মৌলভী শরিয়ৎ-উল্লা যখন দেশে ফিরে এসে এ সম্পর্কে লোকেদের বোঝাতে শুরু করলেন, তখন কেমন করে ইংরেজদের অত্যাচার রুখবার কথাটাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ বুঝলো যে ধর্মকেও সত্যভাবে মানতে গেলে ইংরেজদের হঠাতে হবে আর এর জন্য বিদ্রোহ করা দরকার।

শরিয়ৎ-উল্লা তাঁর কাজ শেষ করবার আগেই মারা গেলেন। তার ছেলে দু দু মিঁয়া বাবার কাজ শেষ করবার দায় নিলেন। যোগ্য-নেতা। তার নেতৃত্বে ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা চব্বিশ পরগণার প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলান কৃষক ইংরেজ এবং ইংরেজের সমর্থক জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য তৈরী হয়ে গেল।

এই সময় চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙ্গার কাছে এক চাষী পরিবারে জন্মে ছিলেন তিতুমীর। সবল স্বাস্থ্য। শিখল লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তলোয়ার চালান। নদীয়ার এক জমিদার তাকে চাকরী দিল লাঠিয়ালের। অন্য এক জমিদারের সঙ্গে হ'ল দাঙ্গা। তিতু ধরা পড়ল। তার জেল হ'ল। জেল থেকে ফিরে তিতু চাকরী ছেড়ে দিয়ে গেল মক্কায়। সেখান থেকে ওয়াহাবী মত নিয়ে ফিরে এলো দেশে। বলতে থাকল : পীর-পয়গম্বর মেনো না। মন্দির মসজিদ তৈরী করো না। শ্রাদ্ধ শান্তির কোন অর্থ নেই। টাকা দিয়ে সুদ নিও না। অত্যাচারের কাছে মাথা নত করো না।

তখন দেশে একদিকে সাহেব কুঠিয়ালদের অত্যাচার অন্যদিকে জমিদারদের অত্যাচার। চাষী আর সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। তারা তিতুর কথায় উৎসাহ বোধ করল। বুকে বল পেল। এসে দাঁড়াল তার পাশে।

এতে ভয় পেল জমিদার, কুঠিয়াল ও স্থানীয় পুলিশ। তারাই প্রথম আক্রমণ করল তিতুর লোকেদের। তিতু প্রথমে কোর্ট-কাচারী করে অত্যাচার বন্ধ করতে চাইল। পারল না। কারণ বিচারকেরা ওদেরই দলে।

এবার ফিরে এসে তিতু ঘোষণা করল ইংরেজ রাজত্ব খতম হয়েছে। ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকেই রাজত্ব নিয়েছিল। এবার তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। সাধারণ লোকেদের বলল তোমরা জমিদারদের খাজনা দিও না। জমিদারদের বলল, তোমরা আমার কাছে খাজনা পাঠাও না হলে শাস্তি পাবে।

গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রায় হাজার খানেক পাইক আর কয়েকশ লাঠিয়াল যোগাড় করলেন। কয়েকটি হাতী তৈরী রইল। তিনি খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন।

এতখানি ধৈর্য ছিলনা মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিসের। তিনি তিতুমীরকে তাঁর গ্রামেই আক্রমণ করে বসলেন।

তাঁর লাঠি-সড়কি আর বন্দুকের বিরুদ্ধে সামান্য লাঠি নিয়ে লড়ল তিতুর দল। কিন্তু আধঘণ্টার সময়ও লাগল না সাহেবের পরাজিত হতে। ডেভিস্ কোন ক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

তিতুর দল এবার নিজেরাই এগিয়ে আক্রমণ করল। ডেভিসকে আশ্রয় দিয়েছিল গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবানন্দ রায়। তাকে আক্রমণ করল তিতুর দল। প্রচণ্ড বিক্রমে লড়লেন দেবানন্দ। বহুলোক হতাশ হল। ঠিক বোঝা গেল না কারা জিতল, কারা হারল।

দেবানন্দ রায়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল খাসপুরের এক মুসলমান। তিতু তার বাড়ি লুট করল। তিনি প্রাণভিক্ষা চাইলেন। তিতু তার মেয়ের সঙ্গে দলের একজনের বিয়ে দিয়ে সন্ধি করলেন। ক্রমে নদীয়া চব্বিশ পরগনার গোটা অঞ্চল তিতুর অধিকারে এসে গেল। পুলিশ, কুঠিয়াল জমিদার সবাই পালাল। তিতুমীর ঘোষণা করল, এ অঞ্চল স্বাধীন। সবাই তিতুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

এ অঞ্চলের কুঠিয়াল, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা পালিয়ে গিয়ে বাঙলাদেশের ছোটলাটের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তখুনি বিদ্রোহীর দমনের নির্দেশ দিলেন বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে।

আলেকজাণ্ডার শ' দেড়েক বন্দুকধারী সিপাই সহ বাদুড়িয়া গ্রামে গেলেন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে। প্রায় পাঁচশ বিদ্রোহী তাকে ঘিরে ফেলল। তারা বন্দুক ব্যবহার করবার আগেই বর্ষার জলের মত ইঁট পড়তে থাকল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালালেন। এক অত্যাচারী দারোগা রামরাম চক্রবর্ত্তী তাদের হাতে ধরা পড়ল। বিদ্রোহীরা তার মাথা কেটে ফেলল।

এবার সত্যি সত্যি তিতুমীর স্বাধীন বাদশা বলে ঘোষিত হ'ল। মৈমুদ্দিন নামে এক জোলা হলেন তার প্রধান মন্ত্রী। তিতুর ভাগ্নে

মাসুম খাঁ হলেন প্রধান সেনাপতি। তিতুমীর নারকেলবেড়িয়া গ্রামে এক আশ্চর্য বাঁশের কেল্লা তৈরী করলেন। তিতুর লোকেরা বলে বেড়াতে থাকলেন এই বাঁশের কেল্লা ইঁট বা পাথরের কেল্লার চেয়েও মজবুত। এর ভেতরে প্রচুর যুদ্ধ-অস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্য মজুত করা হ'ল।

কাছের বাঘারিয়া। মাসুম সেখানে এক পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে আর এক দুর্গ গড়ে তুললেন। সেখানেও প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র মজুত হ'ল।

এদিকে আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর লর্ড বেন্টিঙ্ক নদীয়া জেলার জজ ও কালেকটরকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন। নদীয়ার কালেকটর একটা বড় বাহিনী নিয়ে এলেন বারাসতে। সেখানে জমিদার ও কুঠিয়ালদের বাহিনী তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। সকলের পরামর্শে প্রথমেই কেল্লা আক্রমণ না করে বাঘারিয়ায় মাসুমকে আক্রমণ করতে গেলেন।

কিন্তু দুর্ভাগা ইংরেজদের। এ আক্রমণও ব্যর্থ হ'ল। মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ করেও বিদ্রোহীদের কিছুই করা গেল না। কারণ তারা ছিল বাড়ির আড়ালে। অন্যদিকে শুধু ইঁট, কাঁচা বেল আর কিছু তীর ছুঁড়েই অর্দ্ধেকের বেশী ইংরেজ বাহিনীকে আহত বা নিহত করল মাসুমের দল। কালেকটর সাহেব সকলকেই পালাবার নির্দেশ দিলেন। নিজেও পালালেন। কয়েকটি হাতী এবং বহু বন্দুক মাসুমের হস্তগত হ'ল।

এই যুদ্ধে তিতুর সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল এই যে, তার প্রভাব আরও বেড়ে গেল। ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তার দলভুক্ত হলেন।

এবার তিতুকে আর হেয় চোখে দেখল না ইংরেজরা। একজন কর্ণেলের অধীনে কামান সহ বাহিনী পাঠান হ'ল। বাহিনী ঘিরে ফেলল বাঁশের কেল্লা। ভেতর থেকে ইঁট আর কাঁচা বেল ছোঁড়া হতে থাকল। এতে বহু সৈন্য আহত হ'ল। কর্ণেল বুঝলেন এভাবে

যুদ্ধ করলে তাঁকেও হারতে হবে। তিনি কামান দাগবার হুকুম দিলেন। মুহূর্তে কামানের শব্দে বাঁশের কেল্লা কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে গেল তিতুর সৈন্যরা।

কিন্তু কিছু হ'ল না তো কেল্লার! তিতু চিৎকার করে উঠলেন, গোলা খা লিয়া। মানে, গোলা খেয়ে ফেলেছি।

তিতুর পক্ষে কিনা সম্ভব! আবার উৎসাহে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠ্‌ল তিতুর দলের লোকেরা। আবার আক্রমণ করল। কর্নেল বুঝলেন যে কোন কারণেই হোক গোলার আওয়াজে ভয় পায়নি বিদ্রোহীরা। এবার আর ফাঁকা আওয়াজ নয়, সত্যি সত্যি গোলা বর্ষণ করতে আদেশ দিলেন কর্নেল।

কয়েকটি গোলা পড়তেই বাঁশের কেল্লা হেলে পড়তে থাকল। একটা গোলা এসে পড়ল তিতুর পাশেই। তার উরু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে মারা গেলেন তিতু। তার দলের সকলে পালাতে থাকল। আর আটকে রাখা গেল না কিছুই। বিজয়ী ইংরেজ পক্ষ প্রায় আটশ' জনকে বন্দী করে নিয়ে চল্‌ল।

বন্দীদের নিষ্ঠুর অত্যচারের মধ্যে দিন কাটাতে হ'ল। কাউকে কাউকে ছেড়ে দিলেন বিচারকেরা। বেশিরভাগ বন্দীই কারাদণ্ড ভোগ করল। নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লার সামনেই গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল।

তিতুমীরের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দিল না ইংরেজরা।

আট

সাঁওতাল বিদ্রোহ

তখন ইংরেজরা প্রায় সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে। বাঙলা, বিহার, ওড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ. দিল্লী, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাজ তাদের কুক্ষিগত হয়েছে। পাঞ্জাব যাওয়ার পথে। বাঙলা আর বিহারে চলছে ওয়াহাবী আন্দোলন। সেই সময়েই সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়।

এই কালো রং, প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়ে ওঠা সরল জাতটি দীর্ঘকাল ধরে ছিল ইংরেজদের শোষণের শিকার। ওদের জমি আর চাষের লোভ দেখিয়ে ডেকে আনত জমিদার। তারপর কৌশলে ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত করত। ঐ ভুয়ো হিসেব অমান্য করবার সাধ্য ছিল না তাদের। তাহলেই আসত জমিদারের পাইক পেয়াদা—তার পিছনে পুলিশ এমন কি আইন আদালত সবই ছিল এদের বিরুদ্ধে। আজীবন খেটে খাওয়া আর না খেতে পাওয়া ছিল তাদের জীবনের বাস্তব ঘটনা। দীর্ঘ কালের এই অত্যাচার সহ্যের বাইরে গিয়ে প্রথম বিদ্রোহের রূপ নিল পলাশীর যুদ্ধের প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি সময়ে—১৮৫৫ সালে। দফায় দফায় এই বিদ্রোহ চল্‌ল প্রায় ১৯০০ সাল পর্যন্ত।

সাঁওতাল পরগণার রাজধানী বার্নহাইট। তার কাছেই গ্রাম ভাগনাডিহির। এই গ্রামের মোড়ল কানু আর সিধু নামে দুইভাই। এরাই ইংরেজ-জমিদার-পাইক-পেয়াদা-দারোগা-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট চক্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করল। সরাসরি যুদ্ধ করে নিজেদের অঞ্চল স্বাধীন করবার স্বপ্ন রইল কানু-সিধুর চোখে।

কিন্তু মোড়লের কথা নিজের গ্রাম শুনলেও সমগ্র সাঁওতাল পরগণা শুনবে কেন? সাঁওতালদের চিন্তা চেতনা সম্পর্কে কানু-সিধু খুব ভালভাবেই জানে। উচ্চ চিন্তা বর্জিত সরল অথচ দুর্দ্দম তাদের জাতের মন আগাগোড়া কুসংস্কারে ভরা। ঠিক! ঐ কুসংস্কারকেই কাজে লাগাবে কানু-সিধু। তারা প্রচার করতে থাকলেন যে তারা মারংবুরুর নির্দেশ পেয়েছেন। মারাংবুরু বলেছেন, তোমরা আমার সন্তান। অপরের দেওয়া লাঞ্ছনা সহ্য করো না। প্রতিবাদ কর। বিদ্রোহ কর। তোমাদের জয় হবেই। কারণ আমিই তোমাদের বিদ্রোহ করতে বলছি।

কানু সিধু তাদের এই স্বপ্নাদেশের কথা কাগজে লিখে ছোট একটুকুরো শালের ডাল সঙ্গে দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠাতে থাকল। শাল গাছের টুকরো পাঠানোর অর্থই হ'ল প্রতিজ্ঞার আহ্বান, প্রতিশোধের আহ্বান—আত্মত্যাগের আহ্বান। একে এ আহ্বান এলে কোন সাঁওতাল স্থির থাকে না, তাতে এ আহ্বান' ত তার বুকেরও আহ্বান। অতএব গ্রামকে গ্রাম সাঁওতাল ছুটল মারাং-বুরুর আশীর্বাদ পাওয়া কানু সিধুর সান্নিধ্য পেতে, তাদের আহ্বানে যোগ দিতে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন ভাগনাডিহিতে প্রায় চারশ সাঁওতাল গ্রামের দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হল কানু সিধুর সামনে। কানু সিধু তিল তিল করে নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে চললেন। তিল তিল করে বাড়ছে সাঁওতালদের উত্তেজনা। অবশেষে দশ হাজার সাঁওতাল গর্জে ওঠ্‌ল, প্রতিশোধ চাই। এ অত্যাচারী

চক্রের হাত থেকে মুক্তি চাই। চাই স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য। চাই স্বাধীনতা।

তাদের প্রতিজ্ঞা শেষ হতে না হতে পুলিশ এল সেই গ্রামে। তারা সংবাদ পেয়েছে কানু-সিধু বিদ্রোহের আয়োজন করছে। কোথায় তারা! তাদের বন্দী করে নিয়ে যাবে পুলিশ।

আগুনে ঘি পড়ল। ক্রুদ্ধ জনতা নেতার নির্দেশ পাবার আগেই মুষ্টিমেয় পুলিশ দারোগাকে পিষে মেরে ফেলল।

কানু-সিধু বুঝল যে এবার পুলিশ মিলিটারী নামবে সাঁওতাল পরগণায়। আর অবসর নেই। যে যা অস্ত্রশস্ত্র তাই নিয়ে প্রস্তুত হও ভাইরা। সামনে যুদ্ধ। রক্তের খেলা। সমস্বরে বল-মারাং-বুরুর জয়।

সাঁওতালরা শুধু মারাংবুরু নয়—কানু সিধুরও জয়ধ্বনি দিল। তারপর ইংরেজদের কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে সামান্য তীর ধনুক, কুড়ুল আর দু-একটা তরবারি নিয়ে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। অঞ্চলের মধ্যে ছোট ছোট পুলিশ ঘাঁটি, জমিদার মহাজনের বাড়ি, ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে, সাঁওতালদের শোষণে ইংরেজদের অনুচরদের হত্যা করে তারা তাদের সম্পদ গরীব সাঁওতালদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। মজার কথা এই যে একজন সাঁওতাল ও লুটের জিনিস নিজের জন্য রাখল না। নেতার নির্দেশে বিলিয়ে দিল সমাজের সকলের মধ্যে। এরপর সাঁওতাল পরগণার কাছ দিয়ে যাওয়া রেল লাইন আর পাকা রাস্তা খুঁড়ে তুলে ফেলে দ্রুত সৈন্য নিয়ে আসার সুযোগ নষ্ট করে দিয়ে অঞ্চলটাকে দুর্ভেদ্য করে তুলল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বাঙলাদেশে-বিহারে। সেসব অঞ্চলের বিদ্রোহীরা এসে জমল সাঁওতালদের পাশে। অস্ত্র তৈরী করে উপহার পাঠাতে থাকল। সাঁওতাল পরগণা কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে গেল।

এতে ইংরেজরা 'ত বটেই সবচেয়ে বিপদ গনল জমিদার মহাজনেরা। তারা সাঁওতালদের বর্বরতা দূর করতে গোপন সংবাদ পাঠাতে থাকল—সাহায্য করতে থাকল ইংরেজদের। ইংরেজরাও প্রথমে সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চল বিদ্রোহী মুক্ত না করে গঞ্জগুলিকে রক্ষা করতে চাইলেন।

এমন একটা গঞ্জ পাঁচকোটির বাজার। এখান থেকে বিদ্রোহীরাও প্রয়োজনীয় রসদ কেনে। এক দারোগা বেশ বড় একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। বড় মহাজনের এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। দারোগাকে আঞ্চলিক সংবাদাদি দিতে থাকল। কিন্তু সব শুনে অভিযান শুরুর আগেই বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলল বাজার। দারোগা সাহেব সামান্য যুদ্ধ করবার আগেই সদলে বন্দী হলেন। বিদ্রোহীরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করল। তারপর সেই ক'জন মহাজন, যারা দারোগাকে অভ্যর্থনা করেছিল তাদের দোকান গুদাম লুট করল। অন্যদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করল না। ঘটনাটা ঘটল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই।

এর সপ্তাহ খানেক পরে কানু সিধুর আর দুই সহচর ভৈরব আর চাঁদ আক্রমণ করল পাকুড় রাজবাড়ি। জমিদার সপরিবারে পালিয়ে গেলেন পিছনের দরজা দিয়ে। ভৈরব সব সম্পদ সাঁওতালদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। পরদিন আক্রমণ হ'ল অম্বর পরগণার রাজবাড়ি। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এমনি করে অল্প সময়ের মধ্যেই সাঁওতালরা বীরভূম বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের একটা বড় অঞ্চল তাদের অধিকারে এনে ফেলল।

১৬ জুলাই কামান বন্দুকসহ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কলকাতা থেকে মেজর বরোজ এলেন বিদ্রোহ দমনে। কিন্তু পাঁচ ঘণ্টার তুমুল যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হ'ল।

মেজর বরোজের শোচনীয় পরাজয়ের পর বড়লাট ডালহৌসী বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তাঁর নির্দেশে দানাপুর এবং কলকাতার

সৈন্য ছাউনি থেকে দুটি বাহিনী এসে মিলিত হ'ল রাণীগঞ্জের কাছে এক মাঠে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লয়েডের অধীনে তারা বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

কিন্তু প্রস্তুতি পর্ব মিটবার আগেই রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে গোটা দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিল সাঁওতালরা বহু কামান-বন্দুক এবং গোলাবারুদ তাদের হস্তগত হ'ল।

এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল ভারতের সমস্ত ইংরেজ। কলকাতার ইংরেজদের নিজস্ব পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিউ' বিভৎস অত্যাচারে সাঁওতাল পরগণায় বিভীষিকা সৃষ্টির পরামর্শ দিল। জমিদার মহাজনেরা তাদের অর্থ তহবিল খুলে দিল সাঁওতাল বর্বরতা দমনের জন্য। মুর্শিদাবাদের নামে মাত্র নবাবও পঞ্চাশটি হাতি পাঠালেন ইংরেজদের কাছে সাঁওতালদের দমনের জন্য।

এবার ইংরেজরা চতুর্দিক থেকে সাঁওতালদের ঘিরে ধরবার আয়োজন করল। নবাবের হাতিগুলিকে পাগলা করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল সাঁওতাল গ্রামগুলির ভেতর। বিজিত সাঁওতাল গ্রামগুলিতে বীভৎস অত্যাচার শুরু হল। কোথাও শিশু বৃদ্ধ নারী বিচার না করে সকলকে হত্যা করা হল। কোথাও সকলের হাত বা পা কেটে পঙ্গু করে ফেলে রাখা হতে থাকল। অবশেষে ঔরংবাদ এবং ধুলিয়ানের মাঝামাঝি মহেশপুর নামক এক গ্রামের ওং. যুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বুঝি বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সিধু তার হতাবশিষ্ট অনুচরদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকলেন। আরও বিদ্রোহী চাই। আরও লড়াই চাই। কিন্তু কোথায় সেই প্রেরণা—কোথায় সেই মনোবল। সত্যিই বীভৎস অত্যাচারে মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে ইংরেজরা। কালুর মনেও কি হতাশা! এমন সংশয় সন্দেহের দিনে কানু সহসা ইংরেজ সৈন্যের হাতে বন্দী হ'ল।

এক সিধু তবু গেরিলা যুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু ক্রমেই অসম্ভব

হয়ে পড়েছে যুদ্ধ। সাঁওতাল গ্রামে মানুষ নেই। গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে দেশ। তবু বিদ্রোহী সাঁওতাল বশ মানে না। যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। কিন্তু তাদের রক্ত পড়ে আর তো বিদ্রোহী জন্মায় না। দেড়-দুই বৎসরের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ একেবারে নিভে গেল।

নয়

নীল বিদ্রোহ

"নীল-বাঁদরে সোনার বাঙলা করলেরে ছারখার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।"—

বাঙলা দেশের চারণ কবি গান বেঁধে রূপ দিলেন চাষী এবং সাধারণের দুঃখ। এখন আমরা নীল পাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে। আগে এক রকম গাছ (অনেকটা পাট গাছের মত) পচিয়ে তার থেকে নীল তৈরী করা হ'ত। নীল চাষ ছিল খুবই লাভের কিন্তু পরিশ্রমের। বাঙলাদেশের মাটি ছিল নীলচাষের খুব উপযোগী। কিন্তু বাঙলাদেশের চাষীরা নীল চাষে অনুৎসাহী ছিল।

কিন্তু যেখানেই লাভ সেখানেই নজর সাহেবদের। ওদেশ থেকে গুণ্ডা প্রকৃতির একাদল লোক এদেশে ছুটে এলো এই লাভের চাষ করবার জন্য। তারা সরকার বা জমিদারের কাছ থেকে গ্রাম কে গ্রাম ইজারা নিত নীলচাষের জন্য। তারপর জবরদস্তি করে বিনা পয়সায় চাষীদের দিয়ে নীল তৈরী করিয়ে নিত। এক টাকার নীল তৈরী করবার জন্য চাষীর পিছনে সে এক পয়সাও খরচ করত না।

অথচ ঐ নীল ইংলণ্ডে ও অন্য ইউরোপীয় দেশে বিক্রি করত প্রায় চারশ টাকায়। সবটাই জমত তাদের বলিতে বাঙলার চাষী না খেয়ে তিলে তিলে মরতে লাগল ইংরেজ সাহেবদের এই নতুন উৎপাতে।

এ জন্য নীলকর সাহেবরা পুষত একদল লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ ছিল তাদের হাতে পোষা। আর এদেশের মানুষেরা ছিল যেন তাদের ক্রীতদাস। না ক্রীতদাসকেও মালিক বাঁচিয়ে রাখতে চায়—মরলে তার লোকসান। এদেশের লোকেরা নীলকরদের কাছে ছিল তার চাইতেও অধম। কেন না এদের তো টাকা দিয়ে কিনতে হয়নি। অতএব যেমন করে পার বিনা খরচে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নাও। যতটা বেশি পার শোষণ কর। সইতে না পেরে যদি মরে' ত মরুক।

নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ছিল এক তেজী চাষী আর দিগম্বর বিশ্বাস ছিল মহাজন। নীলচাষ একদিন ওরাই এনেছিল গ্রামে। লোভে দুজনের চোখই চকচক করেছিল। সাহেবরা যেদিন গ্রামে নীলকুঠির সংবাদ নিয়ে এলো সেদিন ওরাই উৎসাহ বোধ করেছিল বেশি। সাহেবরা ওদের কুঠিতে চাকরী দিয়েছিল।

কিন্তু এ কি নীলচাষ! এতো চাষীর রক্ত জমিয়ে নীল তৈরী। হাজার হাজার চাষীর মুখ দিয়ে তোলা রক্তে তাদের মাইনে! চাকরী তো যমদূতের পাণ্ডাগিরি! এমনি করে সকলের আর দেশের সর্বনাশ করা যেতে পারে না। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলো বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর। তারা নীলচাষের বিরুদ্ধে চাষীদের একত্রিত করতে থাকল।

ঠিকই তো একা না বোকা। সব চাষী এক জোট হলে চাষী-দেরই তো শক্তি বেশি। দুই বিশ্বাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বোঝাতে থাকলেন। আর নীলচাষ নয়। সাহেবের দাদন নয়।

কিন্তু নয় বললেই তো না হবার নয়। না বললেই সাহেবদের অত্যাচার বাড়বে। ওদের লাঠিয়াল আছে, সড়কি আছে, বন্দুক আছে। চাষীদের কি আছে?

স্থির হ'ল চাষীদের প্রধান অস্ত্র হবে লাঠি। বন্দুকও যোগাড় করতে হবে। দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণ বরিশাল থেকে লাঠিয়াল এনে গ্রামে গ্রামে লাঠি খেলা শেখাতে থাকলেন। কিন্তু নীল চাষীরা প্রস্তুত হবার আগেই চৌগাছা ঘিরে ফেলল নীল করের লোকেরা। পুরুষেরা বীরের মত যুদ্ধ করে মরল। নীলকরের লোকেরা ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। মেয়ে আর শিশুদের ওপর করল অমানুষিক অত্যাচার।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। কদিনের মধ্যে যশোর, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, দিনাজপুরে নীলচাষীরা রুখে দাঁড়াল। বিষ্ণু-দিগম্বর বেঁচে থেকে যা করতে পারেননি, মরে গিয়ে তাই করে গেলেন। বাঙলাদেশের সব চাষী প্রতিজ্ঞা করে বসল আর নীলচাষ করব না।

ওরা প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তৈরী করল। প্রত্যেক গ্রামে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল ইঁট, কাঁচা বেল, লাঠি, ফাপড়া এই সব সাধারণ জিনিস অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য মজুত করে রাখা হ'ল। কোন গ্রামে নীলকরের লাঠিয়াল এলে শঙ্খ বাজিয়ে অন্য গ্রামে জানিয়ে দেওয়া হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসত অন্যেরা।

চাষীদের এই আন্দোলনে একদল শিক্ষিত মানুষ ভয় পেলেও অন্য দল এদের সমর্থনে নামলেন। সাংবাদিক হরিশ মুখার্জি তাঁর সর্বস্ব ব্যয় করে নীল চাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিটি কথা প্রচার করতে থাকলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ নামলেন ওদের সমর্থনে।

সারা ভারতে তখনও সিপাহী-বিদ্রোহের তাণ্ডব। বাঙলাদেশে

সিপাহী বিদ্রোহের হাওয়া প্রায় ছিল না। এই নতুন বিদ্রোহ ভাবিয়ে তুলল শাসকদের। লর্ড ক্যানিং-এর মনে দিল্লীর ঘটনার চেয়ে বড় হয়ে উঠল নীল সমস্যা। তিনি গোপনে নীলকরদের একটু সংযত আচরণ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কে কান দিল তাতে? নীলকরদের অত্যাচার কমল না। বরং নদীয়া আর যশোর জেলায় পদাতিক সৈন্য নামান হ'ল। দুটি রণতরী দুই জেলার নদীতে টহল দিতে থাকল।

খুলনা জেলায় এবার নীল আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। জেলার দুই নীলকর রেনী সাহেব আর মরেল সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জর হয়েছিল চাষীরা। লাঠিয়াল সর্দার কাদের মোল্লার নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করল। এ বিদ্রোহে একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হল বিদ্রোহীরা। মোল্লাহাটির বিদ্রোহ দেখেছিলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' নাকি সেই কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন তিনি।

এই নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর নাম গোপন রেখেছিলেন। প্রকাশক হিসাবে নাম রইল পাদ্রী ফাদার লং-এর। এই বই ইংলণ্ডের গুণীজনকে পাঠান হ'ল। তাঁরা নীল-চাষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলেন। কিন্তু এদেশের নীলকরেরা আর কাউকে না পেয়ে লং-এর বিরুদ্ধেই মামলা করলেন এবং অকারণে নীলকরদের হেয় করা হয়েছে এই অপবাদে লং-কে হাজার টাকা জরিমানা করা হল। বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ লং-এর হয়ে জরিমানার টাকা দিয়ে দিলেন।

এই সময় বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব স্টিমারে করে গড়াই নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন। সংবাদটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছিল। হাজার হাজার নীল চাষী এসে জমল দুই পারে। স্টিমার থামিয়ে তাদের অবস্থা দেখে যেতে বললে গ্রাণ্টকে সাহেব। গ্রাণ্ট শুনলেন না। নদীর প্রবল স্রোত না মেনে হাজার হাজার চাষী ঝাঁপিয়ে

পড়ল জলে। স্টিমার থামাতেই হবে। বাধ্য হয়ে থামলেন গ্রান্ট। ওদের নেতার কাছে শুনলেন সব। খানিকটা দেখলেনও। তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল, তিনি নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করবেন। চাষীরা উল্লসিত মনে চলে গেল।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ইংরেজ-কোম্পানীর পক্ষে এমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল যে তাঁরা বাধ্য হয়ে এক 'নীল কমিশন' বসালেন।

এসব শুনে আরও ক্ষিপ্ত হ'ল নীলকরেরা। বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের নীলকর মরেল সাহেবের ম্যানেজার রেনী। তিনি একদিন রাত্রি বেলা আড়াই শ' পাইক নিয়ে নীলচাষীদের নায়ক রহিম উল্লার বাড়ি ঘিরে ফেললেন। কিন্তু রহিমের বাড়ির চারদিকে গড় খাই। গড়খাই পার হবার আয়োজন করবার আগেই রহিম গুলি চালান। তারপর সারারাত ধরে চলল যুদ্ধ। মেয়েরা ভিজে কাঁথা টাঙ্গিয়ে ও পক্ষের গুলি আটকাবার আয়োজন করল। কিন্তু ফুরিয়ে গেল রহিমের মজুত গুলি। মেয়েরা রূপোর কাঁকন ভেঙ্গে তাই দিয়ে কার্তুজ করে দিল। কিন্তু কতক্ষণ! তাও শেষ। রহিম এখন রামদা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে এল। এতে ভয়ে পালাতে লাগল নীলকরের পাইকরা। রেণী সামনাসামনি গুলি করে মারল রহিম উল্লাকে।

শোনা যায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই ম্যানেজারকে বন্দী করবার জন্য তাড়া করেন। রেণী বনে আত্মগোপন করে। সেখানে বুনো হাতীর পায়ে পিষ্ট হয়ে সে মারা যায়।

এদিকে নীল কমিশন বের হয়। সরকার আইন করলেন যে, নীলচাষীদের কেউ আর জোর করে চাষ করাতে পারবেন না। নীলচাষ চাষীর ইচ্ছাধীন।

আইন কতখানি পালিত হ'ত বলা যায় না এমন সময় জার্মানে রাসায়নিক নীল উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার হওয়ায় নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল।

দশ

মহাবিদ্রোহের সূচনা

পলাশীর যুদ্ধের পর একশ' বছর পার হয়ে এল। ১৮৫৭ সালে একশ' বছর পূর্ণ হবে। এই একশ' বছর ইংরেজ শাসন এবং শোষণে বিপর্যস্ত ভারতে কেমন করে একটা কথা চালু হয়ে গেল যে এ বছরেই ইংরেজ রাজত্ব খতম। এর পর থেকে ভারতবর্ষ হবে স্বাধীন। সাধারণ মানুষ প্রার্থনা করতে থাকল, তাই যেন হয় ঠাকুর। এ অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না।

তখন ভারতবর্ষে বড়লাট হয়ে এসেছেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, আমি ভারতের মাটি সমান করে দেব। অর্থাৎ তিনি ভারতে মাথা উঁচু করে চলবার আর কাউকে রাখবেন না। থাকবে একমাত্র ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম নির্বাহকেরা।

অবশ্য তখন কতটুকু বা অসমান ছিল ভারতের? ছিল কটি দেশীয় রাজ্য। বাইরে থেকে তাদের স্বাধীন বলে মনে হলেও ইংরেজদের কাছে তাদের মাথা বিকোনো। সবদিক থেকেই তারা বাঁধা পড়ে ছিলেন ইংরেজদের কাছে। এমন কি দিল্লীর দোর্দণ্ড-প্রতাপ মোগল বাদশাদের বংশধরেরাও ছিলেন ইংরেজদের বৃত্তি-ভোগী। তখনও ইংরেজ কোম্পানী কোন রাজ্য দখল করলে বাদশার

কাছ থেকে তার জন্য ফরমান নিতেন। বাদশার দরবারে ঢুকবার আগে খালি পায়ে খালি মাথায় সেলাম করতে করতে ঢুকতেন। এ সবটুকুই ছিল ঠাট। ইংরেজদের ভয় ছিল যে মাথার ওপর ঐ নাম-মাত্র বাদশাটুকু থাকাও তাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল। বাদশাকে সরালে ভারতবর্ষে গণবিদ্রোহ ঘটা অসম্ভব নয়।

এ সব কারণেই তখনও ভারতবর্ষে যেন মোগল রাজত্ব চলছিল—ইংরেজ কোম্পানী যেন তার অছিদার। ছিল অনেক টুক্‌রো টুক্‌রো স্বাধীন রাজ্য—সেখানে রাজরানী ছিলেন, দরবার ছিল। ছিল নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা। সামান্য সেনাদলও ছিল। কিন্তু মূল সৈন্যদল ছিল ইংরেজদের হাতে। এজন্য মোটা টাকা দিতে হ'ত ইংরেজদের। আর তাদের সম্পত্তির বাইরে অন্য রাজ্য যা দেশের সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা চুক্তি করা যেত না। এই না থেকেও থাকা স্বাধীনতা-টুকুও ডালহৌসি লুপ্ত করে দিতে চাইলেন।

তিনি এসে এক অদ্ভুত আইন জারী করলেন। এর নাম হ'ল 'স্বত্ব বিলোপ নীতি'। এতে বলা হ'ল কোন রাজা যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান তবে সে রাজ্য কোম্পানীর অধিকারে চলে আসবে।

এই এক আইনে ইংরেজদের গ্রাসে চলে এলো দাক্ষিণাত্যের পেশোয়াদের রাজ্য বেরার, মারাঠাদের সম্বলপুর, ভোঁসলা রাজ্য নাগপুর, নিজামের হায়দ্রাবাদ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর রাজ্য ঝাঁসি, মুসলমান রাজ্য কর্ণাটক ও তাঞ্জোর আর সব শেষে শিখদের রাজ্য পাঞ্জাব।

এতদিন ধরে এই সব দেশীয় রাজারা ইংরেজদের সাহায্য দিয়ে এবং নিয়ে সমস্ত ভারতীয় বিদ্রোহ দমন করেছে, ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের হাতে তুলে দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। ভাবখানা এমন ছিল যেন পরম বন্ধুর সন্ধান পেয়েছেন—মরণের ঝুঁকি নিয়ে ইংরেজরা তাদের রাজ্য রক্ষা করবেন, আর তাঁরা সুখে-বিলাসে কাল কাটাবেন। কিন্তু ডালহৌসির আমলে ইংরেজদের সব মুখোস খুলে

পড়ল। এবার প্রবঞ্চিত হয়ে রাজারানীরাও সাধারণ মানুষের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। সাধারণ মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভে 'ত ভুগছিলই।—এবার রাজা রানীরাও তাদের মতই দুঃখভাগী হওয়ায় এ প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির জন্ম ঘটল।

এবারের এ বিদ্রোহের আর এক বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এতে শুধু সাধারণ মানুষ এবং দেশীয় রাজারাই যোগ দিলেন না, এতে এসে যোগ দিল ইংরেজদেরই হাতে গড়া দেশী সিপাহীর দল। এদের দিয়ে রাজ্য জয় এবং রাজ্য-শাসন করালেও এদের ভাগ্যে না ছিল ভাল বেতন, না ভাল ব্যবহার। যোগ্যতা দেখলেও একজন ভারতীয় সিপাই হাবিলদারের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারত না। কিন্তু একজন ইংরেজ অনেক কম কৃতিত্ব দেখিয়েও অনেক বেশি উন্নতি করত। তাদের মাইনে খাদ্য বাসস্থান সবই ছিল অনেক বেশি এবং ভাল। ভারতীয় সিপাইরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করত যে শুধু ভারতীয় বলেই সে ঘৃণিত—শুধু ঐ কারণেই তার সুযোগ কম। এ জন্য তাদের মনে বিদ্বেষ জমেই থাকত।

এ অবস্থায় সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে আর চাষীদের গ্রামে গ্রামে সভা হয়ে স্থির হ'ল বিদ্রোহের তারিখ—১৮৫৭ সালের ২২ জুন রাত বারটা। ঐ দিনই পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। ঐ সময়েই ইংরেজ রক্তে ধৌত করে নির্মল করা হবে ভারতের স্বাধীনতার দীপ্তি। হবে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।

সিপাহিরা বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। কারণ ইংরেজ সৈন্য ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার আর ভারতীয় সৈন্য ছিল দু লক্ষ পনের হাজার। ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় ইংরেজদের চেয়ে দেশী সৈন্যরা বেশি কর্মক্ষম ছিল। উপরন্তু দেশের সাধারণ মানুষও ছিল এ বিদ্রোহের সমর্থক।

ঠিক ছিল এক যোগে ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। তখন কোথাও কোথাও সামান্য রেল লাইন বসেছে। বিদ্রোহীরা

তা উপড়ে ফেলবে। হত্যা করবে ইংরেজ সৈন্য, ইংরেজ নাগরিক। জেল ভেঙ্গে বের করে আনবে বন্দীদের। লুট করবে কোষাগার—দখল করবে অস্ত্রাগার—দখল করবে দুর্গ আর ক্যাণ্টনমেণ্ট—সৈন্যাবাস। সম্মুখ যুদ্ধ যতটা সম্ভব এড়াতে চেষ্টা করা হবে – নীতি হবে গেরিলা যুদ্ধ।

বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন গদিচ্যুত পেশোয়া নানা সাহেব। তিনি তাঁর অনুচর আজিমুল্লাকে পাঠালেন ইংলণ্ডে। ভারতের প্রতিবেশি রাজ্যগুলিও যাতে এই বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য দেয়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ সময়ে সিপাহীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির মত এক কারণ ঘটিয়ে বসলেন। তারা এনফিল্ড রাইফেল নামে এক রকম নতুন রাইফেল আমদানী করলেন। আগের রাইফেলের চেয়ে এগুলি উন্নত ছিল। ব্রাউনবেস রাইফেলের চেয়ে এনফিল্ড ছিল ওজনে হাল্কা তাই বহনের পক্ষে সহজ। এর গুলির পরিসর ছিল বেশি। গরম হ'ত কম।

এমন উন্নত অস্ত্র হাতে পেলে সৈন্যদের আনন্দ হবারই কথা। সৈন্যরা আনন্দিত না হয়েছিল এমনও নয়। কিন্তু যখন তাদের সামনে ঐ বন্দুক চালানর মহড়া দেওয়া হ'ল, তখন দেখা গেল, ঐ বন্দুকের গুলি এক রকম চর্বিভেজা কাগজে মোড়া থাকে। ঐ কাগজ দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হয়। কিন্তু কিসের চর্বি? সন্দেহ দেখা দিল যে ওতে শুয়োর এবং গরু দুয়ের চর্বিই মেলান আছে। ও টোটা দাঁতে কাটলে হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই জাত যাবে। বজ্জাত ইংরেজ এতদিন ভাতে মেরেছে, এবার জাতেও মারতে চায়। সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো ফুঁসে উঠল।

সরকার যতই ঐ রাইফেল চালাবার আয়োজন করতে থাকলেন. ততই বিক্ষোভ বাড়তে থাকল। রাণীগঞ্জে এবং সার্জেনের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। ব্যারাকপুরে টেলিগ্রাফ অফিস সহ

কয়েকটি বাংলোতে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ক্রমে এ রীতি ছড়িয়ে পড়ল আম্বালা এবং অন্যান্য পুলিশ ব্যারাকেও। সরকার প্রথম বোঝাতে চাইলেন যে টোটার কাগজে চর্বি নেই পরে বললেন যে দাঁতে না কেটে হাতে কাটলেও চলবে। এসব উল্টো-পাল্টা কথায় সিপাহীদের সন্দেহ আরও বাড়ল।

এমন সময় ২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে কমেণ্ডিং অফিসার কর্নেল মিচলে বহরমপুরে ১৯-বাহিনীর সৈন্যদের বললেন, পরদিন ১৫ রাউণ্ড গুলি নিয়ে প্যারেড করতে হবে। সৈন্যরা জানত এ গুলি সেই বিতর্কিত গুলি। অতএব তারা ও গুলি নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু কর্নেল বললেন, তোমরা যদি গুলি না নাও, তাহলে তোমাদের বর্মা বা চীন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মরতে হবে তোমাদের।

একথা বলে তিনি হয়ত' ভাববার অবকাশ দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু এই হুমকিতে সিপাহিরা ভয় পাওয়ার বদলে আরও ক্ষিপ্ত হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা এত উত্তেজিত হ'ল যে বারুদখানা আক্রমণ করে দরজা ভেঙ্গে মাস্কেট বন্দুক আর টোটা বের করে আনল।

সংবাদ শুনে মিচলে অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হলেন। সৈন্যদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বললেন। সৈন্যরা বল্‌ল, আপনি অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে নিয়ে যান—তবে আমরা শান্তভাবে ফিরে যাব।

বুদ্ধিমানের মত মিচলে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের দাবী মেনে নিলেন। ১৯-বাহিনী বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেও বিদ্রোহ করল না। ২৭ তারিখে তাদের যে ঐ গুলিসহ প্যারেড করতে হল না—এতেই তারা খুশি হ'ল।

কিন্তু সরকার এদের জন্য যে সুপরিকল্পিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তা এরা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। হঠাৎ তাদের যাত্রার আদেশ দেওয়া হ'ল। সৈন্যদল এতে অভ্যস্থ। বহরমপুর থেকে দুশ'

কুড়ি মাইল হেঁটে দমদমে তারা যে মাঠে এসে দাঁড়াল তা কয়েক রেজিমেণ্ট ইংরেজ সৈন্যে ঘেরা। সেখানে ঢুকিয়ে তাদের নিরস্ত্র করা হ'ল এবং বরখাস্ত করা হ'ল।

ব্রিটিশ রেজিমেণ্টগুলি আনা হয়েছিল বর্মা থেকে। কিন্তু তাদের আর ফেরৎ পাঠান হল না। সিপাহীরা বুঝল যে তাদের উপস্থিতিতে জোর করে টোটা ধরান হবে। সামান্য কারণে ২৯শে মার্চ রবিবার সকালে ২৬ বছরের এক যুবক মঙ্গলপাণ্ডে আর নিজের মনের উত্তাপ চেপে রাখতে পারল না। পুরো ইউনিফরম্ পরে. কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে সে তার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে সকলকে ডাকতে থাকল বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য।

সামনেই ঈশ্বরী পাণ্ডে ২০জন সিপাই নিয়ে কোয়ার্টার গার্ড দিচ্ছিল। মঙ্গল পাণ্ডের চারদিকে সিপাইরা জমতে শুরু করল। সে ক্রমাগত উত্তেজক বক্তৃতায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকল।

এমন সময় সেখানে এলেন দুজন অশ্বারোহী অফিসার লেফটেনাণ্ট বগ এবং সার্জেণ্ট মেজর হিউসন। তাদের দেখে কেউ স্যালুট করল না। এতে রেগে গিয়ে একজনকে চড় মারলেন বগ্। হিউসন্ ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বল্লেন, ও লোকটা অত বলছে কি? ওকে থামতে বল।

কেউই তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। মঙ্গল পাণ্ডের বক্তৃতা তাদের মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে। অন্যদিকে বক্তাকে চড় মারতে দেখে মঙ্গল আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সোজা গুলি চালাল সে। বগের ঘোড়াটি নিহত হল। বগ লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করলেন মঙ্গলকে। হিউসনও যোগ দিলেন। কিন্তু যৌথ আক্রমণকে তলোয়ার দিয়ে প্রতিরোধ করল মঙ্গল। তার তলোয়ারের ঘায়ে দুজন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। বগকে শেষ করে দেওয়ার জন্য যখন তলোয়ার তুলেছে মঙ্গল, তখন পল্টু শেখ নামে একজন জড়িয়ে ধরল মঙ্গলকে। অন্য সিপাইরা পল্টুকে গালাগাল করতে থাকল। একজন চিৎকার করে উঠল, এই শেখ, মঙ্গলকে ছেড়ে দে। নইলে

গুলি করব। কিন্তু ইংরেজ ভক্ত পল্টু তাতেও ছাড়ল না মঙ্গলকে। মঙ্গল পল্টুর দিকে তলোয়ার তুল্‌ল। তারপর বল্‌ল, হিন্দুস্থানীর রক্তে আমার তলোয়ার লাল করব না। বলে এমন লাথি মারল যে পল্টু তাকে ছেড়ে ছিটকে পড়ল।

এদিকে ততক্ষণ কমেণ্ডার হুইলার এসে পড়েছেন সেখানে। তিনি কোয়ার্টার গার্ডদের আদেশ করলেন মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার ও নিরস্ত্র করতে। কিন্তু তারা নড়ল না। অন্য দিকে ততক্ষণে দমদম এবং চুঁচুড়ার সৈন্যদের ডাকবার জন্য দূত ছুটেছে। সংবাদ পেয়ে জেনারেল হিয়ার্সে ছুটে এলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শিখ সৈন্য। তাদের আসতে দেখে মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক তুল্‌ল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না কেন? একজন সিপাই বন্ধু ত' তার পিছনে নেই। হায়রে ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেউ ত' এল না তার পাশে। বরং ইংরেজদের পাশে পাশে তারই দেশবাসী এগিয়ে আসছে তার দিকে। মঙ্গল হতাশায় ঘৃণায় বন্দুকের নল নিজের বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ঘোড়া টিপে দিল। গুলি তার দেহের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুর্ভাগ্য—মঙ্গল মরল না। আহত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। শিখ সৈন্যরা তাকে বন্দী করল। বন্দী হল ঈশ্বরী পাণ্ডে এবং তার সঙ্গীরা।

৬ই এপ্রিল সামরিক আদালতে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হল। ৮ই এপ্রিল ব্যারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে মুমূর্ষু মঙ্গল পাণ্ডেকে এনে কোন ক্রমে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। ২১শে এপ্রিল হল ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি। তার সঙ্গীদের দেওয়া হ'ল দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম। ব্যারাকপুরের আকস্মিক বিদ্রোহ এ ভাবে শেষ হল।

সিপাইদের মধ্যে বিক্ষোভ সবচেয়ে বেশি করে জমছিল মিরাটে। এখানেই সবচেয়ে বেশি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মার্চ-এপ্রিলে এখানে খাদ্যাভাব দেখা দিল। সরকার এ সময়ে এমন ময়দা-ঘি সরবরাহ করতে থাকলেন, যাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক

নয় যে ওগুলিতেও সন্দেহজনক চর্বি মেশান আছে। এ সময়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের সঙ্কল্প নিয়ে চাপাটি বিলান হতে থাকল। মিরাট অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠ্ল।

২৩শে এপ্রিল কর্ণেল স্মাইদ হুকুম করলেন পরদিন এনফিল্ড টোটা বিতরণ করা হবে। সিপাইদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে স্মাইদকে জানালেন যে সিপাইরা জাত যাওয়ার ভয়ে ও টোটা নিতে অস্বীকার করবে। অন্য অফিসাররাও স্মাইদকে বিপদজনক ঝুঁকি নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু স্মাইদ কারো কথাই শুনলেন না।

পরদিন সকালে নব্বুইজন সিপাইকে নিয়ে স্মাইদ প্যারেড শুরু করলেন। টোটা বিতরণের সময় মাত্র পাঁচজন ইতস্ততঃ করে টোটা নিল—নিল না পঁচাশি জন। স্মাইদ এদের বন্দী করলেন। কমেণ্ডার ইন চিফের কাছে নির্দেশ চাওয়া হ'ল বন্দীদের নিয়ে কি করা হবে।

রাতে ঐ পাঁচজন সিপাই-এর কুঁড়েতে আগুন জ্বলে উঠ্ল। সাধারণ লোকও উত্তেজিত হয়ে থাকল। সিপাইরা বাজারে হাটে গেলে সকলে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, বন্দীদের সম্পর্কে তোমরা কি করবে?

৮ তারিখে সামরিক আদালত বন্দীদের দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিল। পরদিন প্যারেড গ্রাউণ্ড ঘিরে সাজান হ'ল গোলন্দাজ বাহিনী। তার মাঝে নিয়ে আসা হ'ল বন্দীদের। কমেণ্ডার হিউইট নিজে দণ্ডাদেশ পড়ে শোনালেন। তারপর এক এক করে বন্দীদের আনা হতে থাকল, তাদের গা থেকে ইউনিফরম খুলে নেওয়া হতে থাকল আর তারপর পরিয়ে দেওয়া হতে থাকল দুপায়ে লোহার বেড়ি। তিন ঘণ্টা ধরে দেশী কামার হাতুড়ি ঠুকে বেড়ি লাগালে। এতেও খুশি হলেন না হিউইট। তিনি ঐ অবস্থায় ওদের বাজারের ভিতর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে গেলেন। ক্যাণ্টন-মেণ্টের সৈন্যরা, সহরের সাধারণ মানুষ নীরবে এ শাস্তি দেখল।

হিউইট গর্বভরে রিপোর্টে লিখলেন, মুর্খতা আর অবাধ্যতার শাস্তির নমুনা দেখে সকলেই শক্তিমান সরকারকে সম্ভ্রম করতে শিখেছে।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ গুলির আওয়াজে শুরু হ'ল ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। সেদিন থেকেই সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আধ-ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা জানা ছিল না সিপাইদের। তাই তারা যখন গীর্জা আক্রমণ করে সমস্ত ইংরেজকে একত্রে হত্যা করতে গেল, তখনও তারা গীর্জায় যায়নি। তখনও তারা লাইনে দাঁড়িয়ে। ফলে আকস্মিক আক্রমণে লাইন অধিকার করা সম্ভব হ'ল না সিপাইদের পক্ষে। ওদিকে গীর্জাতেও হত্যা করা সম্ভব হল না। তখন তারা আক্রমণ করল জেলখানা। বন্দী সিপাইদের সঙ্গে অন্য বন্দীদেরও মুক্ত করে তারা চলল শহরে। সেখানে যে ইংরেজকে পেল, তাকেই হত্যা করে চলল দিল্লী অভিমুখে।

১১ মে ভোরবেলা দিল্লীর মানুষ 'দিন দিন' 'মারো ফিরিঙ্গি লোককো' ইত্যাদি ধ্বনি শুনতে শুনতে জেগে উঠল। প্রায় আড়াইশো অশ্বারোহী পুরো সাজে সজ্জিত হয়ে ধীর গতিতে দিল্লীতে প্রবেশ করল। তাদের পিছনে ছিল লাল ইউনিফরম পরা পদাতিকের দল। তাদের বেয়নেটগুলি সূর্যালো'কে ঝক্‌মক্ করছিল। তারা সোজা এসে দিল্লীর মোগল বংশধর বাহাদুর শাহের বাড়ির সামনে থামল।

বাহাদুর শাহ জানালা খুলে বিদ্রোহীদের দেখা দিলেন। তারা বাদশাহের জয়ধ্বনি দিল। তারপর তাদের নেতা এগিয়ে এসে বলল, আমরা ধর্মের জন্য দেশকে ব্রিটিশের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা মিরাটের ইংরেজদের খতম করেছি। দিল্লীকে মুক্ত করতে এসেছি। আপনি যদি সম্রাট হতে রাজী থাকেন তবে আমরা হিন্দুস্থানকে আপনার হাতেই ফিরিয়ে দেব।

চুপ করে রইলেন বাহাদুর শাহ। কি ভাবলেন কে জানে।

বললেন. আমাকে ব্রিটিশদের দেওয়া পেনশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমার তো ধনাগার নেই। আমি কিভাবে তোমাদের বেতন দেব!

সিপাই-সর্দ্দার চেঁচিয়ে উঠলেন, ইংরেজদের ধনাগার লুট করে এনে আমরা আপনার ধনাগার গড়ে দেব।

তবু চুপ করে রইলেন বাহাদুর শাহ। বিদ্রোহী সিপাইরা চিৎকার করে উঠল জবাব দিন বাদশাহ।

বাহাদুর শাহ দেখলেন, তাঁর নিজের সিপাই রাও এসে ভিড়ছে বিদ্রোহীদের দলে। দিল্লীর জনতাও এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের। চারিদিকে উল্লাস। যেন এক বাঁধভাঙ্গা জলপ্লাবন। বাহাদুর শাহ তবু বললেন. এ রকম কাজের ফলাফল কি হতে পারে তা কি তোমরা ভেবে দেখছ? তোমরা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবে কি?

সিপাইরা চিৎকার করে উঠল, বাদশাহ! আমরা ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি চাই। স্বাধীনতা চাই। তার জন্য প্রাণ দিতেও পিছপা নই।

বাহাদুর শাহ প্রাসাদের দরজা খুলে দিতে বললেন।

এদিকে দিল্লীর রেসিডেণ্ট স্যার থিওফিলাস্ মেটকাফ ও কমিশনার ফ্রেজার যে মুহূর্তে বিদ্রোহের সংবাদ শুনলেন, সেই মুহূর্তেই ব্রিগেডিয়ার গ্রেভসকে কাশ্মীর দরওয়াজা এবং সেলিমগড় রক্ষার জন্য হুকুম দিয়ে নিজেরা ছুটলেন লালকেল্লার দিকে। তখন জনতার সঙ্গে মিশে সিপাইরা উঠছে লালকেল্লার সিঁড়ি দিয়ে। প্রাসাদ-প্রহরীরা মেটকাফকে চিনত। কিন্তু তারা সেলাম করল না। ভ্রূক্ষেপ করলেন না মেটকাফ। তিনি জনতাকে রুখতে আদেশ দিলেন। প্রহরীরা নির্বিকার। ক্রুদ্ধ মেটকাফ এক লাথিতে সামনের প্রহরীকে ফেলে দিয়ে তার বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি

করলেন এক সিপাইকে। ফ্রেজারও বন্দুক তুললেন। কিন্তু তার আগেই কিন্তু জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রেজারকে তারা পায়ে পায়ে থেঁথলে মেরে ফেলল। মেটকাফ পালাতে গেলেন। জনতা তাড়া করল। কিন্তু ভাগ্য ভাল। তিনি একটা ঘোড়া পেয়ে তাতে করে পালালেন। বিদ্রোহী জনতা শহরে যেখানে ইংরেজ পেল সেখানেই তাকে হত্যা করল। এমন কি জনপ্রিয় পাদরী জেনিংস তার কন্যাসহ নিহত হলেন। এক সিপাই হত্যার শোধ নিতে হিংস্র জনতা এমনি করে পাগল হয়ে উঠল।

এদিকে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভসএর কাছে সংবাদ পেয়ে মেজর এবটস্ গেলেন কাশ্মীর দরওয়াজায় আর কিছু সিপাই নিয়ে কর্নেল রিপলে গেলেন সেলিমগড়ে। বিদ্রোহীরা সেদিকে আসতেই রিপলে সৈন্যদের গুলি করতে বললেন। সৈন্যরা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্রোহীরা চিৎকার করতে থাকল 'দিন দিন', 'ফিরিঙ্গিকো মার ডাল' 'ব্রিটিশরাজ খতম কর'। সে চিৎকার শুনতে শুনতে ব্রিটিশদলের সিপাইদের হতভম্বভাব কেটে গেল। তারা দৌড়ে এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে থাকল। তারপর বন্দুক তুলে কর্নেল রিপলে এবং অন্য ইংরেজদের গুলি করতে থাকল। ওরা প্রাণ হারালেন।

কাছেই অস্ত্রাগার। এবার বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার দখল করার পরিকল্পনা করল। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে গোলাবারুদ ছিল না বললেই চলে। ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা উচিত মত প্রতিরোধ করলে বিদ্রোহীদের দিল্লীতে ঢোকাই সম্ভব হ'ত না। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা প্রথম দিকে অত তৎপরতা দেখাতে পারেন নি। ঘটনার আকস্মিকতা তাদের হতবুদ্ধি করেছিল। সিপাইরাও এ কথা বুঝেছিল। তাই তারা প্রথম সুযোগেই অস্ত্রাগার দখল করতে গেল।

সেদিন সামান্য কয়েকজন সিপাই নিয়ে লেফটেনান্ট উইলোবি অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি বুঝলেন অস্ত্রাগার রক্ষা করা

অসম্ভব। অথচ এ অস্ত্রাগার বিদ্রোহীদের হাতে গেলে তাদের শক্তি যে কি অসম্ভব ভাবে বেড়ে যাবে, তাও বুঝলেন তিনি। অতএব দ্বিধা না করে তিনি দিয়াশলাই জ্বেলে ছুঁড়ে দিলেন বারুদের স্তূপে। সঙ্গীদল সহ উইলোবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। আশে-পাশের শত শত ভারতীয় পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু অস্ত্রাগার ধ্বংস হওয়ায় বিদ্রোহীদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

এদিকে আশপাশের পল্লীগুলির ভারতীয়দের মৃত্যুতে উৎক্ষিপ্ত জনতা বেপরোয়া ভাবে ইংরেজ হত্যায় নেমে পড়ল। ইংরেজরা যে যেমন ভাবে পারল, গিয়ে আশ্রয় নিল ক্যাণ্টনমেণ্টে। এবার ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাইরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারা অবিলম্বে সকল ইউরোপীয়কে ক্যাণ্টনমেণ্ট ছেড়ে পালাতে নির্দেশ দিল। তারা কেউ ফকির, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ বা মেথর সেজে পালাতে গেল। আশপাশের বিদ্রোহী গ্রামগুলির হাত থেকে তারাও আত্মরক্ষা করতে পারল না। ১০ তারিখের সন্ধ্যা আসবার আগেই দিল্লী থেকে ইংরেজ শাসনের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল। পরদিন দরবার করে বিদ্রোহীরা অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে স্বাধীন-ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এই এক ঘোষণায় বিদ্রোহীদের মর্যাদা বেড়ে গেল। বাহাদুর শাহ হলেন তাদের ঐক্য ও শক্তির প্রতীক। এমন কি যে নানাসাহেব স্বাধীন হিন্দু পেশোয়া শাহী গড়বার স্বপ্ন দেখতেন —তিনিও বাহাদুর সাহের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেন। বস্তুতঃ সেদিন হিন্দু-মুসলমান, নির্বিশেষে ঐ একটি নামের তলায় এসে সমবেত হলেন।

দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে থাকাকে ইংরেজরা রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে থাকলেন। দিল্লী পুনরুদ্ধার করার গুরুত্ব যতই থাক, তা কতখানি সম্ভব সেটাই সেনাপতিদের আলোচনার বিষয় হ'ল। অবশেষে প্রায় কুড়ি দিন পরে ৩০ মে দিল্লী থেকে ১৫ মাইল দূরে হিন্দন নদীর তীরে এসে পৌঁছাল।

বিদ্রোহীরা সম্রাটের তাগিদ সত্ত্বেও ইংরেজ বাহিনীকে পথে বাধা দিল না। হিন্দন নদীর লোহার সেতুর এপারে একটা টিলার ওপর কামান বসিয়ে সেতুটা ধ্বংস করে দিতে চাইল সিপাহীরা কিন্তু ততক্ষণে ইংরেজরা সেতু দখল করে ফেলেছে। এমন সময় এগুরুজ যখন একটি কামানগাড়ি শক্রর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য প্রায় প্রস্তুত করে এনেছেন, তখন একজন সিপাই তাতে গুলি চালিয়ে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজে ত' আত্মদান করলই, ইংরেজদেরও সমুহ ক্ষতি করে দিল। অমীমাংসিতভাবে সেদিনের যুদ্ধ শেষ হল।

পরদিনের যুদ্ধে যখন ইংরেজদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সেই সময় হঠাৎ সিপাই বাহিনী কামান-টামান গুটিয়ে নিয়ে ফিরে চলল। পরদিনও তারা আর আক্রমণ করল না। ইংরেজ সৈন্য হিন্দনের পাড়ে বিশ্রাম করে শক্তি সঞ্চয় করে নিল। ইতঃ মধ্যে ৫ই মার্চ আম্বালা থেকে আর এক বাহিনী এসে পৌঁছাল যমুনার পারে আলিপুরে। বাগপতে যমুনা পার হয়ে হিন্দন যুদ্ধের বিজয়ী বাহিনী মিলিত হল আম্বালা দলের সঙ্গে। একত্রে তারা এগিয়ে চলল দিল্লীর দিকে।

দিল্লীর মাইল পাঁচ-ছয় দূরে বদলি কি সরাই নামে এক গ্রামে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর গতিরোধ করল। এখানে বিদ্রোহীরা ছিল সুবিধাজনক জায়গায়। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যদল এক দিকে যখন ওদের কামান যুদ্ধে ব্যস্ত রেখেছে, তখন আর এক দল ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্রান্টের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের পাশ থেকে আক্রমণ করল। মজার কথা এই যে এর খানিক আগেই বিদ্রোহী অশ্বারোহী বাহিনী দিল্লীতে ফিরে গেছে। গোলন্দাজ বাহিনীকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। ফলে তারা কামান নিয়ে পালাতে বাধ্য হল। পথে ইংরেজরা তাদের তেরটি কামান এবং আরও অনেক অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিল।

দুঃখের কথা হচ্ছে এই পরাজয়ের পরেও বিদ্রোহীরা সতর্ক হ'ল

না। ইংরেজরা প্রায় বিনা বাধায় ক্যান্টনমেণ্ট অধিকার করল। উইলসন সবজি মণ্ডিতেও বাধা পেলেন না। হিন্দুরাও এর বাড়ির থেকে বিদ্রোহীরা তাকে বাধা দিল। গোর্খা বাহিনী ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহীদের ওপর। অর্দ্ধেকের বেশি গোর্খা মারা গেলেও তারাই যুদ্ধ জয় করল। দিল্লী আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কটি দুর্গ ই এবং ঘাঁটিই এসে গেল ইংরেজদের হাতে। ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর অবরোধ চূর্ণ করবার জন্য দিন স্থির হল।

দিল্লীর ভিতরেও শান্তি ছিল না। দিল্লীর ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায়ের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ইংরেজদের সঙ্গে। তারা নিয়মিত সংবাদ পাঠান ও গুপ্তচর বৃত্তি করত। ইচ্ছা করে তারা খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে রেখে বিদ্রোহী সরকারকে বিব্রত করতে চাইত। শাহ-জাদারাও যে যার গুছিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যেও মিলের অভাব ছিল। এক দিকে যেমন লুট ও সংগ্রহের টাকা অনেক নেতা জমা দিলেন না. অন্য দিকে তেমনি চলল সৈন্যদের বেতন না পাওয়ার অসন্তোষ। তবু এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা চাষীর হাতে জমি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আগষ্ট মাসে বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট .হয়ে উঠল। বিরাট বাহিনী নিয়ে বখ্‌ত খান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিমখ-বার্ গীর পরাজয় দেখলেন কিন্তু সাহায্য করলেন না। বাহাদুরশাহ তাঁকে প্রাসাদে ঢুকতে নিষেধ করে দিলেন।

এদিকে ইংরেজরা মরণপণ করে চতুর্দিকে ব্যাটারি তৈরী করতে শুরু করেছিলেন। শব্দ শুনে গোলন্দাজেরা নির্ভুল লক্ষ্যে দু-চারটি কামান দেগে তাদের ক্ষতিও করেছিল, বাধাও দিয়েছিল। তবু ১৪ তারিখের আগেই ওরা সব আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

১৪ তারিখে সূর্যোদয়ের আগেই পাঁচ দিক থেকে দিল্লী আক্রমণ করল ইংরেজরা। প্রথম দল কাশ্মীর গেট আক্রমণ করল। প্রতিরোধ

প্রবল। এক ইঞ্চিও এগুতে পারা সম্ভব হল না ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে। তখন লেকটেনাণ্ট স্যালকত এবং হোম কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও দশজন শিখ যোদ্ধা বারুদের বস্তা নিয়ে এগিয়ে চললেন। কাশ্মীর গেটের কাছাকাছি আসতেই বিদ্রোহীদের গুলিতে বারুদের বস্তায় বিস্ফোরণ ঘটল। ওরা প্রায় সকলেই মারা গেলেন কিন্তু কাশ্মীর দরওয়াজা ভেঙ্গে গেল। বাহিনী সেখান দিয়ে প্রবেশ করল। দ্বিতীয় দল ব্রিগেডিয়ার জোনসের নেতৃত্বে প্রবেশ করল কাবুল গেটে। লাহোর গেটেও প্রবল বাধার সম্মুখিন হতে হল মেজর রীড্‌কে। এখানে নিকলসন আহত হলেন। পরে এই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হল। তৃতীয় দল জুম্মা মসজিদের দিকে যুদ্ধ করে অবশেষে ফিরে চলল। মোট কথা ১৪ তারিখে বিদ্রোহীদল আক্রমণ প্রতিহত করল।

১৪ তারিখের যুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষতি হয় প্রভূত। তবু তারা রাতে সৈন্যদের উৎসাহিত করতে এক অভিনব আদেশ দিল। বলল, বিজিত অঞ্চল লুট করবার অধিকার রইল সেনা বাহিনীর। দিল্লীর ঐশ্বর্য সুবিদিত। সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

১৫ তারিখে ক্ষিপ্ত জন্তুর মত আক্রমণ করল ইংরেজ বাহিনী। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের জয় হ'ল। ধীরভাবে এগুলো ইংরেজ বাহিনী। কিন্তু লুট করতে গিয়ে প্রথম যা তারা পেল তা পর্যাপ্ত মদ। সম্ভবতঃ কৌশল করেই বিদ্রোহীরা এটা করেছিল। সৈন্য-বাহিনী এমন কি অফিসাররাও যখন মাতাল হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—যখন নামমাত্র যুদ্ধে তাদের একেবারে শেষ করে দেওয়া যায়—ঠিক তখনই শোনা গেল বিদ্রোহীদের বড় দল দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেছে।

১৬-১৭ তারিখে অবশিষ্ট সৈন্য দল এবং দিল্লীর অধিবাসীরা প্রতিরোধ করল। ইংরেজ বাহিনী সেই গেরিলা আক্রমণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। ১৮ তারিখে ইংরেজরা সংবাদ পেল বাদশাহ ও শাহজাদারা বড় সড় বাহিনী নিয়ে প্রাসাদ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

১৯ তারিখে ইংরেজরা বহুসৈন্যকে নদী পার হয়ে চলে যেতে দেখল। বাহাদুর শাহ প্রতিরোধের সঙ্কল্প ত্যাগ করে কুতুব মিনারে আশ্রয় নিলেন। বখ্‌ত খান লখনৌতে চলে গেলেন। তিনি বাদশাহকে সঙ্গী হতে বললেন। বাদশাহ গেলেন না।

কিন্তু এতেই ইংরেজ বাহিনীর অগ্রগতি সহজ হল না। দিল্লীর প্রতিটি বাড়ি তখন যেন দুর্গ। প্রতি ইঞ্চি লড়াই করে এগুতে হচ্ছে। মূল্য দিতে হচ্ছে জীবন দিয়ে। যে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তারা আক্রমণ করেছিল, এখন তার চার হাজার হয় মৃত নয় কর্মে অক্ষম। বিদ্রোহীরা যদি না পালাত, তবে ইংরেজদের পরাজয় ছিল নিশ্চিত। রণক্লান্ত যে ইংরেজ সৈন্যদের সামনে ২০ তারিখের ভোর এল, সে ভোর কোন আশার বাণী আনে নি। গত সাত দিনের হাতাহাতি যুদ্ধের জের টানা আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২০ এর ভোর থেকে প্রতিপক্ষ নীরব। ইংরেজ সৈন্য হতাশার মধ্যেও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য। চারদিকে শুধু শবদেহ। কোথাও মানুষ, কোথাও উট-কোথাও ঘোড়া। বিদ্রোহী দিল্লী তার শেষ প্রতিরোধও তুলে নিয়েছে। পতন হয়েছে দিল্লীর।

বাদশাহের শ্বশুর এর প্ররোচনায় ২১শে সেপ্টেম্বর বাহাদুর শাহ আত্ম-সমর্পন করলেন। পরদিন হাডসন গিয়ে শাহাজাদাদের বন্দী করলেন। তাদের গরুর গাড়িতে করে দিল্লী নিয়ে আসা হল। তাদের নামতে বলা হল গরুর গাড়ি থেকে। বন্দীরা কাঁপতে কাঁপতে নামলেন। হাডসন বললেন, খোল ওসব ভাল জামা-কাপড়।

বন্দীরা খুল্‌ল।

এবার পৈশাচিক হাসি হেসে হাডসন, এক প্রহরীর কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে একে একে তিন রাজপুত্রকে গুলি করে মারলেন। তার পর তাদের মৃতদেহ প্রকাশ্য রাজপথে টাঙ্গিয়ে রাখা হ'ল।

একটা বিচারের প্রহসন করে বাদশাহকে নির্বাসিত করা হল। চার বছর পরে ১৮৬২ সালের ৭ই নভেম্বর বাহাদুর শাহের মৃত্যু হল।

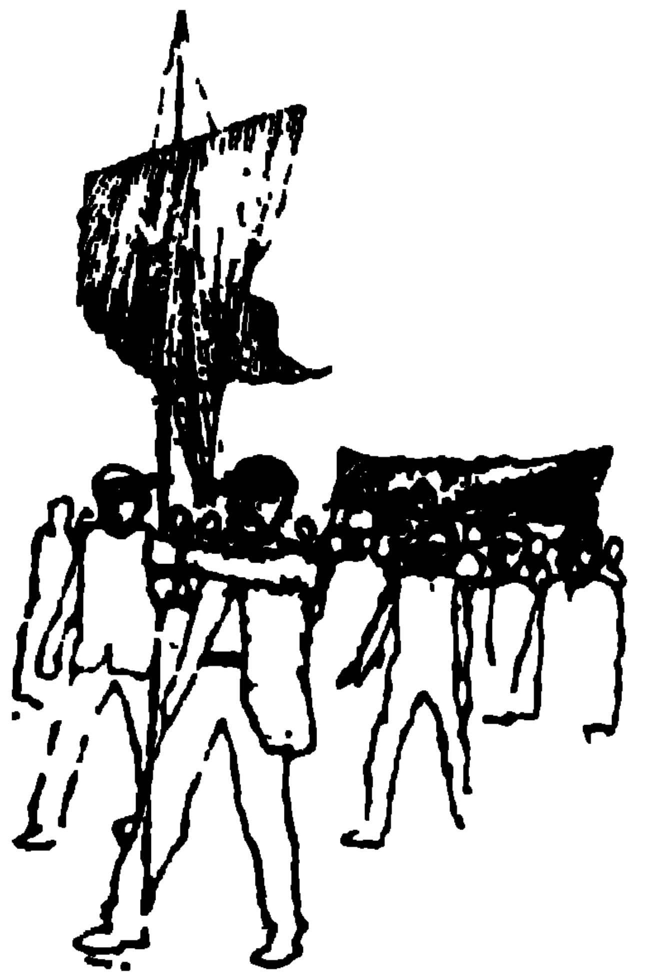

এগার

সিপাহি বিদ্রোহের কাহিনীর মধ্যে ঝান্সিররাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। বোধ করি, সাধারণ দরিদ্র ঘরের এই সামান্য মহিলা ঝান্সিররাণীর গৌরব লাভ করে পরবর্তীকালে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন, যে সমরকুশলতা, সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

অথচ এই রূপবতী রানী ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন একেবারেই পর্দানশীন। বুণ্ডেলখণ্ডের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছোট দেশীয় রাজ্য ঝান্সির জনপ্রিয় মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের প্রিয়তমা হিসাবে তিনি ছিলেন একেবারেই এক মায়াবী পুতুল। গঙ্গাধরের নিজস্ব পুত্রকন্যা ছিল না। তাই রাজা দত্তক নিয়েছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ দত্তক পুত্রকে আঁচলের ধনের মত বুকের পাঁজরে আগলে রাখতেন।

ঝান্সীকে ইংরেজরা বলত, 'মরুভূমির মরুদ্যান'—সমস্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্ন। শুধুই যে সাজান গোছান বলেই এ রাজ্যের প্রতি ইংরেজদের নজর পড়েছিল এমন নয়। ঝান্সী সমৃদ্ধও ছিল কম নয়।

বহুকাল থেকে এখানকার রেশম, কার্পেট আর পিতলের কারুকার্য করা শিল্প দ্রব্য বিস্তৃততর অঞ্চল জুড়ে বাজার তৈরী করেছিল। ফলে সত্যিই ঝাঁন্সী ঐশ্বর্য্য আর সমৃদ্ধিতে ছিল অতুলনীয়। এই রাজ্যের প্রতি লোলুপ ইংরেজদের দৃষ্টি থাকা খুবই স্বাভাবিক।

তাই ১৮৫৩ সালে আকস্মিকভাবে যখন গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হল তখন রাও-এর দত্তকপুত্রের অধিকারকে ত' ইংরেজ সরকার নাকচ করলই, তার ভাই সদাশিব রাও-এর দাবীও নাকচ করে দিল। ইংরেজ সরকার রাণীকে ঝাঁন্সি ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলে মহারাজের প্রেমের পুতুল রাণী বৃথাই উত্তেজিত হয়ে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, মেরি 'ঝাঁন্সি নেহি দেউ ঙ্গি।'

দিতে তাকে হল, কিন্তু রাণীর ঐ তেজটা ইংরেজদের সহ্য হল না। ইংরেজরা রাজ্য নিল এমনকি গঙ্গাধর রাওয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-গুলিও অধিকার করে নিল। ঝান্সির গৃহদেবতা মহালক্ষী এবং তার মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তুটি দেবত্র গ্রাম ছিল। ইংরেজরা তাও দখল করে নিল। রাণী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দেবপূজা চলবে কিসে? ইংরেজ সরকার জবাব দিলেন, আমরা ঝাঁন্সির সব দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আপনার ঈশ্বরের দায়িত্বও আমাদের।

স্বামীহারা, রাজ্যহারা এমনকি গৃহদেবতাহারা রাণী ি য়ে ও ক্ষোভে বারাণসী গিয়ে বাস করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন? ইংরেজরা তার সে সংকল্পেও বাধা দিলেন। রাণী তীব্র ঘৃণায় ইংরেজদের দেওয়া পেন্সন নেওয়া বন্ধ করলেন।

ইংরেজরা জানতেন যে রাণীর এ সব আস্ফালন তার বাস্তব জ্ঞানের অভাবেরই ফল। সত্যিই রাণী কিছুদিনের মধ্যেই এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে বুঝতে শিখলেন। তিনি বাধ্য হয়ে ইংরেজদের দেওয়া সেই পেন্সনই গ্রহণ করলেন। রাণীর েজ কমেছে ভেবে ইংরেজরা মনে মনে খুশি হলেও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইংরেজদের

কমিশনার কলাভিন পুরো খুশি হতে পারলেন না। তিনি রাণীকে আর একটু কড়কে দেওয়ার জন্য, পেন্সনের টাকা থেকে গঙ্গাধর রাও-এর এক পুরানো ঋণ কিস্তিতে কিস্তিতে কেটে নিতে থাকলেন। রাণী বিস্মিত ভাবে লিখে পাঠালেন, ঝান্সি গ্রহণের সময় তোমরা সকল সম্পদ এমন কি দেবতাকেও গ্রহণ করেছো। তবে শুধু ঋণটাই আমার ঘাড়ে পড়ে থাকে কোন বিচারে!

কমিশনার সে কথায় কিছুমাত্র গুরুত্ব দিলেন না। পেন্সনের টাকা থেকে ঋণের টাকা কেটে নেওয়া হতে থাকল। আর অন্য দিকে রাও-এর তৈরী সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হল। ঝান্সিতে বসল ইংরেজ পল্টন। আর তাদের মাংস সরবরাহের জন্য শহরের মাঝখানে বসল এক গরু ও শুয়োরের মাংসের এক কসাইখানা। প্রতিদিন খোলা গরুর গাড়িতে বিভৎস দৃশ্যের অবতারণা করে সেই মাংস স্থানান্তরিত হতে থাকল। নির্বিকার ভাবে সব অসম্মান সহ্য করা ছাড়া লক্ষীবাই-এর অন্য গতি থাকল না।

এমনি করেই ১৮৫৩ থেকে গড়িয়ে এলো ১৮৫৭ সাল। ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। দিল্লী আর মিরাটের সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণার প্রায় একমাস পরে ঝান্সির সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর সঙ্গে রাণীর কোন যোগ নেই। ইংরেজদের ১২ তম বাহিনীর প্রায় ছ'শ সিপাই ইংরেজদের আক্রমণ করে বসে। প্রায় একশ' জন ইংরেজ নারী পুরুষ শিশু দুর্গে আশ্রয় নেয়। এটা ৪ঠা জুনের ঘটনা। সিপাহীরা তখনও ইতি কর্তব্য সম্পর্কে অনিশ্চিত। এদিকে দুর্গ থেকে একজন দেশী চাকর কোন কারণে পালাতে চেষ্টা করছে দেখে লেপ্টেন্যান্ট পোইসরাসে তাঁকে হত্যা করলেন। তা দেখে উত্তেজিত আর একজন চাকর পোইসকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলেন। এ ভৃত্যটি পোইসেরই নিজস্ব ভৃত্য ছিল। ফলে দুর্গের ভেতর ইংরেজরা এত আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই স্থির করল

ভৃত্যেরা বিদ্রোহী হয়েছে। আর তাই সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলকে নির্বিচারে হত্যা করল।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঝাঁন্সিতে। যে বিদ্রোহী সিপাইরা কি করবে স্থির করতে পারছিল না, তারাই সহসা অবরোধ করে বসল দুর্গ। ছোট খাট যুদ্ধে ইংরেজরা বাধা দিতে গিয়ে বুঝল যে চেষ্টা নিরর্থক। অনেক আলাপ আলোচনার পর ইংরেজরা ৮ তারিখে আত্মসমর্পণ করল! বিদ্রোহীরা তাদের কোর্ট মার্শাল বিচারে ৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল। জোকারবাগে নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করা হ'ল। রাণী ইংরেজদের মধ্যে নারী ও পুরুষদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই মানবিক আচরণের দায়ে তাঁকে সিপাহীদের হাতে এক লক্ষ টাকা তুলে দিতে হল। সিপাহীরা সোল্লাসে দিল্লীর দিকে চলে গেল।

অসহায় ঝাঁন্সি। রাজার সৈন্যদল নেই। ইংরেজরা পলাতক। বিদ্রোহীরা গেছে দিল্লীতে। রাণীর বডিগার্ড হিসেবে আছে মাত্র চল্লিশ জন। রাণী লেপ্টেন্যাণ্ট এরস্কিনকে সমস্ত জানিয়ে পত্র পাঠালেন। দ্রুত এসে অরক্ষিত ঝাঁন্সিকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে বললেন।

উত্তরে এরস্কিন এক মজার পত্র পাঠালেন! তিনি ঝাঁন্সির শাসন ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব রাণীর ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশ বাহিনী গঠন করে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বললেন। এটা এরস্কিনের চাল কিনা বোঝা যায় না। তবে ইংরেজদের তখন নিজেদেরই নাভিশ্বাস উঠছে। কিন্তু তারও মধ্যে জব্বর চাল চাললেন এরস্কিন। রাণী যদি দায় গ্রহণ না করেন, তবে দিন ফিরলে তাকে অবাধ্যতার দায়ে ফেলে পেন্সন বন্ধ করা যাবে। আর যদি দায় গ্রহণ করেন তবে রাজস্বের হিসেবের গরমিল বা রাজ্যে অরাজকতার অজুহাতে সর্বচ্যুত করা যাবে রাণীকে।

এতদিনে প্রেম পুত্তুলি রাণী আর অনভিজ্ঞা অসহায়া ছিলেন

না। এক এক জনের পরিণতি এত দ্রুত সাধিত হয় যা সব রকম হিসেবের বাইরে থাকে। লক্ষ্মীবাঈ-এর ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছিল।

রাজার ভাই সদাশিব রাও বৌদিকে কাছ থেকে দেখেও চিনতে পারেন নি। তাই এরস্কিনের চিঠির সংবাদ প্রকাশ হতে না হতে তিনি নিজেকে ঝাঁন্সির রাজা বলে ঘোষণা করে বসলেন। রাণী তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে দুর্গে বন্দী করে ফেললেন।

ঝাঁন্সির পাশেই তেহরি এবং দতিয়া রাজ্য। তারা সদাশিবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন কিনা কে জানে। সদাশিব বন্দী হতে না হতে তারা একযোগে দুদিক থেকে আক্রমণ করে বসলেন।

প্রথম ধাক্কায় রাণী দুর্গ বন্ধ করে ওদের প্রতিহত করলেন। ইংরেজদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ইংরেজরা তুষ্ণীভাব নিয়ে বসে রইল। না পাঠাল রাণীকে সাহায্য, না করল তেহরি বা দতিয়াকে অভিযান চালাতে নিষেধ। রাণী বুঝলেন, নিজের দায় নিজেকেই বইতে হবে।

রাণী একদিকে গোয়ালিয়র এবং বাণপুরের রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন, অন্যদিকে ঝান্সির পুরানো বাহিনীর বরখাস্ত সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তিনি তাদের সঙ্গে নতুন বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান এবং মকরাণী মুসলমানদের মিলিয়ে মিশিয়ে বাহিনী গঠন করে ফেললেন। ঝান্সিতে একটি শক্তিশালী নারী বাহিনীও গঠিত হ'ল। এঁরা একদিকে যেমন বন্দুক চালাতে, তলোয়ার চালাতে শিখলেন। তেমনি শিখলেন শুশ্রূষা বিদ্যা। তিনি ঝাঁন্সিতে কামান তৈরীর কারখানা এবং গোলাবারুদ তৈরীরও ব্যবস্থা করে ফেললেন।

তবে কি তখন রাণী বিদ্রোহী! না, প্রকাশ্যে তিনি তখনও বিদ্রোহী নন। অবশ্য তখনও তার পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভবই ছিল না। ঝাঁন্সির চারদিকে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, তেহরি, অরছা ইত্যাদি দেশীয় রাজারা তখনও ইংরেজ অনুগত। তাদের

মাঝখানে অবস্থিত ঝাঁন্সির বিদ্রোহ সহজ ছিল না। কিন্তু স্বদেশ ও স্বরাজ্যের প্রতি যে আন্তরিক টান ছিল রাণীর তার ফলে তিনি এ সুযোগকে ষোল আনা কাজে লাগাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। আগেকার অসম্মান তাঁর বুকে তখনও বিষাক্ত ক্ষতের মত বর্তমান ছিল। পুনর্বার সেই অসহায় অবস্থায় পড়তে তিনি আর রাজি ছিলেন না।

অল্প দিনের মধ্যেই রাণী অরাজক ঝান্সির চেহারা ফিরিয়ে ফেললেন। দুর্গ এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক চৌকি বসল। দুর্গ সংস্কার করে তাকে কতদূর প্রতিরোধ সক্ষম করে তুলেছিলেন, তা আক্রমণ কালে ইংরেজরা বুঝেছিলেন। নিজে টাঁকশাল স্থাপন করে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের মত অর্থনৈতিক সংকটও রোধ করেছিলেন।

রাণীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি তার সমগ্র বাহিনীকে নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পেরেছিলেন। এজন্য পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের একমাত্র ঝাঁন্সিতেই প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য তীব্র লড়াই-এর সম্মুখিন হতে হয়েছিল। ইংরেজ সেনাপতি লিখেছেন, মরতে মরতেও ঝাঁন্সির আহত সেনানী শত্রুকে একটা আঘাত হেনে মরছে। একমাত্র আদর্শবোধ ও স্বদেশানুরাগ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৈন্য বাহিনীকে এতদূর উদ্বুদ্ধ করা যায় না। লক্ষ্মীবাঈ জুন থেকে পরবর্তী বৎসরের জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বদেশবোধের বিরুদ্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এতদুর হয়ত' ঠিক যে ইংরেজদের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার আকাঙ্ক্ষা হয়ত' রাণীর মধ্যে ছিল না, কিন্তু তিনি যে সর্বরকম অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য তলায় তলায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর প্রতিবাদের মাত্রা বাড়লেই যে তা বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায় এ ঐতিহাসিক

সত্যই বা কে অস্বীকার করবে! অন্ততঃ সেই কালের বিদ্রোহী নায়ক বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী ইত্যাদির চেয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বদেশবোধ ও কর্মতৎপরতা যে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ ও সুগঠিত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাই হোক, মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি আশেপাশের অনেকগুলি অঞ্চল দখল করে নেন। এই সময় শাহগড়ের রাজা বখতার আলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে যোগ দিলেন মর্দন সিং-এর সঙ্গে। ক্রমে মধ্য ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজরা কোনদিনই লক্ষ্মীবাঈকে বিশ্বাস করত না। এবার লক্ষ্মীবাঈ প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ঝান্সির প্রাসাদ শীর্ষে নাকাড়া এবং চামর লাঞ্ছিত লাল রং-এর বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

মধ্য ভারতের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফেরত অভিজ্ঞ সেনাপতি হিউরোজ। তিনি মৌ থেকে নিজের বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন এবং ১৫ই জানুয়ারী এসে উপস্থিত হলেন ভূপালে! ভূপালের বেগম এতদিন সেখানকার বিদ্রোহ মানসিকতার সাধারণ মানুষকে কোনক্রমে স্তোক বাক্য দিয়ে রেখেছিলেন। রোজ আসতেই তাকে বিপুল সংবর্দ্ধনা জানালেন। বহু সৈন্য ও রসদ উপহার দিলেন।

পথে একটার পর একটা দুর্গ জয় করতে করতে ২১শে মার্চ ঝান্সির সামনে এসে দাঁড়ালেন রোজ। বিশাল দুর্গের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনায় তন্ময় হয়ে গেলেন।

বিশাল দুর্গের পশ্চিম দিকে খাড়া পাহাড়। দক্ষিণের মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বুরুজ। এখান থেকে শুরু হয়েছে নগর প্রাচীর। এর দক্ষিণ প্রান্তে একটা বিশাল দৃঢ় এবং নিরেট পাথরের গাঁথুনি। এর সামনে এক মস্ত গোল বুরুজ ছিল। এর

মাথায় পাঁচ পাঁচটি কামান বসান যেত। এর সামনে এক মস্ত পরিখা। রোজ বুঝলেন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গুপ্তচরেরা দুর্গের যে মানচিত্র দিল তাতে দেখা যাচ্ছে দুর্গনগরে প্রবেশের দ্বার চারটি। তাদের নাম যথাক্রমে অরছা, সাগর, লছমি, সইয়াঁর।

দুর্গ প্রাকারের ওপর থেকে লক্ষ্মীবাঈও দেখলেন ইংরেজ বাহিনীকে। বিশাল বাহিনী, অসংখ্য কামান। রাণীর গুপ্তচর বাহিনী ছিল না। থাকলে জানতেন রোজের সঙ্গে ছিল পনের হাজার ইংরেজ সৈন্য, ছ'হাজার দেশী সিপাই আর পাঁচশ' ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তার। এদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল আধুনিক। কামানের সংখ্যা ছিল একশ' কুড়িটি।

বিপরীত দিকে রাণীর ছিল নবগঠিত তিন হাজার সৈন্য, এক হাজার বুন্দেলী আর বানপুর রাজার দু হাজার সৈন্য। এদের প্রধান অস্ত্র তলোয়ার। বেশির ভাগের বন্দুক ছিল না। কামানের সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশটি।

ইংরেজবাহিনীর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলেন রাণী। তার পাশে এসে দাঁড়াল মোতিবাঈ। রাণীর দিকে শ্রদ্ধায় মাথা নত হল তার। মোতি নর্তকী হিসাবে জীবন শুরু করে ক্রমে হয় রাজনর্তকী। রাণীর প্রভাবে আজ সে সৈনিক। নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে গর্ব হল তার। মোতি ডাকল, রাণীজী!

লক্ষ্মীবাঈ ঘুরে দাঁড়ালেন। কর্তব্যে বুঝি অবহেলা হয়ে গেছে। বললেন, চল মোতিয়া।

বাহিনী পরিদর্শন করলেন রাণী। তেজোময়ী বক্তৃতা দিলেন। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সৈন্যদল। আবার মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করল সবাই।

পরদিন সকাল থেকে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেল। রাণীর প্রধান গোলন্দাজ গোলাম ঘৌস এবং তার সহকারী খোদাবক্স নিখুঁত নিরিখে ইংরেজ বাহিনীর ওপর গোলা বর্ষণ করে চললেন। সেনাপতি

রোজ দূরবীন দিয়ে কামানের মুখ নিরীক্ষণ করেও সৈন্য সরিয়ে বাহিনী রক্ষা করতে পারছিলেন না। এদের আক্রমণ ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠল।

ইংরেজ পক্ষের কামানও ঝাঁন্সিবাহিনী ও দুর্গের কম ক্ষতি করছিল না। মাঝে মাঝেই দুর্গর ছাদ ও দেওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আশ্চর্য তৎপরতায় সেগুলি গেঁথে তুলছিল নারীবাহিনী। বিকল কামানকে অনায়াসে স্বল্প সময়ে সারিয়ে তুলছিল কারিগরেরা।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ফোররেস্ট লিখেছেন, বিদ্রোহীরা এতটুকুও বিচলিত না হয়ে মৃত্যু বরণ করছিল।···যথেষ্ট ক্ষতি হলেও তাদের লড়বার ক্ষমতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এতটুকুও কমে নি। বরং বলা যায়, যতই বিপদ বাড়ছিল, তাদের সাহসও ততই বেড়ে যাচ্ছিল।

২৯শে মার্চ। সাঁইয়া গেটের ওপর থেকে কামান চালাবার কালে শত্রুর গুলি এসে লাগল খোদাবক্সের গায়ে। তিনি নিহত হলেন। তার স্থান নিলেন গোলাম ঘৌস। তিনিও একই ভাবে নিহত হলেন। দুই বীর গোলন্দাজের মৃত্যুতে কিন্তু থেমে গেল না ঝান্সির কামান। মোতিবাঈ সে কামানের দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু দিন শেষ হবার আগেই মোতিবাঈকেও দেহত্যাগ করতে হল।

এ সব প্রত্যেকটি সংবাদ ইংরেজদের কাছে পৌছুতে লাগল। পরদিন ইংরেজরা দুর্গের ভেতরের জলাশয়টি নষ্ট করে দিলেন। শত শত মৃত ও আহতকে নিয়ে ঐ নিদারুণ জলকষ্টের মধ্যেও রাণীর বাহিনী, সমান বেগে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকলেন। ঝাঁন্সির দুর্গ যেন অজেয় বলে বোধ হতে থাকল ইংরেজদের কাছে।

৩১শে মার্চ ইংরেজ বাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তার মধ্যেই সংবাদ এলো প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী; প্রচুর কামান ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁতিয়া টোপি রেওয়া নদীর অপর পারে পৌছেছেন। পরদিন তাঁতিয়া নদী পার হয়ে ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ করলেন।

এই বিশাল বাহিনী দেখে রোজ কিন্তু ঘাবড়ালেন না। তিনি বাহিনীর দুর্বলতা বুঝে ফেললেন। তাঁতিয়ার বাহিনীর দুই পাশ আদৌ সুশৃঙ্খল ছিল না। রোজ সেখানেই আক্রমণ করলেন। আশ্চর্য! বিশাল বাহিনী প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলল। বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। বাহিনী পশ্চাদপসরণ শুরু করল। অবশেষে সসৈন্যে তাঁতিয়া পালালেন।

আক্রমণের ধরণ যাই থাক, তাঁতিয়ার আক্রমণের কালে রাণীর বাহিনী যদি এগিয়ে এসে রোজের বাহিনীকে আক্রমণ করতে পারতেন তবে ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে সেদিন জয়ের মুখ দেখা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু সম্মুখ সমরে যোগ দেবার মত হাতিয়ার বা সৈন্যবল তখন রাণীর ছিল না। বিশেষতঃ তাঁতিয়ার ঐ বিশাল ও আধুনিক অস্ত্র সমৃদ্ধ বাহিনী পরাজিত হতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও কল্পনাও করেনি। তারা এই অবকাশকে নিজেদের গুছিয়ে নেবার কাজে লাগিয়েছিল।

তাঁতিয়াকে বিতাড়িত করে ইংরেজ বাহিনী কিন্তু বিশ্রাম নিল না। রাত থেকেই দুর্গের ওপর গোলা বর্ষণ করে চলল। কিন্তু প্রায় পনের ঘন্টার বিরতিতে রাণীর বাহিনীও অনেকখানি সংহত করে ফেলেছে নিজেকে। তারা রাতে মাঝে মাঝে গোলা বর্ষণ করে উত্তর দিলেও প্রধানতঃ দুর্গ মেরামতিতেই কাটিয়ে দিল। পরদিনও চলল ছাড়া ছাড়া আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। বোঝা গেল ইংরেজরা চরম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাণী যে তা প্রতিহত করতে প্রস্তুত, তা বোঝা গেল পরদিন।

পরদিন ভোরের দিকে আক্রমণ শুরু হতে না হতে বাঁ দিককার ইংরেজ সৈন্যরা গেটের দিকে ছুটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাকারের ওপরে তূর্যধ্বনিতে সংকেত জানাল প্রহরী। সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর থেকে গোলাগুলির ঝড় বইয়ে দিল। সররেস্ট লিখেছেন যে প্রায় দু'শ গজ যেন তাদের আগুনের বন্যার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে

হল। তারই মধ্যে প্রাচীর বেয়ে উঠবার জন্য তিন জায়গায় মই লাগিয়ে ফেলল স্যাপাররা। কিন্তু প্রাচীরের ওপর থেকে গরম জল, গরম তেল, বড় পাথর, গাছের গুঁড়ি, গোলাগুলি চলতে থাকল। একাধিক ক্যাপ্টেন, কর্ণেলও মই বেয়ে উঠতে গিয়ে প্রাণ দিলেন।

অবশেষে মইপন্থা পরিত্যাগ করা হল। কর্ণেল লিতেল লেফটেন্যান্টকে বারুদের বস্তা নিয়ে আসতে বললেন। সেই বস্তা গেটের পাশে রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। বিস্ফোরণে দরজাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে গেল সৈন্যরা। কিন্তু তাতে হতাহতই হল সবাই। রাণী পূর্বাহ্ণেই ইঁট পাথর দিয়ে পুরো দরজাপথ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

একের পর এক এমনি আক্রমণের ভেতর দিয়ে অবশেষে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন রোজের সৈন্যরা। সমগ্র সিপাহী বিদ্রোহে এতবড় প্রতিরোধ কখনই চূর্ণ করতে হয়নি ইংরেজদের। স্বভাবতঃ ভেতরে প্রবেশ করে তারা উল্লসিত হয়ে উঠল। একবার প্রতিরোধ বাঁধ ভাঙ্গতে পারলে ভারতীয়রা কাপুরুষে পরিণত হয়। তখন হয় পালায় নয় আত্মসমর্পণ করে।

কিন্তু ঝাঁন্সিতে ঘটল বিপরীত। ইংরেজ সৈন্য যখন প্রসাদে ঢুকল, তখন সেখানে খুবই কম সৈন্য ছিল। কিন্তু তারা দুর্বার তেজে লড়লেন। প্রতিটি কামরা দখল করতে ইংরেজ সৈন্যদের লড়তে হ'ল। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা মুখোমুখি লড়ল অবশেষে পালাবার মুখে বারুদের বস্তায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিজেও মরল, শত্রুকেও মারল।

একবার একটি ঘরে কিছু বুন্দেলী সৈন্য আটকা পড়ে। ইংরেজ সৈন্যরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বন্দী সৈন্যরা জলন্ত পোষাকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজদের আক্রমণ করে।

এমন পাঁচ দিনের লড়াই-এ দুর্গ দখল হয় কিন্তু শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় প্রত্যেকটি বাড়িতে গড়ে তোলা হয় প্রতিরোধের দুর্গ। আফ-

গানরা সেখানে যে লড়াই দেয় তার তুলনা নেই। আফগানদের লড়াই-ই ঝান্সির শেষ লড়াই।

বিচূর্ণ প্রতিরোধ ঝান্সিতে ইংরেজরা গণহত্যা শুরু করে। ইংরেজদের হিসেবেই সেখানে অন্তত পাঁচ হাজার সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা হয়। এর ওপরে বহু গৃহস্থ পুত্র কন্যা স্ত্রীকে কুয়োয় ফেলে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ে।

রাত নেমে আসায় ইংরেজরা বহু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আলোতে চলতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন আর হত্যা। তারই মাঝে রাণী তার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচর নিয়ে ঝাঁন্সি ছেড়ে চলে গেলেন। একদল ইংরেজ সৈন্য তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। কিন্তু সঙ্গীদের দৃঢ়তায় তারা পরাজিত হয়। রাণী নিরাপদে কল্পি পৌঁছান।

কল্পিতে তখন সারা উত্তর দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহী বাহিনীর সমাবেশ। কিন্তু নিজেদের সেকেলে মতামত ও যুদ্ধনীতির জন্য ইংরেজদের প্রায় দশগুণ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও বিদ্রোহীরা পরাজিত হল। রাণী লক্ষ্মীবাই অসমসাহসিক যুদ্ধ করলেও অবশেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন।

ঝাঁন্সির পতনের পর বিদ্রোহী নেতারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করতে সমবেত হলেন গোপালপুরে। রাণী প্রস্তাব করলেন, আমাদের অবিলম্বে গোয়ালিয়র দখল করা উচিত। সেখান থেকেই আমরা সার্থকভাবে বিদ্রোহ চালনা করতে পারব।

বস্তুতঃ গোয়ালিয়রের গুরুত্ব ছিল এমনই। এখান থেকে উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ। তা ছাড়া তখন গোয়ালিয়রের চারদিকে বিদ্রোহীদের বন্ধুরা রয়েছে। এসব কারণে রাণীর প্রস্তাবের মধ্যে চরম রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল। ফলে সকলেই এ প্রস্তাব মেনে নিলেন।

তাঁরা গোয়ালিয়র আক্রমণ করলে গোয়ালিয়রের রাজা নিজ সৈন্যদল নিয়ে তাদের বাধা দিতে এলেন। কিন্তু সৈন্যদল

তাদের সঙ্গে যোগ দিল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ইংরেজ শিবিরে।

হিউরোজ সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বিদ্রোহীদের বাধা দিতে। কিন্তু নানা সাহেবের প্রতিনিধি রাওসাহেব নানা সাহেবকে পেশোয়া ঘোষণা করে আনন্দ উৎসব লাগিয়ে দিলেন। প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই করলেন না। নেতার এই অবিমৃষ্যকারিতায় ক্ষুণ্ণ হলেন রাণী। কিন্তু নেতার টনক পড়ল না। রোজ দশ দিন ক্রমাগত হেঁটে ১৬ই জুন গোয়ালিয়রের পাশে মোরারে এসে পৌঁছালেন। পরদিন আক্রমণ করলেন গোয়ালিয়র।

কোটা কি সরাইতে রাণী এবং লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের বাধা দিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই পিছু হটতে থাকলেন। দুর্বার বাধা এক লক্ষ্মীবাঈ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটি গুলি এসে লক্ষ্মীবাঈকে ধরাশায়ী করে দিল। সিপাহী বিদ্রোহের উজ্জ্বল-তম জ্যোতিষ্কপাত হল।

দ্বিতীয় পর্ব

বার

ঘুম ভাঙানোর গান

নীল বিদ্রোহ আর সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভল প্রায় একই সঙ্গে। কিন্তু এই দুই বিদ্রোহে সারা দেশে বহু ইংরেজ মারা গেল। যদিও জয়ী ইংরেজ শক্তি তার শতগুণ ভারতীয় হত্যা করে তার শোধ নিল, দিল্লী থেকে কলকাতায় আসবার পথের ধারে গাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হল বিদ্রোহীদের মৃতদেহ সেখান থেকেই সেইসব দেহ গলে পচে পড়তে থাকল—সারা দেশ বীভৎসতায় শিউরে উঠল, দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠল, তবু তাতে ইংরেজ মারা বন্ধ হ'ল না। বিলেতে মৃত ইংরেজদের আত্মীয়-স্বজনেরা ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বিরুদ্ধে গর্জে বেড়াতে থাকলেন। একটা কোম্পানীর অধীনে স্বদেশের শত শত ছেলেকে বিদেশে পাঠান বা ভারতবর্ষের মত একটা বিশাল দেশ শাসনের দায়িত্ব একটা ব্যবসায়ী কোম্পানীর ওপর থাকা ঠিক নয় বলে জনমত গঠিত হ'ল। অবশেষে জনমতের চাপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক আইন বলে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে তুলে ভারত বিষয়ক এক মন্ত্রীর হাতে দিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় ১ নভেম্বর থেকে এই আইন কার্যকর হ'ল।

ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসন গিয়ে সরাসরি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বা মহারাণীর শাসন চালু হওয়ায় ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় খুশিই হয়েছিল। পার্লামেণ্টও এদের অনুগত করে রাখবার জন্য বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। বিদ্রোহের সময় যারা ইংরেজদের সহায়তা করেছিল, সেই সব অভিজাত এবং বিশ্বস্তদের মহারাণীর নাম করে নানা ধরণের জায়গীর উপহার দেওয়া হয়েছিল। এ সব জায়গীর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিল পরাজিত বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি। এদের সকলকেই রাজা বা নবাব উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এরা সামান্য কিছু শাসন ক্ষমতা পেলেও আদতে ছিলেন ইংরেজদের পুতুল খেলার পুতুল—ইংরেজদের সেলাম জানানোই ছিল তাঁদের ব্রত। এমনি করেই এই সময় পাতিয়ালা, ঝিন্দ, রামপুর, গোয়ালিয়রের মত রাজ্য গড়ে উঠল।

এদের এমনি করে উপহার দিয়ে ব্রিটিশরাজ কিন্তু শুধু তাঁদের পুরস্কারই দেয়নি, ভারতবর্ষের অভিজাত সমাজের সঙ্গে একটা স্বার্থের গাঁট ছড়া বাঁধতে চেয়েছেন। ঐ সব সামন্ত রাজা যতই নিজেকে ধন্য মনে করেছে, ততই নিজের সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরেজদের দাস হয়ে পড়েছে।

মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রথম যে ভাইসরয় পাঠালেন (লর্ড ক্যানিং) তিনি ১৮৫৯ সালে আগ্রার এক দরবার করে ঘোষণা করলেন যে, ডালহৌসীর আমলে সত্ত্ব-বিলোপ নীতির বলে যে সব রাজ্য ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করেছিল, সেগুলি যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বছর পাঁচেকের মধ্যে এ আশ্বাস বাস্তবে পরিণত করা হ'ল।

কিন্তু ইংরেজদের এ বদান্যতার পিছনে অশুভ লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট। ভারতবর্ষের অভিজাতদের স্তাবক ও সমর্থকে পরিণত করে ব্রিটিশ শক্তি 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির প্রবর্তন করেছিলেন।

এতদিন এদেশ থেকে টাকা শুধু ইংলণ্ডে পাঠান হয়েছে। এবার সেই টাকা মূলধন হিসাবে আবার ফিরে এসে ভারতে লগ্নি হতে শুরু করল। বন্দরগুলির সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্র পর্যন্ত যোগাযোগ করে স্থাপিত হ'ল রেলপথ। একে কেউ ভারতের উন্নতি বলে বর্ণনা করলেও এগুলির মারফৎ আসলে ভারত শোষণের নল ভারতের আরও গভীরে প্রবেশ করান হ'ল। এর ফলে যেসব ব্রিটিশ এসব বিষয়ে টাকা লগ্নী করলেন, তাদের লাভকে যেমন নিশ্চিত করা হ'ল তেমনি এর ষোল আনা মূল্য গুণতে হল ভারতেবর্ষের সাধারণ মানুষকে।

এ সময়ে চাষের উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি করা হয়। পাঞ্জাব আর সিন্ধু প্রদেশ ছিল গম আর তুলা তৈরীর জন্য বিখ্যাত। ফলে এখানে জলসেচের জন্য লগ্নি করা হ'ল। আর মাত্রাতিরিক্ত জলকর বসিয়ে কৃষকদের মাথা থেকে লাভের পাহাড় জমান হ'ল।

এ সময়ে চা-কফি-রবার চাষের জন্য উপযুক্ত জায়গা ব্রিটিশ ধনীদের ইজারা দেওয়া শুরু হয়। কয়লা এবং নানারকম ধাতু উত্তোলন শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় রেল-বস্ত্র-চট ইত্যাদি তৈরীর কারখানা। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐশ্বর্য এবং শ্রমিকদের শ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়। এর ফলে ব্রিটেন এদেশ থেকে বার্ষিক প্রায় দশ কোটি-পাউণ্ড নিংড়ে নিতে থাকে। ভারতবর্ষ দিনকে দিন দরিদ্র এবং অসহায় হয়ে পড়তে থাকে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার অনেক তলায় নেমে আসে।

এই কারণে এই সময়ে সারা ভারতেই বারংবার নানা ধরণের কৃষক এবং শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। রেল শ্রমিকরাই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত করে। আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে প্রথম স্থায়ী শ্রমিক-সংঘ (ইউনিয়ন) তৈরী হয়।

এগুলির কোনটিই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের শিকড় আলগা করতে পারে নি। অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এগুলি ছিল অত্যাচারিত মানুষের স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক প্রতিবাদ। ভারতের অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির প্রকৃতিকে সহজেই চিনেছিল। মোটামুটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু হলেও, শিক্ষিত জনেরা কৃষক ও শ্রমিকদের মত এত সহজে ব্রিটিশ শক্তিকে বুঝতে পারে নি। বিশ্বাস, সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলেও এসব বিদ্রোহীরা উচ্চ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। এজন্য একালে প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুনতর সংঘবদ্ধ জাতীয় চেতনা-উন্মেষের।

অবশ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। আর তা হয়েছিল বাঙলাদেশ থেকেই। তখন ১৭৭২ বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিল এক আশ্চর্য মানুষ। যিনি ছেলেবেলায় আরবী-ফারসী শিখে কোরাণ পড়ে বললেন, বহু দেবতা মানি না—ঈশ্বর এক। ফলে গৃহহারা হতে হ'ল তাঁকে। পালালেন তিব্বতে। সেখানে ধর্মের নামে চলছে লামার অত্যাচার। কিশোর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললেন। ফলে সেখান থেকেও প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ল তাঁকে। দেশে ফিরে দেখলেন মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এর নাম নাকি সতীদাহ। কি বীভৎসতা। এ তো শাস্ত্রীয় বিধান হতে পারে না। পড়া শুরু করলেন সব সংস্কৃত শাস্ত্র। প্রমাণ করলেন সতীদাহ অশাস্ত্রীয়। মানুষটা ছিলেন মনে প্রাণে স্বাধীনতার পূজারী। শুধু রাজনৈতিক নয়, কোন বন্ধনই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বাল্য-কৈশোরে যেমন সংস্কার অধর্ম বা নৃশংসতার বন্ধন সহ্য করেন নি—যৌবনেও

তেমনি সহ্য করলেন না রাজনৈতিক বন্ধন। এই ফরাসীদেশ স্বাধীন হলে তিনি আনন্দে ভোজ দেন। আমেরিকার সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে এতটুকু হারলেও তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। এ মানুষটি কে তা সকলেই জানেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন বহু ভাষা জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বোধ হয়েছিল যে আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু হোক। তাতে দেশের মঙ্গল হবে।

রামমোহনের প্রস্তাব ইংরেজরা লুফে নিল। রামমোহন যেদিক থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, ইংরেজরা আদৌ সেদিক থেকে ইংরেজী শিক্ষা চালু করতে চান নি। ইংরেজী ভাষায় ছিল সারা পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল এবং সর্বাধুনিক বিজ্ঞান। তাদের সাহিত্যে ছিল সমুন্নত মানবতাবোধের কথা। এগুলিকে স্বদেশী মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। কিন্তু ইংরেজরা একে চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। ইংরেজী-প্রচার করে ইংরেজরা চেয়েছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে এমন একদল মানুষ তৈরী করতে, যারা জন্মে ভারতীয় হলেও চিন্তায় হবে ইংরেজদলের সমর্থক। এদের দিয়ে দেশটাকে শাসন করা যাবে। প্রভুভক্ত কুকুর যেমন প্রভুর আদরের লোভে তার স্বজাতিকেও তাড়ায় -এরাও হবে তেমনি। মনের এই ইচ্ছা গোপন রেখে তারা রামমোহনের সদিচ্ছাটাকেই যেন সমর্থন করছেন—এমন ভঙ্গি দেখালেন।

কিন্তু সফল হল কোন পক্ষ? সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে ইংরেজ পক্ষই জয়ী হ'ল। ইংরেজী শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে এল যারা তাদের একটা বড় অংশই হ'ল দাস-মনোবৃত্তির মানুষ। তারা ইংরেজ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকল। এরা হলেন জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-ইন্সপেক্টার। ইংরেজদের থেকেও বেশি

আক্রোশে যেন এরা ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে।

কিন্তু এখানেই কি শেষ! না। ঐ শিক্ষা নিয়ে আর একদল মানুষ এগিয়ে এলেন—যারা হলেন কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক-রাজনীতিবিদ—এঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হ'ল দেশ-প্রেমিক। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করলেন ভারতীয়েরা অসভ্য-কাল কাটিয়ে এসেছে ইউরোপ সভ্য হবার অনেক আগে। হীনমন্যতার প্রয়োজন নেই. আমাদের অতীতও গৌরবোজ্জ্বল। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন, বিজ্ঞানচিন্তায় ভারতীয়েরা বর্তমানেও ইউরোপকে নব নব জ্ঞানে উদ্বোধিত করতে পারে। কবি সাহিত্যিক নাট্যকার চারণের দল জাগিয়ে তুলতে লাগলেন সাধারণ মানুষকে।

রামমোহনের স্বপ্ন প্রথম ফলতে শুরু করে বাঙলা দেশে। এলেন বিদ্যাসাগর। এত বড় খাঁটি মনের খাঁটি মানুষ ক'জন মেলে? যিনি মতের অমিল হ'লে চাকরী ছেড়ে দেন, নিজের উপার্জন থেকে ব্যয় করে গ্রামে নারী শিক্ষার প্রচারে নামেন! বই নেই—তাই লিখতে বসলেন বই। বাঙলায় বই ছাপবার অসুবিধা। বাঙলা টাইপ সাজাবার ছক করতে বসলেন। বিধবাদের দুর্দ্দশায় মন কাঁদল ত' সারাদেশ ঘুরে সব পণ্ডিতদের তর্কে হারিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন যে ভারতীয় শাস্ত্র বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে।

এই কালেই হিন্দু কলেজে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় স্বাধীনতাবোধ ছড়িয়ে পড়ল তার ছাত্রদের মধ্যে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, টমপেনের এবং জেরেমি বেন্থামের রচনাও অনু-প্রাণিত করল তাদের। মনে প্রাণে ইংরেজ হবার স্বপ্ন নিয়েও ফিরে আসতে হল কবি মধুসূদনকে। তিনি অভিজ্ঞতা থেকেই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :—

নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পর সদা ॥

[যে পর, সে চির কালই পর। তার থেকে নির্গুণ স্বজন অনেক ভাল।]

ইংরেজী শিক্ষা আমাদের বুকে স্বদেশকে ঘৃণা করবার যে শিক্ষা দিচ্ছিল তার প্রতিবাদে মধুসূদনের অনুভবকেই আরও তরল করে লিখলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত—

দেশের কুকুর পূজি।
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন,

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল হায় কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়॥

এলেন উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখলেন 'আনন্দমঠ'। তাতে সন্ন্যাসীরা দেশপ্রেমের গান গাইলেন। একদিন রমনা কালিবাড়ির কোন এক নাম হারিয়ে যাওয়া পুরোহিত যে মন্ত্র কানে দিয়ে বিদ্রোহীদের প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, ভারতীয় স্বাধীনতামন্ত্রের ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র তাকে পূর্ণরূপ দিলেন—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

এই সময় চিকাগো ধর্ম সভায় বিশ্বজয় করে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে আসেন। এ ঘটনা গোটা দেশে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করল। রাজনৈতিক নেতা না হয়েও বিবেকানন্দ বললেন।—

'পৃথিবীতে পাপ যদি কিছু থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ।...দুর্বলতা জীবনহীনতার—অসত্যের লক্ষণ।' তখন ইংরেজদের শত অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেম স্বতোৎসারিত হতে থাকল।

তেরো

অগ্নিযুগের শুরু

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষে একদিকে যখন্ গড়ে উঠেছে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য, শুরু হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, তখন আর একদল মানুষ তলায় তলায় নিজেদের প্রস্তুত করছিলেন গোপন বিদ্রোহের। মহারাষ্ট্র এ বিষয়ে অগ্রণীভূমিকা নিয়েছিল। আর এ ব্যাপারে বাল গঙ্গাধর তিলকের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

তিলক জন্মেছিলেন ১৮৬৬তে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট তিনি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে দেশে ফিরে এসে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন তিনি। সি. জি. আগারকরের সহযোগিতায় তিনি প্রকাশ করতে থাকলেন দু'দুটি পত্রিকা। একটি ইংরাজীতে। নাম 'দি মারাঠা'। দ্বিতীয়টি মারাঠীতে নাম 'কেশরী'। দুটি পত্রিকাতেই তিলক জাতীয়তাবোধ প্রচার করে চললেন।

তিলকের প্রভাব সাধারণ কৃষকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন সময় দাক্ষিণাত্যে হ'ল অনাবৃষ্টি। তার ফলে হ'ল দুর্ভিক্ষ আর

মড়ক। সরকার কিন্তু তার জন্য খাজনা এতটুকু মকুব করলেন না। বরং বেশি করে খাজনা আদায় হতে থাকল। তিলক খাজনা বন্ধের ডাক দিলেন। এমন সময় সরকারের তরফ থেকে আমদানী করা কাপড়ের ওপর কর তুলে দেওয়া হ'ল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল স্বদেশী বস্ত্রকারেরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৬তে দাক্ষিণাত্যে প্রবল স্বদেশী অন্দোলন গড়ে উঠল। ছাত্রেরা স্তূপ-স্তূপ বিদেশী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

তিলকের আন্দোলন ছাপিয়ে উঠল দাক্ষিণাত্যের আর এক বিপ্লবীর কর্মতৎপরতায়। তার নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে (১৮৪৫-১৮৮৩)। তার পূর্বপুরুষেরা পেশোয়াদের রাজ কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু বাসুদেবের জন্মের আগেই পরিবারটি দরিদ্র হয়ে পড়ল। রীতিমত লড়াই করে নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী এবং সংস্কৃত শিখে ছিলেন বাসুদেব। লোকে ভাবত বাসুদেব বড় হলে কত বড় চাকুরেই না হবে। মিথ্যা নয়, ইংরেজরা তাকে সমাদর করে ডেকেই কাজ দিয়েছিল প্রশাসন বিভাগে।

এখানে কাজ করতে করতেই বাসুদেব ভাল করে বুঝলেন ইংরেজ শাসনের স্বরূপকে। প্রতি মুহূর্তে ইংরেজরা ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি যে ঘৃণা আর অপমান ছুঁড়ে দিত, তা হজম করতে করতেই বাসুদেবের মনে গড়ে উঠল ইংরেজ-বিদ্বেষ। ফাড়কে নিজের মত করে তরুণদের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ ছড়াতে থাকলেন—ছড়াতে থাকলেন স্বদেশপ্রেম। অচিরেই ঐ নিরীহ কর্মীটির স্বরূপ বুঝে ফেলল ইংরেজরা। বাসুদেব ফাড়কে গ্রেপ্তার হবার আগেই আত্মগোপন করলেন।

ফাড়কের মনে এবার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। তিনি স্থির করলেন অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী কৃষকদের সমবেত করে তিনি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং ইংরেজদের ভারত থেকে উচ্ছেদ করবেন।

তার এই পরিকল্পনায় যোগ দিলেন তখনকার মহারাষ্ট্রের কৃষক

নেতা হরিনায়ক। দুজনের চেষ্টায় বিদ্রোহী কৃষকেরা একটা সৈন্যদলে পরিণত হ'ল। শিবাজী হলেন তাদের আদর্শ। শিবাজী যেমন চকিতে বেরিয়ে এসে বিজাপুর বা মোগলদের ওপর আক্রমণ করত, ঠিক তেমনি ফাড়কের সৈন্যদলও ১৮৭৯ সালের শেষ দিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ ইংরেজ বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে থাকলেন। ইংরেজরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন মহারাষ্ট্রের গভর্নর ছিলেন রিচার্ড টেম্প্লে। ফাড়কে তার কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে অবিলম্বে কৃষকদের খাজনা কমান, জনহিতকর কাজে ব্যয় বাড়ান, এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের সঙ্গে ভারতীয় কর্মচারীদের মাইনের ফারাক কমাবার দাবী জানালেন। তার দাবী না মানলে কি করা হবে তাও জানিয়ে দিলেন ফাড়কে। বলা হল, দাবী না মানলে ওদের কুঠি আক্রমণ করা হবে। পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সমস্ত মহারাষ্ট্রে ঘটান হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। আর সমস্ত দেশ তার সঙ্গে যোগ দেবে।

এই দাবীপত্র পেয়ে টেম্প্লে নিরুপায় হয়েই এক ইস্তাহার জারি করলেন। তাতে বলা হল যে জীবিত বা মৃত - যে অবস্থাতেই হোক ফাড়কেকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে চার হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের তৎপরতা বেড়ে গেল। বাসুদেব ফাড়কের দল মহাজন এবং সামন্তদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বহু অর্থ সংগ্রহ করল। এই অর্থে তাঁর সৈন্যদল আরও সংগঠিত হয়ে উঠল। এবার বাসুদেব আরও তৎপরতার সঙ্গে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ শুরু করলেন। বাসুদেবের সই করা এক ইস্তাহার সকলের হাতে গিয়ে পৌঁছাল—যে টেম্প্লের মাথা এনে দিতে পারবে, তার পুরস্কার সাত হাজার টাকা।

প্রথম দিকে বাসুদেব ফাড়কের দল অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেও অল্প কিছুদিন পর থেকেই ঐ বাহিনীর কার্যক্ষমতা হ্রাস

পেতে থাকল। বোঝা গেল বাসুদেবের সংগঠন অনেক দুর্বল। উল্টো দিকে ইংরেজদের সংগঠনও যেমন দৃঢ় তেমনি ব্যাপক। এর অনিবার্য ফলে সহসা বাসুদেবের সৈন্যদল একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে বাসুদেব ধরা পড়ে গেলেন। পুণায় আদালতের বিচারে ফাড়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

প্রথম জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানের আয়োজন বলে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ফাড়কের আন্দোলনের গুরুত্ব সমধিক। এ কথা ইংরেজরা বুঝতেন। বিশেষতঃ কৃষকদের মধ্যে ফাড়কের জনপ্রিয়তা ইংরেজদের জানা ছিল। অতএব ইংরেজরা তাকে ভারতবর্ষে রাখতেই সাহস পেল না। পাঠিয়ে দিল এডেন বন্দরের এক কারাগারে।

সেখান থেকেও পালালেন ফাড়কে। কিন্তু তাঁর ভাগ্য মন্দ। জাহাজে উঠবার সময় ধরা পড়ে গেলেন আবার। ইংরেজরা এবার আর কোন সুযোগ দিল না ফাড়কেকে। ঐ কারাগারেই আমৃত্যু অনশন করে ১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঐ জেলেই মৃত্যু বরণ করলেন।

ফাড়কের ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করলেন তিলক। তিনি তখন তরুণ। ফাড়কের আদর্শ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তার ব্যর্থতা তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি বোঝেন গোটা দেশকে জাগিয়ে না তুলে কিছু লোক নিয়ে আক্রমণাত্মক আয়োজন ব্যর্থ হবেই। এতএব তিলক তাঁর পত্রিকায় লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, শিবাজী-উৎসব, গণেশ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে শুরু করলেন। বস্তুত সেই কালে তিলকের আন্দোলন গভীর মূল পর্যন্ত সঞ্চারিত হচ্ছিল।

এই ক্রমোবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধের কালে ইংরেজ শক্তি তৎপর হয়ে উঠল। যুবক মাত্রকেই তারা অপরাধী ভাবতে থাকল

স্বাস্থ্যের অধিকারী মাত্রেই শত্রু। অতএব ছলে বলে ওদের পিটিয়ে পঙ্গু করে দাও। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ত' দূরের কথা জীবনের সহজ কাজ কর্মও যেন স্বাভাবিক ভাবে করতে না পারে।

এ সময়ে পুণার পুলিশ অফিসার ছিলেন র‍্যাণ্ডে। যখন তখন যাকে-তাকে গ্রেপ্তার করা ছিল তাঁর স্বভাব। এমন সময় সেখানে প্লেগ রোগের আক্রমণ দেখা দিল। রোগটা ছোঁয়াচে। তখন এর ভাল চিকিৎসাও ছিল না। অতএব রোগের আক্রমণ হওয়া মাত্র রোগীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত। অথচ আত্মীয় স্বজনেরা তা চাইতেন না। তখন পুলিশ এসে জোর করে তাদের স্থানান্তরিত করত।

এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল র‍্যাণ্ডে। রোগী খোঁজার নাম করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু করল পুলিশ। তল্লাশীর নামে মার-ধর, ভাঙ্গ-চুর, লুট. এবং সব রকম অত্যাচার শুরু করল পুলিশ। মেয়েদের ইজ্জত. আব্রু রক্ষাও কষ্টকর হয়ে উঠল। পুণা অঞ্চলে লোকের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। তিলক তৎপর হয়ে গণ সংগঠন গড়ে তুলতে থাকলেন।

একদিন বক্তৃতার জন্য মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন তিলক। এক যুবক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। উপস্থিত সকলের সামনে তাঁর দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কাপুরুষ।

উপস্থিতেরা উত্তেজিত। তিলককে বলে কাপুরুষ! তারা যুবককে ধরে ফেলল। তিলক তাকে কাছে আনতে বললেন। কাছে আনলে বললেন. কেন কাপুরুষ বলছ ভাই।

যুবক বলল. র‍্যাণ্ডের অত্যাচারে যখন দেশের লোক অতিষ্ঠ তখন যারা তার প্রতিকারের উপায় না দেখে শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় তারা কাপুরুষ ছাড়া কি!

তিলক গম্ভীর হলেন। বললেন. ঠিকই বলেছ ভাই। তুমি যে হিসেবে এ কথা বলেছ, সে হিসেবে আমি কাপুরুষই বটে। কিন্তু

পুরুষের মত শোধ নিতে গেলে যা করা দরকার, তার জন্য যে সংগঠন, যে শক্তি প্রয়োজন—তা কোথায়! আমিও ত' চাই শোধ নিতে। আমিও ত' তেমন পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি পারবে সে দায় নিতে!

যুবক বলল, পারব।

তিলক যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

যুবকের নাম দামোদর চাপেকার। ওরা চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ওর বাবার নাম হরিপন্থ চাপেকার। তিনি একজন কীর্তনীয়া। দামোদরেরা তিন ভাই। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। সকাল-সন্ধ্যা তিন ভাই, বাবার সঙ্গে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন গায়। গোপনে গোপনে ফাড়কের রীতিতে গড়ে তোলে বিপ্লবী সমিতি। অস্ত্র সংগ্রহ করে, অস্ত্রশিক্ষা দেয়। তিন জনই স্বভাববিপ্লবী—বিপ্লব যেন ওদের রক্তে।

দামোদর একদিন চাকরির উমেদার হয়ে গেলেন র‍্যাণ্ডের কুঠিতে। চাকর-চাপরাসীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ভাল করে চিনে দেখে এলেন সব। ছোট ভাইকে বাদ দিয়ে সঙ্গী করলেন মেজো ভাই বালকৃষ্ণ আর তার এক বন্ধু বিনায়ক রাণাডেকে।

এবার পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন সাম্রাজ্য-ব্যাপী উৎসব শুরু হয়েছিল। ঐ দিনকেই উপযুক্ত দিন বলে স্থির করলেন দামোদর। শহরের সমস্ত খানাপিনায় ছুটোছুটি করছেন র‍্যাণ্ডে। তিনি ভাবতেও পারলেন না যে তার অলক্ষ্যে তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে কয়েক জোড়া চোখ। তাঁর নিয়তি ঘনিয়ে এসেছে।

এখন যেখানে পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, তখন সেখানেই ছিল গভর্ণরের বাড়ি। রাত সাড়ে আটটার কাছাকাছি সময়ে দামোদর সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হ'লেন গভর্ণরের বাড়ির কাছে—অন্ধকারে। সঙ্গে

তুটো পিস্তল আর তুটো তলোয়ার। কথা আছে, বাসুদেব দূর থেকে র‍্যাণ্ডের গাড়ী চিনিয়ে দিয়ে সংকেত জানালে ওরা আক্রমণ করবে।

রাত সাড়ে এগারটায় র‍্যাণ্ডের গাড়ি বেরিয়ে এল। তার পিছনে সামনে আরও গাড়ি। বালকৃষ্ণ র‍্যাণ্ডের গাড়ি চিনে তার পিছনে লাফিয়ে উঠে গুলি করলেন। কিন্তু গাড়িটি ছিল আসলে সৈন্য-বাহিনীর এক অফিসার, লেফটেনাণ্ট্ আয়ার্স্টের। গুলি সোজা তার বুক ভেদ করে চলে গেল। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

দামোদর কিন্তু বুঝলেন বালকৃষ্ণের ভুল। অতএব লাফিয়ে উঠলেন র‍্যাণ্ডের গাড়ির পিছনে। বাঁ হাত দিয়ে ঝোলা পর্দা সরিয়ে গুলি করলেন র‍্যাণ্ডের ঘাড়ে। দীর্ঘ দিন যন্ত্রণা ভোগের পর ৩রা জুলাই তার মৃত্যু হ'ল। এদিকে ওরা ব্যবহার করা অস্ত্রশস্ত্র এবং অকেজো কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন অন্য শহরে। পুলিশ এঁদের ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করল।

প্রায় দেড়মাস পরে ৯ই আগস্ট দামোদর আর বালকৃষ্ণকে ধরিয়ে দিল তুই দ্রাবিড় ভাই। বাসুদেবের বয়স তখন মাত্র সতেরো। তাকে তু-এক দিন থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু পুলিশ জানত না ঐ সতরো বছরের বাসুদেব কি ধাতুতে গড়া। সে ঐ বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবার দায় তুলে নিল নিজের কাঁধে।

একদিন রাত্রে ঐ তুই দ্রাবিড় ভাই যখন তাস খেলছিল নিজেদের বাড়িতে, তখন বাসুদেব এসে উপস্থিত হ'ল তাদের বাড়ির দরজায়। বলল, তাড়াতাড়ি থানায় চলুন। আপনাদের পুরস্কার সংবাদ এসেছে।

আনন্দে ওরা দরজা খুলে বাইরে আসতেই তুজনকেই চরম পুরস্কার দিল বাসুদেব। ওঁর সঙ্গে ছিল বিনায়ক রাণাডে। তু'জনেই,

যেন জীবনের সব সাধ পূর্ণ হয়েছে এভাবে, নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

তিন চাপেকার ভাই আর রাণাডেকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল ইংরেজ বিচারক। হুকুম শুনে দামোদর বলেছিলেন, ব্যস। ফাঁসি! এতেই শেষ? এর চাইতে শক্ত আর কোন শাস্তি নেই?

বালকৃষ্ণ বলেছিলেন, ঠিক আছে; ঠিক আছে! শুনেছি তো ফাঁসি হবে। তা অত চেঁচাচ্ছে কেন লোকটা?

বাসুদেব হেসে ব্যঙ্গ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি তো দুটো খুন করেছি! কার জন্য আগে ফাঁসি হবে সেটাও স্থির করে দিন হুজুর।

রাণাডে হুকুম শুনতে শুনতে গল্প করছিল বন্ধুর সঙ্গে।

ফাঁসির সকালে অন্য এক সেলের আসামী তিলককে প্রণাম করছিলেন দামোদর। তিলক তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন একখণ্ড গীতা। গীতা বুকে চেপে দামোদর বলেছিলেন, বালকৃষ্ণ! তবে আসি ভাই।

বালকৃষ্ণ বললেন, তুমি যাও দাদা। আমরাও আসছি।

শুনতে শুনতে সেদিন ঘাতকের চোখে জল এসেছিল কিনা, সে কথা কোন ইতিহাসে লেখা নেই। কিন্তু এসব তরুণের জীবনদান ব্যর্থ হয় নি। ওঁদের ত্যাগেই আজ দেশ স্বাধীন।

চোদ্দ

মুণ্ডা বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের পর গোটা ভারতবর্ষের ওপর, বিশেষ করে উত্তর ভারতের ওপর ব্রিটিশরা যে বর্বর অত্যাচার চালায় তার ফলে ভারতের কৃষক সমাজ একেবারে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তখন কোম্পানীর আমল গিয়ে শুরু হয়েছে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের তথা রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ শাসন। ওপর তলায় কিছু স্বদেশীয় মানুষকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ব্রিটিশরা তাদের বনিয়াদ পাকা করে তুলছেন।

এদিকে তখন ইংরাজী শিক্ষা চালু হয়েছে। উর্দু-বাঙলা-তামিল ও মারাঠী সাহিত্যে এসেছে নব শক্তির জোয়ার। কেউ কেউ যুগটাকে নব জাগরণের বা রেঁনেশার কাল বলা যায় কিনা ভাবছেন। গোটা ভারতে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা নব মানবতাবাদ, সাম্যমৈত্রী ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রচার শুরু করেছেন। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্যজাগ্রত কৈশোরের ডাগর চোখ মেলে দেখছেন পৃথিবীতে।

এ সময়ে নিচের তলায় নেমে আসছিল ঘোর অন্ধকার। প্রতিদিনে করভার বেড়ে যাচ্ছিল, বাড়ছিল নানারকম বেআইনী

আদায়ের বছর। এতদিনের ভোগ করা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল কৃষক ও আদিবাসী সমাজ।

একটা সরকারী হিসেব দিলে কর বৃদ্ধির বহরটা সহজে অনুমান করা যাবে। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ভারতবর্ষ বুঝে নেওয়ার কালে ১৮৫৯ সালে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ করের যে হিসেব পান তা হল ৩৬'১ কোটি টাকার মত। কিন্তু ১৮৯৩ সালে সেই প্রত্যক্ষ কর পৌঁছায় ৮৫'৯ কোটি টাকায়। অন্যান্য আদায় ধরলে টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে এর তিন চার গুণ।

এই অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে নিষ্পেষিত কোল ও মুণ্ডা সমাজ আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মনে রাখতে হবে, ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহের পর বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজের ওপর (যাতে কোল, মুণ্ডারাও বাদ যায়নি) যে নিদারুণ অত্যাচার চলেছিল, তার স্মৃতি তখনও তাদের বুক থেকে মুছে যায় নি। সেদিন গোটা অঞ্চলে একজন আদিবাসীও অনাহত বা অনির্যাতীত ছিল না। আস্ত ছিল না একটি গৃহ। তবু সেই বিভীষিকাময় ছবির ওপর আবরণ চাপিয়ে আবার বিদ্রোহের ধ্বজা তুলবার মত শক্তি অর্জন করবার পিছনে যে কি দারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিছু পাহাড় ও শ্যামল অরণ্য ঘেরা রাঁচী জেলা ছিল কোলেদের বাসভূমি। এখানে প্রধানতঃ বাস করত মুণ্ডা-সম্প্রদায়। ব্রিটিশ আধিপত্যের গোড়া থেকেই রাঁচীতে ব্রিটিশ শোষণ ব্যবস্থার জাল ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে বসবাস শুরু করে বহু হিন্দু-মুসলমানও রাজপুত, জমিদার, ঠিকাদার ও মহাজন। এরাই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সংবাদ প্রথম পৌঁছে দেন ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী ও পুলিশকে বিদ্রোহের কালে এরা পালিয়ে ছিলেন সবচেয়ে আগে। আবার বিদ্রোহের শেষে এখানে এসে জাঁকিয়ে বসেছিলেন তারা। আবার

শুরু হয়েছিল ধ্বংসাবশিষ্ট সাঁওতালদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ। মেরুদণ্ড ও মন ভাঙ্গা সাঁওতালেরা বন্দী পশুর মত অসহায় ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল এই অবস্থাটা।

এমন সময় সারা ভারতের রাজনৈতিক ভাবনা যখন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেস গড়ে তুলেছেন, তখনই সাঁওতালদের চিরকালের অধিকার—অরণ্যকে ব্যবহারের অধিকার হরণ করে নেওয়া হল। চিরকাল তারা বন থেকে প্রয়োজনমত বেত, বাঁশ, কাঠ, খড় সংগ্রহ করে এসেছেন। এবার তাদের সে অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হল। এ সব সংগ্রহ করতেও জমিদারের অনুমতি নিতে হবে, দিতে হবে দাম। বেগার প্রথা আবার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল তাদের ওপর। আদি-বাসী সমাজ মরিয়া হয়ে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। পুড়িয়ে দিল জমিদারের কাছারী-বাড়ি, তাদের কর্মচারীদের মধ্যে অত্যাচারী ও ঘুষখোরেরা সর্বপ্রথম নিহত হল। জমিদারদের আর্ত চিৎকারে ব্রিটিশ সরকার বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে রাঁচী জেলা ঘিরে ফেললেন।

কিন্তু এবারে ব্রিটিশ সরকার পূর্বের মত অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী আদিবাসী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসলেন। জাঁদরেল সেনাপতিরা নিজ হাতে নেতাদের হাতে সুরাপাত্র তুলে দিয়ে সহানুভূতির সুরে তাদের অভাব অভিযোগ-গুলি শুনতে থাকলেন। ব্রিটিশ আদালতে মামলা করেও যে সব অধিকারের সমর্থন পায়নি তারা, যে সব অত্যাচারের প্রতিবিধান হয়নি, সেনাপতিরা কিন্তু সেগুলিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেন, অত্যাচার বন্ধের আশ্বাস দিলেন। স্থির হল, তাদের খাজনা আর বাড়বে না—আগের খাজনাই থাকবে। বনের জিনিস তারা আগের মতই প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। তারা স্বেচ্ছায় যেটুকু শ্রম উপহার দেবে, তার বেশি কেউ জোর করে আদায় করতে পারবে না।

সমগ্র রাঁচী জেলা জুড়ে বিজয়-উল্লাস। সফল হয়েছে বিদ্রোহ। আনন্দে হাতিয়ার ফেলে কালো-কালো আদিবাসীরা শান্ত হয়ে ফিরে গেল নিজের আবাসে। আবার ফিরে এল জমিদার আর তার অনুচরেরা। আপাতভাবে খাজনা বাড়ল না বটে, বন থেকে সব এনে ভাঙ্গা ঘরও প্রথমবার বাঁধল আদিবাসীরা। কিন্তু অলক্ষ্যে ধীর-গতিতে একটু একটু করে জমিদারের দল তাদের পুরানো রীতি-গুলোই চালু করল। কয়েক বছরের মধ্যেই মুণ্ডারা বুঝল তারা প্রতারিত হয়েছে।

এই সব আন্দোলনের কালে রাঁচি জেলার তামার থানার চাকলাদ গ্রামের এক সর্দারের ছেলে বিরশা তার বাল্য ছাড়িয়ে কৈশোরে পদার্পণ করছিল। চাইবাসার এক জার্মান স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিল বিরশা। তারপর গিয়েছিল ক্যাথলিক মিশনের স্কুলে মাধ্যমিক পড়তে। কিন্তু স্কুলের পড়া হল না বিরশার। চারপাশের নিপীড়ন আর ছলনা দেখতে দেখতে এই সদা-হাস্যময় ছেলেটির চোখের সামনে আর এক সামাজিক পাঠের পাতা খোলা হয়ে গেল। বিরশা দেখল, ধর্মের নামে তার সমাজকে চারদিক থেকে সরকারের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে এই পাদরী, রোমান-পুরোহিত এবং হিন্দু-পুরোহিতরা। এর ফলে মহা শক্তিমান মুণ্ডারা অসহায় হয়ে পড়ে আছে। আর সেই সুযোগে বাঁধা হাতির গায়ে ডাঁই-ডাঁশের মত বসে রক্ত শুষে খাচ্ছে ঐ জমিদার-ডিকুর দল। এর থেকে মুক্তি কিসে? কি করে আনা যায় ফিরিয়ে আপনার জাতের বুকে আপন শক্তি?

বিরশার পড়া গেল, হাসি গেল, ঘুম গেল। দিন দিন তার সামনে অসহায় মুণ্ডাদের আর্ত চিংকার যেন অসহায় প্রেতের মত নৃত্য করে বেড়াতে থাকল। তাদের অবিরাম তাড়া করে ফিরছে ধর্মধ্বজী নানারকম পুরোহিতের দল আর জমিদার মহাজনেরা। পারা যায় না গোটা জাতকে এক করে এক সঙ্গে সকলের বিরুদ্ধে

ঝাঁপিয়ে পড়তে। মুণ্ডাদের যে তীর ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘ চিতাকে নিমেষে ধরাশায়ী করে, তার তুল্য শক্তিমান কে আছে।

কিন্তু জাতকে গড়ে তুলবার কি পথ? তাদের জাগিয়ে তুলবার উপায়? কোনদিক থেকে পারা যায় তাদের হৃত শক্তি ফিরিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধ করতে?

হঠাৎ দিব্য দৃষ্টির মতই বিরশার মনে জেগে উঠল পরম সত্য। আঁশের বশে গিয়েই কাঠকে নিজের কাজে লাগাতে হয়। ধর্মপ্রাণ মুণ্ডারা নানা সংস্কারে জড়িত। সেই সংস্কার আর ধর্মপ্রাণতাকেই কাজে লাগাতে চাইলে বিরশা। বিষ দিয়ে বিষক্ষয়।

বিরশা ফিরে এল তার গ্রামে। প্রচার শুরু করল, মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা সিংবোঙ্গার প্রত্যাদেশ পেয়েছে সে। শিংবোঙ্গা বলেছেন, তিনি থাকতে মুণ্ডারা কেন অন্য বোঙ্গার পূজা করে। অন্য বোঙ্গাদের কি শক্তি! তার শক্তিতেই তো সকলে শক্তিমান। তিনি খুশি হলেই তো সব দেবতা খুশি।

কথাটা নাড়া দিল মুণ্ডাদের প্রাণে। কথাটার যৌক্তিকতা কেউ খণ্ডন করতে পারল না। অন্য জনেরাও বিরশার কথাটাকে কোন ক্রমেই কাটাতে পারল না। বিরশার পাশে ধীরে ধীরে সমবেত হতে থাকল যুবকের দল। তারাই প্রথম বিরশাকে গ্রহণ করল নেতা হিসাবে। বিরশা শুধু শিংবোঙ্গার আদেশ পাওয়া লোক নয়— বিরশা ভগবান। তারা ছুটল গ্রাম থেকে গ্রামে বিরশার বাণী প্রচার করতে আর মুণ্ডারা ছুটল চাকলাদে তাদের নতুন ভগবানকে দেখতে।

বিরশার সামনে সুযোগ। বিরশা এক সঙ্গে দুটি কাজ শুরু করল। প্রথমেই দরকার গোটা জাতকে একটা সংহত আচরণ-বিধিতে বাঁধতে। তারপর দরকার তাদের উপযুক্ত শাণিত অস্ত্রে পরিণত করে শত্রুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বিরশা জনতার সামনে হাজির হয়ে বলতে থাকল, কেন এত বোঙ্গা। আমরা যেমন

শিংবোঙ্গার সন্তান অন্য বোঙ্গারাও তাই। অতএব ছাড় তাদের পূজা। বোঙ্গার পূজা করবে তুমি, মাঝখানে পুরোহিত কেন? বোঙ্গার সেবা যদি তোমার চাকরে করে তবে সে সেবা কার হয়? তোমার না চাকরের? বোঙ্গা কাকে শক্তি আর আশীর্বাদ দেবে? পুরোহিতকে না তোমাকে? দেখছ না পুরোহিতের জমজমাট সংসার। দেখছ না তার সুখ। নিজে শিংবোঙ্গার পূজো করে নিজে তার আশীর্বাদ নাও। তুমি তার সন্তান—নিজে তার কাছে তোমার দুঃখ জানাও। জানে (পৈতে) ধারণ করবার অধিকার সকলের।

মুণ্ডারা চিৎকার করে উঠল, ঠিক ঠিক। তুমি আমাদের দীক্ষা দাও। দাও নতুন মন্ত্র।

দীক্ষা দিতে থাকল বিরশা। নতুন মন্ত্র দিতে থাকল, পশু পাখির ওপর অকারণ হিংসা ত্যাগ কর। সৎ জীবন যাপন কর। কুসংস্কার দূর কর। সুন্দর নির্মল জীবন যাপন কর। আর এই সৎ সঙ্কল্প নিয়ে ধারণ কর জানে।

দীক্ষার উপকরণ হিসাবে বিরশা প্রত্যেককে পৈতা দিতে থাকল। গোটা জাত এক নবীন উন্মাদনায় মেতে উঠল।

কিন্তু এর মধ্যে ত' কোন রাজনীতি নেই! এর মধ্যে তো সামাজিক বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন বিদ্রোহ নেই। তবু জমিদার আর তার অনুচরেরা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকল বিরশাকে। আর মুণ্ডা সমাজের এতদিনের হত্যাকর্ত্তাবিধাতা পুরোহিতেরা (জানেরা) হতমান হয়ে এসে সেই জমিদারদের কাছেই বেদনা প্রকাশ করতে থাকল।

এদিকে দিনকে দিন বিরশার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকলো গোটা অঞ্চলে। প্রতিদিন শত শত যুবক বৃদ্ধ বিরশার কাছে এসে নব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকল। চাকলাদ পরিণত হ'ল নিত্য জন-সমুদ্রে।

এবার সুযোগ। তিলে তিলে উত্তেজনার তাপ ছড়াতে থাকল বিরশা। বলতে থাকল, সং জীবন যাপন কর। প্রস্তুত হও। শিংবোঙ্গার আদেশে 'প্রলয়ের দিন, আসছে। যেদিন শোষণ থাকবে না, ডিকু থাকবে না। সেদিন আর জমিদারের খাজনা দিতে হবে না, কেউ তোমাকে বেগার দিতে ডাকবে না। গোটা অঞ্চলের সব কিছুতে থাকবে তোমার অধিকার।

মুণ্ডারা আনন্দে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ করে চিৎকার করে উঠল। জয় বিরশা ভগবানের জয়। ধাতৃ আবা (বিশ্বের পিতা) র জয়। প্রলয়ের দিন আসছে। আমরাই হব আমাদের রাজা! গোটা অঞ্চল চঞ্চল হয়ে উঠল।

কিন্তু তার চাইতেও চঞ্চল হল জানেরা। জানেদের কাছে সংবাদ পেয়ে চঞ্চল হল জমিদার, তহশিলদার এবং তাদের অন্যান্য কর্মচারিরা। দূর দুরান্ত থেকে একদিকে যেমন নতুন কাপড় পরে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুণ্ডারা এসে সমবেত হতে থাকল চাকলাদে, ঠিক তেমনি গোটা অঞ্চল থেকে জমিদার এবং তার অনুচরেরা পালাতে থাকল। সবচেয়ে বড় কথা বিরশার প্রলয়ের দিন আসবার আগেই গ্রামে গ্রামে পুলিশ পিকেট বসে গেল। বিরশা বুঝল তার পরিকল্পনায় ফাঁক থেকে গেছে। একদিনে সহসা আক্রমণ করে সব জমিদার ডিকুকে হত্যার যে পরিকল্পনা ছিল তার—তা আর সফল হবার নয়। একদিকে তারা পলাতক, অন্যদিকে পুলিশ উপস্থিত। অতএব ক্ষুণ্ণ মনে বিরশা ঘোষণা করলেন, শিংবোঙ্গা খুশি নন। কোথায় আমাদের মধ্যে পাপ আছে। তাই তিনি প্রলয়ের দিন পিছিয়ে দিলেন। তোমরা ফিরে যাও। আরো শুদ্ধ হও। আরও সৎ হও। অপেক্ষা কর। তাঁর আদেশ আসবেই।

ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ মনে মুণ্ডারা ফিরে চলল কিন্তু তারই মধ্যে কিছু উত্তেজিত যুবক আক্রমণ করে বসল এক পুলিশ ঘাঁটি। অপ্রস্তুত পুলিশেরা প্রস্তুত হবার আগেই আহত হল। কিন্তু যুবকদের হঠাৎ

হয়ত' মনে পড়ল বিরশার নির্দেশ। তারা আহতদের হত্যা না করে ক্যাম্প গুড়িয়ে দিয়ে তাদের বিছানাপত্র নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংঘবদ্ধ পুলিশ হানা দিল চাকলাদ গ্রামে। খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিপদের মুখে একদল অনুচর বিরশাকে প্রায় জোর করে নিয়েই আত্মগোপন করল। কিন্তু পুলিশ দমল না তাতে। স্বয়ং পুলিশ সুপারিনটেন্ডেণ্ট আরও পুলিশ এবং কয়েকটি হাতি নিয়ে এসে মুণ্ডাদের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে গ্রামকে গ্রাম তচনচ করে দিতে থাকলেন। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল বহু গ্রামে। হতাহত মুণ্ডায় ভরে গেল গোটা অঞ্চল। পুলিশের এক কথা, তোদের বিরশা ভগবান কোথায় বল! দুঃখের মধ্যেও এ প্রশ্নে মুণ্ডারা স্বস্তি পেল, যাক্—ধাতৃআবা ধরা পড়েনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, তাদের এ স্বস্তি বেশিদিন রইল না। পুলিশের অত্যাচারে কোন সাধারণ মুণ্ডাই হোক বা পুরস্কারের লোভে কোন লোভীজনই হোক বা প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন জানই হোক, গোপনে গিয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিল বিরশার আশ্রয়-স্থান। অতর্কিতে আক্রমণ করে পুলিশ অনুচর-সহ ঘুমন্ত বিরশাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তাকে পাঠিয়ে দিল চাকলাদ থেকে দূরে রাঁচি জেলে।

দাবানলের মত এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল রাঁচি জেলায়। সঙ্গে সঙ্গে আহত-অনাহত হাজার হাজার মুণ্ডা এসে সমবেত হল চাকলাদ গ্রামে। এখুনি তারা জেল ভেঙ্গে বের করে আনবে তাদের নেতাকে—অথবা মরবে। বিরশার একান্ত কাছের যে কজন অনুচর বাইরে ছিল তারা বহু কষ্টে প্রবোধ দিল মুণ্ডাদের। বললে, তোমরা গ্রামে ফিরে যাও। বিরশা ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। নিশ্চয় তিনি কোন কারণে ধরা দিয়েছেন। তার নির্দেশ না পেলে কিছু করা ঠিক হবে না।

মুণ্ডারা কথাটাকে দ্বিধার সঙ্গেই মেনে নিল। কিন্তু মানল না জনা আষ্টেক অতি উৎসাহী। তারা আট জনেই ছুটল রাঁচি জেলে। ওরা প্রাচীর বেয়ে জেলে ঢুকবার চেষ্টা করলে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। তারা আর কিছু না হোক, বিরশার সান্নিধ্য পেয়ে শান্ত হল।

বিরশার বিদ্রোহ প্রস্তুতি পথে থামিয়ে দিতে পারলেও ইংরেজ সরকার ভাবিত হল। এদের কি করে শান্ত করা যায়! স্থির হল ভয় দেখান, দমননীতি এবং বিরশা সম্পর্কে মোহ নষ্ট করাই হবে যোগ্য পথ। অতএব চাকলাদ থেকে দূরে রাঁচিতে নয়, চাকলাদের কাছেই খুন্তিয়া জেলে নিয়ে যাওয়া হবে বিরশাকে। সেখানে প্রকাশ্যে বিচার করে তাকে শাস্তি দিলে মুণ্ডাদের মন থেকে বিরশার মোহ গত হবে। এই বিশ্বাসে বিরশা ও তার অনুচরদের সরকার খুন্তিয়া জেলে নিয়ে গেলেন এবং নিপুণ পরিকল্পনা মত সংবাদটা প্রচার করে দিলেন।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। সংবাদ পাওয়া মাত্র হাজার হাজার মুণ্ডা ছুটে এসে জেলখানা ঘিরে ফেলল। দুদিন পর্য্যন্ত তারা ঘিরে রইল জেলখানা। আক্রমণ করলে সাধ্য ছিল না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কি ভেবে মুণ্ডারা ঘিরে বসেই রইল। আক্রমণ করল না।

সুযোগ বুঝে গোপনে রাতারাতি বন্ধ গাড়িতে করে আবার বন্দীদের রাঁচি জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ঐ বছরেই (১৮৯৫) নভেম্বর মাসে বিরশাকে আড়াই বছরের জন্য এবং অনুচরদের কম-বেশী নানা সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

এ সংবাদ শুনে মুণ্ডারা দুর্বার হয়ে উঠল। সর্বক্ষণ উত্তেজনা। যে কোন মুহূর্তে মাহুতহীন মত্ত হাতীর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মুণ্ডারা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরেজ সরকার আরও সৈন্য পাঠালেন। গ্রামে গ্রামে পুলিশ পিকেট বসল। মধ্যে মধ্যে সৈন্যদল। অফিসাররা ঘুরে ঘুরে সকলকে বোঝাতে থাকলেন।

সময়, প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের অভাবে মুণ্ডাদের উত্তেজনা আপনা থেকেই কমে এল। একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহের হাত থেকে বাঁচল ইংরেজরা।

উত্তেজনা কমতেই ফিরে এল জমিদার এবং তার লোকেরা। শুরু হল পুরোন কায়দায় কর-আদায়, বেগার খাটান। সেকালের সরকারী ভূমি-রাজস্ব বিবরণে এদের অত্যাচারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। জমিদার আর তাদের অনুচরদের অপকীর্তির কথা ইংরেজ সরকারের অজানা ছিল না। জেনে শুনেও তারা বাধা দেননি এ শোষণে। রক্ষা করেননি আদিবাসিদের। এর মধ্যে ১৮৯৭ সালে গোটা অঞ্চলে হল অনাবৃষ্টি। এক কণা ফসল ফলল না। হাহাকার দুর্ভিক্ষ। বনাঞ্চল ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক মুণ্ডারা অনাহারে বা অখাদ্য খেয়ে মরতে থাকল। এতেও বুঝি ক্ষান্ত হল না দৈবের রোষ। ১৮৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে দেখা দিল এক রকম মহামারি। দুর্ভিক্ষ আসবার সূত্রপাতে পুলিশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হল। অসহায় মুণ্ডারা আবার ডিকুদের শিকারে পরিণত হত।

দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ যখন সবে ঘনিয়ে আসছে, ঠিক সেই সময় ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে বিরশা এবং তার কিছু অনুচর ফিরে এলো জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে। সবে মুণ্ডারা তার পাশে জমতে শুরু করেছে এমন সময় শুরু হল দুর্ভিক্ষ। বিরশা গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসহায়ের মত মরতে দেখল মুণ্ডাদের। পরের বছর মহামারিতে সেবাব্রতের ভিতর দিয়ে আরও প্রাণের মানুষ হয়ে উঠল বিরশা। এই বিপর্যয়েও কিন্তু ডিকুদের খাজনা আদায়, বেগার খাটান কমল না। বিরশা এবার উত্তেজিত কণ্ঠে নতুন সংগ্রামের আহ্বান জানাতে থাকল। আর নয়, এবার ডিকুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। মুণ্ডা অঞ্চলের জমির মালিক তারা। ইংরেজদের খাজনা দিতে রাজি আছে তারা, ঐ জমিদার ডিকুদের নয়।

কিন্তু আক্রমণের কেন্দ্র হবে কোথায়? মনে মনে কেন্দ্র স্থির করল বিরশা। চুঠিয়া নামে এক গ্রামের মন্দির ছিল ডিকুদের মিলন কেন্দ্র। স্থানীয় জমিদার, মহাজন, পুরোহিত সকলে সমবেত হ'ত সেখানে। সেখানে প্রণাম করে আসত সবাই আদিবাসীদের কাছে। দেবী যেন সব দিক রক্ষা করেন। বিরশা সেই দেবীর ওপরেই প্রথম আঘাত হানতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। এবং একদিন অতর্কিত আক্রমণে মন্দির দখল করে নিলেন। দেবীমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। বিরশা স্থির করল, ঐ মন্দিরই হবে তার আশ্রয়। এখান থেকেই সে মুণ্ডাদের পরিচালনা করবে।

এদিকে পলায়িত পুরোহিত, জমিদার মহাজনেরা গিয়ে মিলিত হ'ল ছোট নাগপুরের মহারাজের দরবারে। তার সাহায্যপুষ্ট এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এক রাতে অতর্কিতে হানা দিলেন বিরশার দলকে। বিরশা পরাজিত হয়ে মন্দির ছেড়ে পালাল।

আবার রাঁচী থেকে এল পুলিশ-মিলিটারী। আবার চলল বিরশার অন্বেষণ। বিরশা গোপনে গোপনে শুধু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবার কথা বলে বেড়াতে থাকলেন। এদিকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনতঃ বনের ওপর মুণ্ডাদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নর নিজে এসে ঘোষণা করলেন, তাদের সেই অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হতে থাকল মুণ্ডারা শান্ত হয়েছে। জমিদাররাও আগের মত জুলুম করছে না। অতএব পুলিশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হল।

এল ১৮৯৯ সাল। এ বছর শীতের ফসল হল না এক দানা। আবার হাহাকার পড়ে গেল মুণ্ডা অঞ্চলে। জমিদারেরা তাদের কর আদায়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিরশার দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে কর বন্ধের জন্য প্রচার করে বেড়াতে থাকল। বিরশার বড় বড় জমায়েতে উপস্থিত হয়ে তাদের দুর্দশার কারণ বুঝিয়ে দিতে থাকলেন। আক্রমণের দিন স্থির হল ক্রিষ্টমাস পরবের আগের দিন।

নির্দিষ্ট দিনে তানা, কুঁঠি, তামা, বাসিয়া, রাঁচি ইত্যাদি অঞ্চলের সমস্ত কুঠি, কাছারি, মন্দির, গীর্জা, থানা-আদালত পুলিশ ফাঁড়ির ওপর একযোগে আক্রমণ চলল। গোটা অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রচুর। অন্যেরা পালিয়ে আশ্রয় নিল রাঁচি শহরে। সামরিক ঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও যে কোন মুহূর্তে রাঁচি আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রইল। এ অবস্থায় কেটে গেল প্রায় পনের দিন। গোটা অঞ্চল মুণ্ডাদের অবাধ বিচরণভূমিতে পরিণত হ'ল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছর—১৯০০ সালের ৭ই জানুয়ারী বহু মুণ্ডা যুবক তীর-ধনুক, টাঙ্গি, সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করে বসল খুন্তিয়ার থানা। উপস্থিত সকলে বাধা দিলেও হতাহত ও পরাজিত হল। মুণ্ডারা বিজয় গর্বে থানা তচ্‌নচ্‌ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এলেও তারা নিল না।

ওদিকের প্রস্তুতিও প্রায় সমাপ্ত ছিল। খুন্তিয়ার সংবাদ পৌঁছানমাত্র পুলিশ কমিশনার একশ সৈন্য ও দেড়শ' পুলিশ নিয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য যাত্রা করলেন।

এ সংবাদ মুণ্ডাদের কাছে পৌঁছাতেই ডুমারী-পাহাড়, ঘুটুহাটু, কারাপুর্ত্তি, জানুমপিড়ি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে শত শত মুণ্ডা এসে জড় হল বিরশার পাশে। বিরশা স্বয়ং নেতৃত্ব নিয়ে বাঁশ আর গাছ কেটে বেড়া বেঁধে অন্তরাল সৃষ্টি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

৯ই জানুয়ারী পুলিশ কমিশনার নিয়ম মাফিক আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত তীর এসে প্রথম আক্রমণে বহু সৈন্য ও পুলিশ হতাহত করল। এবার শুরু হল গুলি বর্ষণ। প্রথম আক্রমণের সুযোগে বিরশা এগিয়ে থাকলেও বন্দুকের বিরুদ্ধে তীর নিয়ে যুদ্ধ বেশিক্ষণ টিকল না। বিরশা বাধ্য হয়ে অনুচরদের গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে বললেন। বিজয়গর্বে ইংরেজ সৈন্য পুলিশ এগিয়ে এল। পাওয়া গেল সাতটি মৃতদেহ আর তিনজন আহত

যুবককে। মৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ বেশী নারী। কমিশনার শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

তখনও কমিশনারের সঙ্গে জীবিত সৈন্য ও পুলিশের সংখ্যা দুশ'র বেশি। কিন্তু তিনি এই শক্তি নিয়ে গভীর অরণ্যে ঢুকতে চাইলেন না। সংবাদ পাঠালেন। আরো সৈন্য এলো বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে তারা ঢুকল গভীর অরণ্যে। বিরশা প্রত্যক্ষ লড়াই এড়িয়ে 'অনুচরদের ছড়িয়ে দিল সমগ্র রাঁচি জেলায়। গোটা জেলা জুড়ে মুণ্ডা বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল।

প্রায় দুমাস ধরে এ বিদ্রোহ চল্‌ল। কিন্তু আকস্মিক ভাবেই ধরা পড়ে গেল বিরশা। তার শতাধিক অনুচর সহ বন্দী রইল রাঁচি জেলে। সেখানে হঠাৎ কলেরা হয়ে এই তরুণ বিপ্লবীর মৃত্যু হল। অন্যান্যদের বিচারে পাঁচ থেকে দশ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

পনের

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যে

সিপাহীবিদ্রোহের আগেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ শুরু হয়ে যায়। খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হলেও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় গঠিত 'ল্যাণ্ডহোল্ডারর্স সোসাইটিকেই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের সম্মান দিতে হবে। বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থরক্ষা এবং প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে এ সভাটি গঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করাই ছিল এদের কর্মনীতি।

এর বছর ছয়েক পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এমন আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার নাম ছিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'। এদের লক্ষ্য আর একটু ব্যাপক ছিল। অচিরে এ দুটি দল একত্রে মিশে হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশন।

এদের দেখাদেখি এ সময়ে সারা দেশেই এ ধরণের শহর-ভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৫২ সালে মাদ্রাজে এমন এক সংগঠনের সংবাদ পাওয়া যায়। তার নাম 'মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন'। বোম্বাইতে গড়ে ওঠে 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন'।

এসব সভা পুরোপুরি আঞ্চলিক চিন্তা ভাবনা করত। এগুলি

চালনা করত ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদারেরা। এরা প্রধানতঃ চাইত—

১. শাসনতান্ত্রিক সংস্কার।

২. শাসন-ব্যবস্থার নানা বিভাগে আরও বেশি দেশীয় লোকের নিয়োগ।

৩. ভারতে ইংরেজী শিক্ষার আরও প্রসার।

৪. সব রকম সরকারী কাজে এদেশী লোকের নিয়োগ।

৫. ভারতবর্ষে শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা লাভ।

এজন্য বিদ্রোহ বিপ্লব বা আন্দোলনের স্বপ্নও তারা দেখতেন বলে মনে হয় না। কালটাও তার উপযুক্ত ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যে এসব বিষয়ে অলোচনা করে মোলায়েম ভাষায় ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টের কাছে আর্জি পেশ করতেন এবং ভাবতেন যে পার্লামেণ্ট অনুগ্রহ করে তাদের কিছু সুযোগ দেবে।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি মানুষই বুঝেছিলেন যে দেশীয় রাজা, জমিদার বা ভূস্বামীদের দিয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে না। তেমন আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষের লাভের সম্ভাবনা নেই। পার্লামেণ্ট ভারতীয় শাসনভার গ্রহণ করে আরও নিপুণভাবে ভারত-শোষণ শুরু করে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এর সমালোচনা শুরু করেন। কৃষকদের বা শ্রমিকদের চাইতে তাদের দ্বিধা ছিল বেশি। তাদের বিদ্রোহের ভঙ্গিও ছিল শ্রমিক-কৃষকদের থেকে ভিন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপকে চিনতে তাদের সময় লেগেছিল। কিন্তু চিনবার সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন হয়েছিল গভীর, তেমন পরিকল্পিত। সাময়িক উত্তেজনা নয়, ব্রিটিশ শাসনের শিকড় উপড়ে ফেলবার প্রবণতা ঘটেছিল তার।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই নতুন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে চতুর্থ দশক থেকে গড়ে-ওঠা রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ। তাদের আন্দোলনের মধ্য

দিয়ে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। কারণ তারা বুঝেছিলেন যে সব ভূস্বামী জমিদারদের স্বার্থ ব্রিটিশ স্বার্থের অংশীদার। অতএব তারা নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

শুধু দেশে নয়, একেবারে লণ্ডনের বুকের ওপরেও দাদাভাই নৌরাজী 'ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন ১৮৬৬ সালে। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল ব্রিটেনের জনগণকে ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। নৌরাজী এজন্য তার জীবনপাত করেছেন। এজন্য তিনি লণ্ডনের নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেন এবং পার্লামেন্টের সভ্যপদও লাভ করেন। তিনিই পার্লামেন্টে প্রস্তাব করেন যে ইণ্ডিয়ান-সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা শুধু ইংলণ্ডে নয় —ভারতবর্ষেও একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে হবে। প্রস্তাব পাশও হয়। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গোপনে নানা কৌশল করে এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেনি।

যা হোক নৌরাজীর অবদান এই যে ব্রিটিশ শাসন যে ভারতকে হৃত সর্বস্ব করে ছেড়েছে এ কথা তিনি তার লেখায় এবং ভাষণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রভাব ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ইংলণ্ডে এত মর্যাদা পেত যে গ্ল্যাডস্টোনের মত মানুষও তাঁকে 'The Grand old man of India'—'ভারতের বৃদ্ধ মনীষী' নামে অভিহিত করেন।

যা হোক, শুধু ইংলণ্ডে নয়, এ সময়ে পুণাতেও এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সেকালের বিখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ বিচারপতি রাণাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, এস. এইচ. চিগলুংকর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পুণায় 'সার্বজনীন সভা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক চিন্তা ও কাজকর্ম প্রসারে এ সভার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

গোটা দেশের তলায় তলায় যখন এই রকম রাজনীতি সচেতনতা

ধোঁয়াচ্ছে, সেই সময় ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লিটন। মাত্র চার বছর তিনি ভারতে ছিলেন ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি অসংখ্য ভারত-বিরোধী আইন চালু করলেন। লিটনের এই ভারত বিরোধী কার্যকলাপ দেশব্যাপী রাজনৈতিক উন্মাদনা সঞ্চার করল।

লিটন কি কি করলেন, তার সামান্য পরিচয় নেওয়া যাক। ঊনবিংশ শতকে ভারতে ভারতীয় মূলধনে অনেকগুলি কাপড়ের কল বসেছিল। এর ফলে ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আসা কাপড় বেশ ভালরকম প্রতিযোগিতায় পড়ে। যদিও ভারতীয় মিলে মোটা কাপড় ছাড়া তৈরী হ'ত না (এ জন্য ত' বাঙালী কবি গান বাঁধলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।') তবু ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিরা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে সুনজরে দেখতেন না। লিটন এসেই ব্রিটিশ বস্ত্রের ওপর থেকে আমদানী কর তুলে দিলেন। এর ফলে ঐ কাপড়ের দাম কমে গেল। ফলে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প মার খেতে থাকল।

লিটন এই কমে যাওয়া আয় পূরণের জন্য সাম্রাজ্য বাড়াতে চাইলেন। শুরু হ'ল আফগানীস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু এ জন্য যে বাড়তি ব্যয়ভার তা চাপিয়ে দেওয়া হ'ল ভারবাসীদের ওপর বাড়তি কর হিসাবে।

লিটন এসেই অস্ত্র আইন চালু করলেন। এই আইন বলে ভারতীয়েরা কোন রকম অস্ত্র রাখতে পারবেন না বলে হুকুমজারী হ'ল। শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, এমন কি পশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার অস্ত্রও ভারতীয়দের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ল।

এবার লিটন চাইলেন ভারতীয়দের ব্রিটিশ সমালোচনার আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ করতে। এ সময়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তারা প্রয়োজনে ব্রিটিশ

শাসনের সমালোচনায় পিছপা হ'ত না। এজন্য লিটন জারি করলেন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট।

এ সময়ে বাঙলাদেশে বেশ কয়েকটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা স্বদেশাত্মক চিন্তা প্রচার করত, করত' ইংরাজদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং স্বজাতিত্ব-বোধ জাগাতে বাঙলা দেশের রঙ্গমঞ্চ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদৌল্লা নাটকে যখন মীরজাফর, জগৎশেঠ ইত্যাদি ষড়যন্ত্র করছে, তখন করিমচাচা নামে একজন ঢুকে নানা কথার শেষে বল্‌লেন—

'দুধ-কলা দিয়ে ঘরের ভেতর কাল সাপের
ঝাঁক-পুষো না, সকলে মিলে আগে ওদের
উচ্ছেদ করো।'

এ যে স্পষ্ট ইংরেজদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা, এ করিমচাচা যে সিরাজ-দৌল্লার আমলের কেউ নয়, এ যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের বিবেকের বাণী—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। লিটন এ প্রচার ব্যবস্থাকে কিছুতেই বরদাস্ত করলেন না। প্রচলিত হ'ল ১৮৭৬ সালের নাট্য আইন।

এই সময়ে সারা ভারত জুড়ে চলছিল দুর্ভিক্ষ—আর তারই মধ্যে লিটন মহা জাঁকজমকে করলেন দিল্লীর দরবার।

লিটনের এ সমস্ত কার্যকলাপ ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে। ইংরেজী শিক্ষা তাদের মধ্যে এক ধরণের তাত্ত্বিক স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছিল। তার সময়ে এক স্বতস্ফূর্ত আবেগের সঞ্চার করল। কলকাতায় 'সঞ্জীবনী' সভার মত সভা গড়লেন রাজনারায়ণ বসু। নবগোপাল মিত্রের প্রস্তাবে এবং ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'হিন্দুমেলা'। সেখানে স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হ'ল। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন

বসু ইত্যাদি আত্মত্যাগী স্বদেশপ্রেমিকরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'। এঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন ব্রিটিশের চাকরী নেবেন না এবং নিজ আয়ের একাংশ দান করবেন দেশের কাজে।

এই সময় ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট এক আইন জারি করে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় বসবার বয়সের সীমা একুশ থেকে নামিয়ে উনিশ করে দিল। এর ফলে ভারতীয় ছাত্রদের সামনে সুযোগ গেল কমে। একে ভারতীয়েরা তাদের অধিকার সংকোচন বলে ভাবলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একে এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নিজেদের অর্থে সুরেন্দ্রনাথকে পাঠাতে থাকলেন সারা ভারতে। এই সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ও মত বিনিময় হতে থাকে এবং তাঁরা একটি সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে প্রয়াসী হ'ন। পশ্চিম ভারতে দাদাভাই নৌরাজী, বিচারপতি রাণাডে, ফিরোজ শা মেহেতা, কে. টি. তেলা, রহিমতুল্লা মুহম্মদ সায়ানি, জ্যাভেরিলাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত, বদরুদ্দিন তায়বজি, দক্ষিণ ভারতে জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দ চরলু আর পূর্ব ভারতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি সবভারতীয় সংগঠনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

এঁরা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে একটি সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন করেও সংগঠন গড়া গেল না। অবশেষে বোম্বাই-এর রাজনৈতিক নেতারা ১৮৮৫-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আর এক সম্মেলনের আয়োজন করলেন। এক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী এই কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম এ. ও. হিউম।

হিউমের কার্যকলাপ অবাক করার মত। যখন গোটা ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শোষণের জন্য তৎপর তখন হিউম ইংরেজ হয়েও ভারতীয়দের সর্বভারতীয় সংগঠন গড়তে তৎপর কেন? পরবর্তী

সময়ে হিউম নিজেই তাঁর অভিসন্ধি ব্যাখ্যা করেছেন। তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিদ্বেষ যেভাবে চরমপন্থা গ্রহণের দিকে এগুচ্ছিল, তাতে ইংরেজদের মনে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল। ঐ রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে হিউম তাকে একটা বাঁধনের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। এতে সব মিলিয়ে ইংরেজদেরই উপকার হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

হিউমের বিশ্বাসকে অতিক্রম করে এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান যে মহান উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে বারংবার সব বিভেদ ভুলে সকল মতামতের রাজনৈতিক কর্মীই যে এই এক পতাকা তলে সমবেত হয়েছিলেন, পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

মোট কথা লিটনের ভারত বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে এবং প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। নানা দলের সম্মিলিত রূপ বলেই তার নাম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) আর তার প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সমস্ত ভারতে তাঁর পরিচিতি ছিল ডাব্লু. সি. ব্যানার্জি নামে।

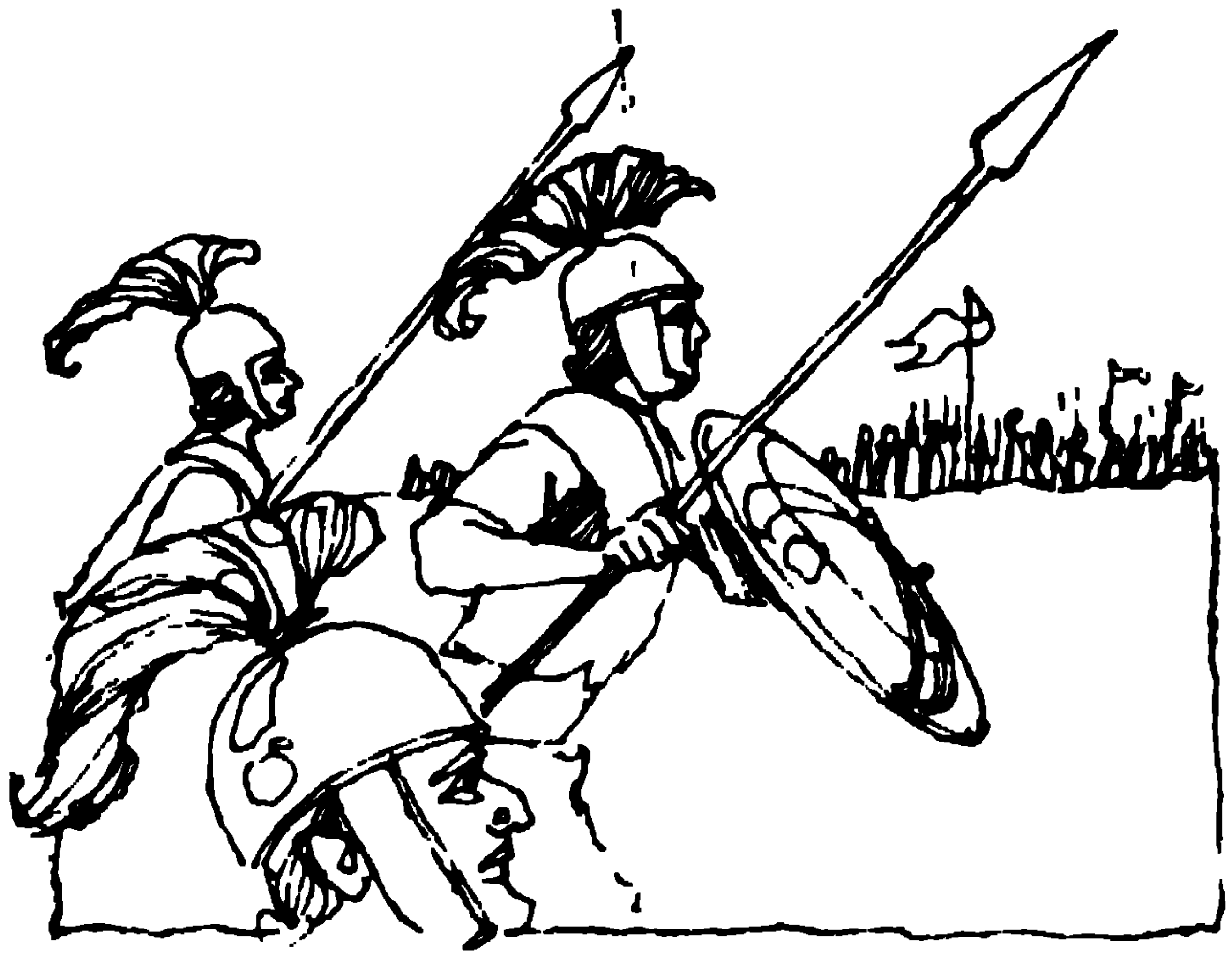

ষোল

বিদ্রোহী মণিপুর

পাহাড়-ঘেরা দেশ মণিপুর। পাহাড়-ঘেরা কেন, বলা যায় পাহাড়-ময়। চিরকাল স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে সে দেশের মানুষ। মহাভারতের বিজয়ী বীর এখানে এসে পরাজিত হয়েছিল রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদার কাছে আর শেষ জীবনে মণিপুর-পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধেও মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই মাটিতেই স্বাধীনতার জয় পতাকা প্রথম পুঁতে ছিলেন নেতাজী সুভাষ। ইম্ফলই তাঁকে প্রথম ভারতের মাটিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল। এখান থেকেই তার বজ্র ঘোষণা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—দিল্লী চলো।

এই মণিপুরে ইংরেজরা প্রথম পা রাখবার জায়গা পায় ১৭৬০ সালের কাছাকাছি। মাত্র তিন বছর আগে হয়ে গেছে পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজের খণ্ড খণ্ড দেহ তখনও হয়ত' লালবাগের কবরে মাটির সঙ্গে মিশে যায় নি। মীরজাফরের নবাবীর দিনও শেষ হয়েছে। ইংরেজদের কাছ থেকে নবাবী কিনেছেন মীরকাশিম। আর ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের সিংহাসন নিয়েই নিলাম ডাকছে

ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী। সেই সময়ে তাদের নজর পড়ল মণিপুরের দিকে।

তখন মণিপুরের রাজা জয়সিংহ। দীর্ঘকাল ধরে রাজার শোষণ আর অবিচারটুকু এত গা-সওয়া হয়ে গেছিল যে সে দেশের রাজা-প্রজা সবাই নিজেদের ভাবতেন সুখী। এই সুখী রাজ্যটির দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ল ইংরেজদের।

এই সময় ব্রহ্মের রাজা হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন মণিপুর রাজ্য। জয়সিংহ প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু বুঝলেন তাঁর প্রস্তুতির অভাব আছে। পরাজয় নিশ্চিত। আত্মরক্ষার উপায় কি? ভাবতে গিয়েই তার মনে পড়ল ইংরেজদের কথা। ওদের সুশিক্ষিত সেনাদল ওরা ভাড়া খাটায়। মাদ্রাজ থেকে গোয়ালিয়র, অযোধ্যা থেকে পাটনা কোথায় না যায় তারা। এজন্য মূল্যটা বড্ড বেশি চায়। জয়সিংহ ভাবলেন, তা চাক্। রাজ্যই যদি চলে যায় তবে দামাদামী করে কি লাভ! অতএব প্রাণ বাঁচাতে ইংরেজদের কাছে শ্রীহট্টে দূত পাঠালেন জয়সিংহ।

জয়সিংহের দূতকে পেয়ে যেন স্বর্গ পেল ইংরেজরা। কিন্তু কলকাতার গভর্ণরের অনুমতি ভিন্ন তো এত বড় কাজে হাত দিতে পারা যায় না। অতএব শ্রীহট্ট থেকে কলকাতায় লোক গেল অনুমতি আনতে। গভর্নর সাগ্রহে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বড়ই দেরী হয়ে গেছে। মণিপুর-ব্রহ্ম যুদ্ধ শেষ। মণিপুর ব্রহ্মের দখলে। জয়সিংহ পলাতক।

এতেও দমল না ইংরেজরা। রাজনীতিতে নাক গলাবার সুযোগ যখন এসেছে তখন ষোল আনা কাজে লাগাবার মানসিকতা ইংরেজদের। জয়সিংহের হেরে যাওয়া বা পালানকে তারা বরং সুযোগ ভাবল। এই জয়সিংহকে দিয়ে আরও বেশি সুবিধাজনক সর্তে রাজী করান যাবে। এতএব রাজাকে খুঁজতে লোক পাঠাল ইংরেজ সেনাপতি।

পাওয়া গেল হতোদ্যম জয়সিংহকে। তিনি ইংরেজদের সব শর্তেই রাজি। সৈন্যদল প্রস্তুত হ'ল। জয়সিংহের পতাকা নিয়ে ইংরেজরা আক্রমণ করল ব্রহ্ম-অধিকৃত মণিপুর। প্রায় পঞ্চাশ বছরে ১৮১৬ সালে সমগ্র মণিপুর উদ্ধার হ'ল। ততদিনে জয়সিংহ পরলোকে গেছেন। রাজা এখন তার পুত্র গম্ভীর সিংহ। মণিপুরের লোক আনন্দে স্বাধীন মণিপুরের জয়ধ্বনি দিল বটে কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না যে তার অনেক আগেই মণিপুরের গলায় শেকল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে :

গম্ভীর সিংহের পর রাজা হলেন তার ছেলে চন্দ্রকীর্তি। এবার মণিপুর পুরোপুরি ইংরেজ সাম্রাজ্যের করদ মিত্ররাজ্যে পরিণত হ'ল। চন্দ্রকীর্ত্তি নিজেও ইংরেজ রেসিডেন্টের ওপর সব দায় ছেড়ে দিলেন। এজেন্ট নীতি-নির্দ্ধারণ করেন, রাজস্বের হেরফের করেন। বদল করেন আইন-কানুন। সব আদেশ জারি হয় রাজার নামে। দেখলে মনে হয় ইংরেজরা দর্শকমাত্র—এত তাদের সেলামের ঘটা। রাজাও ভাবেন এত বড় বন্ধু হয় না।

এই চন্দ্রকীর্তির তৃতীয় পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ। রাজপুত্র হয়েও যেন রাজপুত্র নন। তিনি সাধারণ পোষাকে মেশেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। করেন স্বাস্থ্যচর্চা। পড়েন ইতিহাস।

একদিন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও ?

টিকেন্দ্রজিৎ উত্তর দিল, সেনাপতি হতে চাই।

: রাজা হতে চাও না !

: না।

: কেন ?

: রাজা তো ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের গোলাম। আমি সেনাপতি হয়ে ওদের উচ্ছেদ করতে চাই।

রাজা সবিস্ময়ে তাকালেন পুত্রের দিকে। এত বড় শিক্ষা সে পেল কোথায় ! তাকে কোলের কাছে টেনে এনে বললেন, যা

আমাকে বললে তা আর কাউকে বলো না। জেনো, মন্ত্রগুপ্তি সিদ্ধির উপায়।

টিকেন্দ্র প্রণাম করল বাবাকে। বাবা আশীর্বাদ করে মনে মনে স্থির করলেন যুবাকালে টিকেন্দ্রকেই সেনাপতি পদে বরণ করবেন।

কিন্তু বিধিবাম। চন্দ্রকীর্তি টিকেন্দ্রকে সেনাপতি পদে বরণ করবার আগেই আকস্মিক ভাবে মৃত্যু বরণ করলেন। সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র।

শূরচন্দ্র ছিলেন আরও ভালমানুষ। অতএব তাঁর কালে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্টের আরও শক্তি বাড়ল। শূরচন্দ্রের দরবার ছাড়াও এজেণ্টের কুঠিতে আর এক দরবার বসতে থাকল। রাজ্যের গণ্য-মান্যেরা প্রতিদিন সেখানে হাজিরা দিতে থাকলেন।

এমন সময় বৃদ্ধ-সেনাপতির মৃত্যু হ'ল। পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাত তাড়াতাড়ি রাজার কাছে গিয়ে ঐ পদের জন্য রাজ পরিবারের আর এক যুবক ভৈরবচন্দ্রের নাম বললেন। শূরচন্দ্র টিকেন্দ্রের মনোভাব জানতেন, জানতেন তার বাবার মনোভাবের কথা। তিনি আরো জানতেন যে সেনা-বাহিনীও ঐ পদে টিকেন্দ্রকে প্রার্থনা করে। এ অবস্থায় তিনি দ্বিধায় দুলতে থাকলেন। প্রতিদিনই তাই ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্ট তাড়াতাড়ি পদ পূরণের কথা এবং সেই সঙ্গে ভৈরবচন্দ্রের নাম বলতে থাকলেন। একদিন স্বয়ং ভৈরবচন্দ্র রাজার ঘরে ঢুকে তার দ্বিধার জন্য নানা কথা শুনিয়ে এল। কেটে গেল রাজার দ্বিধা। তিনি ঐ দুর্বিনীত উদ্ধত যুবককে বাতিল করে টিকেন্দ্রকেই সেনাপতি পদ দিলেন।

রাজ্য জুড়ে আনন্দের ঢেউ বইল। পলিটিক্যাল এজেণ্ট টিকেন্দ্রকে অভিনন্দন জানাল। উপহার দিল। তার সম্মানে কামান দাগা হ'ল। কিন্তু শূরচন্দ্রকে কানে কানে বলল, কাজটা ভাল করলে না রাজা। এজন্য তোমাকে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

রাজা বললেন, তা হোক। টিকেন্দ্র তো ভৈরবের মত অপমান করবে না।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট বুঝলেন অধৈর্য্য ভৈরবচন্দ্র তার পাকা গুটি একেবারে কাঁচিয়ে দিয়েছে। একে পাকা করতে আরও অনেক জল ঘোলা করতে হবে। প্রকাশ্যে ভদ্রতা থাকলেও টিকেন্দ্র এবং এজেণ্ট দুজনই দু'জনকে মনে মনে শত্রু চিহ্নিত করে রাখলেন। টিকেন্দ্র সৈন্যদল এবং সাধারণ মানুষ—এই দু-ধার তলোয়ারে শান দিতে থাকলেন।

বিদ্রোহের পরিকল্পনা স্থির হ'ল। হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলবে সৈন্যদল। তারপর বন্দী রাজা প্রকাশ্য দরবারে টিকেন্দ্রকে দেবেন প্রধান মন্ত্রিত্বের ভার। রাজা যথাবিহিত সিংহাসনে থাকবেন কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবেন প্রধানমন্ত্রী। মোট কথা রাজা আর ইংরেজদের মধ্যে থাকবেন টিকেন্দ্র।

১৮৯০ সালের এক রাত্রে সৈন্যদল সহসা ঘিরে ফেলল প্রাসাদ। কিন্তু রাজা নেই। কোন বিশ্বাসঘাতকের সূত্রে বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছেছিল ইংরেজদের কাছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠায় রাজার কাছে। রাজা বিদ্রোহীদের ভয়ে সেই লোকের সঙ্গেই গোপনে চলে যান ইংরেজ কুঠিতে। একদল গোর্খা সৈন্যের পাহারায় তারা রাজাকে পাঠিয়ে দেয় কাছাড়ের কাছে এক প্রাসাদে।

বিদ্রোহীরা সে রাতেই জরুরী বৈঠক বসাল। স্থির হ'ল রাজার পিছনে ছুটে লাভ নেই। তারা রাতারাতি দুর্গ, বারুদখানা, মহাফেজ-খানা ইত্যাদি দখল করে নিল। রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ মণিপুর তাদের আয়ত্বে এসে গেল। তারা বাধ্য হয়েই কুলচন্দ্র নামে রাজ-পরিবারের একজনকে রাজ-প্রতিনিধির আসনে বসাল। এ সংবাদ শুনে শূরচন্দ্র কাছাড় ছেড়ে একেবারে কলকাতায় চলে গেলেন। মণিপুর কার্যত স্বাধীন হ'ল।

ইংরেজরা পরামর্শ করল কলকাতায়। তারা রাজা শূরচন্দ্রের নামে টিকেন্দ্রকে বিদ্রোহী ঘোষণা করল এবং আসামের চিফ কমিশনার কুইটন সাহেবের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন মণিপুরে। কুইটন রেসিডেণ্টের কানে কানে কি যেন মন্ত্রণা দিলেন।

শূরচন্দ্রের পালান বা কুলচন্দ্রের সিংহাসনে বসায় বাইরের দিক থেকে কোন রীতিরই পরিবর্ত্তন হয় নি। তাই প্রতিদিন রাজ সভায় রেসিডেণ্ট আসতেন। সে দিন ও এলেন। সঙ্গে চিফ্ কমিশনার কুইটন, তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল রাজার সঙ্গে। কুইটন সেলাম জানিয়ে নজর উপহার দিলেন। রাজাও দিলেন প্রতিদান। কিন্তু তারপরই রাজার সঙ্গে রেসিডেণ্টের কথা-কাটাকাটি শুরু হ'ল। রাজসভার তপ্ত পরিবেশ। টিকেন্দ্র রাজার হয়ে রেসিডেণ্টকে সাবধান করে দিলেন। তবু রেসিডেণ্ট থামেন না। তখন কুইটন ধমকে থামিয়ে মধ্যস্থের ভূমিকা নিলেন। রেসিডেণ্ট ক্রোধে রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। রাজার অপমানে গজরাতে থাকলেন টিকেন্দ্রজিৎ।

কুইটন সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করে উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রেসিডেণ্টের বাড়িতে এক দরবার ডাকলেন। এবং রাজাকে উপস্থিত হবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজকৃপা প্রার্থনায় পদপ্রান্তে বসে পড়লেন। বিগলিত কুলচন্দ্র সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি জানালেন। প্রধানমন্ত্রী টিকেন্দ্রজিৎকেও আমন্ত্রণ জানান হ'ল।

ইংরেজ কুঠিতে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতে সাজসাজ রব পড়ে গেল। প্রাসাদেও রাজযাত্রার আয়োজন চলল। এমন সময় রেসিডেন্সির এক সামান্য সেপাই এল এক সরাইখানায় মদ খেতে। দামের টাকা হাতে নিয়ে সরাইওয়ালা পকেটে পুরে রাখল। সে সেই টাকা দিয়ে কিনল পান। পানওয়ালী সেই টাকাটা মন্ত্রী-

মশাই-এর বাড়ির পানিপাত্রের তলায় রেখে পাঠালেন প্রাসাদে। টাকাটা হাতে নিয়ে টিকেন্দ্রজিৎ হেসে উঠলেন। টাকার উল্টো পিঠে লেখা আছে :—

আপনার সন্দেহ সত্য। ফাঁদ পাতা হচ্ছে।

শিকওয়ালা খাঁচা। বাঘ এলেই বন্দী হবে।

আবার হাসলেন টিকেন্দ্রজিৎ। সত্যিকারের বাঘ খাঁচার গন্ধ পায়। সে দিনের ঝগড়া থেকেই সবটা অনুমান করেছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনাও প্রস্তুত ছিল। দরবারে যাবার সব প্রস্তুতি সমাপ্ত। রেসিডেন্সিতে জৌলুসের সীমা নেই। ইংরেজী ব্যাণ্ডের খ্যাতি দেশ-জোড়া। বাজছে সেই ব্যাণ্ড। ডে-লাইটের রোশনাই রাতকে দিন করে তুলেছে। রাজা এসে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী এলেই কাজ শুরু করা যায়।

এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর নিজের গাড়ি আসতে দেখা গেল। স্বয়ং রেসিডেন্ট এগিয়ে গেলেন। কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন টিকেন্দ্রজিৎ নয়—তার প্রতিনিধি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি আসতে পারলেন না। সব ক্ষমতা দিয়ে তাই প্রতিনিধি প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছেন টিকেন্দ্রজিৎ। এতে কাজ চলবে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুপস্থিতির জন্য টিকেন্দ্র মার্জনাপ্রার্থী।

বিনয়ে বিগলিত হয়ে রেসিডেন্ট প্রতিনিধিকেই নিয়ে গেলেন। আলোচনা সভাও হ'ল। রেসিডেন্ট সেদিনের ব্যবহারের জন্য মার্জনা চাইলেন। রাজাও মার্জনা করলেন। খুব হার্দ্য পরিবেশে সভা শেষ হ'ল। অতিথিরা বিদায় নিতেই ইংরেজদের আর এক গভীর সভা হয়ে গেল। স্থির হ'ল আর অপেক্ষা করা নয়। সহসা টিকেন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে হবে।

কয়েকদিন পর এক রাতে অন্ধকারের আবরণে ইংরেজগণ প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। তারপর শুরু হ'ল আক্রমণ। প্রাসাদ-প্রহরীরা তীব্র লড়াই করল। উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হল—যদিও

ইংরেজ পক্ষের বেশি। তবু জয়ী হল তারাই। শেষ রাতের দিকে তারা প্রাসাদ দখল করল। কিন্তু এ কি প্রাসাদ! কয়েকজন দাস-দাসী ছাড়া রাজপরিবারের একটি প্রাণীও নেই।

জয়লাভ করেও ইংরেজদের কোন লাভ হ'ল না। শুধু তারা সমগ্র মণিপুরের কাছে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। তা থাকুন ক্ষতি নেই. কিন্তু প্রাসাদরক্ষীরা অমন মরণপণ লড়াই করল কেন? তারাও কি জানত না যে রাজপরিবারের কেউ নেই। আর টিকেন্দ্রজিতের মত স্বাধীনচেতা মানুষ পালালেন কেন?

জবাব পাওয়া গেল দিন কয়েক পরেই। রেসিডেন্সির কাছেই রাজার এক দুর্গ ছিল। যেদিন ভোরে ঐ দুর্গ থেকে কামান গর্জে উঠল রেসিডেন্সী লক্ষ্য করে। অবিশ্রান্ত বর্ষণ। রেসিডেন্সী প্রতি-আক্রমণেরও সময় পেল না। ভেঙ্গে পড়ল দুর্গ-প্রাচীর। বাড়ি ঘরের কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ল। দিশেহারা ইংরেজরা প্রাণভয়ে সাদা নিশান ওড়াল। টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ-রীতির সম্মান দিয়ে গোলাবর্ষণ বন্ধ করলেন। নতমস্তকে রেসিডেণ্ট গ্রিমউড এবং কমিশনার কুইটন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে উপস্থিত হলেন শর্ত আলোচনার জন্য।

ইম্ফলের পথে পথে জনতার উল্লাস। তারা তো ইংরেজদের মস্তক নত করাতেই চেয়েছে। তাদের দাবী আরও বেশি। টিকেন্দ্রকে যারা বন্দী করতে চেয়েছিল, অকারণে যারা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে তাদের সঙ্গে আলোচনা নয়, প্রকাশ্যে শাস্তি দাও। তাদের মাথা কমিয়ে দাও উলঙ্গ করে শহর ঘোরাও। এতদিন যাদের বেগাড় খাটিয়েছে, জিনিস কেড়ে নিয়েছে, কথায় কথায় অপমান করেছে আজ ছেড়ে দাও তাদের হাতে।

টিকেন্দ্রজিৎ নির্দেশ পাঠিয়েছেন, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর।

শান্তই ছিল জনতা। তবে দুর্গ থেকে মাঝে মাঝে গুজব

ছড়িয়ে পড়ছে। কোন শর্তই মানতে চাইছে না সাহেবরা। সাহেবরা নাকি অশিষ্ট আচরণ করেছে। অপমান করেছে টিকেন্দ্রজিৎকে। সত্যাসত্য বিচার করবার ক্ষমতা জনতার থাকে না। ছিলও না। যতই সময় যাচ্ছিল ততই উত্তেজিত হচ্ছিল জনতা।

অবশেষে সংবাদ এল—সে দিনের মত নিষ্পত্তি হয়নি। আলোচনা ভেঙ্গে দিয়েছে। সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইংরেজ প্রতিনিধিরা। আর স্থির থাকল না জনতা। প্রথমে ধিক্কার ধ্বনি দিল, পরে থুথু ছিটাল তারপর এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। কিল-চড় লাথি—বিনাঅস্ত্রে চোরের মার মারল সবাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল পাঁচটি অর্ধমৃত দেহ পড়ে আছে পথে। সেনাপতি থঙ্গাল সব নির্দেশ ভুলে তলোয়ারে মুণ্ডগুলো কেটে বর্শায় বিঁধিয়ে নাচতে থাকলেন।

অবস্থা সব রকম আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। জনতা ছুটল রেসিডেন্সির দিকে। গোলন্দাজ বাহিনী কামান দেগে রেসিডেন্সি একেবারে সমভূমি করে দিল। গোটা ইম্ফলে একটা ইংরেজও রইল না। ওরই মধ্যে অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া এক আধজন কর্মচারীর কাছ থেকে শিলচরের কুঠি প্রথম এই সংবাদ পেল। সংবাদ পৌঁছাল কলকাতায়।

বড়লাট লান্সডাউন ব্যাপক আয়োজন করলেন। পঙ্গপালের মত সৈন্যদল এসে ঘিরে ফেলল মণিপুর।

সামান্য কিছুসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য আর দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ নিয়ে গড়ে উঠল মণিপুরের প্রতিরোধ। কিন্তু তবু একের পর এক যুদ্ধে হারতে লাগল টিকেন্দ্রজিতের বাহিনী। হারল পালালের যুদ্ধে, হারল থোবালের যুদ্ধে। অবশেষে বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী বীরদর্পে প্রবেশ করল ইম্ফলে।

শূন্য। সব শূন্য। রাজপ্রাসাদ থেকে দুর্গ, ধনী নাগরিক থেকে

সাধারণ গ্রামীণ মানুষ সবাই পালিয়েছে। দু-একটি অক্ষম, ভিখিরি বা পাগল যারা শহরে পড়েছিল, তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করল। কামান দেগে শহরটাকে মিশিয়ে দিল মাটির সঙ্গে। অবশেষে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আশপাশের গ্রামের ওপর।

নৃশংসতা দিয়ে যেন মণিপুরে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চায় ইংরেজরা। ভেঙ্গে দিতে চায় তার মেরুদণ্ড। অনাবশ্যক ছিল এসব। পালাল এবং থোবলের যুদ্ধে আগেই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছিল মণিপুরীদের। টিকেন্দ্রজিৎ থেকে কুলচন্দ্র সকলেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবকাশে ইংরেজদের হাত ধরে মণিপুরে আবার ফিরে এলেন শূরচন্দ্র। কিন্তু আনন্দ পেলেন কি? এই কি তাঁর সাধের ইম্ফল! শহরের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে জল এলো। তিনি তাড়াতাড়ি তা গোপনে মুছে ফেললেন। কি জানি! যদি ইংরেজ পক্ষের কেউ জেনে ফেলে। কোন ভারতীয়ের পক্ষে স্বদেশের জন্য বেদনা অনুভব করা যে ইংরেজদের চোখে পাপ।

ইংরেজরা প্রথমেই শূরচন্দ্রকে দিয়ে নিরস্ত্র করলেন মণিপুরীদের। বন্দুক ত' দূরের কথা— সামান্য ছুরিও সঙ্গে রাখা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হল। টিকেন্দ্রজিৎ, থঙ্গাল ও অন্যান্য মণিপুরী নেতার নামে পরোয়ানা জারী হ'ল—ঘোষিত হ'ল পুরস্কার। তারপর ইংরেজরা চিরুনি চালাবার মত প্রতিটি গ্রাম-নগর-পাড়া-বাড়ি চষে বেড়াতে থাকল পলাতকদের খোঁজ করবার নাম করে। আর সেই সঙ্গে চলল অত্যাচার। অসহ্য অত্যাচারে বিচার হারিয়ে মণিপুরীরা এবার তাদের নেতাদেরই দায়ী করল সব দুর্দশার জন্য এবং যে কোন নেতাকে দেখা মাত্র ধরিয়ে দিতে থাকল।

এদিকে এক বন্ধুর বাড়িতে নিঃসঙ্গ পড়ে আছেন টিকেন্দ্রজিৎ। আহত-অসুস্থ। নিরুপায় ভাবে শোনেন নানা অত্যাচারের কাহিনী আর তার বুক উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। স্বাধীনতার স্বপ্ন চূর্ণ

হয়েছে। বেঁচে থাকা নিরর্থক। বোঝা যাচ্ছে তাকে ধরবার জন্যই এত অত্যাচার। টিকেন্দ্রজিৎ স্থির করলেন. নিজের প্রাণ দিয়ে এ অত্যাচার বন্ধ করবেন। অতএব তিনি সংবাদ পাঠালেন শূরচন্দ্রের কাছে যে তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান।

ইংরেজরা লাফিয়ে উঠল, আত্মসমর্পণের শর্ত!

দূত বললেন, একমাত্র শর্ত মণিপুরের ও'পর সব অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

ইংরেজরা বলল, বন্ধ হবে! জামিন চাই?

দূত বলল, আপনাদের কথাই জামিন।

ইংরেজরা বলল, আমরা রাজী।

আত্মসমর্পণ করলেন টিকেন্দ্রজিৎ। তাকে বন্দী করে আনা হ'ল। রাখা হ'ল প্রাসাদেরই এক অংশে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও হ'ল। তারপর ইংরেজদের প্রতি ষড়যন্ত্র, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ পরিকল্পনা এবং সন্ধিপ্রার্থী ইংরেজদের হত্যার অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল। শুধু তাঁর বিরুদ্ধে নয় ধৃত সব নেতার বিরুদ্ধেই।

১৮৯১ সালের জুন মাসে রায় বের হ'ল। বিচারক সকলকেই ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। রায় শুনে গুমরে উঠল মণিপুরীরা। ইংরেজরা তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে টিকেন্দ্রজিৎ এবং থঙ্গালকে পাশাপাশি প্রকাশ্যে ফাঁসি দেবেন বলে স্থির করলেন।

তেরই আগস্ট। ইম্ফলের পোলো মাঠে পাশাপাশি দুটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরী হল। সৈন্য বাহিনী ঘিরে রইল মাঠ। কাতারে কাতারে লোক জমতে থাকল মাঠের চারদিকে। কারো মুখে কথা নেই। গম্ভীর মুখ। চোখে যেন জল ছাড়া কান্না।

গাড়ি করে নিয়ে আসা হল থঙ্গাল আর টিকেন্দ্রজিৎকে। থঙ্গাল যেন চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তাকে সৈন্যরা ধরে এনে ফাঁসির মঞ্চের কাছে একটা টুলে বসিয়ে দিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ উদ্যত মস্তকে গাড়ির বাইরে এলেন। অমনি একটা চাপা হাহাকার গুঞ্জন

যেন বয়ে গেল মাঠের ওপর দিয়ে। জনতা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানাল। টিকেন্দ্র প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর নিঃশব্দ হাসিতে গিয়ে উঠলেন মঞ্চে। সৈন্যরা থঙ্গালকেও দাঁড় করাল। একটু পরেই জনতা দেখল, তাদের দুই প্রিয়নেতার দেহ ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে।

মুহূর্তে সৈন্যদের ভয় ভুলে হু হু করে কেঁদে উঠল জনতা। কে চিৎকার করে বলল, আত্মদানের কথা তোমরা কেউ ভুলো না। জনতা যেন নিঃশব্দ চিৎকারে প্রতিজ্ঞা করল, কখনই না।

মণিপুর পুরোপুরি ইংরেজ বণিকের গহ্বরে চলে গেল।

সতের

চাপেকার ভাইরা যখন মহারাষ্ট্রে র‍্যাণ্ডেকে হত্যার চেষ্টা করছে তখন বাঙলাদেশেও গড়ে উঠেছে নানা গুপ্ত সমিতি। এ গুপ্ত সমিতিগুলির বুকে যত বড় স্বাধীনতার স্বপ্ন থাক—তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। তাদের কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক ছিল না। সংগঠনগুলিকে একত্রিত করতে পারলে কি প্রবল শক্তি সৃষ্টি করা যেতে পারে—যে কথা ভাবছিলেন একটি লোক। তিনি ছিলেন বাঙলাদেশ থেকে অনেক দূরে—বরোদায়।

অদ্ভুত জীবন মানুষটির। প্রথম যুগের স্বাধীনতার উদ্গাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসু—স্বয়ং বিবেকানন্দ যাঁর পদধূলি নিতে গিয়েছিলেন তার বাসগৃহে। এই মানুষটির স্বাদেশিক ভাবনায় গড়ে ওঠা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'ল একেবারে সাহেবীভাবাপন্ন সার্জেন ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের। এঁদের পুত্র জন্মাতে না জন্মাতে ডাক্তার ঘোষ তাদের পাঠিয়ে দিলেন সাহেব-হোস্টেলে—সেখান থেকে ইংলণ্ডে। চোদ্দ বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে

আই-সি. এস পরীক্ষায় পাশ করেও সামান্য ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত হয়ে তিনি ইংরেজের চাকরী গ্রহণের দায় থেকে মুক্ত হলেন। তারপর বনবাসের রামচন্দ্র যেন ফিরে এলেন অযোধ্যায়। না, বাঙলা দেশে ফেরা হ'ল না তাঁর। বরোদার রাজা তাকে ভাল মাইনের চাকরী দিয়ে নিয়ে গেলেন নিজ রাজ্যে। সেখানে রাজার কাজের সঙ্গে তিনি শিখতে থাকলেন বাঙলা আর সংস্কৃত। বাবা যাকে করতে চেয়েছিলেন খাঁটি ইংরেজ—তিনি হয়ে উঠলেন তীব্র স্বাদেশিক। স্বদেশের পরাধীনতা তাঁর বুকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। তিনি কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিলেন না। ভারতের গুপ্ত বিপ্লবীদের একত্রিত ও সংগঠিত করতে থাকলেন। তাঁর নাম প্রায় মন্ত্রের মত কাজ করতে থাকল। মানুষটি হ'লেন অরবিন্দ ঘোষ। আজ যাঁকে সবাই ঋষি অরবিন্দ বলে জানে।

বাঙলাদেশে তখন স্বদেশমন্ত্রে উত্তেজনার ঢেউ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বদেশী মেলা। প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক স্বদেশমন্ত্রে উদ্দীপ্ত পত্রিকা। তারা জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শুধু স্বদেশ প্রীতি নয়, ইংরেজ শাসনের স্বরূপও খুলে ধরছেন। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়। তারা একের পর এক নাটকে লোকের বুকে এঁকে দিচ্ছেন তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। গিরিশ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ থেকে ক্রমে হাল ধরেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে বাঙলা। আর বাঙলা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তা সারা ভারতে। এজন্য তখনকার ইংরেজ গভর্ণর লর্ড কার্জন বাঙালীকে শায়েস্তা করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি স্থির করলেন বাঙলাদেশকে দু-টুকরো করে এক অংশ বিহারের সঙ্গে, অন্য অংশ আসামের সঙ্গে যোগ করে দেবেন। বাঙলার নাম মুছে দেবেন মানচিত্র থেকে।

এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র বাঙলার পত্র-পত্রিকা একযোগে এর বিরোধিতা শুরু করল। ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে থাকল 'বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলন।' আন্দোলনকে গোটা ভারতে ছড়িয়ে দিতে থাকলেন সর্বভারতীয় বাঙালী নেতা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিন পাল, আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হুসেন ইত্যাদি নেতারা। বাঙলার বাইরে থেকে পাঞ্জাবের নেতা লালা-লাজপত রায় আর মহারাষ্ট্রীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলক সর্বশক্তিতে সমর্থন করলেন এ আন্দোলন।

তখন বাঙলাদেশে বিখ্যাত পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা'। এরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকলেন। এমন কি ইংলিশম্যান, স্টেট্‌সম্যান, পাইওনিয়রের মত পত্রিকাও কার্জনের বিরুদ্ধে লিখল। ইংলণ্ডের লণ্ডন-ডেইলি-নিউজ, দি লণ্ডন টাইমস, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানও কার্জনের এ কাজকে সমর্থন করলেন না। কিন্তু এতেও দমবার পাত্র নন কার্জন। তিনি ভেদনীতি দিয়ে জয়ী হতে চাইলেন। তিনি গেলেন ঢাকা সফরে। ঢাকার নবাব সলিমউল্লাকে বোঝালেন যে বাঙলাকে ভাগ করে যে অংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, সে অংশে মুসলমানরাই হবে সংখ্যায় বেশি। তাতে তাদেরই সুবিধে। তবে কেন মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ করছে।

নবাবের মনে লাগল কথাটা। তা হলে তিনি হবেন বাঙলা-আসাম সম্মিলিত রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। স্বার্থবোধে নবাব সমর্থন করলেন বঙ্গভঙ্গকে। তাঁর তাঁবের কিছু মুসলমান একে সমর্থন করল। কিন্তু মুসলমান সমাজের বেশির ভাগ অংশই রইল এর বিরুদ্ধে।

এদের সমর্থন নিয়ে কার্জন ঘোষণা করলেন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (বাঙলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) থেকেই ঐ আইন চালু হবে। এ আইন জারী করে কার্জন বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদ আনতে চাইলেন কিন্তু ফল হ'ল উল্টো।

তখন বাঙলাদেশে জাতীয়তাবোধ জাগাতে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন পয়লা নম্বর মানুষ। সব ব্যাপারে 'ন্যাশনাল' কথাটা ব্যবহার করতেন দেখে লোকে তাকে ঠাট্টা করে ন্যাশনাল কৃষ্ণকুমার বলতেন। ঠাট্টা করলেও কৃষ্ণকুমার শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাম 'ন্যাশনাল-থিয়েটার' তিনিই দিয়েছিলেন। এই কৃষ্ণকুমার মিত্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বঙ্গভঙ্গ রোধ না হলে ব্রিটিশের সব কিছু বয়কট করবার আহ্বান দিলেন। লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গ রোধ না হওয়া পর্যন্ত বিলিতি দ্রব্য বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন। প্রথম একে গ্রহণ করল খুলনা জেলার বাগের হাট শহরের এক জনসভা।

ক্রমে এ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। দিনাজপুরের এক সভায় জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি থেকে প্রতিনিধিদের পদ-ত্যাগের আহ্বান জানান হ'ল। ওরা স্থির করলেন পরবর্তী এক বৎসর কেউ কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। পালন করা হবে জাতীয় শোক। দেখা গেল নির্দ্ধারিত বঙ্গভঙ্গের দিন আসবার আগেই গোটা দেশ এক প্রবল আবেগে কাঁপতে থাকল।

অক্টোবর আসবার আগেই ৭ইআগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক সভা ডাকা হয়েছিল। তাতে এত জনসমাগম হ'ল যে এক সভা ভেঙ্গে তিন সভা করতে হ'ল। ২৮শে সেপ্টেম্বর কালীঘাটের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বাঙালী শপথ নিলেন : বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবেন না, কোন বিলিতি দোকানে পদার্পণ করবেন না।

গোটা দেশে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। কালীঘাটের ধোপারা বলল তারা বিলিতি কাপড় কাচবে না, ফরিদপুরের মুচিরা বলল বিলিতি জুতো সারাবে না। উড়িয়া পাচক জানিয়ে দিল তারা বিলিতি রান্না রাঁধবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী ছেড়ে দিল বিলিতি পোশাক, মেয়েরা ছাড়ল প্রসাধন সামগ্রী—এমন

কি ছাত্র-শিক্ষকেরা স্কুল, উকিল-মোক্তার আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকলেন।

শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমান সমাজও পিছিয়ে রইল না। ২৩ শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে রাজাবাজারের এক সভায় সম্পূর্ণভাবে বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করা হ'ল। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, অশ্বিনী দত্ত, রমেশ দত্তের মত লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনাভি, মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর মত নেতারাও এ মত প্রস্তাবে এগিয়ে এলেন।

অবশেষে নির্দ্ধারিত দিন এসে গেল। ১৬ ই অক্টোবর বঙ্গজননী বিভক্ত হলেন। আসাম-পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট হলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। দিনটিকে শোকের দিন হিসাবে পালন করল বাঙালীরা। গোটা দেশে পালিত হ'ল অরন্ধন। ভোরবেলা কলকাতার হিন্দুরা গিয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে গঙ্গাস্নান সারলেন। তারপর মিছিল বের হ'ল। মিছিলের প্রথমে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে চললেন :—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান॥

একদিকে চলছে গান, অন্য দিকে একে অন্যের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে করছে কোলাকুলি। কার্জন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ভেদের কাঁটা পুঁতে দিতে চেয়েছে, তা যেন উপড়ে ফেলার বিপুল আয়োজন।

শুধু কলকাতা নয়, বাঙলা দেশের গ্রামে গঞ্জেও লাগল ঢেউ। রবীন্দ্রনাথ-রজনী সেন-দ্বিজেন্দ্রলালের গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠল

দেশ। বরিশালের ভেজা মাটি থেকে উঠে এলো চারণ কবি মুকুন্দ দাস। যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে যখন গান ধরল,

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি
বঙ্গনারী
আর কভু হাতে পরো না—

তখন চিকের আড়াল থেকে সমস্ত মেয়ে দর্শক হাতের চুড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকল মুকুন্দ দাসের পায়ে। অন্য কবি গাইলেন,

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।

তখন প্রতিটি বাঙালীর শিরায় শিরায় আবেগ চঞ্চল হয়ে উঠল। ছিঁড়ে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টারের তৈরী মোটা কাপড়। এ অসহযোগ অন্য দিকে ভারতীয়দের নানারকম কলকারখানা এবং ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তুলতে প্রেরণা দিল। গড়ে উঠল বহু তাঁত, কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কোম্পানী, সাবানের কারখানা, ওষুধের কারখানা, চিনি-লবণ-দেশলাই তৈরীর কারখানা।

এ আন্দোলনে ছাত্রেরা এক মস্ত বড় ভূমিকা নেয়। তারা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারাই বিলিতি জিনিসের দোকানে পিকেট করে, তারাই বিলিতি জিনিস পোড়ায়—তারাই প্রচার করে বয়কটের মন্ত্র। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বাঙলা সরকারের চিফ সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল এক আদেশ জারী করলেন যে, যে ছেলে ঐ আন্দোলনে যোগ দেবে, তার জলপাণি (স্কলারশিপ) কাটা যাবে—যে কলেজ-স্কুলের ছাত্র যোগ দেবে, সে স্কুল কলেজের সরকারী সাহায্যও কাটা যাবে। এর বলে সেকালের হ্যারিসন রোডে পিকেট করার অপরাধে আসেপাশের বহু স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে ডেকে শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ পেডলার যা খুশি অপমান করলেন। স্থির হ'ল আন্দোলনে যোগ দিলে বা সমর্থন করলেও শিক্ষকেরা ছাত্রদের তাড়িয়ে দেবেন।

এ সংবাদ প্রকাশ হলে দেশে আর এক তুমুল প্রতিবাদ উঠল।

নেতারা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবার কথা ভাবলেন। এ নিয়ে সভা হ'ল। সুবোধ মল্লিক মশাই সভাতে এক লক্ষ টাকা দান করলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী দিলেন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ঠিক এক মাসের মাথায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হ'ল। প্রথম কাউন্সিলে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন:—

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
তারকনাথ পালিত
ডাঃ নীলরতন সরকার
আব্দুল রসুল
সুবোধ চন্দ্র মল্লিক
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
বিপিনচন্দ্র পাল
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পরিষদ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করে। তারাই পরের বছর প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় স্কুল এবং কলেজ। তৈরী করে কারিগরী বিদ্যালয়। এই সূত্রেই অরবিন্দ বরোদার চাকরী ছেড়ে চলে আসেন বাঙলায়। সাড়ে সাতশ' টাকার চাকরী ছেড়ে মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে অরবিন্দ গ্রহণ করলেন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ। এ পদ ত' বেতনের জন্য নয়—এ যে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সংকল্প পূরণের পাথেয়।

বাঙলা দেশে আসবার আগে থেকেই অরবিন্দ বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী। এ জন্য তিনি সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করে-ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবককে তাই তিনি

যতীন্দ্র উপাধ্যায় নামে বরোদার সৈন্য বিভাগে ভর্তি করে দেন। তাঁর শিক্ষা শেষে তাকে পাঠান বাঙলা দেশে। যতীন সে কালের অনুশীলনী দল, যুগান্তর দল—ইত্যাদি নামের বিপ্লবী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিন্তু তাদের একত্রিত করতে পারলেন না। এমন সময় অরবিন্দ এসে হাল ধরলেন। যোগাযোগের দায়িত্ব দিলেন নিজের ছোট ভাই বীরেন ঘোষের ওপর।

বিপ্লবী সংস্থার অস্ত্র চাই। অরবিন্দ হেমচন্দ্র দাসকে পাঠালেন বিলেতে। সেখানে ছিলেন বীর সাভারকর। তিনি হেমচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কাছে। এ সময় আরও একজন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে গিয়েছিলেন সেখানে। শ্যামজী দুজনকেই পাঠালেন ফ্রান্সে। সেখানে এক রাশিয়ান মহিলা দু'জনকেই বোমা তৈরীর কৌশল শিখিয়ে দিলেন।

দেশে ফিরে হেমচন্দ্র আর উল্লাসকর মিলে বানালেন প্রথম বোমা। পরীক্ষা করা দরকার। যথেষ্ট সাবধানতা সহ সেটি দিয়ে পাঠান হ'ল প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে। প্রফুল্ল গেলেন দেওঘরে। নির্জনে পরীক্ষা করবেন বোমাটির শক্তি। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন তারিখে ডিগরিয়া পাহাড়ে ভয়াল শব্দে ফাটল বোমা। বিস্ফোরণের আঘাতে প্রফুল্ল প্রাণ দিলেন। বোঝা গেল, যতখানি শক্তিশালী ভাবা হয়েছিল, বোমাটা তার চাইতেও বেশী শক্তিশালী।

এমন সময় বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখবার জন্য অরবিন্দকে বন্দী করা হ'ল। সেকালে প্রবন্ধে লেখকের নাম থাকত না। সরকার কৌশলে লেখকের নাম আদায় করে নেবার জন্য সম্পাদক বিপিন পালকে সাক্ষ্য দিতে ডাকল। বিপিন পাল ত' জানেন প্রবন্ধটি অরবিন্দের লেখা। তিনি মিথ্যা বলতেও রাজী নন। এই দোটানার মধ্যে বিপিন পাল এক অত্যাশ্চর্য বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, অত্যাচারী ইংরেজের মামলায় সাহায্য করবার জন্য সাক্ষী দিতে আমার বিবেক নিষেধ করে। অতএব

আমি এ বিষয়ে কিছু বলব না। বিপিন পালের বক্তব্যে অরবিন্দের মামলা কেঁচে যায়। তিনি মুক্তি পান। কিন্তু বিপিন পালকে সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন বিচারক কিংসফোর্ড।

এই বিচারের কালে শত শত লোক ভীড় করে দাঁড়াল। সেদিন এক ইউরোপীয়ান দারোগা জনতার ওপরে লাঠি চালাল। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি বছর পনেরর ছেলে। সে আর থাকতে পারল না। সেই সাহেব দারোগাকে লাগাল এক ঘুঁসি। নাক ফেটে গেল তার। কিন্তু আশেপাশের পুলিশরা চেপে ধরল তাকে। নিয়ে যাওয়া হ'ল কিংসফোর্ডের কাছে। বিচারকের নিরপেক্ষতা ভুলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঙালী ছেলেরা ভেবেছে কি! তারা ইংরেজের গায়েও হাত তুলবে। লাগাও ও বালকের পিঠে পনের ঘা চাবুক। চাবুক লাগাবে প্রকাশ্য স্থানে।

প্রতিপালিত হ'ল আদেশ। প্রকাশ্যে হাত-পা বেঁধে চাবুক চালান হ'ল। পনের বছরের ছেলেকে চাবুক মেরে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কিংসফোর্ড। সুশীলও ইতিহাস সৃষ্টি করল। যতক্ষণ তার জ্ঞান থাকল, ততক্ষণ প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচাল সুশীল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সেদিন সুশীলকে নিয়ে মিছিল বের হ'ল কলকাতায় কিন্তু বিপ্লবীরা স্থির করলেন ঐ দুঃশাসন বিচারককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

এ সব ঘটনায় শুধু যে বিপ্লবীরাই ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন এমন ভাববার উপায় নেই। বরিশালের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন ছোটলাট ফুলার। অতবড় লোককে সংবর্দ্ধনা করতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ছাড়া একজন ভিখিরিও ছিল না। তারা দশগুণ দাম কবুল করেও ফুলারের জন্য একটা ডিম বা এক গ্লাস দুধ জোগাড় করতে পারলেন না।

হঠাৎ একদিন কিংসফোর্ড একটা মোটাসোটা বই উপহার

পেলেন। কোন বন্ধু পাঠিয়েছে হয়ত। তখন সময় নেই। অতএব বইটি তুলে রাখলেন কিংসফোর্ড। কদিন পর এক বেয়ারা খুলল বইটি। সঙ্গে সঙ্গে ফাটল বোমা। বই-এর ভেতর স্প্রিং দিয়ে এমন ব্যবস্থা করা ছিল যাতে বইটা খুললেই বোমা ফাটে। ভাগ্য কিংসফোর্ডকে বাঁচিয়ে দিল। মরল বেয়ারাটি।

ফুলারকে মারবার আয়োজন হ'ল তিন-তিনবার। কিন্তু তিনবারই ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল সে।

ইংরেজ সরকার বাঙালী বিপ্লবীদের হাত থেকে কিংসফোর্ডকে রক্ষা করবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন মজঃফরপুরে। বিপ্লবীরা স্থির করলেন সেখানেই তাকে সরাসরি বোমা ছুঁড়ে মেরে হত্যা করা হবে।

এ জন্য নির্বাচন করা হ'ল তুটি তরুণ ছেলেকে! তাদের নাম ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী। ওরা এল মজঃফরপুরে। চিনে নিল রাস্তাঘাট। পালাবার পথ। নজর রাখল কিংসফোর্ডের গতিবিধির ওপর। দেখল প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ইউরোপীয়ান ক্লাবে যান কিংসফোর্ড, ফেরেন রাতে। এটাই সবচেয়ে ভাল অবসর। সাহেব পাড়ার নিরালা পথ আর স্বল্প আলো তাদের কাজের পক্ষে আরও উপযুক্ত।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। অমাবস্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওরা ইউরোপীয়ান ক্লাবের গেটের কাছাকাছি বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাত প্রায় আটটার কাছাকাছি গেটের ভেতর থেকে কিংসফোর্ডের গাড়ি বেরিয়ে এল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ল বোমা। অব্যর্থ লক্ষ্য। গাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বোমার আঘাতে। শক্তিশালী বোমা। ওরা প্রথমে গেল রেলস্টেশনে, সেখান থেকে একজন বাঁকিপুরের দিকে একজন সমস্তিপুরের পথে।

তখনও ওরা কার্যসিদ্ধির আনন্দে মশগুল। কিন্তু ওরা জানত

না ভাগ্য বাঁচিয়ে দিয়েছে কিংসফোর্ডকে। সেদিন মিঃ কেনেডির গাড়ি আসেনি। তার স্ত্রী আর কন্যাকে ভদ্রতা করে নিজের গাড়িতে বাড়ি পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিংসফোর্ড। তাদের পৌঁছে দিয়ে গাড়ি ফিরে এলে তিনি যাবেন। বড় সমাদর করে মা আর মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন কিংসফোর্ড। দূর থেকে তাদের হাসির শব্দও শুনেছিল ক্ষুদিরামরা। কিন্তু গাড়িতে সওয়ারী বদলের কথা জানত না তারা। অতএব কিংসফোর্ড বেঁচে রইলেন। মরল কেনেডির বৌ আর মেয়ে।

আরও দুর্ভাগ্য, পরদিন সমস্তিপুরের কাছে ওয়ালি নামে একটা স্টেশনের কাছে একটা কল থেকে জল খাবার আয়োজন করছিল ক্ষুদিরাম। তখনই সেখানে ঘটল এক কনস্টেবলের আবির্ভাব। কিন্তু তাকে দেখে ঘাবড়ে গেল ক্ষুদিরাম। কনস্টেবলের সন্দেহ হ'ল। সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে চেপে ধরল ক্ষুদিরামকে। তাকে কায়দা করতে পারবার আগেই ক্ষুদিরামের কোমরে গোঁজা পিস্তল বের হয়ে পড়ল। কনস্টেবল চিৎকার করে লোক ডেকে বন্দী করে ফেলল ক্ষুদিরামকে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে। পুলিশ তাকে ওয়ালিতে রাখা নিরাপদ মনে করল না। নিয়ে গেল মজঃফরপুর।

কিন্তু একি! স্টেশন লোকে লোকারণ্য। সকলের কৌতূহল, কে সে বালক যে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যায়। জনতাকে দেখে ক্ষুদিরামের মধ্যে বিপ্লবী সত্তা জেগে ওঠল। সে মাথা উঁচু করে চিৎকার করে উঠল—বন্দেমাতরম্। জনতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো—বন্দেমাতরম্। ক্ষুদিরাম যত ধ্বনি দেয়, জনতাও তত ধ্বনি দিতে থাকে। তত বাড়তে থাকে লোক। কে জানে জনতা শেষে ছিনিয়ে নেবে কিনা আসামীকে। পুলিশ তাড়াতাড়ি ভাড়া গাড়ী করেই ক্ষুদিরামকে জেলে নিয়ে গেল।

এদিকে লোকমুখে ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার সংবাদ শোনে প্রফুল্ল।

সমস্তিপুরে এক বাঙালী ভদ্রলোক দু'দিনের জন্য আশ্রয় দেন প্রফুল্লকে। ওর পরনে ছিল হিন্দুস্থানী বালকের পোশাক। ঐ ভদ্রলোক তাকে নতুন পোষাক কিনে দেন। তুলে দেন গাড়িতে। কলকাতার দিকে রওনা হয় গাড়ি।

কিন্তু মোকামা স্টেশনে ঐ নূতন জামা কাপড় দেখেই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় নামে এক পুলিশ অফিসারের সন্দেহ হয় তাকে। তাকে পুলিশ প্রায় ঘিরে ফেলে। নিরুপায় প্রফুল্ল শেষ চেষ্টা করে। বলে বাঙালী হয়ে আপনি বাঙালীর সর্বনাশ করবেন! কিন্তু এ আবেগে সাড়া দেবার মত মন নন্দলালের ছিল না। সে দলবল নিয়ে এগিয়ে এলো। সিংহ-শিশু গর্জে উঠল খবরদার। তারপরেই গুলি করল নন্দলালকে লক্ষ্য করে।

না। গুলি লাগে নি। আর ব্যর্থ হতে চায় না প্রফুল্ল। নিজের গলায় নল ঠেকিয়ে পর পর দুবার ফায়ার করে লুটিয়ে পড়ল মৃত্যুর কোলে। জীবন্ত ধরা দিল না প্রফুল্ল। আশ্চর্য! মানসিক শক্তি! নিজের দেহে দু-দুবার গুলি!

নন্দলালের দল প্রফুল্লর মাথা কেটে নিয়ে গেল মজঃফরপুরে। জেলে বসেই সমস্ত সংবাদ শুনল ক্ষুদিরাম।

১০ই জুন ফাঁসির হুকুম হ'ল ক্ষুদিরামের। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন কিছু ইচ্ছে করে কি তোমার?

করে বৈ কি?

কি?

ইচ্ছে করে দিদিকে দেখতে আর—

আর কি?

আর ইচ্ছে করে দেশের সমস্ত লোককে কেমন করে বোমা তৈরী করে, তা শিখিয়ে দিতে।

বিচারক বিস্মিত হলেন। ফাঁসির কথা শুনেও বুক কাঁপে না এ কেমন বালক! কোথায় পেল এত শক্তি!

বিচারক কি করে জানবেন যে স্বাধীনতার স্বপ্ন যার বুকে, তার বুকে ভয় থাকে না। তাই ১১ই আগস্ট নির্ভিক পদক্ষেপেই ফাঁসির মঞ্চে হেঁটে গেলেন ক্ষুদিরাম। দড়ি টেনে পরীক্ষা করে গলায় পরিয়ে নিয়ে হাসল ক্ষুদিরাম। শেষবার তাকাল পৃথিবীর দিকে।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে বাঙালী চারণ কবি গান বাঁধলেন।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।

সত্যিই কি ক্ষুদিরাম ফিরে আসবে? আসবে নিশ্চয়। আসবে ভারতের লক্ষ কিশোরের মধ্যে—যদি তারা ক্ষুদিরামেরই মত প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসতে পারে।

আঠারো

মাণিকতলা বোমার মামলা

১৯০৫-১৯১০

ক্ষুদিরাম ধরা পড়বার পরই পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেল। মাণিকতলার এক বাগানবাড়ি খানা-তল্লাসী করে পুলিশ। সেটা ২রা মে তারিখের ঘটনা। কয়েকজন বিপ্লবীর বাড়িও তল্লাসী করা হয়। বাগানবাড়ি থেকে পাওয়া যায় বোমা, ডিনামাইট এবং কার্তুজ তৈরী করবার যন্ত্রপাতি এবং মশলা। কতকগুলি বন্দুক, রিভলভার এবং চিঠিপত্রও পুলিশের হাতে আসে। বিভিন্ন স্থান থেকে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত ইত্যাদি চৌত্রিশজন বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দকেও তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। এদের সকলকে জড়িয়ে শুরু হয় মাণিকতলা বোমার মামলা।

ওদের সকলকে রাখা হয় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। ক'দিনের মধ্যেই সেখানে আরও একজন লোককে এনে ঢোকান হয়। নাম তার নরেন গোস্বামী। বাড়ি শ্রীরামপুরে। নরেন ওদের দলে কাজ করতেন বটে কিন্তু সকলে তাকে সমান ভাবে বিশ্বাস করতেন না। যুগান্তরের ভূপেন দত্ত তাকে পুলিশের চর ভাবতেন। বারীন ঘোষ

ভাবতেন নরেনের মন তখনও বিপ্লবীদের মত শক্ত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, জেলে আসবার পরেই শোনা গেল নরেন রাজসাক্ষী হয়েছে। যতখানি জানা ছিল সব গোপন সংবাদ সে বলে দিয়েছে সরকারকে। এখন যদি সে কোর্টে দাঁড়িয়ে হলফ করে সব বলতে পারে, তবে সর্বনাশ। কাউকে বাঁচান যাবে না।

বিপ্লবীরা বললেন, আর কাউকে বাঁচাতে না পারলেও ক্ষতি নেই. অরবিন্দকে বাঁচাতেই হবে।

এক অরবিন্দকে বাঁচাতে গেলেও নরেনকে সাক্ষী দেওয়া বন্ধ করাতে হবে।

কিন্তু উপায়। উপায়, তাকে হত্যা করা। হয় সব বিপ্লব চেষ্টার, সমাপ্তি না হয় নরেনের মৃত্যু। কিন্তু কিভাবে? জেলের মধ্যে তা কি সম্ভব? বিশেষতঃ রাজসাক্ষী হওয়ায় নরেনকে দিনরাত কড়া পাহাড়ায় রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

তবে? না কোন তবে নেই বিপ্লবীদের মনে। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাদের বৈশিষ্ট্য। দায়িত্ব নিলেন ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেন্দ্রনাথ এবং কানাইলাল দত্ত।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কানাইলালের জন্ম হয় চন্দননগরে। জন্মাষ্টমীর দিনে জন্ম দেখে বাপ-মা নাম রাখলেন কানাই—কানাইলাল। তার বাল্যকাল কাটে বোম্বাইতে। পরে চন্দননগরে এসে ভর্তি হন ডুপ্লে বিদ্যালয়ে। পরে হুগলী মহসীন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় তাঁকে বিপ্লবী কাজে টেনে নেন। কানাইলাল মনপ্রাণ ঢেলে কাজে নেমে পড়েন।

একসময় দলের নির্দেশে তিনি যান চট্টগ্রামে। কুলি সেজে কুলির দলে ভিড়ে পড়লেন কানাইলাল। দলের দেওয়া কাজ তো করলেনই, সেই সঙ্গে কুলিদের নিয়েও এক গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন।

এই সময় শুরু হ'ল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন। নেতারা

স্থির করলেন, সবরকমভাবে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করবেন। তাঁরা ছাত্রদের ডাক দিলেন ইংরেজদের স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে। তাঁরা সব বিলেতি জিনিস ব্যবহার করতে, কিনতে নিষেধ করলেন। এসব কথা লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিপ্লবীদলের কর্মীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেতেন। কানাইলালও এ কাজে যোগ দিলেন।

এই সময়েই অরবিন্দ এলেন কলকাতায়। মুরারিপুকুরে তৈরী হ'ল বোমার কারখানা। কানাইলালও এসব কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন।

নিজের জীবন দিয়ে যাঁরা বহু মানুষের মনে স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে দিয়ে গেছেন মহর্ষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁদের একজন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এক সময় রাজনারায়ণের কাছে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা নেন—স্বামী বিবেকানন্দ এসে পদধূলি নিয়ে যান রাজনারায়ণের। এঁর কন্যার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের বাবা কৃষ্ণধনের বিয়ে হয়।

এই রাজনারায়ণ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেঠামশাই। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই তাঁর জন্ম হয় মেদিনীপুরে। বাবার নাম অভয়চরণ। এখানকার কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর দীক্ষায় এই স্কুলের তথা গোটা জেলার ছাত্রেরা জেগে উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ জন্মাবার আগেই তিনি দেওঘরে চলে যান। কিন্তু শৈশবের দিনগুলি কাটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যখন স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন মেদিনীপুরে দেশপ্রেমের তপ্ত হাওয়া বইছে।

ছাত্র হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের খুব সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন যেমন মেধাবী, তেমনি প্রখর তাঁর স্মৃতিশক্তি। তাঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্র-নাথও ছিলেন বিপ্লবী। দাদার কাছ থেকেই তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন, দু'বছর পর মেদিনীপুর কলেজ থেকে পাশ করেন এফ. এ.। কলকাতা

সিটি কলেজ থেকে বি. এ. দেবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

এই সময় ১৯০২ সালে নতুন করে বিপ্লবীদল গড়ে উঠে মেদিনীপুরে। তখন নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। সতেন্দ্রনাথ সহকারী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সত্যেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে এক ছাত্রভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এখানে ব্যায়ামচর্চ্চা হত। দরিদ্র ব্যক্তিদের তাঁত চালান শিখিয়ে জীবিকা অর্জনে সহায়তা করা হত। তলায় তলায় চলত বিপ্লবের ষড়যন্ত্র। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলে চাকরী করতেন।

১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে যে কৃষি শিল্প মেলা হয়, যেখানে ক্ষুদিরাম এক পুস্তিকা বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েন, সে মেলার সম্পাদক ছিলেন সতেন্দ্রনাথ। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, ক্ষুদিরামকে তিনি অদ্ভুত কৌশলে ছাড়িয়ে আনেন। কিন্তু সে কৌশল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সতেন্দ্রনাথের চাকরী যায়।

এর মধ্যে হেমচন্দ্র বোমা বানাবার নিয়ম শিখবার জন্য চলে গেলেন প্যারিসে। জেলার পুরো দায় পড়ল সতেন্দ্রনাথের ওপর। তিনি ক্ষুদিরামের মত ছেলেদের গোপনে প্রস্তুত করতে থাকলেন। গোপনে বন্দুক সংগ্রহ করে বিপ্লবের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কিংসফোর্ডকে ক্ষুদিরাম বোমা মারবার আগেই বেআইনী বন্দুক রাখার অপরাধে সতেন্দ্রনাথ বন্দী হন। পরে তাঁকে মাণিকতলা বোমার মামলার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই দুই বিপ্লবীর কাছে কোথা থেকে কিভাবে জেলখানার ভেতর দু-দুটো পিস্তল এলো কে জানে! শোনা যায় এক আত্মীয় কাঁঠাল উপহার দিয়েছিলেন। তারই ভেতরে ছিল দুটি কার্ত্তুজ ভরা পিস্তল। সত্যেন্দ্রনাথ এমন ভান করতে থাকলেন যে তিনিও আর অত্যাচার সহ্য করতে পারছেন না। তিনিও রাজসাক্ষী হতে চান। কিন্তু তার আগে নরেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। পুলিশ নিজের আগ্রহেই ব্যবস্থা করে দিল।

২১শে আগস্ট। বেলা দশটা নাগাদ নরেন সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন হাসপাতালে। কদিন আগে অসুস্থ হয়ে কানাইলালও এসেছেন হাসপাতালে। দোতলায় ঘরে সত্যেনের বিছানায় এসে বসল নরেন। বাইরের বারান্দায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল নরেনের ইউরোপীয়ান প্রহরী। ওদের নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিতে ও দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরী থেকে আরও খানিকটা দূরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে যেন দাঁত মাজতেই ব্যস্ত আছেন কানাইলাল।

নরেনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ গুলি চালালেন সতেন্দ্রনাথ। লাগল নরেনের উরুতে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে নরেন দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল। ইউরোপীয়ান প্রহরী বাঁচাতে গেল তাকে। সত্যেনের আর এক গুলিতে তার হাত ফুটো হয়ে গেল। সে বসে পড়ল। নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। সামনে যমদূতের মত কানাইলাল। নরেন আঁকা বাঁকা হয়ে ছুটছে যাতে বন্দুকের তাক না করতে পারে। কিন্তু নরেনের সাধ্য কি পালায়। দুই বিপ্লবীর পাঁচ পাঁচটা গুলি ছুটে গেল তার দিকে। মাঠের মাঝে পড়ে গেল নরেন। আর উঠল না। সতেন্দ্রনাথ আর কানাইলাল বীরের মত আত্মসমর্পন করলেন।

পুলিশ ওদের নামে নতুন করে মামলা রুজু করল। কিন্তু নরেনের মৃত্যুতে তাদের যে ক্ষতি হ'ল —তার সীমা নেই।

কানাইলাল স্থির করলেন, এ মামলার সব দায় তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নেবেন। এজন্য তিনি নিজের কোন উকিল নিলেন না। তিনি বললেন, এ ষড়যন্ত্র তাঁর। তাঁরই গুলিতে নরেন নিহত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ নির্দোষ।

বিচারক তাঁর ফাঁসির হুকুম দিলেন। খুশি কানাইলাল। জেলে নিয়মিত খান ঘুমান। ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়া যেন আনন্দের যাত্রা।

ফাঁসির দিন নিজে হাসতে হাসতে গিয়ে উঠলেন ফাঁসির মঞ্চে। বললেন, আমি বলছি, ইংরেজদের এ দেশ থেকে চলে যেতে হবেই

হবে। মৃত্যু দিয়েও আমাদের প্রতিহত করা যাবে না। আমরা বার বার আসব। বন্দেমাতরম্ ১৯০৮। সালের ১০ই নভেম্বর ভোর-বেলা ফাঁসি হ ল কানাইলালের।

তাঁর মৃতদেহ নিয়ে কলকাতায় সেকি বিরাট মিছিল। একটা শব্দ নেই। শুধু কান্না। সারা কলকাতায় সেদিন শুধু শোক। রান্না হ'ল না কোন বাড়িতে। শোকে জাতভেদ ভুলে গেল সবাই। ইংরেজরা ভেতরে ভেতরে এত ভয় পেয়ে গেল যে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসির পর আর তার দেহ আত্মীয় স্বজনের হাতে দিল না। কে জানে, বিপ্লবীর দেহ স্পর্শ করে গোটা জাতিটা যদি বিদ্রোহ করে বসে!

মৃত্যুর আগে সতেন্দ্রনাথের মা দেখা করতে যান তাঁর সঙ্গে। সতেন্দ্রনাথ বলেন মা. তুমি যদি এখানে এসে চোখের জল না ফেল. তবেই আমি দেখা করব। তুমি বীর জননী। আমার এ গর্ব নষ্ট করে দিও না।

মা প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি চোখের জল ফেলবেন না।

মা এলেন। সতেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, মা! আমাদের দেশে লোক কাশী গিয়ে তার প্রিয় ফলটি বিশ্বনাথকে উৎসর্গ করে আসে। এতে তার পূণ্য হয়। তুমি তোমার প্রিয় সন্তানকে খুশি মনে দেশ-মায়ের পায়ে দান করতে পারবে না।

শোনা যায় তাঁর মা, এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলেও বলে-ছিলেন, তোর মত সন্তান যার, তার পক্ষে এ তো অসম্ভব নয় বাবা! আমার প্রিয় সন্তানকে আমার দেশমায়ের পায়ে বলি দিলাম!

সত্যেন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠলেন, বন্দেমাতরম্! ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর ভোরবেলা সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়। কিন্তু পুলিশ তার মরদেহ তার আত্মীয়দের হাতে দিল না। জেলের মধ্যে গোপনে তার দেহ দাহ করা হয়। হাজার হাজার মানুষ দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে শেষে তার এক কুশ-পুত্তলিকা বহন করে নিয়ে চলল শ্মশানে।

জনতা সত্যেন্দ্রের কুশ-পুত্তলিকা বয়ে নিয়ে চলছে শ্মশানে। সকলের চোখে জল, খালি পা। শব নেই, তবু একবার চালিটি স্পর্শ করবার জন্য সকলের কি ব্যাকুলতা। বিপ্লবীরা এক একটা মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সবার বুকের ভেতর স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে দিচ্ছেন। ভেঙ্গে দিচ্ছেন সব ভয়। গোটা দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এ জাতকে আর কোন দিক থেকেই আটকাতে পারছে না ইংরেজরা। তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের সওয়ালে তচনচ হয়ে গেল পুলিশের সাজান মামলা। অরবিন্দ খালাস পেলেন। অন্যেরা কম বেশি সাজা পেলেন—কিন্তু ফাঁসি হ'ল না কারোরই। সরকার পক্ষ কোন দিক থেকেই খুশি হতে পারলেন না।

না। তাদের জন্য আরও অখুশির খবর ছিল। এই সব গ্রেপ্তার মামলা চালনায় যারা সরকারী পক্ষে ছিলেন, তাদের একে একে শাস্তি দিতে থাকলেন বিপ্লবীরা। প্রফুল্লকে ধরেছিল যে বাঙ্গালী দারোগা—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে তার বাড়ির সামনেই হত্যা করল—পুলিশ হত্যাকারীর কোন সন্ধানই পেল না।

বোমার মামলায় সরকারী উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। একদিন চাদর গায়ে এক যুবক কোর্টের সিঁড়ির কাছে বিনীতভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আশুতোষ বিশ্বাস।

আশুবাবু বললেন, হাঁ। কেন বলত!

এই নিন আপনার পুরস্কার। যুবকের গুলিতে পড়ে গেলেন আশুবাবু। যুবক পালাল না। খুলনায় বাড়ি তার। বোমা বাঁধতে গিয়ে ডান হাতটা উড়ে গেছিল তার। সে হাতে পিস্তল বাঁধা দড়ি দিয়ে। বাঁ হাত দিয়ে ট্রিগার টিপে হত্যা করেছে সে। নাম চারু বসু।

পুলিশ সুপার ছিলেন সামসুল হুদা। বীরেন দাশগুপ্ত তাকে হত্যা করলেন। সেই এক কথা: আপনার কাজের জন্য এই হ'ল

জাতির দেওয়া পুরস্কার! বীরেনও নির্ভীকভাবে ধরা দিয়ে ফাঁসি বরণ করল।

ওরা প্রমাণ করল, এ জাত জেগেছে। যে জাত মৃত্যুকে ভয় পায় না, তাকে মারবে কে! মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত এগিয়ে চলল বিপ্লবীরা। স্বাধীনতার স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

প্রসঙ্গতঃ আলিপুর বোমার মামলার শেষ কথাগুলি বলা দরকার। মামলার আসামীদের ভেতর সত্যেন্দ্রনাথ-কানাইলাল চলে গেলেন। নরেন্দ্র আগেই গেছে। অন্যেরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা আত্মপক্ষ ত' সমর্থন করবেনই না বরং আদালতে বিচারের সুযোগে তারা তাদের মত এবং আদর্শকে প্রচার করবেন। তাদের আদালতের বিবৃতি কাগজে প্রকাশ হবেই তার ফলে সারা দেশে জন্ম নেবে আরও শত শত দেশপ্রাণ যুবক। অতএব তারা বিচারালায়ে নিজ নিজ বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। বরং কোর্ট যখন গভীরভাবে বিচারের প্রহসন তৈরী করছে, তখন বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা হট্টগোল ছাড়া আর কিছুই করলেন না।

এ মামলার হাল ধরেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। বিপ্লবীরা তাঁকেও বললেন যে, যে কোন উপায়ে হোক অরবিন্দকে বাঁচাতে হবে। তিনি বাঁচলে বিপ্লব বাঁচবে—বাঁচবে বিপ্লবের প্রেরণা। এ কথা বুঝি চিত্তরঞ্জনও ভাবতেন। বোধ করি তিনি এর থেকেও কিছু বেশি ভাবতেন। তাই কাঠগড়ায় দাঁড়ান অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ—

তাঁর মৃত্যুর পর—তিনি যখন পৃথিবীতে আর থাকবেন না—তখন তাঁকে মান্য করা হবে স্বদেশপ্রেমের উদ্গাতা হিসাবে, তাঁকে দেখা হবে জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক হিসাবে—মানবতার প্রেমিক হিসাবে। তার মৃত্যুর পর—তিনি যখন আর পৃথিবীতে থাকবেন

না, তাঁর কথাগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে শুধু ভারতেই নয় সুদূর সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে দূরদেশেও ছড়িয়ে পড়বে। আমি বলছি, ঐ মানুষটি আজ শুধু এই আদালতের কাঠগড়াতেই দাঁড়িয়ে নেই—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের কাঠগড়ায়।

চিত্তরঞ্জন একদিকে তার তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে যেমন ছিন্নভিন্ন করে দিলেন পুলিশ ও সরকারের রচিত ষড়যন্ত্রের ব্যূহ, ঠিক তেমনি তিনি প্রমাণ করলেন যে অরবিন্দ এক সর্বত্যাগী মহামানব। বিচারক অরবিন্দকে মুক্তি দিলেন কিন্তু অন্য আসামীরা সকলেই কম বেশি সাজা পেলেন।

আন্দোলনের লাভ হ'ল এই যে, চিত্তরঞ্জনের মত মানুষ এসে যুক্ত হলেন স্বদেশিক ব্রতে। মনে রাখতে হবে এই চিত্তরঞ্জনের পূতঃ স্পর্শেই গড়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের সত্তা। কিন্তু মজা এই যে এই মুক্তি লাভের পর অরবিন্দ আর বিপ্লব চিন্তায় যুক্ত থাকলেন না। তিনি গোপনে পাড়ি দিলেন পণ্ডিচেরীতে। অগ্নিযুগের ঋত্বিক অরবিন্দ হলেন—ঋষি অরবিন্দ। সে মানুষ অন্য মানুষ।

উনিশ

আত্মদানের পর্ব

সারা ভারতে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এবং দিকে দিকে গড়ে উঠছে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা—তখন ইংলণ্ডের বুকেও ভারতীয়দের স্বাদেশিক কার্যকলাপের চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর নায়ক ছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭ ১৯৩০)। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাড়িটি একদিকে যেমন ছিল সর্ব ভারতীয় ছাত্রের মিলন স্থল, ঠিক তেমনি ছিল তখনকার বিপ্লব মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের আড্ডাখানা। ১৯০৬ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকার তাঁর সহকারী হিসাবে সেখানে যোগ দেন। বিপ্লবী হরদয়াল, বি. ভি. এস. আয়ার, মাদাম কামা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই সমবেত হতেন সেখানে।

কৃষ্ণবর্মা 'দি ইণ্ডিয়ান সোসিয়ালজিস্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ পত্রিকায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা এবং ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করা হত। এখান থেকেই সাভারকার দাক্ষিণাত্যের বিপ্লবের জন্য পিস্তল পাঠিয়েছিলেন, ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া এমন কি বোমা তৈরীর বিদ্যাও এঁদের মধ্যমেই পাচার হয়েছিল।

এ কারণে 'ইণ্ডিয়া হাউস' ইংলণ্ডের শাসকদলের কাছে সন্দেহের বস্তু হয়ে উঠেছিল। তাই পার্লামেণ্টের সেক্রেটারী ফর স্টেট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়ার আর এক নতুন দপ্তর খুললেন। এদের কাজ হ'ল ইণ্ডিয়া হাউসে আসা প্রত্যেকটি ছাত্রের মতামত সংগ্রহ করা এবং গতিবিধির হদিশ রাখা। এজন্য ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক অবসর প্রাপ্ত অফিসার উইলি কার্জনের ওপর সব দায়িত্ব দেওয়া হ'ল।

উইলি দায়িত্ব পেয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন যে নিরীহতম ছাত্রটি পর্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠল। তাদের যে কোন রকম চলাফেরার এমন কি পড়াশুনার জন্য লাইব্রেরী বা অধ্যাপকের বাড়ি যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ল। গুপ্তচরের খোঁচানিতে ইংরেজ বন্ধুবান্ধব এমন কি পরিচিত জনেরাও এড়িয়ে চলতে থাকলেন ভারতীয় ছাত্রদের। সাভারকার এ অবস্থায় ভিন্নতর পরিকল্পনা করলেন।

সেই সময় পাঞ্জাব থেকে ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল এক তরুণ যুবক। দেশে রয়েছে তার স্ত্রী আর ছোট এক পুত্র। সে এসে উঠেছিল ইণ্ডিয়া হাউসেই। তার সঙ্গে কথা বলে সাভারকার বুঝে ছিলেন ছেলেটির বুকে আগুন আছে। এক সময়ে তিনি পরীক্ষা করলেন যুবককে। যুবক উত্তীর্ণ হল। সাভারকার বললেন তুমি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে মদনলাল।

মদনলাল বলল, পারব।

ভেবে দেখ! তোমার স্ত্রী পুত্র আছে।

মদনলাল বলল, কিন্তু তারও আগে থেকে আছে আমার দেশ।

খুশী হলেন সাভারকার। বললেন, তবে তোমাকেই আমি উইলি কার্জনকে হত্যা'র দায়িত্ব দিলাম।

এবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে থাকল। মদনলাল ধিংড়াকে ইণ্ডিয়া হাউস থেকে সরিয়ে আনা হ'ল। লর্ডবেরি রোডে মিস্‌রোজ

নামে এক মহিলার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে রইল সে। এতে ইণ্ডিয়া হাউসের ছেলেরা ধিংড়ার ওপর চটল—তারা ভাবল যে এটা ধিংড়ার বড়লোকী চাল—তাদের ঘৃণা করা। তারা ধিংড়ার বিরুদ্ধে বলতে থাকল। অথচ জানল না যে তাদের নিরাপদ করবার জন্যই তাকে তাদের থেকে দূরে যেতে হয়েছে।

কে জানত যে উইলি কার্জন মিস্ রোজের আত্মীয়। অতএব বাড়ির মধ্যেই উইলিকে পেল ধিংড়া। তার ঘরে এসেও গল্প করে গেল উইলি। বলল, ইণ্ডিয়া হাউস থেকে এখানে এসে ভাল করেছ। ইউরোপীয় কালচার জানতে গেলে তাদের পরিবারে থাকতে হয়। আমি দেখছি তোমার যত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, তাতে তুমি ইউরোপীয়দেরও ছাড়িয়ে যাবে।

উইলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধিংড়া ভিতরে ভিতরে ছটফট করত। ইচ্ছে হ'ত ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরে। কিন্তু নেতার নির্দেশ প্রকাশ্য স্থানে মারতে হবে যাতে সমস্ত ব্যাপারটা প্রচার হয়—নইলে জীবন নিয়ে বা দিয়ে কি লাভ! অতএব ধিংড়া নেতার নির্দেশের অপেক্ষা করে।

অবশেষে প্রতীক্ষিত সুযোগ আসে। ১৯০৯ সালের ১ জুলাই। লণ্ডনের বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের জাহাঙ্গীর হল। যেখানে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশানের বার্ষিক উৎসব। সেখানে উপস্থিত হবেন উইলি-কার্জন। সেখানেই তাকে আক্রমণ করা হবে স্থির হ'ল।

অনেক আগেই হ্যাটেন গার্ডেন পোস্ট অফিস থেকে পিস্তলের লাইসেন্স নিয়েছে ধিংড়া। লক্ষ্য ভেদের নিশানা করছে প্রায় তিন মাস। আজ নিজের পিস্তলের সঙ্গে সাভারকারের একটা পিস্তলও নিল ধিংড়া। তবু রজার্স এণ্ড সন্স থেকে কিনে নিল আর একটি বারো ইঞ্চি ছোরা। নিখুঁত সাহেবী পোষাক, জুতোয় বুঝি বা মুখ দেখা যায়।

যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হ'ল খিংড়া। আসনে বসল। সভার গান শেষ হ'ল। উঠে দাঁড়াল উইলি। মদনও উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল উইলির দিকে। পরিচিত মদনকে দেখে উইলি হেসেছিল কি! কে জানে। পরপর পাঁচটা গুলিতে মদন উইলির মুখখানা একেবারে ছিন্নভিন্ন করেছিল।

উইলির পাশে ছিল কাওয়াস-জী লালকাকা নামে এক পার্শী ভদ্রলোক। সে ছুটে এলো যুবককে ধরতে। উত্তেজিত মদন তার প্রতি প্রয়োগ করল ষষ্ঠ গুলি। ততক্ষণে হলের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেছে। কিন্তু নির্ভয় মদন পিস্তল ফেলে দিয়ে আদেশের সুরে বলল, অযথা ভয় পাবেন না। আমার কাজ শেষ। আমি আর কারো ক্ষতি করব না।

হাতে পিস্তল নেই দেখে ছুটে এলো ক'জন পুলিশ। জড়িয়ে ধরল মদনকে। মদন তাদের সরিয়ে দিয়ে বলল, ভদ্রভাবে ধরতে পারছ না। আমার কোটের ইস্তিরি নষ্ট করে দিচ্ছ কেন? দেখছ ত' আমি আত্মসমর্পণ করেছি।

ইংলণ্ডের মানুষ, যুবক মদনলালের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিতে থাকল। উইলির মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন হ'ল। শোক সভা নয় মদনলালের বিরুদ্ধে ধিক্কার-সভা। কিন্তু যে মুহূর্তে মদনলালের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উঠল, প্রতিবাদ করলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার। মদনলাল তো সাধারণ হত্যাকারী নয়, সে তো ব্যক্তিগত লাভের জন্য হত্যা করে নি, সে করেছে স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ—সে পৃথিবীর সমস্ত স্বদেশ প্রেমিকের সমগোত্রীয়—একথা সোচ্চার কণ্ঠে বলতে থাকলেন সাভারকার।

এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক মিঃ পামার অতিরিক্ত রাজভক্তিতে আর সহ্য করতে পারল না বিনায়কের বক্তব্য। সে ছুটে এসে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিল তার মাথায়। বিনায়ক রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে গেলেন। ছুটে এলো বিনায়কের বন্ধুরা। থিরুমল

আচারিয়া আর এক ঘুসিতে ধরাশায়ী করে দিল পামারকে। আর এক বন্ধু পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করতে গেল পামারকে। কিন্তু মাঝে দাঁড়িয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন বিনায়ক। উপস্থিত ইংরেজদের অসভ্য আচরণের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। গোলমালে লেন। কোন প্রস্তাবই নেওয়া গেল না সভায়।

জেলখানায় ধিংড়ার সঙ্গে দেখা করতে এলেন সাভারকার। বললেন, মদন তোমায় দর্শন করতে এসেছি। সত্যিই দর্শন—দেব দর্শন। পদধুলি নিলে পূণ্য। তবু গুরুর মুখ-চেয়ে হাসল ধিংড়া। সাভারকার বললেন, তোমার কিছু চাই ধিংড়া।

আরও হাসল মদন। বলল, না ইংরেজ সরকার বড় সদাশয়। আমার কোন অভাব রাখে নি। শুধু টাই-এর নডটা ঠিক বাঁধা হয়েছে কিনা, দেখবার জন্য একখানা আয়নার বড় অভাব।

বিচারক ফাঁসর হুকুম দিলেন। হুকুম শুনে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না ধিংড়াকে। তার জামাকাপড় জুতো থাকত সর্বদা পরিপাটি। ঐ পরিপাটি পোষাকেই ১১ই জুলাই পেণ্টনভেলি জেলের ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন ধিংড়া। মুখের ওপর কালো কাপড় দিতে দিল না সে। মৃত্যুর আগে স্ত্রী পুত্রের কথাও বলল না। শুধু বলল, তার পকেটে যে পত্র আছে তা যেন তার মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হয়।

পুলিশ সে কাগজের বক্তব্য প্রকাশ করেনি। তারা যতটা সম্ভব গোপনেই রেখেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ হয়ে গেল লণ্ডন নিউস-এ। আর তা প্রকাশ হ'ল ধিংড়ার মৃত্যুর আগেই। তাতে ধিংড়া পরাধীন জাতির হয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে।

ভীত ইংরেজের দল ধিংড়ার মৃতদেহ তার বন্ধুদের হাতে দিল না। নিজেরাই কবর দিল জেলের মধ্যে। কিন্তু একান্ত নিষ্ঠায় ভারতীয় মতে অশৌচ পালন এবং পারলৌকিক কাজ করলেন ধিংড়ারই এক

বন্ধু জ্ঞানচাঁদ। এবার ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য সাভারকার। তিনি তা অনুমান করেই পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সে। সেখান থেকে লণ্ডনের এবং ভারতের সঙ্গে রইল তার যোগাযোগ।

এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবল হয়ে উঠেছে সাভারকারের বিপ্লবীদল অভিনব-ভারত। এই দলের শাখা খোলা হয়েছিল প্রায় প্রতিটি স্কুল কলেজে। তারা এক সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটনার সংবর্তে আত্মপ্রকাশ করে বসল সংগঠন।

বিনায়ক বিদেশে, তাই এ সংগঠন পরিচালনার দায় বর্তে ছিল তার দাদা গণেশ সাভারকারের ওপর। গণেশ সাভারকার কবি। তাঁর কাব্য মারাঠীদের প্রাণে প্রাণে স্বদেশবোধের উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়। অতএব গণেশ সাভারকারকে বন্দী করা হ'ল। এবং এক-খানা কাব্যগ্রন্থ লেখার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। এ ষড়যন্ত্রের নায়ক নাসিকের কালেক্টার মিঃ জ্যাকসন বিপ্লবীদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ল।

গুপ্ত সভায়,জ্যাকসনকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন অনন্ত লক্ষ্মণ কান্হেরে।

অনন্তর জন্ম ১৮৯১ সালে ইন্দোরে। তার এক মামা শ্রীবার্ভে চাকরী করতেন আওরঙ্গবাদে। সেখানে এল অনন্ত পড়াশুনা করবার করবার জন্য। যে ঘর ভাড়া নিল, সেখানেই বসত বিপ্লবীদের গুপ্ত চক্র। সেখান থেকেই অনন্ত লক্ষ্মণ বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

এ সংস্থার অন্যতম প্রধান ছিল আইনের ছাত্র কৃষ্ণগোপাল খারে। কৃষ্ণগোপাল বাঙলাদেশ থেকে বোমার ফরমুলা আনালেন। একটা গুপ্ত কারখানা তৈরী হ'ল। বিনায়কের কাছ থেকেও এল কিছু অস্ত্র।

এ সময়ে নাসিকের পঞ্চবটী স্কুলে ছিল এক যুবক শিক্ষক বিনায়ক নারায়ণ পাণ্ডে। ইনিও বিপ্লবীদলের সদস্য। তিনজন মিলে জ্যাকসন হত্যার পরিকল্পনা স্থির করলেন।

ইতঃমধ্যে রটে গেল যে জ্যাকসন নাসিক থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। বিপ্লবীরা আরও তৎপর হলেন। একদল নাগরিক জ্যাকসনকে সংবর্দ্ধনার আয়োজন করলেন। ১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর। নাসিকের বিজয়ানন্দ থিয়েটারে জ্যাকসনের সম্মানে অভিনীত হবে সারদা নাটক। বালগন্ধর্ব নিজে সারদার ভূমিকায় অভিনয় করলেন। এই রঙ্গমঞ্চেই আর এক নাটকাভিনয়ের আয়োজন করলেন বিপ্লবীরা।

আগে থেকে সমস্ত পরিকল্পনা ছকে রাখা হ'ল। ২১শের বিকেলে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল বগি থেকে নাসিকা-এ নামলেন অনন্ত-লক্ষণ অন্য এক তৃতীয় শ্রেণীর বগি থেকে নামলেন কার্ভে আর দেশপাণ্ডে। অনন্তের কাছে আছে পিস্তল আর বিষের পুরিয়া। থিয়েটার বাড়িতে এসে সামনের সারির সবচেয়ে বেশি দামের সিটে বসলেন অনন্ত লক্ষণ। সঙ্গীরা দরজার কাছাকাছি।

নাটক শুরু হ'ল। তখনও জ্যাকসন আসেন নি। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য সবে শুরু হচ্ছে—এমন সময় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গী পরিবৃত হয়ে ঢুকল জ্যাকসন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অনন্ত লক্ষণ। ছুঁড়ল গুলি। উত্তেজনায় গুলি লাগল না। অনন্ত তখন দৌড়ে গিয়ে হতভম্ব জ্যাকসনের বুকে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে সব কটি গুলি চালিয়ে দিলেন। জ্যাকসন সেইখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

অনন্ত লক্ষণ ছুটলেন। কিন্তু তাকে চেপে ধরল কয়েকজন পুলিশ। ব্যস্ততায় অনন্ত বিষের পুরিয়াও খেতেও পারল না। তবু সান্ত্বনা অত্যাচারী জ্যাকসন নিহত। নিহত তার সরকারী দম্ভ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদের। পরদিনই ধরা পড়ে গেলেন বৈদ্য আর ডি. পি. যোশী। দেশপাণ্ডে আর সোমান তেইশে, আর কার্ভে চব্বিশে, যোশী গ্রেপ্তার হলেন ত্রিশে ডিসেম্বর।

নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হ'ল। অনন্ত-লক্ষণ

কান্‌হেরে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে এবং বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হ'ল। শঙ্কর, রামচন্দ্র সোমান, ওয়ামান্ নারায়ণ যোশী এবং গণেশ বি. বৈছর হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আর দত্তাত্রেয় পাণ্ডুরান যোশীর হ'ল দু'বছরের জেল।

পুলিশ কি করে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা যায় তার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকল।

এ সময়ে তিরুভেল্লী জেলাতেও বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সাব-কালেক্টার মিঃ এস. ডব্লু. অ্যাশের বিরুদ্ধে। এ অঞ্চল স্বামী-বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ ছিল। তারপর বিপ্লবী ভূপেন দত্তের সংগঠনে আর বিপিন পালের বক্তৃতায় গড়ে উঠেছে গুপ্ত বিপ্লবী দল। দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট নেতা তখন সুব্রহ্মণ্য ভারতী, চিদাম্বরম্ পিল্লেই, সুব্রহ্মণ্য শিব, নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, হরিহর শর্মা ইত্যাদি। ইংরেজ নিপীড়নে আত্মরক্ষা করতে সুব্রহ্মণ্য ভারতী পালিয়ে গেছেন ফরাসী-পণ্ডিচেরীতে। সেখান থেকে তিনি 'দি ইণ্ডিয়া' নামে পত্রিকা পরিচালনা করছেন। পত্রিকাটি উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়াচ্ছে।

এই পত্রিকায় কাজ করতেন এন. নাগস্বামী নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন সাভারকারের বন্ধু ভি. ভি. এস. আয়ারের শিষ্য। ১৯১০ সালে তার কাছে শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার নিয়ে এলেন এক যুবককে। নাগস্বামী পরীক্ষা করলেন যুবককে।

এই যুবকর নাম সেনকোট্টা ওয়াঞ্চি আয়ার। নাম থেকেই বোঝা যায় কন্যাকুমারিকার কাছে সেনকোট্টি গ্রামে তার জন্ম। ত্রিবাঙ্কুরের বনবিভাগে হিসাব রক্ষকের কাজ করত ওয়াঞ্চি। বিয়ে করেছিল। সংসার-বদ্ধ জীব। তার কানে কি করে বিপ্লবের মন্ত্র ঢুকল কে জানে! শঙ্করকৃষ্ণ তার আত্মীয় ছিলেন। তার মারফৎও এ কাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু তা ঘটলেও দেখা গেল উদ্দীপনায় এবং আগ্রহে নিরীহ ওয়াঞ্চি দক্ষকর্মী এবং সংগঠক

শঙ্করকে ছাড়িয়ে গেলেন। নাগস্বামী বললেন, ওয়াঞ্চি পারবে শঙ্কর। তাকে আমি প্রস্তুত করব।

সত্যিই তাই করলেন নাগস্বামী। কয়েক মাসের মধ্যেই অব্যর্থ টিপ হ'ল ওয়াঞ্চির। কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হয় না সে, বা প্রবল উত্তেজনাতেও হাত এতটুকু কাঁপে না ওয়াঞ্চির। গুরু আশীর্বাদ করলেন। সাভারকারের আমদানী করা রিভালভার নিয়ে যাত্রা করলেন ওয়াঞ্চি।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় কয়েক বছর কেটে গেল। অ্যাশের তাণ্ডবে ঘুম নেই বিপ্লবীদের। বিপ্লবী'দর নাম করে নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচারেরও সীমা নেই। থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া তার সাধারণ কাজ। একটু সচেতন গ্রামে মিলিটারী লেলিয়ে দিয়েছেন অ্যাশ। এবার আর নয়—ওয়াঞ্চি পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন।

নিশ্চিন্ত সংবাদ তিরুভেল্লির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশ ১৭ই জুন যাচ্ছেন কেদারকানাল। সঙ্গে তার স্ত্রী থাকবেন। থাকবে প্রচুর পুলিশ পাহারা। অবসর কাটাতে যাচ্ছেন অ্যাশ। রাজকর্তব্য করে বড়ই ক্লান্ত! কয়েকদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কাটিয়ে আসবেন। তারপর পূর্ণ উদ্যমে আবার শুরু করবেন রাজকার্য। ওয়াঞ্চি স্থির করলেন অ্যাশকে আর কাজে যোগ দিতে দেবেন না। তিনি ঐ ট্রেনে অনুসরণ শুরু করলেন অ্যাশকে।

স্টেশন মানিয়াচি। গাড়ি থেমেছে। থেমে থাকবেও কিছুক্ষণ। লোক উঠছে নামছে। ব্যাস্ততার শেষ নেই। এমন সময় নেহাৎ গোবেচারা রাজভক্ত কেরাণীর মত একজন সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাশ সাহেব কে সিপাহিজী?

সিপাহী কিছুর বলার আগেই জানলা দিয়ে মুখ বের করলেন অ্যাশ। নিরীহ কেরানী সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তুলে রাজভক্তির নিদর্শন রাখল। অ্যাশ পড়ে গেলেন গাড়ির ভিতরে। কেরানীটি

উঁকি দিল। স্বামীর পাশে বসে মেম সাহেব ধাক্কা দিচ্ছেন তাকে। গুলি একেবারে কপাল ভেদ করে চলে গেছে। কেরানীটি নিশ্চিন্ত হলেন—তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার ছুটলেন তিনি।

কিন্তু ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের অনেকে ছোটা শুরু করেছেন তার পিছনে। তারা জানেও না যে যার পিছনে তারা ছুটছে, সে তাদেরই এক রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাতে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের ও কথা জানাবে কে? জানাবার সময় কোথায়? ছুটতে ছুটতে লোকটা ঢুকে পড়ল এক শৌচাগারে। তারপর শোনা গেল গুলির শব্দ।

পুলিশ এসে যখন শৌচাগার খুলল, তখন তার রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে নোংরার মধ্যে। অজ্ঞাত পরিচয় এ কেরানীকে সহজে সনাক্ত করান গেল না। শুধু তার পকেটে পাওয়া গেল লাল কালিতে লেখা কিছু কাগজ—ইংরেজ দস্যুকে যেখানে পাও হত্যা কর। দেশকে মুক্ত কর। কিন্তু দীর্ঘ-কাল এ যুবকের নাম জানল না কেউ।

পুলিশ এ ক্ষেত্রেও সাভারকারকে সন্দেহ করে রাখল। কিন্তু সাভারকার ফরাসী দেশে। ইংরেজদের আয়ত্তের বাইরে।

কিন্তু এমন সময় অন্ধ আবেগে ভুল করে বসলেন সাভারকার। কে যেন তাকে বলে বসলেন, সকলকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেকে নিরাপদে রক্ষা করতে লজ্জা করে না, সাভারকার।

উত্তপ্ত মাথায় কোন পরিকল্পনা ছাড়াই লণ্ডনের দিকে রওনা হলেন তিনি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসেই বন্দী হলেন।

আমরা আগেই বলেছি উপযুক্ত প্রমাণ থাক বা না থাক ভারতে অনেকগুলি মামলাতেই সাভারকারের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব ইংরেজ সরকার তাকে ভারতে পাঠাবার আয়োজন করলেন। মুরিয়া নামে এক জাহাজে তোলা হ'ল তাকে। বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা হ'ল। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থা

হ'ল। এমন কি সাভারকার পায়খানায় গেলেও নজর রাখবার জন্য বিশেষ কাঁচের জানালা ব্যবহার করা হ'ত। আপত্তি জানিয়ে সাভারকার তার ওপর তোয়ালে চাপা দিতে থাকলেন।

এই সুযোগটুকু নিয়েই জাহাজ থেকে পালাবার আয়োজন করলেন সাভারকার। জাহাজ তখন মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি এসেছে। সাভারকার পায়খানায় ঢুকে জানালা তোয়ালে দিয়ে চাপা দিয়েই ম্যানহোল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। তারপর প্রাণপণে সাঁতরে ডাঙ্গার দিকে চললেন। কিন্তু ততক্ষণে প্রহরীরা টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু নিরাপদে ডাঙ্গায় পৌঁছে গেলেন সাভারকার।

কিন্তু তাতেও বিপদ কাটল না। ঠিক এখানেই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবার কথা সরোজিনী নাইডুর ভাই বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং মাদাম কামার। কিন্তু কোথায় তারা! [পরে জানা যায় পথে গাড়ি খারাপ হওয়ায় তারা সময় মত আসতে পাবেন নি] ওদিকে ইংরেজ পুলিশও তেড়ে আসছে। সাভারকার দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন এক ফরাসী পুলিশকে। বললেন, আমাকে থানায় নিয়ে চল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে লোকটা বিন্দুমাত্র ইংরেজী বোঝে না। সাভারকরও ফরাসী জানেন না। ইতঃমধ্যে ইংরেজ পুলিশ এসে পৌঁছেছে। তারা চেপে ধরল সাভারকারকে। ফরাসী পুলিশকে তারা কি সব বোঝাল। ঐ অর্ধ-উলঙ্গ দুর্বোধ্য ভাষাভাষী লোকটার চেয়ে ইংরেজ পুলিশকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল পুলিশটির। সে সাভারকারকে ইংরেজ পুলিশের হাতে ছেড়ে দিল।

ব্যাপারটা দূর থেকে দেখেছিলেন বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং মাদাম কামা। তাঁরা ফরাসী লোকজন যোগাড় করে এনে প্রতিবাদও তুললেন। কিন্তু ততক্ষণে, সাভারকারকে জাহাজে তোলা হয়ে গেছে। ছেড়ে দিয়েছে জাহাজ। ফরাসী নাগরিকেরা আন্তর্জাতিক

আদালতে মামলা আনলেন। আইন অনুসারে ইংরেজ পুলিশ অন্যায় করেছে এটা বোঝা গেলেও ভারতীয় উপনিবেশের এক সামান্য কয়েদী নিয়ে কোন রাষ্ট্রই তেমন মাথা ঘামাল না। অতএব ইংরেজ সরকার সভারকারকে নির্বিঘ্নে ভারতে নিয়ে এলো। দুটি মামলায় সাভারকারকে দু'দুবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

শুনে হেসে সাভারকার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জীবন ত' একটা। দু-দুবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করব কি করে!

রসিক সার্জেন বলল, তুমি যেমন বজ্জাত কয়েদী, তোমাকে মরবার পর ফিরে এসে পর জন্মেও সাজা ভোগ করতে হবে।

হো হো করে হেসে সাভারকার বললেন; বোধ হয় তোমাদের বিচারক বা তুমি খ্রীষ্টান নও। অথবা তোমরা আমার জন্যই পর জন্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।

সার্জেন শুধরে নিয়ে বলল, পরজন্মে কি হবে সেটা পরে ভেব! যাবজ্জীবন বলতে পঁচিশ বছর কারাদণ্ড বোঝায়। তোমাকে পঞ্চাশ বছর জেলে থাকতে হবে।

সাভারকার আবার হাসলেন। বললেন, তোমরা কি ভাবছ যে আরও পঞ্চাশ বছর তোমরা আমাদের দেশ শাসন করতে পারবে।

সাভারকারের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে। তারপর পঞ্চাশ বছর ইংরেজ রাজত্ব টেঁকে নি। সাভারকার জেলে গিয়েছিলেন ১৯১১ সালে। এর ছত্রিশ বছর পরেই দেশ স্বাধীন হয়ে ছিল। সাভারকারের আত্মদান বিফল হয়নি মোটেই।

কুড়ি

বিপ্লবের স্বপ্ন

আগের অধ্যায়ে আমরা দাক্ষিণাত্যে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠার গল্প বলেছি। এ কালে এমন শত শত গল্প ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। ওয়াঞ্চি আয়ার, অনন্তলক্ষণের মত শত শত প্রাণ সেদিন অহুতি দিয়েছে স্বদেশের জন্য।

এ কথা থেকে মনে করবার কারণ নেই যে দেশের যুবকের বুঝি গুপ্ত সমিতি গড়ে অত্যাচারী ইংরেজদেরই হত্যা করছিল আর সারা দেশ ছিল শান্ত। না। তা নয়। দক্ষিণাত্যের গুপ্ত সমিতির কথা আমরা আগেই বলেছি। ওখানকার প্রকাশ্য আন্দোলনের কথা বললে সকলের ধারণা স্পষ্ট হবে।

মাদ্রাজের নেতা ছিলেন বিপিন পালের ভাবশিষ্য চিদাম্বরম পেল্লাই। তাঁরা বিপিন পালের ভাষা অনুকরণ করে কালীমায়ের পূজায় শ্বেত-পাঁঠা বলি দেবার আহবান জানান। সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৮ সালের ১২ই মার্চ তাদের বন্দী করা হয়। প্রিয় নেতারা বন্দী হলে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, মুনসেফের কাচারী, পুলিশ ব্যারাক, থানা, সরকারী দপ্তরখানা আক্রমণ করা হয়। কোথাও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে সৈন্যদল

নামিয়ে শান্ত করতে হয় মাদ্রাজকে। তিন বছর পর এরই প্রতিক্রিয়ায় ওয়াঞ্চি, হত্যা করে অ্যাশকে। ওয়াঞ্চি অ্যাশ-এর বুকে যে চিঠিটা এঁটে দিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল আরও মারাত্মক তাতে লিখা ছিল,

> 'প্রত্যেক ভারতবাসীই এইভাবে ইংরেজদের হত্যা করে
> ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট
> হয়ে উঠেছে।...তিন হাজার মাদ্রাজী শপথ গ্রহণ
> করেছে যে, যে মুহূর্তে পঞ্চম জর্জ এই পবিত্র
> দেশে পা দেবেন—সেই মুহূর্তেই তারা পঞ্চম জর্জকে
> হত্যা করবে। অ্যাশ-হত্যা তার পূর্বাভাস মাত্র।'

মধ্য প্রদেশের পত্রিকাগুলি ক্ষুদিরামের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সরকার এ সব পত্রিকা সৈন্যদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করে দেন। তবু নাগপুরের 'দেশ-সেবক' পত্রিকা লিখল, 'এখন ভারতের প্রত্যেক যুবকের উচিত ক্ষুদিরামের মত বোমা তৈরী এবং ব্যবহার করতে শেখা'। ১৬ মে (১৯০৮) তারিখের হিন্দী 'কেশরী' লিখল যে, 'আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তারা নাকি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ইংরেজরা কি ভারতের সম্রাট! 'চোর ডাকাতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কি ষড়যন্ত্র!'

নাগপুরের ছাত্রেরা একদিন দিনের বেলাতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি ভেঙ্গে তাতে আলকাতরা লেপে দিয়ে গেল। বিহার-উড়িষ্যা তখন প্রধানত বাঙালী-বিপ্লবীদের ক্রীড়াক্ষেত্র। পাঞ্জাব বাইরে শান্ত থাকলেও তার বুকে লেগেছিল বিপ্লবের স্বপ্ন। এ সমস্ত গুপ্ত দলকে একত্রিত করতে হাল ধরেছিলেন রাসবিহারী বসু।

মানিকতলা বোমার মামলায় আসামী হিসাসী গ্রেপ্তার হন রাসবিহারী। কিন্তু প্রমাণ অভাবে তিনি ছাড়া পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যান দেরাদুনে। সেখানে ফরেস্ট রিসার্চ

ইন্সটিটিউটের হেড ক্লার্কের চাকরি পান। সেখান থেকে তিনি গোটা উত্তর ভারতে বিপ্লবী-সংস্থা গড়তে থাকেন।

এই সময় ব্রিটিশ সরকার কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে বাতিল করে বাঙলাকে এক করে দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যান। সরকার ভেবেছিলেন এ সময়ে বাঙলা এক করে দিলে বাঙালীরা শান্ত হবে—আবার দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে বাঙালী বিপ্লবীদের কাছ থেকেও রাজধানী রক্ষা করা যাবে।

এ সংবাদ শুনে রাসবিহারী ইংরেজের দম্ভে আঘাত হানবার পরিকল্পনা করলেন। শুধু যে বাঙালীরাই বিপ্লবী নয়—গোটা ভারতই যে বিপ্লব মন্ত্রে জেগে উঠেছে এটা প্রমাণ করতে চাইলেন রাসবিহারী।

অবশ্য এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবার অন্য কারণও ছিল। রাসবিহারী নিয়মিত ক্লাস নিয়ে তার কিছু শিষ্যকে যেমন বোমা-পিস্তল চালানতে দক্ষ করে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন স্বদেশপ্রেমে। তারা কাজের জন্য ছটফট করেছিলেন। অতএব রাসবিহারী এক বিচিত্র পরিকল্পনা করলেন।

তখন বড়লাট ছিলেন হার্ডিঞ্জ। তিনি রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে জাঁক জমকের সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণের উৎসব পরিকল্পনা করলেন। যেন কোন মহারাজের অভিষেক। রাসবিহারী ঐ দিনেই হার্ডিঞ্জকে হত্যা করে দেখিয়ে দিতে চাইলেন যে ভারতের সম্রাটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তাকে ভারতীয়রা ক্ষমা করে না।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আগ্রা থেকে মিছিল বের হ'ল রাজকীয় সমারোহে। প্রথমে খোলা তলোয়ার হাতে অশ্বারোহীর দল। তারপর কামানের গাড়ি। তার পিছনে পদাতিক সৈনিক। মাঝে একসার হাতি। তার ভেতর মাঝের বড় হাতিটিতে বসে

আছেন সস্ত্রীক হার্ডিঞ্জ। কাতারে কাতারে লোক রাস্তার হু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই মিছিল।

মিছিল এসে পৌঁছাল চাঁদনি চকের কাছে। সেখানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ছাদে মেয়েদের ভীড়। তার সামনা সামনি আসতেই হঠাৎ কোথা থেকে এক বোমা এসে পড়ল হার্ডিঞ্জের রূপোর হাওদার ওপর। বোমাটি ছিল পিন্ বম্ জাতীয়। ভিতর থেকে ছররা ছিটকে হার্ডিঞ্জের পিঠের হাড় চামড়া ছিঁড়ে গেল। পিছনে যে প্রহরী ছাতা ধরেছিল তাঁর হ'ল মৃত্যু। পুলিশ উপস্থিত জনতাকে পেটাল। কিন্তু কোথা থেকে যে কি ঘটল তা তারা ভাবতেও পারল না। ব্যাঙ্কের ছাদের মেয়েদের মধ্য থেকে একজন বিপ্লবী যে মেয়ে সেজে বোমা ছুঁড়তে পারে এবং মেয়ে সেজেই তাদের সামনে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে নিরাপদে, এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারল না।

এতবড় আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়েও কাউকে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল না দেখে বিপ্লবীদের শুধু মনোবল বাড়ল না, নেতার ওপর আস্থাও বেড়ে গেল। রাসবিহারী এক সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা করতে থাকলেন।

এমন সময় সংবাদ এল যে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে লাহোরে লয়েন্স গার্ডেনে ইংরেজ রাজপুরুষদের এক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক সঙ্গে বহু রাজপুরুষ মেরে হার্ডিঞ্জের রক্ষা পাওয়ার শোধ নিতে চাইলেন রাসবিহারী।

হার্ডিঞ্জকে বোমা নিক্ষেপকারী তরুণ বসন্ত বিশ্বাস এবারেও কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করল। সে কৌশলে সেখানে গিয়ে উপযুক্ত জায়গায় কিছু আবর্জনার মধ্যে বোমা বসিয়ে রেখে এল। এমনই দুর্ভাগ্য যে অনুষ্ঠানের আগে হঠাৎ সেই জঞ্জাল নজরে পড়ায় এক ধাঙ্গড় গেল সেই স্তূপ সরাতে। তার ঠেলাতেই হোক আর আঘাতেই হোক বোমাটা ফেটে যায়। লোকটি প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দেয় সাহেবদের।

এমন সময় লাহোরে বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করছিল দীননাথ নামে এক উত্তরপ্রদেশী যুবক। সে অনেক দিন ধরে বিপ্লব কর্মে যুক্ত। তবু ধরা পড়ার আকস্মিক বিভীষিকায় সে এক স্বীকারোক্তি দিয়ে বসে। এর ফলে এক রাতে পুলিশ উত্তর প্রদেশ ছেঁকে প্রায় সমস্ত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে ফেলে পুলিশ। ধরা পড়েন বিপ্লবী আমীর চাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ—এমন কি বাঙলাদেশ থেকে বসন্ত বিশ্বাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

রাসবিহারীকে ধরবার জন্য পুলিশ পাঞ্জাব এবং দিল্লী একেবারে তোলপাড় করে ফেলে। তাকে পলাতক আসামী বলে ঘোষণা করা হয় এবং তাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিলে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য বারবার নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসবিহারীকে ঘিরে ফেললেও কোনবারই ধরতে পারল না তাঁকে। শোনা যায় একবার ধাঙ্গড় সেজে মলের ভাঁড় মাথায় নিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান রাসবিহারী। পুলিশ নাকে কাপড় চেপে তাকে পথ করে দেয়। তাড়াতাড়ি পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলে তাকে।

বন্দীদের নিয়ে শুরু হয় দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। দীননাথের স্বীকারোক্তি পুলিশের খুব কাজে লাগে। এদের সকলের ফাঁসির হুকুম হয়। অল্প বয়স বলে প্রথমে বিচারক বসন্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন অনুমান করা গেল যে সেই মেয়ে সেজে বোমা ছুঁড়ে থাকতে পারে, তখন তাকেও ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

গল্প প্রচলিত আছে যে ফাঁসির আগে অবোধবিহারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমার কোন শেষ ইচ্ছা আছে?

অবোধবিহারী বললেন, আছে।

: কি?

: ইচ্ছে ইংরেজ শাসন একেবারে শেষ করে দিয়ে যাই।

বালমুকুন্দর কাহিনীর শেষ অংশ বড় করুণ। এদের মধ্যে একমাত্র সেই বিয়ে করেছিল। সরল গ্রাম্য মেয়ে রামরাখী প্রাণ দিয়ে ভালবাসত স্বামীকে। প্রথম দিন জেলে দেখা করতে এসে নির্নিমিখ নয়নে তাকিয়ে ছিল স্বামীর মুখের দিকে। বড় রোগা দেখাচ্ছে যে। খাওয়া শোয়া ঠিক মতো হয়তো!

রামরাখী জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিসে শোও।

বালমুকুন্দ বলল, দুটি কম্বল আমার শয্যা। একটি পাতি। একটি গায়ে দি।

আর খাওয়া!

বালমুকুন্দ হাসল। বলল, খাই দুখানা রুটি।

রামরাখী ফিরে এসে ঘোষণা করল, সেও দুখানা কম্বলে শোবে। দিনে রাতে দুখানার বেশি রুটি খাবে না।

ফাঁসির দিনে খাবার সামনে নিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল রামরাখীর আজ থেকে তার স্বামী আর খাবে না। সেও খাওয়া ছেড়ে দিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রামরাখীও ইহলোক ছেড়ে গেল।

রামরাখী থাক। থাক বালমুকুন্দ। বসন্ত বিশ্বাস অবোধবিহারী বা আমীর চাঁদের মত এক একখানা পাঁজরের হাড় খসে যাক বিপ্লবীর বুক থেকে। কিন্তু রাসবিহারীকে থামলে চলবে না। অতএব রাসবিহারী ১৯১৪-র ফেব্রুয়ারীতে কাশীতে পালিয়ে এসে আবার সংগঠনের আয়োজন করতে থাকলেন। তাকে আশ্রয় দিলেন শচীন সান্যাল। শচীন্দ্রনাথের আহ্বানে যুক্ত প্রদেশের সব কর্মী এসে রাসবিহারীর কাছ থেকে অস্ত্র এবং পন্থার দীক্ষা নিতে থাকলেন।

এমন সময় জার্মানীর সঙ্গে গদর পার্টির যোগাযোগের সংবাদ নিয়ে বিষ্ণুগণেশ পিংলে এলেন রাসবিহারীর কাছে কাশীতে। পিংলে রাসবিহারীকে পাঞ্জাবে গিয়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দায়িত্ব নিতে বলেন। রাসবিহারী নানা দিক বিবেচনা করে পাঞ্জাবে যাওয়া

মনস্থ করেন। শচীন্দ্রনাথ এবং পিংলে পাঞ্জাবে গিয়ে রাসবিহারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্থির করে এলেন।

এদিকে রাসবিহারী এতদিন যাদের দীক্ষা দিয়েছেন তাদের প্রাণ দিয়ে দেশের মুক্তির সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন। বিপ্লব আসন্ন। মৃত্যুও আসন্ন। শেষ নির্দেশের জন্য সকলে যেন উন্মুখ থাকে। তিনি স্বরূপ দামোদর নামে এক বিপ্লবীর উপর এই সব বিপ্লবীর দায়িত্ব দেন। তাকে এলাহাবাদে কেন্দ্র করে কাজ চালাতে বলা হয়।

এবার রাসবিহারীর পরিকল্পনা ব্যাপক। তিনি চাইলেন একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে সেই শক্তিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে, অন্যদিকে বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে একযোগে আঘাত হানতে। অস্ত্র আনবার আয়োজন সত্যেন সেন আর বিষ্ণুগণেশ পিংলে করে এসেছেন!

যতক্ষণ বিদেশী অস্ত্র না আসে ততক্ষণ কিছু দেশী অস্ত্র কাছে রাখবার জন্য কলকাতা থেকে বোমা আনবার ব্যবস্থা করলেন রাসবিহারী। কাশী থেকে সেই বোমা লাহোরে নিয়ে গেলেন বিনায়ক রাও কপিল।

এদিকে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে বিদ্রোহ ঘটাবার দায় পেলেন বিভূতি আর প্রিয়নাথ। জব্বলপুরে সৈন্যদের উত্তপ্ত করতে থাকলেন নলিনী মুখোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ নিজে কাশী ক্যাণ্টনমেণ্টের দায়িত্ব নিলেন।

সমগ্র ভারতে বিপ্লবের জন্য তারিখ স্থির হ'ল ২১শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে এই সংবাদ পৌঁছে গেল পুলিশের কাছে। বোঝা গেল দলের মধ্যে পুলিশের লোক আছে। তাড়াতাড়ি করে তারিখ এগুনো হ'ল। কিন্তু সে তারিখও জেনে ফেলল পুলিশ। শুরু হ'ল ব্যাপক ধর পাকড়। ধরা পড়লেন প্রায় সকলেই। মীরাটে সৈন্য ব্যারাকের কাছে বোমার বাক্স নিয়ে ধরা পড়লেন পিংলে। বিচারে এঁদের ফাঁসির হুকুম হ'ল।

এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যারা রাজসাক্ষী হয়েছিল বা গুপ্তচর বৃত্তি করে ছিল বিপ্লবীরা একে একে তাদের শাস্তি দেয়। এর ভেতর রাজসাক্ষী ফণী ঘোষকে কুকরি দিয়ে কুপিয়ে শেষ করে ১৯৩৪-এর ১৪ মে ফাঁসি বরণ করে বৈকুণ্ঠ সুকুল।

কিন্তু রাসবিহারী! এ সময় রবীন্দ্রনাথ যাবেন জাপানে। কয়েক দিন আগে তার সেক্রেটারী পি. এন. ঠাকুর এসে পাসপোর্ট চাইলেন। তিনি আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করবেন কবির জন্য। সরকার শশব্যস্ত হয়ে বিশ্বকবির সেক্রেটারীকে পাসপোর্ট দিয়ে দিল। তারা অনুমানও করতে পারল না যে, তাদের ছাপ দেওয়া ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন রাসবিহারী।

না। পালালেন না রাসবিহারী। বিদেশে গিয়ে আত্মসুখেও নিমগ্ন হলেন না। আজীবন স্বাধীনতার স্বপ্নে মশগুল রাসবিহারী বিদেশে ভারত চিন্তার ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনিই গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ সরকার। সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী পদে বরণ করে তবে তাঁর মুক্তি।

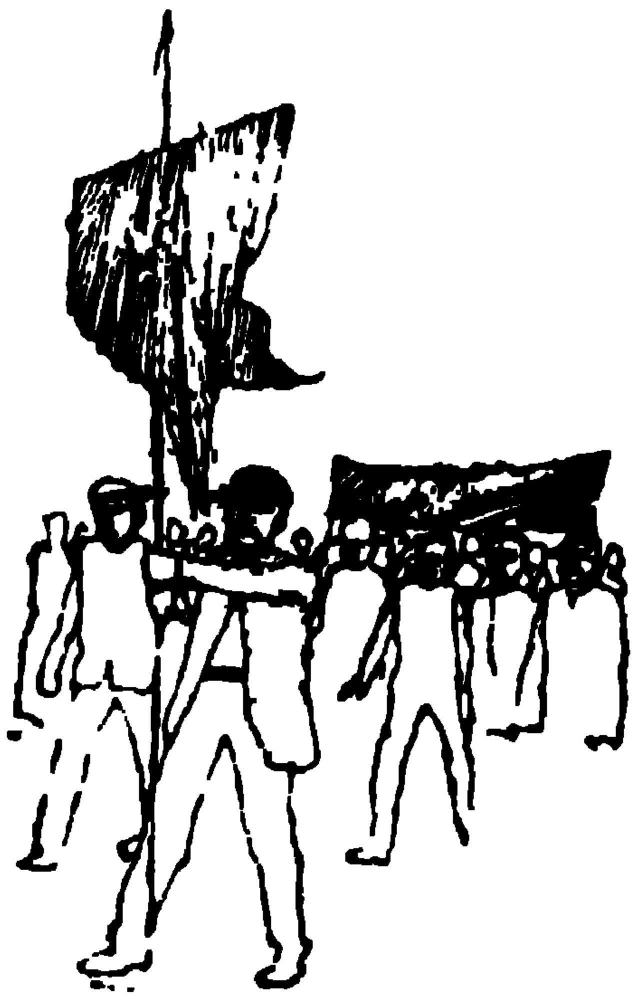

একুশ

রক্তাক্ত বুড়িবালাম

অরবিন্দ ঋষি হয়েছেন। রাসবিহারী নেই। ভারবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের একত্রিত করে পরিচালিত করবার শক্তি কার? সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বাঘাযতীন বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথ প্রথমেই বিছিন্ন বিপ্লবী দলগুলির সাধারণ বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন। প্রত্যেক দলের নিজস্ব সংগঠন তার রইল। কিন্তু মিলিত কাজে তারা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেবেন বলে স্থির করলেন।

১৮৭৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর (বাঙলা ১২৮৬ সালের ২১শে অগ্রাণ) নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বাবা উমেশচন্দ্র তাঁর পাঁচ বছর বয়সে মারা যান। মা শরৎশশী শক্ত হাতে বড় করে তুলতে থাকেন ছেলেকে।

কোমরে দড়ি বেঁধে গড়াই নদীর স্রোতের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতেন ছেলেকে। যতি প্রাণের দায়ে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে নদীকে বশ করতে শিখল। মামাবাড়িতে ছিল এক আক্রিদি

ওস্তাদ। ফেরাজের কাছে কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তলোয়ার চালনা, ঘোড়ায় চড়া শিখল ছেলেটি। আফ্রিদি ওস্তাদ নিজের দেশের গল্প বলে বলে ছেলেটির মনে জাগিয়ে তুলল স্বাধীনতার স্পৃহা।

একবার বাঘ বেরিয়েছে গ্রামে। শিকারী এসে তাড়া করছে তাকে। আহত বাঘ ছুটে আসছে গ্রামের ভেতর। গ্রামে ঢুকলে কতজনকে মারবে, কতজন আহত হবে কে জানে। সামান্য একখানা দা হাতে লাফিয়ে পড়ল যতি। চেপে ধরল বাঘের কণ্ঠনালী। কোপের পর কোপ চালাতে থাকল। বাঘও ছেড়ে কথা কইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতে হল বাঘকেই। যতীনকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে তুললেন ডাক্তাররা। সেই থেকে যতীনের নাম হল বাঘা যতীন। এটা ১৯০৬ সালের কথা।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন কলেজে পড়তে। কলকাতায় তখন মহামারী চলছে। যতীন দুর্গতের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ছেলেটির শিক্ষা, সহবৎ ও নির্ভীক আচরণ ভগিনী নিবেদিতার নজর এড়াল না। তিনি যতীনকে নিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ তাঁর মনে নূতন আলো জ্বেলে দিল।

যতীন এক সওদাগরী অফিসে চাকরি পেলেন। চাকরির বেশীর ভাগ টাকা চলে যায় নানা সমিতির পিছনে। সমিতিগুলি দেশ সেবার জন্য তৈরী করছে দেশের তরুণ আর কিশোরদের। চাকরিজীবনে ক্রমেই উন্নতি হতে থাকে যতীন্দ্রনাথের। ক্রমে তিনি হন ইংরেজ সরকারের দুই সেক্রেটারী হুইলার আর ওমালী সাহেবের স্টেনো। সাহেবরা ভাবতেও পারেন নি কতবড় বিপ্লবীকে তাঁরা ঘরের ভিতর পুষছেন।

১৯০৩ সালে যতীনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগ ঘটল। স্ত্রী ইন্দুবালা, কন্যা আশালতা আর দুই ছেলে তেজেন আর বীরেনকে ভবিষ্যতের হাতে ফেলে যতীন দেশের কাজে মেতে উঠলেন।

এমন সময় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বোমা ফাটাল মজঃফরপুরে। এরই জের টেনে কলকাতার মাণিকতলায় এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল পুলিশ। বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ, গ্রেপ্তার হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। নরেন গোঁসাই ওঁদের গোপন কথা পুলিশের কাছে বলে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। বিপ্লবীরা আরও বিপদে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের বাঁচাবার দায়িত্ব নিলেন সত্যেন বসু আর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কানাইলাল দত্ত। ওঁরা দুজন গোপনে পিস্তল আনিয়ে জেলের ভিতরেই হত্যা করলেন নরেন গোঁসাইকে। ওঁদের দু'জনকেই ফাঁসি বরণ করতে হ'ল কিন্তু আলিপুর বোমার মামলা অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে গেল। বাকি-টুকুও নাড়িয়ে দিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। ফলে অরবিন্দ ছাড়া পেলেন, ছাড়া পেলেন আরও অনেকে। ফাঁসি হল না কারো। কয়েকজন শুধু দ্বীপান্তরের সাজা পেলেন।

ইতঃমধ্যে বোমার মামলার বিচার শেষ হয়েছে। বহুজনের ফাঁসি, দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই দমে গেছেন। স্বয়ং অরবিন্দ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন পণ্ডিচেরীতে। এই অসহায় অবস্থায় বাংলাদেশের বিপ্লবের দায়িত্ব নিলেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর নির্দেশে আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আর পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট সামশুল আলমকে কোর্টের মধ্যেই হত্যা করা হ'ল। যতীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন বাঙলার বিপ্লবীরা দমে নি আর ইংরেজদের যারা সাহায্য করবে, তাদেরও ক্ষমা নেই।

এখানেই থামলেন না তিনি। সারা ভারতের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকলেন। বিদেশে দূত পাঠালেন অস্ত্র আর অর্থ চেয়ে। তাঁর ইচ্ছা হ'ল গোটা দেশ জুড়ে এমন বিপ্লব গড়ে তোলা, যাতে ইংরেজরা আমাদের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়—দেশ হয় স্বাধীন।

এমন সময় ১৯১৪ সালে শুরু হ'ল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিপন্ন হল। শত্রুরও অভাব নেই। সেই সমস্ত রাষ্ট্রকে ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করতে রাজী করান যায় না কি? তখন নানা স্থানে রয়েছেন নানা পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী। প্রবাসী ভারতীয়েরাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কম আগ্রহী নন। বিশেষতঃ রাসবিহারী নিজে রয়েছেন বাইরে। যতীন্দ্রনাথ দূত পাঠালেন।

জার্মানী রাজী। শর্ত নিয়ে কথা বার্তা চলল। অবশেষে স্থির হ'ল জার্মান-সরকার অস্ত্র, অর্থ এবং যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন। এসব হবে জার্মান সরকারের কাছে স্বাধীন ভারতের ঋণ। দেশ স্বাধীন হ'লে ভারত তার সব ঋণ শোধ করবেন। ভারতবর্ষে এর পরিবর্তে কোন জার্মান সৈন্য আসতে পারবে না। জার্মান অন্য কোন দাবীও করতে পারবে না।

এই শর্ত মেনেই জার্মানী ভারতে অস্ত্র পাঠাবে বলে স্থির হ'ল। কিন্তু জার্মান অস্ত্র ও অর্থ আসবার আগের প্রস্তুতি ব্যয় কিসে চলবে? যতীন্দ্রনাথ স্থির করলেন এজন্য ডাকাতি ছাড়া পথ নেই। কিন্তু তার জন্যও যে অস্ত্র দরকার।

তখন কলকাতায় অস্ত্র-শস্ত্রের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী রডা কোম্পানী। সংবাদ পাওয়া গেল তাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র চালান আসছে বিদেশ থেকে। তার ভেতর 'মশার' নামে এক উন্নত ধরণের পিস্তল আসছে। এই পিস্তলের মস্ত সুবিধা এই যে এতে একটা বাড়তি নল লাগাবার ব্যবস্থা আছে। নলটি জুড়ে নিলে পিস্তলটি রাইফেলের মত ব্যবহার করা যায়। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামে এক কর্মচারী কাস্টমস্ অফিস থেকে মাল খালাস করে আসবার পথে পঞ্চাশ বাক্স কার্তুজ এবং পঞ্চাশটি মশার পিস্তল পাচার করে দেন। পুলিশ শ্রীশচন্দ্র বা পিস্তলগুলির কোন হদিশই করতে পারল না।

যতীন্দ্রনাথ এই সম্পদ সমস্ত বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ভাগ করে দেন। কয়েকটি ডাকাতি করে প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ হয়ে যায়। পুরো দমে প্রস্তুতি চলতে থাকে। পুলিশ তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে যতীন্দ্রনাথকে। কিন্তু পুলিশের চরেরা কোথাও থেকেই তার কোন সন্ধান আনতে পারছে না। বরং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে পুলিশ অফিসারদের এক মিটিং-এর ওপর গুলি চালিয়ে প্রচুর হতাহত করে এলো যতীন্দ্রনাথের দল। ১৯১৫ সালে ২৪শে ফেক্রয়ারী নীরদ হালদার নামে এক গুপ্তচর যতীন্দ্রনাথের সংবাদ নিতে গিয়ে নিহত হল পাথুরেঘাটায়। পুলিশ হন্যে হয়ে উঠল যতীন্দ্রনাথের জন্য। কিন্তু দেশকে স্বাধীন না করে তো যতীন্দ্রনাথ মরতে পারেন না।

এদিকে ঐ বছরেরই ১২ই ফেব্রুয়ারী অ্যানি লার্সেন, লিওনর আর মাভেরিক নামে তিনটি জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছিল ভারতবর্ষের দিকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম জাহাজ যাবে হাতিয়া বা চট্টগ্রামে। দ্বিতীয় জাহাজ যাবে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে আর তৃতীয় জাহাজ বালেশ্বরের কাছে বুড়িবালামের তীরে নামিয়ে দেবে অস্ত্রশস্ত্র। এই তৃতীয় জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে নেবার দায়িত্ব ছিল যতীন্দ্রনাথের। তাই তিনি চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত আর নলিনীকান্ত করকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বরে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে কোন কারণে নলিনীকান্ত কলকাতায় চলে গেলেন, পরিবর্তে এলেন জ্যোতিষ পাল।

এবারও দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদের। বোম্বাই-এ নির্দিষ্ট জাহাজ পৌছালে পুলিশ সন্দেহবশে তল্লাসী করতে গিয়ে ধরে ফেলে সে জাহাজকে। বিপ্লবীরাও গ্রেপ্তার হন। রায়মঙ্গলে কোমাগাতামার জাহাজ থেকে অস্ত্রাদি নামাবার আয়োজন যখন সমাপ্ত ঠিক তখন জাহাজ-অস্ত্র অর্থ ও বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলে পুলিশ। যতীন্দ্রনাথের

অন্যতম প্রধান কর্মী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ধরা পড়ে গেলেন। অবশিষ্ট রইল একটি মাত্র জাহাজ—সেটি বালেশ্বরে এসে পৌঁছাবে—নাম মেভারিক।

এ জাহাজ থেকে মাল খালাস করবার দায় স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের। তিনি তার চার সহযোগী নিয়ে অপেক্ষা করছেন বালেশ্বরের কাছে। এঁদের মধ্যে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী পাকা বিপ্লবী। এর আগে সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে প্রকাশ্যে দিনের বেলা সুরেশ মুখার্জী দারোগাকে হত্যা করে পালিয়েছে। ধরা পড়েনি। অন্যেরা অল্পবয়স্ক। এদের নাম নীরেন সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন আর জ্যোতিষ পাল। এদের নিয়ে মহানদীর মোহনায় ময়ূরভঞ্জ জেলার কোপ্তিপোদা নামে এক জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি অন্য দুটি জাহাজের আটক হওয়ার সংবাদ জানতেন না।

এ দিকে ঐ দুই জাহাজের সূত্রে বালেশ্বরের এক দোকানের হদিশ পায় পুলিশ। এ দোকান ছিল যোগাযোগ কেন্দ্র। সেখানে হানা দিল পুলিশ। কোন কাগজে কোপ্তিপোদার নাম পেয়ে সেখানে গেল পুলিশ। যতীন্দ্রনাথ পুলিশের আঁচ পেয়েই সঙ্গীদের নিয়ে পালালেন। পুলিশ ব্যর্থ হ'ল।

পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে ট্রেনে উঠতে গিয়ে সন্দেহ হ'ল যতীন্দ্রনাথের। সঙ্গীদের ইঙ্গিত করলেন। উল্টো দিক দিয়ে নেমে পড়লেন তারা। গ্রাম্যপথে চলে এলেন লোকালয় ছাড়িয়ে। কিন্তু পুলিশ ততক্ষণে অনেকটা বুঝে ফেলেছে তাদের গতিবিধি।

তারা এক চাল চালল। সর্বত্রই রটিয়ে দিলে যে পাঁচ বাঙালী ডাকাত এ অঞ্চলে লুকিয়ে আছে। পুলিশ তাদের ধরতে চায়। যে ধরিয়ে দেবে তাদের পুরস্কার মস্ত।

এর ফলে যতীন্দ্রনাথ খুব অসুবিধায় পড়লেন। সব গ্রামের লোক তাদের ধরে ফেলবার সাহস করল না। কিন্তু তাদের না দিতে চাইল খাদ্য, না অন্য সাহায্য। এই অবস্থাতেই ওরা বুড়িবালাম

নদীর তীরে পৌঁছলেন। আকাশে মেঘ। তাড়াতাড়ি পার হওয়া দরকার। কিন্তু মাঝি পুলিশের অনুমতি ছাড়া পার করে দিতে অস্বীকার করল। ওঁরা কার্তুজ আর বন্দুকের পুটুলি মাথায় নিয়ে সাঁতরে নদী পার হবেন স্থির করলেন।

কিন্তু তার আগেই এক চৌকিদার আর দফাদার তাড়া করল তাদের। পিছনে গ্রামবাসীরা। ওরা বোঝাতে চাইলেন ওরা ডাকাত নন—বিপ্লবী, দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন—গ্রামবাসীরা মরিয়া হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধে মাততে হ'ল। কয়েক জন মারা গেল, আহত হ'ল কয়েকজন। বিপ্লবীরা পালালেন।

কিন্তু পুলিশ দ্রুত এগিয়ে আসছে। বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, সঙ্গে প্রচুর সৈন্য নিয়ে সার্জেন র্যাডারফোর্ড। পুলিশ সুপার টেগার্ট স্বয়ং পরিচালনা করছেন তাদের।

ছুটছেন বিপ্লবীরা। পুলিশও ছুটছে। আর কত ছোটা যায়! যতীন্দ্রনাথ বললেন হল্ট। সামনে বালির মাঝে সামান্য খাদ। অনেকটা ট্রেঞ্চের মত। সেখানে নেমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন বিপ্লবীরা। সম্মুখ যুদ্ধ। ধরা দেবেন না কিছুতেই।

পুলিশ ও সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। বিপ্লবীরাতো গুলি করছে না। তবে বোধ হয় ওদের কাছে পিস্তল ছাড়া কিছু নেই। পুলিশের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা দ্রুত ছুটে আসতে থাকল।

আর মাত্র আড়াইশ' গজ বাকী। যতীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিলেন। লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন সৈন্য। রাডারফোর্ডের নির্দেশে সৈন্যরা শুয়ে পড়ে গুঁড়ি মেরে এগুতে থাকল। তার মাঝেই গুলি ছুঁড়ছে সৈন্যরা। বিপ্লবীরাও থেমে নেই। তবে খুব বুঝে গুলি খরচ করছেন ওরা। ওদের ভাণ্ডার তো অফুরান নয়।

এমন সময় যতীন্দ্রনাথের ডান হাতে একটা গুলি লাগল। তিনি বাঁ হাতে বন্দুক চালাতে লাগলেন। হঠাৎ আর্তনাদ করে লুটিয়ে

পড়ল চিত্তপ্রিয়। বুকে গুলি লেগেছে তার। যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাকে কোলে শোয়ালেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একটা গুলি এসে লাগল তাঁর তলপেটে। যতীন্দ্রনাথ পড়ে গেলেন। ওদিকে নরেন আর মনোরঞ্জনও আহত। যতীন্দ্রনাথ জ্যোতিষকে বললেন সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও। আত্মসমর্পণ কর।

বিপ্লবের আর এক অধ্যায় শেষ হ'ল এখানে। যতীন্দ্রনাথ পরদিন হাসপাতালে মারা গেলেন। নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসি হ'ল। জ্যোতিষ পাল শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে মারা গেলেন।

বাইশ

সত্যাগ্রহের সভা

এইসব বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বাইরে আরও এক আন্দোলন চলছিল ভারতবর্ষে আর তার হাল ধরে বসেছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তারা আলাপ আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু শাসন সংক্রান্ত অধিকার লাভ করেছিলেন। তখনও নির্বাচনের মাধ্যমে কিছু গণ-প্রতিনিধি পাঠান যেত। সরকার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রতিনিধিরা ঐ সব বিষয়ে নিজেদের মধ্য থেকে মন্ত্রীও নির্বাচন করত। মন্ত্রীরা তার কাজের জন্য কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকতেন। তবে এ সব পরামর্শ গভর্নর আদৌ গ্রহণ করবেন কিনা, তা গভর্নরের মর্জির ওপর নির্ভর করত। মোট

কথা, এ সব ব্যবস্থায় বাইরে থেকে দেখলে মনে হত ইংরেজরা ভারতীয়দের অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গভর্নর জেনারেল বা তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্বেচ্ছাচার রোধ করবার কোন ব্যবস্থাই এতে ছিল না।

এই শাসন সংস্কারের বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ ছিল প্রবল। দ্বিধা-বিভক্ত কংগ্রেস যখন অকারণ কালক্ষয়ে মত্ত তখনই গান্ধীজী আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন স্বদেশে। ১৯১৪ সালের শেষ দিক। তখন গান্ধীজীর নাম সারাবিশ্বের সুধী মহল জানে, জানে ভারতবর্ষের অগ্রসর, অনগ্রসর ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষেরা। কংগ্রেসের প্রবীন নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন পাল, মতিলাল নেহেরু এমন কি তরুণ জওহরলালও জানেন ঐ বিচিত্র ভারতীয়টির কাহিনী। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের সঙ্গে বা ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। যদিও তখন আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করে গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তবু জওহরলালের মত মানুষও সেই সময় গান্ধীজির সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, তিনি রাজনীতি-সম্পর্কহীন, ভিন্ন প্রকৃতির ভীষণ দূরের মানুষ।

কিন্তু কেন তখনই গান্ধিজী বিশ্বখ্যাত? কি তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ? এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

গুজরাটে এক সমৃদ্ধ বণিক পরিবারে গান্ধীজীর জন্ম হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। তাঁর সম্পূর্ণ নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এঁর পূর্বপুরুষেরা পোরবন্দরের রাজসভায় দেওয়ানী করেছেন বংশানুক্রমে। মোহনদাসের পিতা শুধু পোরবন্দর নয় কাথিয়াবোড়ের রাজকোট ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যের দেওয়ানী করেন। বোম্বাই প্রদেশের ইংরেজ গভর্নর তাঁকে রাজসভার সদস্য মনোনীত করেন।

এই পরিবারে গান্ধীজি শৈশব থেকেই নীতি ও আদর্শবোধে

উদ্দীপ্ত হল। সত্যবাদিতা, ধর্মনিষ্ঠা তাঁর বাল্যজীবন থেকে নিত্য ধর্ম। ওখানকার ইংরেজি স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ব্রিটেনের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সব ভারতীয় বসবাস করতেন, তাদের এক জটিল মকোদ্দমা হাতে নিয়ে আফ্রিকার নাটোলে যাত্রা করেন। সেখান থেকে তাঁকে যেতে হয় ট্রান্সভালে। ঐ মামলা চলা কালেই তিনি নাটোল সুপ্রীমকোর্টে ব্যারিস্টার হবার জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু একদল বর্ণবিদ্বেষী লোক এর বিরোধিতা শুরু করেন। গান্ধীজী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর যুক্তি বোঝান। কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুমতি দেন।

এই ঘটনা থেকেই প্রথম গান্ধীজি সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন এবং সেখানে 'নাটোল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেস' নামে এক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় নাটোল সরকার 'এসিয়াটিক এক্সক্লুশন অ্যাক্ট' নামে এশিয়াবাসীদের তাড়াবার জন্য এক আইন প্রণয়ণ করেন। আফ্রিকায় তখন প্রায় এক লক্ষ এশিয়াবাসী বাস করত। গান্ধীজি তাদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে তিনি আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দ্দশার বিবরণ জানিয়ে জনমত গঠন করতে থাকেন। এতে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা এতদূর বিক্ষুব্ধ হয় যে তিনি আফ্রিকায় ফিরলে তাকে হত্যার চেষ্টা করে।

গান্ধীজির আফ্রিকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি প্রতিবাদী হলেও ইংরেজ সরকার বিরোধী ছিলেন না। তিনি যখন ভারতীয়দের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালাচ্ছেন, সেই সময়েও সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতা অব্যহত থাকত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর' বুয়ার যুদ্ধে আহতদের শুশ্রূষায় খ্যাতি লাভ করে। এঁরাই ব্রিটিশ সেনাপতি

লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বয়ে নিয়ে আসে। ১৯০৫ সালে আদিম অধিবাসীরা বিদ্রোহী হ'লে বা আফ্রিকার প্লেগ দেখা দিলে গান্ধীজি সেবাব্রতে অসাধারণ কর্মকুশলতা দেখান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকা তাঁর মতাদর্শ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। গান্ধীজি যেমন অনুচর সহ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন, ঠিক তেমনি ১৯১৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইংরেজ সরকার 'কাইসার-ই—হিন্দ' নামে এক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

এমনিভাবে প্রতিবাদী অথচ বিরোধী নয় এমন এক বিচিত্র আন্দোলন চালিয়ে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যেও বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এই খ্যাতির ডালি মাথায় নিয়ে তিনি যখন ১৯১৫ সালে গোখলের অসুস্থতায় সেবা করতে গিয়ে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন চিকিৎসকগণের নির্দেশে সস্ত্রীক ফিরে এলেন স্বদেশে। এপেলো বন্দরে পদার্পণ মাত্র সাধারণ মানুষ তাঁকে অভিনন্দিত করল। জওহরলালের ভাষায় তখনও তিনি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ভীষণ দূরের মানুষ।

এ দূরত্ব গান্ধীজির ক্ষেত্রে আশীর্বাদ স্বরূপ কাজ করেছিল। আসলে সেদিন পর্যন্ত রাজনীতি ছিল কিছু গুপ্ত স্বভাব বিপ্লবীর বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা ভারতীয় ধনীর দ্বারা পরিচালিত। বিপ্লবীদের ভয় করত সাধারণ মানুষ। ইংরেজদের প্রচার যন্ত্র ছিল প্রবল। তাই অনেক সময়েই তাদের প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ এদের ডাকাত ভাবত। ফলে তাদের সহযোগিতার বদলে বিরোধিতাই করত। যতীন্দ্রনাথের দল গ্রামের মানুষের সহায়তা পেলে ওভাবে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ না দিয়ে বেঁচে থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করতে পারতেন। ১৯১১ সালের ১৭ই জুন যখন কোদাইকানাল স্টেশনে অত্যাচারী জেলাশাসক মিঃ অ্যাশকে গুলি করে মারে ওয়াঞ্চি আয়ার তখন স্টেশনের সাধারণ মানুষ তাকে তাড়া করে।

ওয়াঞ্চি দ্রুত এক শৌচাগারে ঢুকে নিজের মাথায় গুলি করে গ্রেপ্তারের হাত এড়ান। এমন শত শত ঘটনায় জানা যায় যে বিপ্লবীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ একেবারেই অজ্ঞ ছিল। আর শিক্ষিতজনের তাত্বিক দ্বন্দ্বের কচকচানি বুঝত না। স্বভাবতঃ সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে তারা ছিল বহু দূরে। ফলতঃ সাধারণ মানুষ গান্ধীজি সম্পর্কে অনুরূপ দূরত্বে মানসিকতা পোষণ করত না।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজি বোলপুরে এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে প্রথম 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করলেন। গান্ধীজি তাঁকে বললেন 'কবিগুরু'। বেশ কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে উভয়ের মধ্যে নানা নীতি নিয়ে আলোচনা হ'ল। গান্ধীজি সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা করলেন: সমাজে কোন অন্যায়ের প্রতিকার করতে যাবেন যিনি, তিনি এক দিকে আদর্শ জীবন-যাপনের চেষ্টা করবেন, অন্যদিকে অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ শুরু করবেন। তাঁর নীতিতে অন্যায়কারীকে আঘাত করবার প্রয়োজন নেই। বরং নিজে সত্যপথে থেকে অপর পক্ষের দেওয়া আঘাত বীর্য এবং তিতিক্ষার সঙ্গে সহ্য করা প্রয়োজন। এর ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের মনে সম্ভ্রম সৃষ্টি হয়। এর ভিতর দিয়েই উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসাব সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি এই আদর্শ শিক্ষা এবং প্রচারের জন্য আমেদাবাদের কাছে কোচরাব নামে এক গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তা সবরমতী নদীব তীরে স্থানান্তরিত হয়।

১৯১৬ সালের শেষ দিকে লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজির সঙ্গে পরিচয় হ'ল বিহারের কিছু রাজনৈতিক কর্মী এবং চম্পারণ জেলার কিছু কৃষক প্রতিনিধির। তাঁরা গান্ধীজিকে জানালেন যে চম্পারণে তখনও নীলচাষ হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে ভীষণ অত্যাচার চলে চাষীদের ওপর। জার্মানিতে নীল আবিষ্কার হওয়ার পর নীলচাষ কোন দিক থেকেই লাভজনক ছিল না। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে

পুলিশ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এবং কুঠিয়ালরা এক হয়ে চাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। 'তিন-কাঠিয়া' নামে এক আইনের বলে তারা চাষীদের নিজের জমির কুড়ি ভাগের তিনভাগ জমিতে নীল বুনতে বাধ্য হ'ত। এ নীল একটা নির্দিষ্ট দামে (যে দাম নাম-মাত্র) নীলকরদের বিক্রি করতে বাধ্য করা হ'ত। এ ছাড়াও ছিল পঞ্চাশ রকম কর। প্রজার ঘরবাড়ি, কামারশালা, ঢেঁকি, ঘানি এমন কি বিয়ের ওপরেও ছিল কর। কুঠি-পরিচালনের নামে চাষীদের ওপর লুটতরাজই ছিল নীলকর কুঠিয়ালদের কাজ। রাজ-নৈতিক কর্মী এবং কৃষকেরা গান্ধীজিকে এই অবস্থার প্রতিকারে অংশ গ্রহণ করতে আবেদন জানালেন।

তাদের আবেদন গান্ধীজিকে নাড়া দিল। তিনি চম্পারণে সত্যা-গ্রহের পরীক্ষা করবেন বলে স্থির করলেন।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে তিনি চম্পারণের সদর মতিহারিতে পেঁীছান মাত্র স্টেশনেই পুলিশ তাকে জেলা ত্যাগের হুকুম জারি করল। গান্ধীজি স্মিত হেসে সে নির্দেশ উপেক্ষা করে অগ্রসর হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। একটি মানুষকে গ্রেপ্তার করায় সারা ভারতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল, তার তুলনা নেই। পরে তাঁকে আদালতে উপস্থিত করলে তথ্যে আবেগে এবং নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ এক অভাবনীয় ভাষণ দিলেন গান্ধীজি। পরিস্থিত সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করল। সমগ্র চম্পারণ জেলা যেন বারুদের স্তূপ। যে কোন মূহূর্তে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। সরকার বাধ্য হয়ে মুক্তি দিল গান্ধীজিকে– চম্পারণের যে কোন জায়গায় ঘুরে চাষীদের অভিযোগ শুনতে অনুমতি দিল।

গান্ধীজির এই প্রাথমিক জয় উদ্বুদ্ধ করল নানা যুবক রাজনীতি-বিদকে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহর উল-হক, মহাদেব দেশাই, জে. বি. কৃপালনি ইত্যাদি বহু তরুণ এসে সমবেত হলেন গান্ধীজির পাশে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘুরতে থাকলেন গান্ধীজি এবং তাঁর অনুচরেরা।

প্রায় বিশ হাজার চাষী তাঁদের কাছে অভিযোগ পেশ করল। কর্মীরা ঝাড়াই বাছাই করে শুধু সেই অভিযোগগুলিই লিখে নিলেন, যেগুলি প্রমাণ করা যাবে। তারপর সেই বিশাল সংগ্রহ পেশ করা হ'ল সরকারের কাছে।

সরকার অভিযোগের চরিত্র এবং চম্পারণের পরিস্থিতি বিবেচনা করে জমিদার, নীলকর, সরকার এবং কৃষকদের প্রতিনিধি নিয়ে এক কমিশন গঠন করলেন। অভিযোগের সত্যতা নির্দ্ধারণ, আর অভিযোগ সত্য হলে তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করা হল কমিশনের কাজ। স্বয়ং গান্ধীজি ঐ কমিশনে কৃষকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন।

কমিশন গান্ধীজির রিপোর্টকে হুবহু সত্য বলে রায় দিতে বাধ্য হলেন। তারা প্রতিকারের জন্য যে সব নীতি স্থির করেন, সে অনু-যায়ী সরকার নতুন আইন করে 'তিন কাঠিয়া' আইন বাতিল করলেন। করের হার কমল। ফাল্তু কর উঠে গেল। সবচেয়ে বড় কথা কুঠিয়ালরা অন্যায় ভাবে যে প্রায় বার লক্ষ টাকা আদায় করেছিল বলে প্রমাণ হয়েছিল, তারও অংশ বিশেষ তাদের ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হ'ল। এরপর কুঠি বেচে দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া কুঠিয়ালদের গত্যন্তর রইল না।

চাম্পারণ সত্যাগ্রহের সাফল্য গান্ধীজিকে শুধু রাজনৈতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল না, তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব সাধারণের চিত্ত জয় করল। তাঁর অনাড়ম্বর পোশাক এবং স্বভাব, সাধুর মত আচরণ, ভারতীয় ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ, ধর্মগ্রন্থে আসক্তি সর্ব-সাধারণের কাছে দেব চরিত্রে পরিণত হ'ল। গান্ধীজির সত্যাগ্রহের মূল যে নীতি—সত্য ও অহিংসা—তা ভারতীয় ধর্ম চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে এত বেশি জড়িত যে গান্ধীজি শুধু নেতা রইলেন না—তিনি হলেন গান্ধী মহারাজ। আপামর জনসাধারণ গান্ধীজির নামে এক অলৌকিক প্রেরণা বোধ করতে থাকল।

চম্পারণের বিজয়ী নেতা গান্ধী-মহারাজ এবার এলেন গুজরাটের কইরা জেলার চাষীদের সাহায্যের জন্য। কিন্তু এখানকার জেলা কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে রইল। গান্ধীজি ততদিনে কৃষকদের সংগঠিত করে ফেলেছেন। এ সময় তাঁর প্রধান সহায় ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। এবার তিনি অসহযোগের ডাক দিলেন। সরকার কর রীতি পরিবর্তন না করলে কর বন্ধ করা হ'ল। ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে জোরজুলুম এমন কি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিল। গান্ধীজি সংস্পর্শে কইরা তখন নৈতিক বলে বলিয়ান। সব রকম ত্যাগে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ। অতএব সরকারী হুমকি উপেক্ষা করেই প্রায় গোটা জেলায় সত্যাগ্রহ শুরু হ'ল। অবশেষে সরকার রফা প্রস্তাব দিলেন। গান্ধীজির জয়জয়াকার।

এ সময় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আমেদাবাদে ওকালতি করতেন। যেমন দৃঢ়চেতা মানুষ, তেমনি প্রতিপত্তি তাঁব ব্যারিস্টার মহলে। এই দুই আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে এত অভিভূত করল যে তিনি গান্ধীজির প্রধান অনুগামী হয়ে উঠলেন।

এ আন্দোলন চলা কালেই গান্ধীজী আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের দিকে আকৃষ্ট হন। মালিক পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে গান্ধীজি সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। প্রথম ধাপ হিসাবে ধর্মঘট শুরু হ'ল। কর্তৃপক্ষ অনড়। দিন যতই এগুতে থাকল ধর্মঘটী শ্রমিকরা ততই হতাশ হতে থাকল। তাদের সঙ্কল্প শিথিল হ'ল। ধর্মঘট কি তবে ভেঙ্গে পড়বে! গান্ধীজি অকস্মাৎ আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন। তাঁর অনশন শুরু হ'ল। বিদ্যুত চমকের মত চঞ্চল হয়ে উঠল সারা দেশ। শ্রমিকদের দ্বিধা কেটে গেল। তারা আবার সংঘবদ্ধ। দেশ জুড়ে উৎকণ্ঠা! মহামানবের মৃত্যু ঘটবে কি! মিল মালিকদের প্রতি দেশজুড়ে ধিক্কার। এমন কি তাদের আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। মিল মালিকেরা গান্ধীজির অনশনের চতুর্থ দিনে সমবেত ভাবে গান্ধীজির

কাছে নতি জানিয়ে অনশন ত্যাগের মিনতি জানালেন। অন্যান্য দাবী পূরণের সঙ্গে মাইনের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গান্ধীজি অনশন ভাঙ্গলেন।

এবার নিঃসন্দেহে গান্ধীজি একক কৃতিত্বে গ্রামে ও শহরের সাধারণ কৃষক শ্রমিকদের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে এ মানুষটিকে শ্রদ্ধার এমন কি নীতি নির্ধারকের ভূমিকা দিতেও দ্বিধার অবসান হ'ল।

এ সময়ে দু-দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে ঝঞ্ঝা সঙ্কুল করে তোলে। তার প্রথমটি রাওলাট বিলের প্রতিবাদ আর দ্বিতীয়টি খেলাফৎ আন্দোলন।

ভারতের রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ায় এ সময় ইংরেজ সরকার চিন্তিত ছিল। বিচারপতি রাওলাটের স্থপারিশ ক্রমে সরকার এক বিল চালু করলেন। এর বলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখবার অধিকার দেওয়া হ'ল। সারা ভারতবর্ষ গর্জে উঠল এর প্রতিবাদে। গান্ধীজি এই বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করবার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করলেন। তারপর বেশির ভাগ নেতার আপত্তি সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত ব্যাপী এক সাধারণ হরতালের ডাক দিলেন। অন্য নেতাদের বিস্মিত করে দিয়ে এ হরতাল আশ্চর্য সফলতা লাভ করল। একদিনের জন্য গোটা ভারতবর্ষ যেন স্তব্ধ হয়ে রইল।

এই হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হলেও দিল্লীর পুলিশ গুলি চালল। মারা গেল কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান। আহতও হলেন অনেকে। শোনামাত্র গান্ধীজি দিল্লী যাত্রা করলেন। তাকে পথে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিশ পাহারায় বোম্বাইতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতিবাদে পরদিন বহুস্থানে হরতাল পালিত হল। লাঠি গুলিও চলল। চূড়ান্ত ঘটনা ঘটল পাঞ্জাবে।

পাঞ্জাব আগে থেকেই ছিল অগ্নিগর্ভ। পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যান্ট

গভর্নর ছিলেন ও ডেয়ার। তিনি তখন পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধের জন্য চাঁদা এবং সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন নির্দয়ভাবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমছিল তাকে একটা সংহত রূপ দেবার জন্য সকলেই গান্ধীজির আগমন ও নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছিল। আশা ছিল যে দিল্লী ফেরৎ তিনি পাঞ্জাবেও যাবেন। কিন্তু তাকে দিল্লীতেই আসতে না দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাব ৯ এপ্রিল প্রতিবাদ মিছিল বের করল। ডঃ কিচলু এবং ডঃ সত্যপালের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত এক বিরাট মিছিল অমৃতসরের পথ পরিক্রমা করে লে. জেনারেল মাইকেল ও ডেয়ারের হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দিল। মাইকেল কিন্তু কোন সৌজন্য দেখালেন না। সদ্য-প্রণীত আইনের বলে তি ন ঐ দুই নেতাকে বন্দী এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ড দিলেন।

পরদিন আরও বিরাট মিছিল বের হ'ল। সেদিন মিছিলে অমৃতসরের সমস্ত বিশিষ্ট মানুষেরাও যোগ দিলেন। মিছিল রেল সেতুর কাছাকাছি আসতেই পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাল। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। আহতও হলেন বহুজন।

জনতা আহতদের কাতরানি এবং সহযোগীদের মৃত্যু দেখে ভয় পাওয়ার বদলে উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাছেই ছিল এক ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক। জনতা তার ম্যানেজার এবং তিনজন ইউরোপীয় কর্মীকে হত্যা করল। ব্যাঙ্ক লুট হয়ে গেল। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল আশেপাশের কয়েকটি সরকারী অফিসে। এক ইউরোপীয়ান মহিলা প্রহৃত হলেন।

পাঞ্জাব সরকার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার দায় সৈন্য বিভাগের ওপর ছেড়ে দিল। মিলিটারী জেনারেলের নাম ছিল ডায়ার। তিনি দায়িত্ব পেয়েই সব রকম মিটিং মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা হ'ল না।

এ দিকে বারোই এপ্রিল জনসাধারণের তরফ থেকে এক জন-সমাবেশের আহ্বান করা হ'ল জালিয়ানওয়ালাবাগে। এ উদ্যানটি অমৃতসর শহরের পুবদিকে অবস্থিত। প্রায় চারদিকেই বাড়ি। একদিকে প্রায় পাঁচফুট উঁচু প্রাচীর। প্রবেশপথ একটি। পর দিন ছ'হাজার থেকে দশহাজার লোক সমবেত হ'ল সেখানে। তারা সকলেই কম বেশি গান্ধী আদর্শে বিশ্বাসী—তাই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কিন্তু এই সমবেত হওয়াকে জেনারেল ডায়ার বেআইনী সমাবেশ হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং বিশাল এক বাহিনী নিয়ে প্রবেশ পথ আটকে কোন রকম সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই গুলি করা শুরু করলেন। প্রায় দশ মিনিটে ১৫০০ রাউণ্ডের ওপরে গুলি বর্ষণ করা হল। সরকারী হিসেবেই নিহতের সংখ্যা প্রায় চারশ' আর আহত বারশ'র বেশি। আহত-নিহতদের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে এমন কি আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার মত সৌজন্যটুকুও না দেখিয়ে ডায়ার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেন।

এখানেই থামলেন না ডায়ার। গোটা অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হ'ল। দিনের পর দিন চলল ছেদহীন কার্ফু। যখন সামান্য শিথিল করা হ'ল, তখন প্রকাশ্যে রাস্তায় বের হওয়া ব্যক্তিকে বেত মারা হতে থাকল। যেখানে ইউরোপীয়ান মহিলা প্রহৃত হয়েছিলেন, সেখানে দিয়ে সকলকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা হ'ল। ছাত্রদের কোথাও ষোল মাইল পর্যন্ত হেঁটে থানায় হাজিরা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সম্মানিত ব্যক্তিদেরও বন্দী করে রাখা হ'ল খাঁচার মধ্যে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবর যাতে প্রকাশিত না হয় তার জন্য পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হ'ল। তবু ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। শান্তিনিকেতনে এ সংবাদ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। ২৯শে এপ্রিল ছুটে এলেন কলকাতায়। স্থানীয় নেতাদের প্রতিবাদ সভা ডাকতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সাহস

পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সভাপতি হিসাবে ভাষণ রাখবার দায়িত্ব নিতে চাইলেও সকলে সমবেত হলেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেমসফোর্ডের কাছে এক পত্র পাঠালেন। শঙ্করনারায়ণ আয়ার ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ-সভার মনোনীত সভ্যের বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এ সম্মানও তিনি ত্যাগ করলেন প্রতিবাদে।

এ দুই ঘটনার আঘাতে যেন জড়তা কেটে গেল। শুরু হ'ল প্রতিবাদের উত্তাল ঢেউ। মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু ইত্যাদি কংগ্রেসী নেতারা ছুটে গেলেন। এবং সে বছর অমৃতসরেই মতিলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন বসল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে লিবারেল দল কংগ্রেসের মতকে সমর্থন করলেন। পার্লমেন্ট ডায়ারকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করল। এবং লর্ড হাণ্টারের অধীনে এক কমিশন নিয়োগ করল। কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে আর এক বেসরকারী কমিশন বসালেন। দুই কমিশনই এ হত্যা-কাণ্ডকে কম বেশি রুঢ় ভাষায় বর্বরোচিত বলে অভিহিত করলেও ইংলণ্ডের জনসাধারণ ডায়ারকে বীরের সম্মান দিল। যে ভারতীয়দের হাতে ইউরোপীয়ান মহিলার নিগ্রহ হয়েছে তাদের হত্যা করে ডায়ার মহৎ কাজ করেছেন - এই হ'ল তাদের মানসিকতা। ভারতীয়দের প্রতি কতখানি ঘৃণা তখনও ব্রিটিশদের মনে চাপা ছিল তা এ ঘটনায় প্রকাশিত হ'ল। জলিয়ানওয়ালাবাগের করুণ স্মৃতি সারাভারত-ব্যাপী তীব্র অসহযোগ আন্দোলন টেনে আনিতে সাহায্য করল।

তেইশ

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

এ সময়ে মাইকেল কলিন্সোর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ডের গেরিলাদের সংগ্রাম শুরু হয়। মিশর ও তুরস্কে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। এগুলি ছিল ভারতীয়দের কাছে প্রেরণা। এর ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট থেকে মণ্টেগু সরকার ভারতবর্ষকে কিছু কিছু দিয়ে আপোষ করতে চাইলেন। এই প্রস্তাব মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রস্তাব নামে খ্যাত।

এতে বলা হল যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয়েরা নির্বাচনের মাধ্যমে একটি করে মন্ত্রীসভা গঠন করবে। তারা যে কোন বিষয়েই মতামত প্রকাশ করতে পারবে, কিন্তু তা গ্রহণ করা না-করার অধিকার থাকবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের।

১৯১৮ সালে ৮ই জুলাই শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাব পেশ করা হল, অমৃতসর অধিবেশনে তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অস্ফুট রইল না। ইতঃমধ্যে মণ্টেগু চেমসফোর্ড যে সব শাসন-সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার পক্ষেই ছিল বেশির ভাগ ব্যক্তি। তিলক মোটামুটি গ্রহণের দলে ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মতটি ছিল এই যে, স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে যদি

বিরোধিতা প্রয়োজন হয়, তবে তা স্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ হোক। যা হোক, তখনকার মত আপোস হ'ল। স্থির হ'ল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারকে গ্রহণ করে এমন ভাবে তা ব্যবহার করতে হবে যাতে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার গঠনের পথ দ্রুত প্রস্তুত হয়।

এ সময়ে আমাদের দেশে মুসলমান সমাজ আর একটি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মুসলমান সমাজের প্রধান হচ্ছেন খলিফা। হজরৎ মহম্মদের পর থেকে ৯৮ জন খলিফা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব করে আসছিলেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই দায়িত্বলাভ করেছিলেন তুরস্কের সম্রাট। বিশ্বের সমস্ত মুসলমান তাঁকেই তাদের নেতা বলে মানতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজদের কাছে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। খলিফার ভাগ্য বিপন্ন হয়। এতে সারা পৃথিবীর মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এ বিক্ষোভের একমাত্র কারণ তাঁদের ধর্ম-চিন্তা নয়। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ কালে মুসলমানেরা তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ কতকগুলি প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন এবং ইংরেজ সরকার সেগুলিতে মোটামুটি সম্মতিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য না করায় মুসলমান সমাজ বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। একে একটি আন্দোলনের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন মওলানা মহম্মদ এবং শওকৎ আলি। সাধারণ ভাবে এঁরা আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে অভিহিত হন।

গান্ধীজি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝেন যে মুসলমানদের দাবীর মধ্যে সত্যতা আছে। তাঁর মনে হয় "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সৃষ্টির এমন সুযোগ আগামী একশ' বছরে মধ্যেও আর আসবে না।" অতএব তিনি মুসলমানদের এই ধর্মীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাইলেন।

ইতঃপূর্বেই মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খান এবং হজরৎ

মোহনির নেতৃত্বে এক খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯১৯-এর নভেম্বরে গান্ধীজিকে তার সভাপতি পদে বরণ করা হ'ল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আদর্শ প্রচার করতে মৌলানা আজাদ, আক্রম খান, ফজলুল হক প্রভৃতি নেতারা বাঙ্গলা দেশ পরিক্রমণ করলেন। উত্তর ভারত পরিক্রমণের দায়িত্ব নিলেন দেওবন্দ গোষ্ঠীর মৌলানা আর লক্ষ্মৌ-এর উলেমারা। কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু এমন কি গান্ধীজিও খেলাফৎ আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখলেন। ১৯২০ সালের অধিবেশনের ভারতের জাতীয় দাবিগুলির সঙ্গে খিলাফৎ দাবীও সংযুক্ত করা হল। এই সংযুক্তির বিরুদ্ধে বল্‌লেন বিপিন পাল। তিনি বল্‌লেন যে ভারতের বাইরের কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সমর্থনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় দাবী এক করা স্ববিরোধিতা। এ আপত্তি কেউ অস্বীকার করতে না পারলেও অধিবেশনের ভোটে সংযুক্তি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এবার হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত একদল প্রতিনিধি দেখা করল ভাইসরয়ের সঙ্গে। তিনি সহৃদয় ব্যবহার করে পরামর্শ দিলেন ইংলণ্ডে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। ইংলণ্ডে প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রকৃত পক্ষে ফিরিয়ে দিলেন।

গান্ধীজি রাওলাট বিল, মণ্টেগুর শাসন সংস্কার এবং খিলাফৎ আন্দোলনকে একত্রিত করে একত্র সহযোগে আন্দোলনের পরিকল্পনা করলেন। ইতঃমধ্যে তিলকের মৃত্যু হ'ল ১৯২০ সালের আগস্টে। গান্ধীজি তার সবচেয়ে কঠোর সমালোচকের হাত থেকে মুক্তি পেলেন। পরের মাসে ৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। চিত্তরঞ্জন চান নি যে ইংরেজ সরকার সেটুকু সুযোগ দিচ্ছে তা বর্জন করা হোক, তিনি চেয়েছিলেন, ঐ সুযোগটুকুই ব্যবহার করা হোক অস্ত্র হিসাবে। তিনি বলেছিলেন,

"এই সংস্কারগুলোকে ব্রিটিশ সরকারের দান বলে ভাববার

কোন কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকারের হাত মুচড়েই আমরা এটুকু বের করে এনেছি। আমি চাই কাউন্সিলের ভেতরে গিয়ে তাকে স্বরাজ লাভের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে। আমাদের হাতে যে অস্ত্র এসেছে, তাকেই ব্যবহার করতে হবে পূর্ণ এবং অখণ্ড স্বরাজলাভের উপায় হিসাবে।"

লাজপত রায় কাউন্সিলগুলি বয়কটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু না বললেও স্কুল-কলেজ বয়কটের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। বিপিন পাল বললেন, উত্তেজনার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা স্থির হোক। সুভাষচন্দ্র পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করলেন চিত্তরঞ্জনকে।

মতিলাল মধ্যস্থতা করে মোটামুটি সকলকে শান্ত করলেন। স্থির হ'ল কংগ্রেসের কর্মসূচীতে স্বরাজের দাবী থাকবে সর্ব প্রথমে। ইংরেজের তত্ত্বাবধানে যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন হতে চলেছে তাতে কংগ্রেস যেমন প্রার্থীও দেবে না, ঠিক তেমনি ভোটও দেবে না। স্কুল-কলেজ-কাছারি ক্রমে ক্রমে বয়কট করা হবে।

নাগপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনই অসহযোগ প্রস্তাব পেশ করলেন। স্থির হ'ল ,সদস্যরা কাউন্সিল ত্যাগ করবেন, আইন-ব্যবসা ত্যাগ করবেন, স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সর্বরকম অর্থনৈতিক বয়কট করা হবে। জাতীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উদ্দেশ্যে এক জাতীয় তহবিল গড়ে তোলা হবে।

এ অধিবেশনে স্বরাজের লক্ষ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব ছিল তার বিরোধিতা করলেন মদনমোহন মালব্য এবং জিন্না। কিন্তু গান্ধীজি যখন বললেন যে আগামী বছরেই আরও উগ্র কর্মপন্থা পরিকল্পনা করা হবে, তখন সব বিরোধিতা ঘুচে গেল। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকর করা হ'ল। কংগ্রেসের সমস্ত সভ্য নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। আইনজীবিরা কোর্ট

কাচারি ছেড়ে দিতে থাকলেন। মতিলাল, চিত্তরঞ্জন বা বল্লভভাই প্যাটেলের মত মানুষ ইংরেজের আদালতে 'মি লর্ড' বলে দাঁড়ান বন্ধ করে দিলেন। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য উকিলেরাও আদালত বর্জন করতে থাকলেন। স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল ছাত্ররা, বেরিয়ে এলেন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা। বাঙলাদেশে চিত্তরঞ্জনের আহ্বান কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরতে থাকল—

'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজের আর
অপেক্ষার সময় নেই।'

বেরিয়ে আসা ছাত্রদের শিক্ষার জন্য নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকল। প্রতিষ্ঠিত হ'ল জামিয়ামিলিয়া ইসলামিয়া, কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি। শিক্ষা ক্ষেত্রে এলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ জাকির হোসেন, সুভাষচন্দ্র, আচার্য নরেন্দ্রদেব ইত্যাদি।

ছাত্রসমাজ এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিল। তারা দান-সংগ্রহ, প্রচার, বিদেশী পণ্যের দোকানে পিকেটিং ইত্যাদি নানা কাজের দায়িত্ব নিল। বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে কাপড় সম্পূর্ণ বর্জিত হল।

এ আন্দোলনে শুধু শিক্ষিত জন নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন মহিলারা। গোটা ভারতবর্ষ অসহযোগে উত্তাল হয়ে উঠল।

খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা আলি ভ্রাতৃদ্বয় অসহযোগের উপায় হিসাবে মুসলমান যুবকদের সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে নিষেধ করলেন। ফলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। এতে সারা ভারতেই উত্তেজনা আরো প্রবল হ'ল। এ অসহযোগ এবার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের হয়ে দাঁড়াল।

এ অসহযোগের একটি পর্ব ছিল কর-বয়কট। এ নীতি কৃষকদের

মর্ম স্পর্শ করেছিল। দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরের গ্রাম থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সংখ্যাতীত গ্রামের প্রায় শত করা পঁচানব্বুইটি গ্রাম এ আন্দোলনে যোগ দিল। কোথাও কোথাও পুলিশ লাঠি চালাল। এমন উত্তেজক ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে। উত্তেজিত জনতা আক্রমণ করল কোর্ট। তাদের মুক্ত করবার আন্দোলনে জড়িয়ে রাজনীতির আবর্তে এলেন মতিলাল জওহরলাল নেহেরু।

এই উত্তেজনার মধ্যেই প্রিন্স অব ওয়েলস্ এলেন ভারত পরিদর্শনে। তিনি যেদিন বোম্বাইতে পা দিলেন, সেদিন সেখানে ধর্মঘট পালিত হ'ল। স্বয়ং গান্ধীজি সেখানে সভা করে বিদেশী বস্ত্র ও পণ্যের বহ্ন্যুৎসব করলেন। কিছু ইউরোপীয়ান এবং পার্শী প্রিন্সকে সংবর্দ্ধনা দেখাল। ফিরবার পথে তারা নিগৃহীত হ'ল জনতার হাতে। পুলিশ গুলি চালাল, ও লেলিয়ে দিল গুণ্ডাদের। মারা গেল পঞ্চাশের ওপরে।

বিক্ষুব্ধ সরকার কংগ্রেস এবং খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। জনসভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হ'ল। তবু থামল না আন্দোলন। দলে দলে স্বেচ্ছা-সেবক কারাবরণ করে জেলখানা ভরিয়ে তুলতে থাকল। সরকার গান্ধীজি ছাড়া আর সব নেতাকেই গ্রেপ্তার করলেন।

এ সময়ে আমেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজি আন্দোলনের কেন্দ্র শহর থেকে গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। স্থির হ'ল— শুরু হবে ব্যক্তিগত এবং জনতা-নির্ভর অসহযোগ। এই নতুন অসহযোগ শুরু করবার জন্য বারদৌলি গ্রাম নির্বাচিত হ'ল।

কিন্তু এ আন্দোলন শুরু হবার আগেই গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিশ জনতার উপর যথেচ্ছগুলি চালাল। উৎক্ষিপ্ত জনতা প্রতিশোধ নিতে থানা আক্রমণ করল। কিছু পুলিশ ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল এক চালা ঘরে। জনতা

তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে ঘটল এ ঘটনা। গান্ধীজি সংবাদ শুনে আতঙ্কিত হলেন। তাঁর মনে হ'ল শুধু উৎক্ষিপ্ত জনতাই নয় কংগ্রেস কর্মীরাও অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ গান্ধীজি একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। সমস্ত দেশে নিশ্চিত বিভ্রান্তি দেখা দিল। ১০ই মার্চ গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বিচারে তিনি ছ'বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

এদিকে ঐ বছরেই তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফা পদ তুলে দিয়ে সেখানে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগ নিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের বেগও স্তিমিত হয়ে এল।

ইংরেজ সরকার তার দমন নীতি থেকে পিছালেন না। কিন্তু বাঁধন যত শক্ত হতে থাকল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তত দুর্বার হতে থাকল। অবশেষে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ১৯৩০ সালের সূচনায় গান্ধীজি ঘোষণা করলেন—

'পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—'

ঐ বৎসর ২৬ শে জানুয়ারী পালিত হ'ল স্বাধীনতা দিবস। পুলিশের নির্যাতন মেনে নিয়েই সর্বত্র জনসভা ডাকা হ'ল। উড়ল স্বাধীনতার তেরঙ্গা পতাকা, গাওয়া হ'ল বন্দেমাতরম্ গান।

এ স্বাধীনতার স্বপ্নকে রুখবে কে?

চব্বিশ

চৌরিচৌরা ঘটনা ছাড়াও যে ঘটনা গান্ধীজিকে অহিংস আন্দোলনের হিংস্ররূপ গ্রহণ সম্পর্কে আতঙ্কিত করে তোলে তার অন্যতম প্রধান হ'ল মালাবার উপকূলের মোপলা-বিদ্রোহ।

মোপলারা মুসলমান। বহু বহু বৎসর পূর্বে এক সময় মোপলারা আরবদেশ থেকে এসে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রের তীরে বসতি স্থাপন করেছিল। সেদিন থেকেই দারিদ্র্য তাদের সঙ্গী। মাটিকে ভালবাসে তারা। তাই শত শোষণেও চাষ ছাড়ে না। জমিদার-মহাজন-রাজকর্মচারী-ব্যবসায়ীর শোষণ নীরবে সহ্য করে। মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়ালে করে বিদ্রোহ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে নিরস্ত্র সাধারণ মোপলা চাষী বিদ্রোহ করেছে বার বার। ব্যর্থ বিদ্রোহের ঘা না শুকাতেই আবার করেছে বিদ্রোহ। আসলে লোভীর দল শোষণের মাত্রা বাড়িয়েই বিদ্রোহী করে তুলেছে তাদের। তাই আপাতঃ শান্ত মোপলারা চিরকাল ঘৃণা আর সন্দেহের চোখে দেখেছে জমিদার-মহাজন আর রাজকর্মচারীদের। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেছে বুকের মধ্যে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর মোপলারা শান্ত জীবন

অতিবাহিত করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষ থেকে তিলে তিলে অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে তারা। খলিফার ভবিষ্যৎ তাদের ধর্মোন্মাদনাকে উদ্দীপ্ত করে। এর সঙ্গে সম্মিলিত হয় গান্ধীজির আহ্বান।

চিরকালই সাপের হাসি বেদেয় চেনে। মোপলাদের এই উন্মাদনা আতঙ্কিত করে তুলল আঞ্চলিক জমিদার-মহাজনদের। তারা ঐ অঞ্চলের মোপলাদের প্রিয় নেতা আলি মুজালিয়রকে সতর্ক করে দিলেন।

আলি মুজালিয়র এ সতর্ক বাণী উপেক্ষা করেই কর-বয়কট আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মিলিটারি নামল অঞ্চলে। মিলিটারি মোতায়েন রইল। প্রয়োজন হলেই সাহায্য করবে। আর পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে সন্দেহভাজন মাত্রকেই গ্রেপ্তার করতে থাকল। এমন কি মসজিদে পর্য্যন্ত ঢুকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

এ আঘাত ধর্ম-প্রাণ মোপলাদের উৎক্ষিপ্ত করে তুলল। মোপলারা উত্তেজিত ভাবে স্থানীয় কাচারি বাড়ি আক্রমণ করল। জমিদারের লাঠিয়ালদের সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধে দু-তরফেরই কিছু ক্ষয়ক্ষতি হল। দু-পক্ষ তাড়াতাড়ি মীমাংসা করে নিলেন।

কিন্তু পরদিন ১৮ই আগস্ট ইংরেজ সরকার মোপলা অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করলেন। অবস্থা থমথম করতে থাকল। ঐ অবস্থাতেই কেটে গেল ১৯ তারিখ। পরদিন কালিকট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে তিরুরাঙ্গা গ্রামে এলেন কয়েকজন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেপ্তার করতে।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসতে থাকল মোপলারা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। এমন সময় তিনি যখন নেতাদের হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, মোপলারা তাতে বাধা দিল। প্রায় দুই শত মোপলা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল পুলিশদের বন্দুক-গুলি। ছিনিয়ে

নিল বন্দীদের। ভয় পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশ দল নিয়ে পালালেন।

মোপলারা খানিক দূর তাদের তাড়া করে গেল। তারপর চিরকাল যারা তাদের নানাভাবে ঠকিয়ে এসেছে সেই সব জমিদার মহাজনদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। কোন রকম বাধা না দিয়েই তারা কোথাও গাড়ি করে কোথাও বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালালেন।

প্রাথমিক এই জয়ের উল্লাসে উদ্ভ্রান্ত না হয়ে মোপলারা এবার নিজেদের সংগঠিত করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। তারা টেলিগ্রামের তার কেটে দিল। লাইন তুলে ফেলে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। ক্রমেই বিদ্রোহীর সংখ্যা বাড়তে থাকল। তারা সংঘবদ্ধ সেনাদলের মত মার্চ করে গিয়ে পরপর অনেকগুলো স্টেশন এবং থানা ধ্বংস করে দিল।

এতদিন যারা মোপলাদের দাবিয়ে রেখেছে, তারা সংবাদ পাওয়া মাত্র পালাতে থাকলেন। কালিকটে তারা নিরাপদ আশ্রয় নিল আর তাদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ বিচার করে কালিকটের ম্যাজিস্ট্রেট সৈন্য নামাবার হুকুম দিলেন।

এ দিকে ততক্ষণে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর ইংরেজ শাসন নেই। মোপলরা সানন্দে তাদের প্রিয় নেতা আলি মুজালিয়রকে তাদের স্বাধীন রাজ্যের সুলতান বলে ঘোষণা করল। এরদান এবং ওয়াল্লুভানাদ তালুক নিয়ে এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন শক্তি নিয়ে এই ক্ষুদ্র অঞ্চল স্বাধীন রাখা সহজ নয়। বিশ্বযুদ্ধ জয়ী ইংরেজ সরকার এ সময়ে মরিয়া। মোপলাদের দমন করতে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত সৈন্যশক্তি ঐ গ্রামগুলির চতুর্দ্দিকে সমবেত করল ইংরেজরা। উপকূল রক্ষা করতে এগিয়ে এলো তিন তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। সেখান থেকে কামান দেগে ধ্বংস করা হতে থাকল গ্রামগুলিকে। আট হাজার সৈন্য, বহু যুদ্ধ-গাড়ি, ছোট ট্যাঙ্ক

ইত্যাদি নিয়ে স্থলবাহিনী আক্রমণ চালাতে থাকল। আর আকাশ পথে বোমা ফেলতে থাকল বিমান বাহিনী।

মোপলা বিদ্রোহীরা পাহাড়ে পালালো। সৈন্যদল পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে ঢুকতে থাকল পাহাড়ে। বহু খণ্ড-খণ্ড যুদ্ধ হ'ল। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয় জেনে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে থাকল। সৈন্য-দল কোন নিয়ম না মেনে শত শত আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক বিদ্রোহীকে গুলি করে হত্যা করল। বন্দীদের বিনা বিচারে দিল ফাঁসি। এক-দলকে ট্রেনপথে বেলালী জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল প্রায় একশ জন। প্রায় চার হাজার মোপলার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মোপলা-বিদ্রোহ শেষ হ'ল।

পঁচিশ

১৯৩০এর গণ-বিদ্রোহের ঢেউ-এ সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। তার ঢেউ এসে লাগে নাগা পাহাড়ের পার্বত্য নাগাদের মধ্যেও। এই জাগরণের ইতিহাসে উনিশ বছরের মেয়ে বীরাঙ্গনা রাণী গাইদিলিউ-এর কাহিনী শুধু ভারতের নয়—সারা পৃথিবীর বিস্ময়।

রাণী গাইদিলিউ-এর কথা বলবার আগে নাগাভূমি এবং নাগা জাতি সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। মণিপুরের উত্তরে এবং আসামের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নাগাদের বাসভূমি। মণিপুরের উত্তর অঞ্চলে এবং ব্রহ্মদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও নাগাজাতি বাস করে।

অসংখ্য খণ্ডজাতিকে একত্রে ধরে নাগাজাতি। এদের মধ্যে কোন কোন খণ্ডজাতি দীর্ঘকাল নগ্ন থাকত। সম্ভবতঃ সে কারণে আশপাশের অন্য জাতি এদের ঘৃণাভরে নগ্নজাতি বলত। তার থেকে 'নাগা' নাম সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

যে খণ্ড জাতিগুলি নিয়ে সমগ্র নাগাজাতি গঠিত, তাদের নানা নাম। যেমন, অঙ্গামি, আও, সেমা, রেঙমা, লোহতা, সাংটাম, চাং, ইমচংগ্র, টাংকুল, জেমি, লিয়াঙসাই, কোইয়াঁক, চাখেসাং, কাবুঈ।

এদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা আছে—এমনকি বহু খণ্ড জাতি পরস্পরের ভাষা বুঝতেও পারে না।

দীর্ঘকাল থেকে নাগারা আসাম, মণিপুর, ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে আসছিল। চারপাশে রাজনৈতিক উত্থান পতন তাদের তেমন করে বিব্রত করেনি। নিজেদের সমাজ শাসন এবং আদিম জীবন নিয়ে এরা প্রায় স্বাধীন জীবন-যাপন করত। দুর্দ্ধর্ষ নাগাদের ঘাঁটান কেউ-ই তেমন আবশ্যক বোধ করতেন না। ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে নরকাসুর নামে যে মহাশক্তিমান রাজার বর্ণনা আছে, তিনি সম্ভবতঃ এই নাগা জাতীয় মানুষ ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে অহোম জাতীয় নেতা সুকাফার নেতৃত্বে ঐ জাতি পাটকই পাহাড় পার হয়ে আজকের পূর্ব-আসাম অঞ্চলে বাস শুরু করে। এঁরা ছিলেন উত্তর ব্রহ্ম বা চীনসীমান্তবাসী 'সান্' বংশোদ্ভূত। এই রাজারা প্রায় ছ'শ বছর এ অঞ্চল শাসন করেন। নাগাদের বহু অঞ্চল এঁরা কেড়ে নেন। কিন্তু খুব কম নাগাই এঁদের বশ্যতা স্বীকার করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসামের রাজতন্ত্রের ওপরতলায় বেশ গোলযোগ সৃষ্টি হয়। অহোম রাজাদের শাসন ব্যাপারে সাহায্য করতেন তিনজন সভাসদ যাঁদের বলা হত গোঁহাই আর দুজন মন্ত্রী বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকন' রাজা চন্দ্রকান্তের আমলে রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বড়ফুকন বদনচন্দ্র আর বুড়া গোঁহাই পূর্ণানন্দ মেতে ওঠেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। একসময় এমন অবস্থা হয় যে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাবার ভয়ে বদনচন্দ্রকে রাজধানী ছেড়ে পালাতে হয়। পালিয়ে গিয়ে প্রতিশোধের উন্মাদনায় বদনচন্দ্র এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। তিনি সব গোপন তথ্য জানিয়ে ডেকে পাঠালেন ব্রহ্মরাজ বোদায়পয়কে। ব্রহ্মরাজ সুযোগ বুঝে আক্রমণ করলেন আসাম-বাহিনী। পূর্ণানন্দ সাধ্যমত প্রতিরোধের আয়োজন করলেন বটে,

কিন্তু আসামী-বাহিনী পরাজিত হল। পূর্ণানন্দ নিহত হলেন। বিজয় গর্বে আসামের রাজধানী জোড়হাটে ফিরে এলেন বদনচন্দ্র। চন্দ্রকান্ত নানা সর্তে ব্রহ্মরাজকে সন্তুষ্ট করে সিংহাসন বজায় রাখলেন। ব্রহ্মবাহিনী ফিরে গেল নিজদেশে।

কিন্তু রাজনীতির চক্রান্ত বড় সহজ নয়। ব্রহ্মবাহিনী ফিরতে না-ফিরতে গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলেন বদনচন্দ্র। বিজয়ীর বেশে আসরে উপস্থিত হলেন পূর্ণানন্দের পুত্র রুচিনাথ। তিনি তার পিতৃহত্যার জন্য চন্দ্রকান্তকেও দায়ী ভাবলেন। অতএব রুচিনাথ তাকেও বিতাড়িত করলেন রাজ্য থেকে।

বদনচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে ব্রহ্মরাজসভায় ভগ্নদূতের মত উপস্থিত হলেন, বদনচন্দ্রের এক বন্ধু। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবাহিনী আবার এসে হাজির হ'ল আসামে। আবার চন্দ্রকান্ত সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাহিনী পূর্ণানন্দের সমর্থকদের খুঁজবার নাম করে গোটা আসাম রাজ্যে লুণ্ঠন এবং অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। চন্দ্রকান্ত গোপনে রুচিনাথের কাছে ঐক্যের দূত পাঠালেন। সমবেতভাবে সাধারণ শত্রু বর্মীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিলেন না রুচিনাথ। একা চন্দ্রকান্ত বর্মী-প্রাধান্য খর্ব করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততদিনে সিন্দবাদের দৈত্যের মত বর্মীরা চেপে বসেছে আসামে। সাধ্য কি বর্মীদের তাড়ায়। ব্যর্থ চন্দ্রকান্ত শেষ পর্যন্ত পালালেন ব্রিটিশ অধিকৃত গোয়ালপাড়ায়। তিনি ব্রিটিশদের সহায়তায় বর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু পর পর দুটি যুদ্ধে আসামের ওপর থেকে আহোমদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

আহোমদের সর্বভৌমত্ব নষ্ট হওয়ায় ইংরেজদের পক্ষে আসামে অনুপ্রবেশ সহজ হয়ে গেল। ১৭৬৫ সালে তারা আসামের শ্রীহট্ট অধিকার করে সেখানেই থমকে ছিল। কিন্তু এবার তারা সুযোগ বুঝে তিল তিল করে এগুতে থাকল। শ্রীহট্টের নিরাপত্তার অজুহাতে

লর্ড আমহার্স্ট এ সব অঞ্চলের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। কাছাড়, জয়ন্তীয়া ইত্যাদি রাজ্যের স্বল্পশক্তির রাজারা ইংরেজদের বরণ করে নিলেন। ১৮২৪ ও ১৮২৫ সালের দুটি ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধের শেষে ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে য়ান্দাবোর সন্ধিতে ব্রহ্মদেশও শেষ পর্য্যন্ত আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তীয়াদের ওপর তাদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলেন। ইংরেজদের শোষণ ও উৎপীড়ন চালাবার নতুন ক্ষেত্র হাতে এল।

শ্রীহট্টকে কেন্দ্র করেই ইংরেজরা নাগাভূমির সমতলে ও পার্বত্য-অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে ছড়িয়ে পড়েছিল। নাগা-খাসিয়া ইত্যাদি চিরস্বাধীন জাতিগুলির ইংরেজ সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা শুভ হল না। মনে মনে প্রথম থেকেই তারা ইংরেজ বিদ্বেষী রইল। ফলে রাজ্য হাতে পেয়ে তারা যখন বন্দুক কামান হাতে নিয়ে নবতর শোষণ ব্যবস্থা চালু করতে নেমে পড়ল তখন নাগারা সেই নিয়মের বেড়াজালে বিস্মিত-বিহ্বল হয়ে পড়ল।

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার একটা বড় বিষয় মুদ্রা। চাষের ফসল নয়, কর হিসাবে দিতে হ'ত যে মুদ্রা তা তৈরীর অধিকার যার—তার নির্দ্ধারিত মূল্যই সত্য। এ হিসেবে অভ্যস্থ ছিল না নাগারা। তাদের হিসেব বোঝাতে এলো মহাজন-ঠিকাদার-আড়তদার। নাগারা বাধা দিয়ে চলছিল এই বিচিত্র ব্যবসায়। কিন্তু রাজ্য অধিকার ইংরেজদের হাতে আসায় নাগারা আরও বিপদে পড়ল। কর ধার্য হল জমির ওপর, কর বসল বসত বাড়ির ওপর। স্বাধীন নাগার প্রথম দিন থেকেই করল বিদ্রোহ ঘোষণা। বস্তুতঃপক্ষে ইংরেজ শাসনের দু'শো বছর—নাগাদের বিদ্রোহেরই ইতিহাস।

বস্তুতঃপক্ষে ইংরেজরা কোনদিনই নাগা অঞ্চল আয়ত্তে আনতে পারেনি। তবু কাবুঈ ও কাচা সম্প্রদায়ের নাগারা মোটামুটি ইংরেজ প্রভুত্ব মেনে নেয় এবং ইংরেজরাও এদের অঞ্চলকে শাসনাধীন অঞ্চল ও অন্য অঞ্চলকে শাসন বহির্ভূত অঞ্চল বলে ভাগ করে একটা

কাল্পনিক সীমারেখা টেনে নেন। মজার কথা হচ্ছে যে নাগারা কোন দিনই এ সীমারেখা মানত না। ইংরেজরাও জানতেন রেখাটি নিতান্তই অর্থহীন।

শাসনাধীন অঞ্চলের কাবুঈ ও কাচা সম্প্রদায়ের নাগারা শান্তি ও স্বস্তির লোভেই মেনে নিয়েছিল ইংরেজ শাসন, কিন্তু পরিবর্তে তারা পেয়েছিল শোষণ ও অত্যাচার। তাদের চাষের জমি বা বাসের গৃহের ওপর তো কর ধার্য ছিলই, সেই সঙ্গে বেগার খাটা এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদান ছিল আইনসঙ্গত। নিজেদের দুর্দ্দশার জন্য এদের মনে ত' বিক্ষোভ ছিলই, আরো বিক্ষোভ ছিল এই যে তাদের বাধ্যতামূলক শ্রমদানে, তাদের উন্নতির নামে যেসব রাস্তঘাট তৈরী করা হচ্ছে, আসলে তা অন্য স্বাধীন নাগাদের বিরুদ্ধে দ্রুত অস্ত্র রশদ ইত্যাদি সরবরাহের কাজে লাগান হত বলে। অন্য স্বাধীন নাগাদের কাছে নিজেদের অপরাধী আর বিশ্বাসঘাতক হিসাবে যেন চিহ্নিত হয়েছে তারা, এমনই এক মর্মপীড়ায় ভুগত কাবুঈ আর কাচারা। তাই শাসন বহির্ভূত অঞ্চলের নাগাদের মত প্রকাশ্য বিদ্রোহ না থাকলেও তার চেয়ে বহুগুণ অন্তর্জ্বালা নিয়ে পরাধীনতা বহন করে বেড়াত পরাধীন সম্প্রদায়ের নাগার দল।

এমন সময়ে এলে ১৯৩০ সাল। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। কয়েক মাস মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন স্তব্ধ হয়ে রইল, চট্টগ্রামের মহাবিদ্রোহের সংবাদ নাড়িয়ে দিল সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। আমরা ইতঃপূর্বেই পেশোয়ার আর শোলাপুরের গণ-বিদ্রোহের সংবাদ বলেছি। যুক্তপ্রদেশের কর বন্ধের আন্দোলন এক ব্যাপক গণ-বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই ঢেউ নাগা অঞ্চলকেও কাঁপিয়ে তোলে।

১৯৩ এর আগে থেকেই যাদুনাগ নামে এক যুবক নাগা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাগাদের সংগঠিত করছিলেন। এমনই এক সংগঠিত সভায় যাদুনাগ এর সঙ্গে পরিচয় হ'ল তারই এক সম্পর্কিত

ভগ্নী গাইদিলিউ-এর। গাইদিলিউ মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করে ছিলেন। সেখানেই নানা দেশের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর সঙ্গে তার পরিচয়। সংবাদপত্র মারফৎ সর্ব-ভারতীয় সংগ্রামের সংবাদও সে রাখত। জন্মসূত্রে ইংরেজদের সম্পর্কে যে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ তার মনে সংগুপ্ত ছিল—ঐ শিক্ষা গুণে তা তার বুকের মধ্যে সর্বদা এক ঝঙ্কার বেগ সঞ্চার করে রাখত। কিন্তু গাইদিলিউ তা প্রকাশের কোন পথ খুঁজে পেত না। যাদুনাগের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে গাইদিলিউ যেন সেই পথের সন্ধান পেল। তার বুকের মধ্যে যেন কালান্তের রক্ত দপ্ করে জ্বলে উঠল।

সমাবেশের শেষে সে এসে যাদুনাগকে বলল, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও দাদা। আমি জানি আমার বুকে যে আগুন জ্বলছে, তাতে আমি গোটা জাতকে জাগিয়ে তুলতে পারব।

যাদুনাগ হাসলেন। এ পথ বড় দুর্গম। হঠাৎ আবেগে এপথে এসো না। এ পথে এলে আর ঘরে ফেরা যায় না।

গাইদিলিউ বললেন, ঘর কোথায় যে ঘরে ফিরব! আর ইংরেজ রাজত্বে আমাদের পক্ষে কোন জায়গাই বা দুর্গম নয়! ভয় পেয়ো না দাদা। আমি হঠাৎ আবেগে পথে নামছি না।

কদিনের মধ্যেই যাদুনাগ বুঝলেন, তার বোন ভার ভাইতে দীপ্তিময়ী। তার বুকের উত্তাপে অন্যকে উত্তপ্ত করে তুলতে সে অব্যর্থ। কি তীব্র তার আবেগ, কি অব্যর্থ তার যুক্তি! কি সঠিক তার শব্দচয়ন। গাইদিলিউ সামান্য কয়েক মিনিটের ভাষণে উদ্দীপ্ত করে তোলে সকলকে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞায় ও আক্রোশে সংঘবদ্ধ হয় নাগারা। যাদুনাগ বুঝলেন, তাদের কর্মের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, গাইদিলিউ একাই তাকে যোগ্যরূপ দিতে পারবে। স্বেচ্ছায় যাদুনাগ সামনে এগিয়ে দিল বোনকে। নিজে পেছনে রইল হাল ধরে। মানুষকে উদ্দীপ্ত করবার, প্রভাবিত করবার,

সংঘবদ্ধ করবার যেন অলৌকিক ক্ষমতা গাইদিলিউ-এর—তার নিজেরও অত ক্ষমতা নেই।

১৯৩০ সালে সারা ভারতব্যাপী গণবিদ্রোহের মুখে যাদুনাগের ইঙ্গিতে গাইদিলিউ বিদ্রোহের আহ্বান দিলেন। প্রথম অবস্থায় অহিংস আন্দোলন শুরু হল প্রধানতঃ তিন দাবী নিয়ে। গোটা শাসিত অঞ্চলে গৃহকর, বেগার-খাটা এবং মজুরের কাজকরা বন্ধ হয়ে গেল।

ইংরেজ রাজকর্মচারীরা একে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে মনে করলেন। কোথাও কোথাও দাম্ভিক ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে দমিত করতে চাইল। বাদ প্রতিবাদের মুখে কয়েকস্থলে গুলিও চলল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রায় শতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জ্বালা আত্মপ্রকাশ করল মারাত্মকরূপে। গৃহকর আদায় করতে গিয়ে, বেগার খাটাবার লোক সংগ্রহ করতে গিয়ে কয়েক জায়গায় সরকারী কর্মচারীরা নিহত হলেন।

এ অঞ্চলের ইংরেজ শাসন কর্তা ছিলেন মণিপুরের ইংরেজ রেসিডেণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব। সংবাদ শুনেই তিনি এর গুরুত্ব অনুভব করলেন। তাঁর প্রধান আশঙ্কা দাঁড়াল শাসনাধীন অঞ্চলের এই বিদ্রোহের সঙ্গে স্বাধীন নাগাদের যোগাযোগ ঘটলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। অতএব নাগা অঞ্চলের শাসকদের তিনি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে বলে, প্রথমেই গোটা অঞ্চল সৈন্য-বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেললেন। তারপর চলল বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র যাদুনাগের অনুসন্ধান। ম্যাকডোনাল্ডের স্থির বিশ্বাস ছিল ঐ একটি লোককে সরিয়ে দিতে পারলে বিদ্রোহটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যাবে। আর তা ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়।

আশ্চর্য! সেই সহজ কাজটাই কঠিন হয়ে উঠল। একজন নাগা মুখ খুলল না। শত অত্যাচারেও যাদুনাগের সংবাদ সংগ্রহ করা গেল না। নাগাদের মাঝে এতদিন থেকেও অনেকেই

দুই নাগার মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারেন না। অতএব যাদুনাগ সন্দেহে গ্রেপ্তারের সংখ্যাও কম রইল না। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি! অবশেষে আকস্মিক ভাবেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধরাপড়ে গেলেন যাদুনাগ। উল্লসিত ইংরেজের দল তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারতে পারলেই হয়'ত খুশি হতেন তবু তারা একটা বিচারের আয়োজন করলেন। মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিচার শেষ করে তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বিদ্রোহী নায়ক মৃত্যু বরণ করে অমর হয়ে রইলেন।

ম্যাকডোনাল্ড ভেবেছিলেন যাদুনাগের মৃত্যুতে থেমে যাবে বিদ্রোহ। কিন্তু দাদার অসহায় ফাঁসি বরণে দুর্বার হয়ে উঠলেন গাইদিলিউ। সত্যিই এবার ভুললেন ঘরের মায়া, বাপমায়ের স্নেহ। অঙ্গে তার যোদ্ধার বেশ। হাতে বন্দুক, মুখে স্বদেশবাসীর মুক্তির বাণী। তার প্রেরণায় শত শত নাগা বিদ্রোহী গেরিলা-বাহিনীতে যোগ দিল। যারা গৃহে বসে রইলেন তাদের বুকেও গাইদিলিউ-এর দেওয়া স্বপ্ন—মুখে এক ধ্বনি, রাণী গাইদিলিউ-এর জয়। গোটা অঞ্চল যেন গাইদিলিউ-এর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

যোগ্য নেত্রীর মত পথ বেছে নিলেন গাইদিলিউ। পাহাড় পর্বতে আত্মগোপন করে থাকে তার দল। হঠাৎ পুলিশ বা সৈন্য বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে হতাহত করে ঝটিকার মত আবার মিলিয়ে যায়। মজার কথা হচ্ছে গাইদিলিউ-এর বাহিনী একই সঙ্গে দু-তিন যায়গায় আক্রমণ চালায়—একই ভঙ্গিতে একই পরিকল্পনায়। কোনটি যে সঠিক তার নেতৃত্বে তাও অনুমান করা যায় না।

১৯৩১ সাল পার হতে চলল। ইংরেজদল না পারলেন কর সংগ্রহ করতে, না পারলেন, বেগার বা মজুরের লোক সংগ্রহ করতে না পারলেন গেরিলা বাহিনীর উচ্ছেদ করতে। বিব্রত ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২-এর প্রথম দিকে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি গাইদিলিউ-এর

সংবাদ দিতে পারবে, তাকে দেওয়া হবে দুইশত টাকা এবং একটি বন্দুক।

ঘোষণা ব্যর্থ হল। নাগাদের মধ্যে কেউ এত বড় প্রলোভনেও তাদের রাণীকে ধরিয়ে দিল না। বরং ইংরেজদের সর্ব রকমে বয়কট করে চলল নাগাদল।

ম্যাকডোনাল্ড পুরস্কারের মাত্রা বাড়ালেন। এবার ধরিয়ে দেওয়া নয়, শুধু গতিবিধির সন্ধান দিলেই পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। আরও জানান হল, যে গ্রামের লোক এই বিদ্রোহিনীকে ধরিয়ে দেবার মত সূত্র দিতে পারবে, সে গ্রামের সমস্ত লোককে দশ বছরের জন্য গৃহকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

এতবড় ঘোষণাতেও ব্যর্থ হলেন ম্যাকডোনাল্ড। তাঁর দপ্তরে মাছিটিও এল না সংবাদ দিতে। বিব্রত রেসিডেণ্ট হঠাৎ এক সংবাদ পড়ে চমকে উঠলেন। এক নাগা গ্রামে ডাইনী সন্দেহে এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সংবাদ পড়তেই রেসিডেণ্টের মনের সামনে ফুটে উঠল ইতিহাসের একটা ছবি।

তখন ইংরেজরা অধিকার করে রেখেছে ফরাসী দেশ। ইংরেজদের বর্বর অত্যাচারে ফরাসী কৃষকের দল জর্জরিত। কে তাদের দেখাবে মুক্তির পথ। এমন সময় এগিয়ে এল যেন দৈব শক্তিতে বলীয়ান এক কৃষক কন্যা। আঠারো বছরের মেয়ে জোয়ানের দীপ্তিতে জ্বলে উঠল নিপীড়িত কৃষক কুল। ইংরেজ শক্তি একের পর এক পরাজয় বরণ করতে থাকল।

ফরাসীদেশ থেকে পাততাড়ি ওঠাতে হবে নাকি! ভাবিত ইংরেজরা নিপুণ ষড়যন্ত্র করল। কিছু ইংরেজ সমর্থক জমিদারের সাহায্যে ফরাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল মতবাদ—জোয়ান ডাইনী, তাই তার এত প্রভাব।

শব্দটার মোহে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য ফরাসী কৃষকের দল ডাইনীর কবলমুক্ত হতে জোয়ানকে বন্দী করে তুলে দিলেন

ভূস্বামীদের হাতে। তারা ইংরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে একটা বিচারের প্রহসন করে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে জোয়ানকে পুড়িয়ে মারলেন আগুনে। ফরাসীদের মধ্যে ডাইনীর কুসংস্কার আর ভীতি, ভাগ্যে ছিল, তাই ইংরেজরা রক্ষা পেল।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইলেন ম্যাকডোনাল্ড। সঙ্গে সঙ্গে মণিপুর রাজসভার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মণিপুর রাজসভা থেকে গাইদিলিউকে 'ডাইনী' বলে ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু সত্যি সত্যি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'ল না। নাগাদের কোন গাই বুড়োই রাণীকে ডাইনী ভেবে নিতে স্বীকৃত হল না। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড সৈন্যবাহিনীকে বর্বর অত্যাচার করে গাইদিলিউকে খুঁজে বের করবার হুকুম দিলেন।

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন লাউজলি নামে এক সেনাপতি এক বি[illegible] সেনাবাহিনী এনে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এবারেও গোটা অঞ্চল ঘিরে রাখল সৈন্যদল। তারপর এক একটা পৃথক গ্রামকে ঘিরে অন্বেষণের নামে অত্যাচার শুরু করলেন লাউজলি। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হতে থাকল। কোথাও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। কোথাও দৈহিক পীড়ন করা হল। নিদারুণ অত্যাচারে যে গ্রামে অন্বেষণ করা হল, সেখানে একজন মানুষও রইল না। এ অত্যাচারে শিশু ও নারীরাও অব্যাহতি পেল না।

এ ত' অত্যাচার নয়। এ ত' একটা গোটা জাতকে অস্ত্রের জোরে, পশু শক্তির জোরে, মানসিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়া মাত্র এক মাসের মধ্যে ইংরেজ সেনাপতি সংবাদ পেলেন গাইদিলিউ নাগা পাহাড় অঞ্চলে অনুচর সহ আত্মগোপন করে আছেন খানোমা গ্রামে। সেখান থেকে এক অভিযানের পরিকল্পনা হচ্ছে। অভিযানের আগে গাইদিলিউ ওখান থেকে নড়বেন না।

ঘুরপথে এগুতে থাকলেন ক্যাপ্টেন লাউজলি। দুর্গম পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠল। কিন্তু, লাউজলি বুঝি তার চেয়েও

অনমনীয়। চতুর্থ দিনে গভীর রাতে বুকে হেঁটে গ্রাম ঘিরে ফেলল ইংরেজ সৈন্যদল। মাছি পালাবারও পথ রইল না। তারপর ভোর হবার অপেক্ষায় রইল ইংরেজ বাহিনী।

১৭ ই অক্টোবর। ভোর হতে না হতে সঙ্গীন উঁচিয়ে প্রতি বাড়িতে অনুসন্ধান শুরু হল। স্তম্ভিত গ্রামবাসীরা প্রতিরোধের সুযোগ পেল না কিন্তু তবু রক্তের বান বইল। আগুনের ধুম ছুটল। হত্যা-অগ্নিকাণ্ড, অত্যাচারের মাঝে অনুচর-সহ গাইদিলিউ বন্দী হলেন। এত অত্যাচার মৃত্যুর মধ্যেও সকলে রাণীর জন্য অশ্রু-বিসর্জন করতে থাকল।

বন্দীদের নিয়ে আসা হল মণিপুরে। রেসিডেন্ট এবং সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বসলেন বিচারকের আসনে। নরহত্যা এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল।

একুশ বছর বয়সে নাগা বিদ্রোহের নায়িকা রাণী গাইদিলিউ প্রবেশ করলেন কারাগারে। তার অবর্তমানে নাগা বিদ্রোহ স্বভাবতঃ স্তিমিত হয়ে এল।

বিদ্রোহের অবসান হ'ল বটে কিন্তু রাণী বেঁচে রইলেন নাগাদের মনে। ১৮৩৫ সালে নব প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রদেশের মত আসামেও কংগ্রেস-সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বহু রাজবন্দী মুক্তি পেলেন। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এই বীরাঙ্গনাকে মুক্তি দিতে ভুলে গেলেন সবাই।

নাগারা ভুললেন না। শুরু হল তাকে মুক্তির আন্দোলন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থনে তা পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। বাধ্য হয়ে ১৯৩৯-এ জওহরলাল এলেন আসামে। জওহরলাল সব সংবাদ সংগ্রহ করলেন। তিনি সব তথ্য সাজিয়ে এক পুস্তিকা প্রচার করেন Release Giedileu 'গাইদিলিউকে মুক্তি দাও।'

অবশেষে ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। সমগ্র নাগাভূমি আবার গর্জে উঠল, রাণী গাইদিলিউ-এর জয়।

ছাব্বিশ

বিদ্রোহ দিকে দিকে

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ যখন দেশকে তোলপাড় করছে তখন এই আন্দোলনের মধ্যে থেকেও সব প্রদেশেই কিছু কিছু লোক অন্যদলও গড়ে তুলেছেন। গড়ে তুলেছে বিপ্লবী সংস্থা। এই দলগুলি এবং তাদের আন্দোলনের পরিস্থিতিটা একটা বিশাল সমুদ্র আর তার বিচ্ছিন্ন ঢেউ বলে কল্পনা করা যায়। এরা সকলেই প্রকাশ্যে ছিলেন সেই বিশাল সমুদ্রের অংশ—যার মুখ্য প্রবক্তা গান্ধীজি। অথচ তারা গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হওয়ায় গোপনে ভিন্ন নামে ছিলেন বিপ্লববাদী।

এ সময়ে আমাদের দেশে এসেছে সাম্যবাদী চিন্তা। গড়ে উঠেছে শ্রমিক সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা—মত বিমত নানা চিন্তার আঘাত সংঘাতের শত শত তরঙ্গের স্পন্দন। কিন্তু এ সব স্পন্দন একেবারে সাধারণ মানুষের প্রাণের গভীরে নাড়া দিতে পারত না দেখেই কংগ্রেসের অহিংস পতাকার তলে সকলে সম্মিলিত হয়ে 'কংগ্রেস' নামটাকে সার্থক করে তুলত। আসলে কংগ্রেস ত' তখন কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল নয়—সারা

ভারতবর্ষের কাছে সেদিন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের প্রতীক—স্বদেশ প্রেমিকদের মিলন মঞ্চ।

এজন্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক ধরে যে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের ঢেউ আসছিল তা চতুর্থ দশকে পা দিয়ে যেই গান্ধীজি আহ্বানে থেমে গেল, অমনি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল বিপ্লবীদল-গুলির ক্রিয়াকর্ম। প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল তারা। এই অধ্যায়ে আমরা তেমন কয়েকজনের গল্প বলব।

প্রথমেই গোপীনাথ সাহার গল্প বলা যাক। বাবা-মরা ছেলেটি পড়ত শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে বেরিয়ে এসেছিল স্কুল থেকে। সে এসে ধর্ণা দিল কলকাতা ফরবেশ হাউসে—কংগ্রেস অফিসে। দেশের কাজ করবে সে। কিন্তু বছর বার-তেরর ছেলেকে ভলেন্টিয়ার করে ত' পাঠান যায় না। কিন্তু ফেরানও যায় না ছেলেটিকে। সে ঝুলি কাঁধে মুষ্টি-ভিক্ষা করে, করে রুগীর সেবা। ক্রমে গোপী এসে জুটল হুগলী বিদ্যামন্দিরে। ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত. প্রফুল্ল সেন ইত্যাদি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন ছেলেটিকে।

১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গে হল বন্যা। ত্রাণ কার্য্যে প্রফুল্ল রায় হলেন সভাপতি, সুভাষচন্দ্র সম্পাদক। গোপীনাথ যোগ্যতা দেখিয়ে হল গ্রুপ-ক্যাপ্টেন। অমানুষিক পরিশ্রমে অসুস্থ হল গোপীনাথ। প্রফুল্ল রায়, সুভাষচন্দ্র নিয়ত খোঁজ নেন—কবে সুস্থ হবে সে। কাজের লোক প্রচুর কিন্তু নিষ্ঠাবান আর প্রকৃত আত্মত্যাগী কজন মেলে। কিন্তু গোপী সুস্থ হতে হতে বন্যা কমে গেল। গোপীর হাতে কাজ নেই।

এ সময়ে এক বিচিত্র মানসিকতা পেয়ে বসল তাকে। মানিকতলা বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে নরেন গোঁসাই শ্রীরামপুরের নাম ডুবিয়েছে। সে নামকে পুনরুদ্ধার করবে সে। তার টার্গেট-ও স্থির করে ফেলল সে। কলকাতা পুলিশের বড় সাহেব 'টেগার্ট'।

গোপীনাথ তার বাসনার কথা যাকেই বলে, সেই হেসে উড়িয়ে দেয়। ছোট বলে কেউ পাত্তা দেয় না তাকে। মন ভুলাতে কখনও পাঠায় লাইব্রেরীতে কখনও কলকাতায় বা বাইরে। এতে গোপীর সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়। গোপী নজরুলের অগ্নিবীণা পড়ে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে।

হঠাৎ সে একদিন নজরুলের ধূমকেতু অফিসে এসে হাজির। বুকে জ্বালা ধরানো কবিতা আর প্রবন্ধ লেখে যারা তারা নিশ্চয় তাকে সমর্থন করবে। সাহায্য করবে। কিন্তু ও কি! ধূমকেতু অফিসে হাসি! সবাই হো হো হাসছে! ধিক্কার দিয়ে উঠল গোপীনাথ। ছিঃ হাসতে লজ্জা করে না আপনাদের। দেশ যখন পরাধীন, অত্যাচারী শাসক যখন প্রতিদিন অসম্মান আর পীড়ন করছে তখন আপনারা হাসছেন! ছিটকে বেরিয়ে এলো গোপীনাথ।

কে জানে কোথা থেকে পিস্তল সংগ্রহ করল সে, কোথায় শিখল পিস্তল চালাতে! কিন্তু ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারী ভোরবেলা চৌরঙ্গী আর পার্কস্ট্রীটের মাঝামাঝি সে লাফিয়ে পড়ল টেগার্টের সামনে। প্রথম গুলিতেই ধরাশায়ী হলেন তিনি। কিন্তু যদি না মরে। বাকি সব গুলিও শেষ করল গোপীনাথ।

এবার পালাতে চাইল। একটা ঘোড়ার গাড়িকে পিস্তল দেখিয়ে থামিয়ে উঠল গোপীনাথ। তখন জনতা তাড়া করেছে ওকে। গাড়োয়ান উচিত মত চালাচ্ছে না। ভবানীপুরের কাছাকাছি লাফ দিয়ে নেমে পালাতে গেল সে। জনতা ধরে ফেলল। তুলে দিল পুলিশের হাতে। আহত ক্লান্ত পর্যুদস্ত গোপীনাথ থানায় এসে জানল, টেগার্ট বলে যাকে সে মেরেছে, সে টেগার্টের মত দেখতে হলেও আসলে মিস্টার ডে। অনেকেই ওদের ভুল করত। সেই ভুলই করেছে গোপীনাথ। টেগার্ট ভেবে সে মেরেছে ডে কে।

আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভিক গোপীনাথ বলল, সে ভুল করে ডে কে মেরেছে, এ জন্য সে অনুতপ্ত। তার লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী

টেগার্ট। এ পরিকল্পনা তার একার। দেশমাতার আহ্বানে টেগার্টকে বলি দিতে গিয়েছিল। সে পারে নি। সে মায়ের অক্ষম সন্তান। কিন্তু টেগার্ট মরবেনই। আর এক দেশকর্মী তুলে নেবে অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব।

বিচারক তার ফাঁসির হুকুম দিলেন। শুনে গোপীনাথ বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আমার মঙ্গল করলেন। গোপীনাথের এক এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়বে আর আর একশ' আটটি করে গোপীনাথের জন্ম হবে।

এক প্রবল আবেগের মাঝে চলে গেল একক বিপ্লবের সাধনার অমর গোপীনাথ। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন গোপীনাথের সাহস ও দেশপ্রেমের প্রশংসা জানিয়ে এক প্রস্তাব আনলেন। কংগ্রেস সম্মেলনে বিপ্লবীকে সম্মান জানিয়ে সেই প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

*　　*　　*　　*

এমন আর এক আত্মত্যাগী মানুষ ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। না, আজাদ তার উপাধি নয়। কেমন করে তার নামের সঙ্গে আজাদ কথাটা যুক্ত হয়ে গেল সে গল্পও বলব।

১৯০৬ সালে মধ্য প্রদেশের 'ভাওরা' নামে এক গ্রামে চন্দ্রশেখরের জন্ম হয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। মাত্র তের বছর বয়সে পালিয়ে আসেন বোম্বাই। নৌকোয় কাজ করার কাজে লাগলেন। কিন্তু মন লাগল না। গেলেন কাশীতে। ভর্তি হলেন সংস্কৃত বিদ্যালয়ে। সেখানে চন্দ্রশেখরের পরিচয় হয় ছোটখাটো শীর্ণদেহ একটি ছেলের সঙ্গে। এক ক্লাস ওপরে পড়ে সে। নাম তার লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। অসহযোগ আন্দোলনে দুজনেই নেতৃত্ব দিলেন বিদ্যালয় বয়কটের। এই প্রসঙ্গেই চন্দ্রশেখর প্রথম ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম?

চন্দ্রশেখর উত্তর দিল, আজাদ

ঃ তোমার বাবার নাম ?

ঃ স্বাধীনতা।

ঃ তোমার বাড়ির ঠিকানা ?

ঃ সরকারী জেলখানা। কেয়ার অফ জেলার।

উত্তর শুনে ম্যাজিস্টেট পনের বেত সাজা দেন। আশ্চর্য, যা কেউ হজম করতে পারে না, তিন চার বেতের পর অজ্ঞান হয়ে যায়, সেই বেত শেষ পর্যন্ত সহ্য করল চন্দ্রশেখর। তারপর বলল, তোমাদের ম্যাজিস্টেটকে বলো বেত মেরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা যায় না।

এই সময়ে উত্তর প্রদেশে গঠিত হয়েছে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি। শচীন সান্যাল স্থির করেন তার কর্ম পদ্ধতি। তিনি সমস্ত বিপ্লবীকে সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। বোমার কারখানা তৈরী হয়। সংগ্রহ হতে থাকে অস্ত্র। চন্দ্রশেখর এদের দলে যোগ দেন।

এইচ-আর-আইতে এ সময় আর যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিসমিলের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি।

১৮৯৭ সালে রামপ্রসাদের জন্ম হয় শাজাহানপুর জেলায়। ছেলেবেলায় তাঁর দুরন্তপনার শেষ ছিল না। এই সময় হঠাৎ তাঁর হাতে এলো আর্য-সমাজী নেতা স্বামী দয়ানন্দের 'সাত্যার্থ প্রকাশ' পত্রিকা। তিনি আর্য-সমাজে যোগ দিলেন। সহজ, সরল, প্রায়-সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন শুরু করলেন তিনি। লেখাপড়া শুরু করলেন। দেশের ইতিহাস, অন্য দেশের বিপ্লবের কথা পড়তে পড়তে তিনি মনে মনে দেশের জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন। লিখলেন নানা ছোট ছোট বই। যোগ দিলেন ভারতের রাজনৈতিকদল 'কংগ্রেসে'।

কিন্তু মন খুশী হ'ল না তার। ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে, ভিক্ষে চেয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না, এ বিশ্বাস

জন্মাল তাঁর। তিনি উগ্রপন্থী তিলকের সমর্থক হলেন। এই সময়েই বিখ্যাত বিপ্লবী গেণ্ডালাল দীক্ষিত তাঁকে বিপ্লবীদলে টেনে নিলেন।

১৯১৯ সালে 'মৈনপুর ষড়যন্ত্র' মামলায় রামপ্রসাদ প্রথম বন্দী হলেন। কিন্তু মামলা টিকল না, রামপ্রসাদ ফিরে এলেন বাড়িতে। গোটা অঞ্চলে রামপ্রসাদ এক মস্ত মানুষ হিসাবে সম্মান পেতে থাকলেন।

এই সময় তাঁর কাছে ঐ অঞ্চলের এক মুসলমান যুবক এলো। নাম আসফাকউল্লা। ধনী পরিবারের ছেলে। বাড়ীর অন্য সকলে সরকারী দপ্তরে মস্ত মস্ত কাজ করেন। কিন্তু আসফাক্ শান্ত জীবন চায় না। সে দেশের কাজ করতে চায়।

এ সব ফাঁকা আবেগ বলে রামপ্রসাদ তাড়িয়ে দিলেন আসফাক্‌কে কিন্তু যুবক এঁটে রইল আঠার মত। রামপ্রসাদ একটু একটু পরীক্ষা করে বুঝলেন, ছেলেটা মনেপ্রাণে খাঁটি বিপ্লবী। দলে টেনে নিলেন তাকে। ১৯২৩ সালে রশোন ঠাকুর বলে এক রাজপুত দু'বছর জেল খেটে এসে যোগ দিলেন তাদের দলে।

আর একটি যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হ'ল এইচ-আর-আই-এর। নাম তার রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। বাংলাদেশের পাবনা জেলার ছেলে সে। তার বাবাও বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ছেলেটি এসেছিল কাশী বিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ. পড়তে। নানাপত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখত সে। ক্রমে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁকে দলে টেনে আনলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন রামপ্রসাদের সঙ্গে। উত্তর প্রদেশে জোর সংগঠন গড়ে উঠল।

কাজ কাজ আর কাজ। সভ্যসংখ্যা বাড়ছে। নতুন নতুন জায়গায় সংগঠন তৈরি হচ্ছে। এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বই ছাপানো দরকার। যাতায়াতের জন্য ব্যয় আছে। আছে সর্বসময়ের কর্মীদের ভরণপোষণ, সংগ্রহ করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র। অর্থ

চাই। প্রচুর অর্থ। উপায়? চাঁদায় কাজ চলে না। অতএব সুদখোর মহাজনের এবং সরকারী টাকা লুট করতে হবে।

কতকগুলো ছোটখাট ডাকাতিতে মোটামুটি কাজ চলার মত অর্থ এলেও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, তা কোথায় পাওয়া যায়? সংবাদ এলো (১৯২৫ সালের) ৯ই আগস্ট তারিখে লক্ষ্ণৌগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এক সিন্দুক বোঝাই সরকারী টাকা যাচ্ছে। রামপ্রসাদের দল স্থির করলেন ঐ টাকা লুট করতে হবে। কাকোরী নামে ছোট একটা রেল স্টেশনকে ওরা নির্বাচন করলেন। ঐ স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে কিছুদূর যেতেই চেন টানলেন বিপ্লবীরা। গাড়ি থেমে গেল। গার্ড, ড্রাইভার আর সেপাইদের বন্দী করে ফেলল বিপ্লবীরা। যাত্রীদের বলল, আপনাদের ভয় নেই। আমরা সরকারী টাকা লুট করব। দেশের কাজে।

ওরা সিন্দুকটা নামিয়ে ফেলল। আসফাকের ব্যায়াম-করা পুষ্টপেশীর জোরে দশসেরী হাতুড়ির ঘা পড়ল তালার ওপর। ভেঙ্গে গেল তালা। রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বিপ্লবীরা।

পুলিশ উঠে পড়ে লাগল আসামীদের পাকড়াও করতে। কিন্তু ওরা নির্বিকার। অর্থের অভাব দূর হয়েছে, অতএব সবদিক থেকে সংগঠন বড় করবার চেষ্টা করতে থাকলেন। রাজেন্দ্রকে পাঠান হ'ল বাঙলাদেশে, সে সেখান থেকে শিখে আসবে বোমা তৈরীর কৌশল। রৌশন চেষ্টা করতে থাকলেন বিদেশী অস্ত্র সংগ্রহের। আসফাক আত্মগোপন করে সংগঠনকে বড় করে তুলতে লাগলেন।

১৯২৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সঙ্গে বহু জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় সবাইকেই গ্রেপ্তার করে ফেলল। কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে ধরা পড়লেন রাজেন্দ্র। কিন্তু আসফাক্‌কে ধরা গেল না।

জেলের ভেতরে বন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন করলেন রামপ্রসাদ আর রৌশন। একবার জেলভেঙ্গে পালাবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

এদিকে দিল্লীতে একেবারে কর্তৃপক্ষের বুকের ওপর বসে বিপ্লবের কাজ করতে করতে আসফাকও ধরা পড়লেন। এক মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট আর একজন পুলিশ অফিসার তাকে বোঝাতে থাকলেন, কেন তুমি হিন্দুদের সঙ্গে মিলছ? রামপ্রসাদরা তো চাইবে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। এর চেয়ে সব কথা বলে দিয়ে, মার্জনা চেয়ে নাও।

আসফাক সতেজে জবাব দিলেন, ওরা আমার কাছে হিন্দু নয়··· হিন্দুস্থানী। আমরা হিন্দুর স্বাধীনতা চাই না, চাই হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা। আর যদি হিন্দুর স্বাধীনতাই আসে, আসুক না। আমি ইংরেজের অধীনতার চেয়ে হিন্দুর অধীনতা অনেক বেশী পছন্দ করি; কারণ ইংরেজ বিদেশী···আর হিন্দু হিন্দুস্থানেরই।

রুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন অফিসাররা।

একদিন রূপসী এক নারী দেখা করতে এল আসফাকউল্লার সঙ্গে। মেয়েটি তার পূর্ব-পরিচিতা। পলাতক জীবনে মেয়েটি আসফাককে অনেক আদর যত্ন করেছে। আশ্রয় দিয়েছে। আজ বলল, আসফাক! ছেড়ে দাও বিপ্লবের পথ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

আসফাক হেসে বললেন, সুন্দরী! জান না! বিয়ে আমার হয়ে গেছে। ঐ দেখ বাসর শয্যার জন্য অপেক্ষা করছে ফাঁসির দড়ি।

কাঠগড়ায় এসে মিলিত হ'ল বন্ধুরা। এতো বিচারালয় নয়— বিপ্লবীদের সম্মেলন স্থল। আদালতে রামপ্রসাদ বিসমিল হাতকড়িতে তাল ঠুকে গাইতে থাকলেন স্বরচিত গান।

আমার প্রিয় মৃত্যু আসি বুকের মাঝে নাচে
দেখব আজি ঐ ঘাতকের শক্তি কত আছে॥
সব বাসনা ঘুচে গেছে নাইকো কলরব।
বিসমিলের বুকের মাঝে মৃত্যুরই উৎসব॥

বিচারক রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা, রৌশন ঠাকুর আর রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসির হুকুম দিলেন।

জেলখানায় বিসমিলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তার মা। কিন্তু একি তার শান্ত সংসার-বিবাগী সন্ন্যাসী ছেলের চোখে জল। মা আকুল হয়ে বললেন, একি বাবা! শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তোর চোখে জল।

বিসমিল বললেন, ভুল বুঝো না মা। আমি নিজের জীবনের জন্য কাঁদি নি। আমার কান্না দুই মায়ের জন্য। এতদিন আমার জন্মভূমি মায়ের জন্য কেঁদেছি। আজ তোমার জন্য কাঁদলাম। তোমার বড় দুঃখ হবে, না মা!

মা বললেন. পুত্রের মৃত্যুতে সব মা-ই দুঃখ পায় বাবা। কিন্তু তোর মত ছেলের মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ কোথায় বাবা! তুই যে আমার গর্ব--আমার গৌরব।

বিসমিল মাকে প্রণাম করে বললেন. পরজন্মে যেন তোমাকে আবার মা পাই। আবার যেন ভারতের বুকে আমার জন্ম হয়।

মা আশীর্বাদ করলেন।

১৯২৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে ফাঁসি হ'ল রাজেন্দ্রের। মৃত্যুর আগে সে বলে গেল. আমার মৃত্যুতে কেউ যেন চোখের জল না ফেলে। আমি যেন আবার ভারতে জন্মাই।

১৯ তারিখে দুই ভিন্ন জেলে ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন বিসমিল আর আসফাক। বিসমিল তখনও গেয়ে চলেছেন—

আমার প্রিয় মৃত্যু আজি বুকের মাঝে নাচে।
দেখব আজি ঐ ঘাতকের শক্তি কত আছে॥

আসফাক দড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, অপেক্ষা কর প্রিয়। এই তো এসেছি। আজ আমাদের সুখের মিলন বাসর।

২১ ডিসেম্বর নাইনি জেলে ফাঁসি হল রৌশন ঠাকুরের। ফাঁসির মঞ্চে উঠে তিনি চিৎকার করে বলতে থাকলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস

হোক! হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। বন্দেমাতরম্। ভারতমাতা কি জয়!!!

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় সন্ধান মেলেনি শুধু চন্দ্রশেখরের। চন্দ্রশেখর বলতেন, তিনি কোন দিন জেলের প্রাচীরের মধ্যে যাবেন না। সেই প্রথম মামলা থেকে তার নাম হয়ে গেছিল আজাদ। পুলিশও তাকে আজাদ বলে জানত'। চন্দ্রশেখর সঙ্গীদের বলতেন, আজাদ কখনও বন্দী হয়।

বন্দী হলেন না আজাদ। পলাতক জীবনে কখনও কাউকে ঠিকানা দিতেন না। অসাধারণ ছিল তার ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতা। কতবার পুলিশের বেষ্টনীতে পড়েছেন। কতবার পড়েছেন পুলিশের জেরার মুখে। কিন্তু যেমন সাহস, তেমন ছিল তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

একবার তিনি সাধুদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন সাধুর বেশে। সেই গ্রামেই হ'ল খুন। পুলিশ এসে তাদেরও জেরা করতে থাকল। বলল, বল নাম।

সাধুবেশী আজাদ ধমকে উঠলেন। তুমি হিন্দু না মুসলমান! সাধুকে নাম জিজ্ঞেস করছ! জান না পূর্ব আশ্রমের কথা সাধুকে স্মরণ করাতে নেই। তাতে তার ব্রত ভঙ্গ হয়। তুমি কি আমার ব্রতভঙ্গের পাপ গ্রহণ করতে চাও।

সাধুর ধমকে হিন্দু দারোগা জড়োসড়ো হয়ে মাপ চেয়ে সরে গেল।

আর একবার এক দারোগা তাকে ধরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আজাদ?

চন্দ্রশেখর মৃদু হেসে বললেন, জী সাহাব! সাধু আজাদ ছাড়া কি। সব বন্ধন থেকে মুক্তিই তো তার লক্ষ্য। শুধু আমি নই সব সন্ন্যাসীই তো আজাদ!

এ সময়ে চন্দ্রশেখরের সম্পর্ক গড়ে উঠল হিন্দুস্থান-সোসালিস্ট

রিপাবলিশান পার্টির সঙ্গে। এই পার্টির ভকৎ সিং আর শুকদেবের সঙ্গে। একদিন ভকৎ সিং নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভাই-সাহেব! আপনি যে এমন বেপরোয়া ঘুরে বেড়ান, আপনার ভয় করে না!

হেসে কবিতা রচনা করে উত্তর দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর,

যেদিন থেকে শুনেছি ভাই
মৃত্যুরই নাম জীবন।
সেদিন থেকে যমকে খুঁজি
মাথায় বেঁধে কাফন॥

সত্যিই যেন যমদূতকে খুঁজে ফিরেছেন চন্দ্রশেখর। পলাতক অবস্থাতেই নানা অ্যাকশানে যোগ দিয়েছেন। জেল ভেঙ্গে বন্ধুদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন—সর্বাত্মক বিপ্লব গড়বার।

এ সময়ে ভারতে এল সাইমন কমিশনের সভ্যেরা। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন তীব্র হ'ল। এই আন্দোলন চলা কালে পাঞ্জাবে লাঠি চালালেন পুলিশ সুপার স্কট। লালা লাজপৎ রায় আহত হলেন। সেই আঘাতেই মারা গেলেন লাজপৎ। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন সোসালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি।

এ পার্টির নেতা তখন ভকৎ সিং। তেজি রূপবান ছেলে। তার বাবা কিষাণ সিং এবং কাকা অজিত সিংও এক সময় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। লাহোর ন্যাশনাল কলেজে পড়াশুনা করে ভকৎ। সেই কলেজের জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ক্রমে ভকতের যোগাযোগ হয় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে। ভকৎ সিং-এর প্রেরণা এবং চেষ্টাতেই লাহোরে 'নওজোয়ান ভারতসভা' গড়ে ওঠে।

দলের কাজ করতে গিয়েই ভকৎ বুঝেছিলেন, সংগঠন গড়বার মতই কাজ হচ্ছে আদর্শ প্রচার। এ কাজে মেতে উঠলেন ভকৎ।

একদিকে পড়া অন্য দিকে লেখা আর একদিকে সংগঠন গড়া। চব্বিশ বছর বয়সের যুবক মেতে উঠল নানা কাজে। বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্য কানপুরের 'প্রতাপ' 'প্রভা', দিল্লীর 'অর্জুন', এলাহাবাদের 'চাঁদ' এবং অমৃতসরের 'কীর্ত্তি' পত্রিকায় ইংরাজী, হিন্দী গুরুমুখী ভাষায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ভকৎ গোটা উত্তর ভারতের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেন, হয়ে উঠলেন একটি নাম। সকলে তাকে এক পাবক-শিখা হিসাবে দেখতে থাকল।

ভকৎ এ সময়ে স্কটকে হত্যা করতে চন্দ্রশেখর আজাদ, আর শিবরাম রাজগুরুকে নিয়ে উপস্থিত হলেন স্কটের বাংলোতে। পরিকল্পনা মত গুলি করবেন ভকৎ। সঙ্গীরা তার পার্শ্বরক্ষা করবেন আর ছড়িয়ে দেবেন ইস্তাহার।

নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলেন সবাই। দিনের বেলা। অদূরে ডি. এ. ভি কলেজ, কলেজ হোস্টেল এবং আদালত। সেখানে রয়েছে তিন তিন খানা সাইকেল। বিপ্লবীরা কাজ সেরে পালাবে।

সময় মতই স্কটের বাংলো থেকে বেরিয়ে এল সাণ্ডার্স নামে এক সাহেব। যার সংকেত করবার কথা সে সংকেত করল না। কিন্তু রাজগুরু অপেক্ষা করলেন না। সাণ্ডার্স মটর বাইকে উঠতে যাচ্ছিলেন। রাজগুরুর গুলিতে পড়ে গেলেন। আহত রাখব না এ ছিল বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা। অতএব ভকৎ পর পর পাঁচটি গুলি চালিয়ে দিলেন তার ওপর। সাণ্ডার্স সেখানেই মারা গেলেন। তার দেহের চার দিকে লাল কালিতে লেখা ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এবার বিপ্লবীরা নির্ভীক পায়ে চলে যেতে থাকলেন।

কিন্তু তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলেন এক ইউরোপীয় সার্জেন এবং চন্দন সিং নামে এক সেপাই। পিছন ফিরে সার্জেনকে গুলি করলেন রাজগুরু। সার্জেন এক লাফে গুলি এড়িয়ে গেলেন কিন্তু পড়ে তার পা গেল মচকে। তার পক্ষে আর তাড়া করা সম্ভব নয়।

কিন্তু চন্দন সিং ছুটছে। রাজগুরু বললেন, তুমি ভারতীয় তোমাকে মারতে চাই না। তুমি সরে যাও।

চন্দন বলল, তুমি যাও। তোমাকে নয় আমি ঐ লোকটিকে ধরতে চাই। বলে চন্দন ছুটল ভকৎসিং-এর পিছনে।

বিচিত্র মিছিল চলেছে। আগে ভকৎ। তাকে ধরতে তার পিছনে চন্দন সিং আর চন্দনকে বোঝাতে বোঝাতে তার পিছনে রাজগুরু। সে দিকে তাকিয়ে এ অবস্থাতেও হাসলেন আজাদ। তারপর নিখুঁত নিশানায় রাজগুরুকে এড়িয়ে চন্দনকে গুলি করে ফেলে দিলেন। হঠাৎ না দেখা চন্দনের বৌ ছেলেমেয়ের ছবি ভেসে উঠল চোখে। চন্দ্রশেখর চন্দনকে প্রাণে মারলেন না।

সকলে উঠে গেলেন দয়ানন্দ অ্যাংলো বেসিক কলেজ হোস্টেলের ছাদে। ভকৎ বললেন, এখানেই যুদ্ধ করে প্রাণ দেব।

চন্দ্রশেখর বললেন, প্রয়োজনে প্রাণ দেব। কিন্তু অপ্রয়োজনে নয়। পালাবার সুযোগ আছে। চল পালাই। আরো কাজ করা যাবে।

পালালেন তিনজন। পুলিশ কারো সন্ধান পেল না।

তারা শুধু জেনেছিল আক্রমণকারীদের একজন দাড়ি-গোঁফ ওয়ালা মানুষ। ভকৎ দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেললেন। চলে গেলেন কলকাতায়। সেখান থেকে কাশী. বিলাসপুর. সাহারাণপুর লাহোরে নানা রাজনৈতিক অ্যাকশন করে ভকৎ এলেন দিল্লীতে।

তখন দিল্লীতে আইন সভার অধিবেশন চলছে। সরকার চাইছেন একটি দমনমূলক এবং একটি শ্রমবিরোধী বিল পাশ করিয়ে নিতে। আইন সভার সভ্যেরা সাধারণ ভাবে এ বিলের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় ইচ্ছা করলে ভেটো দিয়ে সকলের আপত্তির বিরুদ্ধেও যে কোন বিল পাশ করিয়ে নিতে পারতেন। এ অর্থে সেদিন সভা থাকা না থাকা সমান ছিল। ভকৎ স্থির করলেন ঐ আইন সভাকেই আক্রমণ করবেন! সে হবে তাদের আদর্শ প্রচারের সুযোগ।

ভকৎ সিং যখন এ সব স্থির করছেন, তার আগেই এক সকালে চন্দ্রশেখর সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। সেটা ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সকাল। এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কের এক বেঞ্চে এসে বসলেন চন্দ্রশেখর। একটু পরেই সেখানে এল সুখদেব রাজ নামে এক রাজনৈতিক কর্মী। গোপন আলোচনা শুরু করলেন ওরা।

কিন্তু সেদিন একটু বুঝি অসতর্ক ছিলেন চন্দ্রশেখর। নইলে সুখদেও রাজের পিছনে পিছনে বীরভদ্র তেওয়ারীর নামে যে এক চর এসে তাকে দেখে চিনে ফেলে ছুটেছে কোতোয়ালীতে—সেটা তার চোখ এড়িয়ে যেত না। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। তাই তেওয়ারীর কথায় সি. আই. ডি পুলিশ সুপারেনটেনডেণ্ট মিঃ নটবাউয়ার কাছাকাছি চলে এলেও দেখতে পেলেন না কেন চন্দ্রশেখর! তারা যখন গজ কুড়ির মধ্যে এসে গেছে, তখন সচেতন হয়েই গুলি চালালেন চন্দ্রশেখর। পুলিশও গুলি চালাল। একটা গুলি লাগল নটবাউয়ারের গায়ে, চন্দ্রশেখর আহত হলেন উরুতে। পুলিশ হতভম্ব। সেই সুযোগে এক গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গীকে তখুনি পালাতে বললেন। সুখদেও এক যুবকের সাইকেল কেড়ে নিয়ে পালালেন। চন্দ্রশেখরের মুহুর্মুহু গুলিতে পুলিশ ক্রমেই পিছু হটতে থাকল।

এদিকে ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিং নামে এক সিপাই ঘুরপথে গিয়ে একটা গুলি চালালেন চন্দ্রশেখরের পিঠে। । চন্দ্রশেখর ঘুরে এক গুলিতে চোয়াল উড়িয়ে দিলেন তার।

গোটা আলফ্রেড পার্কে যুদ্ধের উত্তেজনা। একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন চন্দ্রশেখর। বুঝে নিয়েছেন যে আজ আর পালান সম্ভব নয়। মনে পড়েছে বন্ধুদের ঠাট্টা আর তার উত্তর। কোন বিপ্লবী বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিল, তুই যা মোটা, তোকে সাধারণ দড়িতে ফাঁসি দিতে পারবে না ইংরেজরা।

একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, ফাঁসি তো তোমাদের জন্য, আমার জন্য নয়।

আমি ত' শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়ব।
আমি যে আজাদ ভাই আজাদেই মরব॥

আজ এই মুহূর্তে কবিতাটা আর একবার আবৃত্তি করে নিলেন মনে মনে। তারপর প্রস্তুত হলেন মুখোমুখি শেষ লড়াই-এর জন্য।

ইতঃমধ্যে কর্ণেলগঞ্জ থানা থেকে রায় সাহেব বিশাল সিংচৌধুরী রাইফেলধারী সিপাহীদের বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সব দেখছে আজাদ। আর যুদ্ধ চলতে পারে না। গুলিও শেষ হয়ে এসেছে। তবু 'আমি যে আজাদ ভাই, আজাদেই মরব।' চন্দ্রশেখর কোনদিন ফাঁসিতে ঝুলবে না। অতএব ব্রিটিশ সরকারকে নতুন দড়ি তৈরীর ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজের কপালে নল ঠেকিয়ে শেষ গুলিটি উজাড় করে দিলেন। পুলিশ তাও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সকলে এক রাউণ্ড করে ফায়ার করে ছিন্নভিন্ন করে দিল চন্দ্রশেখরের দেহ।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। দলে দলে লোক এসে হাজির হতে লাগল অলিন্দে ও পার্কে। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন আর কমলা নেহেরু এক বিশাল মিছিল নিয়ে এসে থানায় চন্দ্রশেখরের দেহ দাবী করল। মিছিলের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চালাতে গোপনে কড়া পুলিশী পাহারায় মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হ'ল রসুলবাদ ঘাটে।

কেমন করে সে সংবাদ পেয়ে গেল প্রতিবাদীরা। জনতা ছুটল ঘাটে। শচীন সান্যালের স্ত্রী প্রতিমা সান্যাল এসে আজাদের চিতার ছাই তিলক করে পরলেন। সে ছাই-এর তিলক নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। চন্দ্রশেখরের অস্থি মাথায় করে মিছিল বের হ'ল।

সংবাদ শুনে ভকৎ সিং এবং তার বন্ধুরা বিদ্রোহী চন্দ্রশেখরকে

প্রণাম জানালেন। আগামী অ্যাক্‌সনে চন্দ্রশেখর পাশে থাকবে না। কিন্তু তার প্রেরণা কাজ করবে। ঠিক, ঠিক। শুধু চন্দ্রশেখরই তো আজাদ নয়। আজাদ আমরা প্রত্যেকটি মাতৃমন্ত্রী সন্তান। আজাদ দীর্ঘজীবি হোক।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল। সকালবেলা সবে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশন শুরু হয়েছে, সভার সদস্যরা, সরকারী আমলা, সাংবাদিক, সাধারণ দর্শক এমন কি বিশিষ্ট দর্শকের আসনে স্যার জন সাইমন সাহেবও বসে আছেন।

দর্শকদের গ্যালারি থেকে উঠে দাঁড়াল দুটি যুবক। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে ছুঁড়ল দুটি বোমা। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল সে দুটি। এক টুকরো পাথর কুচিও ছিটকাল না। শুধ্‌ শব্দ আর ধোঁয়া। তারপরেই ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন ওরা। যা'র প্রথম কথাই হচ্ছে,

'কালা-কানকে শোনাতে একটু বড় শব্দই করতে হয়!'

এরপর হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলেন ভকৎ সিং আর তার সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত। ওরা বললেন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আঘাত করতে আসি নি। আমরা আঘাত করতে এসেছি প্রতিষ্ঠানকে। এই ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। এ সভা স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতন্ত্রী ব্রিটিশ-শাসনেরই প্রতীক। এ শুধু নামেই ভারতীয়। এর অস্তিত্ব এবং কার্য ভারতের পরাধীনতারই নামান্তর।

পুলিশের কাছে গোটা ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে লাগল। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে দুটিকে গ্রেপ্তার করতেও তারা ভয়ে কাঁপতে থাকল। অবশেষে সাহসে ভর করে ধরে নিয়ে গেল তাদের।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতেই তারা বললেন, মানব জীবনকে তারা শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে। তাই হত্যা তারা করতে চান না তাদের প্রতিবাদ নির্বীর্য আইন সভার ওপরে। যে আইন সভা ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে না, যা স্বাধীনতা

কর্মীদের দমন করতে আইন পাশ করে তাতে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকলেও তা বিদেশী শাসকের ছায়ামাত্র। তাতে স্বদেশের কোন মঙ্গল নেই।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত ওরা বললেন, জন সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। আইনের নাগপাশে বা অত্যাচারের নিগড়ে আর তাকে আটকে রাখা যাবে না। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে যে অত্যাচার দিয়ে মানুষকে দমন করা যায়, হত্যাও করা যায়—আদর্শকে দমন করা যায় না। আর যে জাত আদর্শের জন্য, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু-বরণ করতে শিখেছে, সে জাত অভয়, অমর—তার স্বাধীনতা আসবেই আসবে।

ভকৎ সিংদের বক্তব্য প্রতি কাগজে প্রকাশিত হ'ল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে গেল তাদের নতুন আদর্শের বাণী। ক'দিনের মাঝে বটুকেশ্বর দত্ত আর ভকৎ সিং বুঝিবা গান্ধীজির চাইতেও প্রিয় মানুষ হয়ে উঠলেন ভারতবাসীর কাছে।

ইংরেজ সরকার জানতেন যে আইন সভার মাঝে বোমা ফেলার মামলায় ভকৎ সিংদের বেশি দূর শাস্তি দেওয়া যাবে না। অতএব তারা তাদের অন্য মামলায় জড়াবার চেষ্টা চলতে থাকল। চল্‌ল ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার। বন্দীদের ওপর চল্‌ল পীড়ন। এ অবস্থায় হঠাৎ একজন রাজসাক্ষী হয়ে স্যাণ্ডার্স হত্যার কথা প্রকাশ করে দিল।

এই সূত্র ধরেই নূতন করে শিবরাম রাজগুরু আর শুকদেবের খোঁজ শুরু হ'ল। প্রায় ন' মাস পরে ১৯২৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পুলিশ পুনায় নিজের বাড়ির কাছে গ্রেপ্তার করল রাজগুরুকে। আর তার আগে ১৫ই এপ্রিল লাহোরে একটা ছোট যে বাড়িতে বোমা তৈরীর কারখানাই গড়ে তুলেছিলেন সেখানেই ধরা পড়েন শুকদেব।

একে একে বন্দীরা এসে মিলিত হতে থাকলেন জেলে, আর

আনন্দের উল্লাস বইল। তারা হাসি ঠাট্টা গানে যেন উত্তাল হয়ে উঠলেন। পুলিশ কিন্তু এ সব সহ্য করল না। নিতান্ত সাধারণ চোর ডাকাতের মত আচরণ করতে থাকল তাদের সঙ্গে। নিয়ত নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলতে থাকল তাদের ওপর। অসহ্য হয়ে বন্দীরা ১৪ই জুন থেকে অনশন শুরু করলেন।

অনশন ভাঙ্গাবার যত পথ আছে সব গ্রহণ করল পুলিশ বাহিনী। জলের কুঁজোয় জলের বদলে দুধ ভরে রাখল। তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেবার উপায় নেই। এ সময়ের ভুক্তভোগীর বর্ণনা আছে পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক অজয় ঘোষের 'ভকৎ সিং এণ্ড হিজ কমরেডস্' বইতে।

বন্দীদের অনশনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বাইরে! সারা ভারতের মানুষ অস্থির উত্তাল হয়ে উঠল। ব্যবস্থাপক-সভা এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিতে বাধ্য হয়। দেশের লোকের উত্তেজনা অনুভব করে কংগ্রেস-কমিটি এই অত্যাচারের প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করে ৪ঠা অক্টোবর তাদের অনশন ভঙ্গ করান। একমাত্র যতীনদাসকে এ সর্ত্তেও রাজী করান যায় না। তিনি প্রতিরোধ না হলে অনশন ভঙ্গ করবেন না এ প্রতিজ্ঞা করে অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন।

সকলের সব আবেদন উপেক্ষা করে যতীনদাস তেষট্টি দিন অনশন চালিয়ে গেলেন। জোর করে খাওয়ালে যতীনদাস বমি করে ফেলতেন। ফলে দিনে দিনে তার দেহের শক্তি কমে গেল। স্পন্দন স্তিমিত হয়ে এল। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন। যতীনদাস স্মরণ করিয়ে দিলেন আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্ময়কর মানুষ টেরেন্স ম্যাকসুইনির। তিনিও অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন জেলখানায়। যতীনদাসের মৃত্যুতে টেরেন্স পত্নী মেরী ম্যাক্‌সুইনি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, "টেরেন্স ম্যাকসুইনির আত্মীয়-স্বজন শোকে ও গর্বে

যতীনদাসের মৃত্যুতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর সঙ্গে যুক্ত হ'ল। ভারতের স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত।"

যতীনদাসের মৃতদেহ কলকাতায় পৌঁছালে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দল সুশৃঙ্খল স্তব্ধতার সঙ্গে শোক মিছিল বের করল। স্তব্ধ কলকাতা। কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তার দুপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বীরের সম্মান দিল। যারা তাঁর মরদেহ বয়ে নিয়ে চললেন তাদের প্রথমেই ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কেওরাতলা শ্মশানে বৃদ্ধ পিতা অকম্পিত কণ্ঠে এক মাত্র যে মন্ত্রপাঠ করে তার আত্মার শান্তি কামনা করলেন, তা হ'ল, 'যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের পুত্রকে তোমার চরণে সমর্পণ করলাম।'

এদিকে বিচারের নামে সর্বপ্রকার রীতিনীতি বর্জন করে ভকৎ-সিংদের লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা চলতে থাকল। এমন কি আসামীদের অনুপস্থিতিতেও শুনানী চল্‌ল। অবশেষে রায় বের হল ভকৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসি। আর বটুকেশ্বর প্রভৃতি আটজনের হল দ্বীপান্তর।

ভকৎ-সিং এর ফাঁসির হুকুম রদ করবার জন্য আন্দোলন উঠল। কিষেণ সিং সরকারের কাছে আবেদন করলেন। শুনে পুত্র ভকৎ সিং বাবাকে চিঠি লিখলেন। বললেন, আপনার এ কাজকে আমি সমর্থন করছি না। আপনি আজীবন দেশভক্ত। তা জানি বলেই আপনাকে বিশ্বাসঘাতক বলছি না। পুত্র স্নেহে দেশের অমঙ্গল ডাকবেন না। জানবেন আমার বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুতে দেশের মঙ্গল হবে।

দেশের লোকের দাবী মেনে গান্ধীজি বড়লাটের কাছে দাবী করলেন ভকৎ সিং-এর দণ্ড মকুব করতে। শোনা যায় লাট-সাহেব নাকি রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু এতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের আই-

সি-এসরা নাকি একযোগে পদত্যাগের হুমকি দেন। তাতে লাট-সাহেব মত বদলাতে বাধ্য হন।

ভকৎ সিং-এর উকিল এসে জানান যে, গান্ধীজি, এক তারবার্তায় সংবাদ পাঠিয়েছেন যে ভকৎ সিং যদি হিংসাত্মক রাজনীতি পরিত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা ছেড়ে দিতে রাজী থাকেন, এবং এ মর্মে লাটসাহেবকে চিঠি দেন, তবে তার ফাঁসির মকুব হতে পারে।

শুনে সব রাজবন্দীরা ধিক্কার দিলেন। কিন্তু ভকৎ সিং চিঠি লিখতে রাজী হলেন। লিখলেও তাতে লেখা রইল—'আপনার বিচারকেরা বলেছেন, আমরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। তা হলে আমরা যুদ্ধবন্দী। আমাদের প্রতি তাই যুদ্ধবন্দীর মত আচরণ করা হোক। আমাদের ফাঁসি নয়—গুলি করে হত্যা করুন।'

এ সব চিঠির কোন গুরুত্বই ছিল না ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তারা সমগ্র দেশ ও চিন্তাকে উপেক্ষা করে ফাঁসির আয়োজন করল। ২৩শে মার্চ পৃথিবীর সমস্ত রীতির বাইরে সন্ধেবেলা ফাঁসি দেওয়া হল তিন জনকে। আত্মীয়-স্বজনের হাতে তারা মৃতদেহগুলি দেবার সৌজন্যও দেখালেন না। নিজেরাই শতদ্রু নদীর তীরে পুড়িয়ে ফেলল দেহগুলি। কিন্তু গোটা দেশের বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল তাদের শেষ ধ্বনিগুলি :—

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।
সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ।'

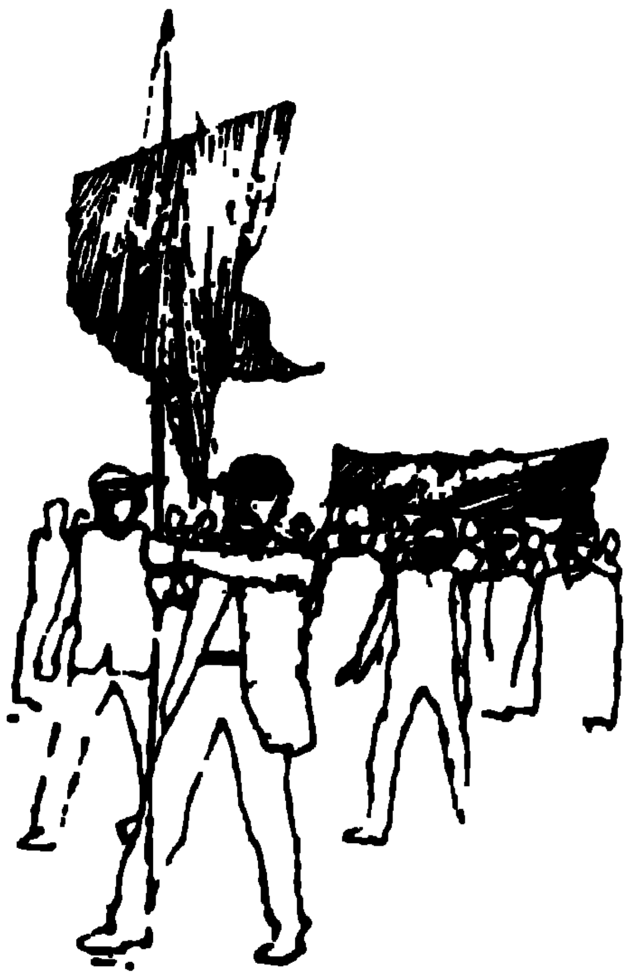

সাতাশ

বাঘের ঘরে যুদ্ধ

একটির পর একটি অভ্যুত্থান ও পতনের ভেতর দিয়ে অসহযোগ থামল কি? না। কোথাও স্ফুট কোথাও অস্ফুটভাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকল। এবার এ প্রসঙ্গে আমি এখানে কয়েকটি গল্প শোনাব।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও-ডায়ার ইংলণ্ডে বীরের সম্মান নিয়ে বাঁচলেও ভারতবর্ষের সব মানুষ যে তার কথা ভুলে গেল এমন নয়। তার ওপর শোধ নিতে পাঞ্জাব থেকে ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্র উধম সিং।

অত্যাচারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার গুপ্ত প্রবণতা সে-কালে বহু বিপ্লবীই পোষণ করতেন। উধম কারো সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেননি তাঁর সঙ্কল্প। তবু তাঁর প্রচেষ্টা ঐতিহ্যশূন্য ছিল না। তাঁর আগে আর একজন পাঞ্জাবী তাঁর প্রায় একত্রিশ বছর আগে লণ্ডনের বুকে আর এক চক্রান্তের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তিনি মদনলাল ধিংড়া।

জানিনা মদনলাল ধিংড়ার কাহিনী উধম সিংকে অনুপ্রাণিত

করেছিল কিনা। কিন্তু এই নেহাৎ ভাল ছেলে উধম সিং যে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনার দিন থেকেই ও-ডায়ারকে হত্যার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, তা জানা গেল তার মৃত্যুর পর তার ডাইরি থেকে। শুধু ডায়ার নয়, তার তালিকায় আরও নাম ছিল। তার একজন ইংলণ্ডের সেক্রেটারী-অব-স্টেট, ফর ইণ্ডিয়ার মিঃ জেটল্যাণ্ড, পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্নর লুইসডেন আর বোম্বাই-এর প্রাক্তন গভর্নর লর্ড লেসিংটন।

আশ্চর্যভাবে সব কজনাকে একই সভায় পাশাপাশি মঞ্চের ওপর পেলেন উধম সিং। ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ। 'রয়েল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি' এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আহূত হয়েছিল এক সভা। স্বয়ং সেক্রেটারী অব স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া মিঃ জেটল্যাণ্ড হলেন সভাপতি। অন্যেরা এসে যোগ দিলেন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে।

সভা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এমন সময় উধম উঠে দাঁড়িয়ে করল গুলি। একদিন নিরস্ত্র সহস্র মানুষকে হত্যা করেছিল যে ডায়ার—এক গুলিতেই লুটিয়ে পড়ল সে। বুঝি একটু আনন্দে চঞ্চল হলেন উধম। তার হাত কাঁপল। তার অন্য লক্ষ্যগুলি ভ্রষ্ট হল না। কিন্তু ওরা প্রাণে বেঁচে গেলেন। আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন সবাই।

পালালেন না উধম। নিশ্চিন্তে ধরা দিলেন। পুলিশ নাম শুধাল। উধম বললেন, আমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ। যেন, ভারতের সর্ব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে তার মধ্যে। পুলিশ খুঁজে বের করল তার প্রকৃত পরিচয়। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হ'ল। শুনে উধম বললেন, যে অত্যাচারী ও-ডায়ার শত শত মানুষকে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী করে পশুর মত হত্যা করেছে, পাঞ্জাবের পথে পথে বুকে হাঁটিয়ে মানহানী করেছে শত শত স্ত্রী-পুরুষ মান্য-জনকে—তাকে হত্যা করা আমি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি।

আমি স্বজন হত্যার শোধ নিয়েছি। আমার মাথায় রয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

১৯৪০ সালের ১২ জুন উধম সিং-এর ফাঁসি হ'ল ঐ পেণ্টনভেলি জেলেই।

* * *

মদনলাল বা উধম সিং-এর মত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের আরও এক গল্প এবার বলব। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনের পার্ককে আজ বলে বি-বা-দি বাগ। এই নামকরণের পিছনে লুকিয়ে আছে বিনয়-বাদল আর দীনেশ নামে তিন যুবকের আত্মত্যাগের গল্প। অসাধারণ আত্মত্যাগের এত বড় দৃষ্টান্ত সত্যিই তুলনাহীন।

এটিও ১৯৩০ সালের ঘটনা। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। দিকে দিকে জেগে উঠেছে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। ১৮ই এপ্রিল সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে যুব-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল—তা ব্যর্থ হয়েছে। সূর্যসেন পলাতক। সেই সময় কলকাতায় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন বিনয়-বাদল আর দীনেশ। এ গল্প বলবার আগে, তিন যুবকের একটু পরিচয় বলে নেওয়া যাক।

বিনয়ের পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুর জেলার রাউতভোগ গ্রাম। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রেবতীভূষণ বসু। রেবতীভূষণের অন্যান্য গুণের মধ্যে ছিল শিকার-দক্ষতা। শৈশবেই বিনয় বাবার কাছ থেকে বন্দুক চালনা শিখে নিয়ে ছিল। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হ'ল ঢাকা মিটফোর্ড কলেজে—ডাক্তারী পড়তে।

বিনয় তার আগে থেকেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সে ছিল সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের স্বেচ্ছাসেবক। ঐ দলে সে মেজর পদে উন্নীত হয়েছিল। দলের লোক তাই তাকে বলত' মেজর বিনয় বসু।

আর্মানিটোলায় মেডিকেল হোস্টেলে থাকার সময় বিনয়ের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যোগাযোগ ঘটে। তারা স্থির করে অত্যাচারী পুলিশ-ইন্স্‌পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন জল পুলিশের সুপারিটেনডেন্ট মিঃ বার্ড। ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট সকাল বেলা ডিউটিতে এসে বিনয় দেখল চারদিকে বড়ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সাজান গোছান ভাব। জানা গেল মিঃ লোম্যান আসছেন ব্যক্তিগত বন্ধু মিঃ বার্ডকে দেখতে। শুনেই বিনয় তার গুপ্ত পরিকল্পনা সফল করবার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলল। ছুটল রিভলভার জোগাড় করে আনতে।

ফিরে এসে মূল গেট দিয়ে ঢুকতে পারল না বিনয়। কর্তারা এসে গেছেন। অন্য গেট দিয়ে এসে বিনয় দেখল ঢাকার সিভিল-সার্জেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান এবং ঢাকার সুপার মিঃ হাডসন। তাদের অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন এক কনট্রাক্টার সত্যেন সেন। বিনয় অনুগত ছাত্রের মত এগিয়ে গেল এবং চকিতে লোম্যানের বুকে পর পর দুটি গুলি মারল। পুলিশ সুপার হাডসন ঘুরে দাঁড়ালেন বিনয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকেও গুলি করলেন বিনয়। হাডসন আহত হয়ে পড়ে গেলেন। লোম্যানের দিকে তাকিয়ে বিনয় বুঝল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

পরপর দুজনকে মৃত ও আহত হতে দেখে সিভিল সার্জেন হত-বুদ্ধি হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি হলেন না সত্যেন সেন। তিনি যেই বুঝলেন যে বিনয়ের রিভলভারে আর গুলি নেই, অমনি জাপটে ধরলেন বিনয়কে।

কিন্তু তাকে আটকে রাখা অত সহজ ব্যাপার নয়। হকি-টেনিসে বিনয়ের জুড়ি ছিল না। কুস্তি বক্সিং জানত বিনয়। অতএব এক প্যাঁচে তাকে কুপোকাত করে ফেলে লাগাল বিরাশি সিক্কা এক ঘুঁসি। কণ্ট্রাক্টার সাহেব ছিটকে পড়লেন। বিনয়

হাসপাতাল এবং স্কুলের মধ্যের রাস্তায় রিভালভার ফেলে দিয়ে পালাতে লাগল।

কিন্তু পথে বিপত্তি। কাজ করছিল কুলি শ্রেণীর কিছু লোক। তারা তাড়া করল বিনয়কে। বিপদ বুঝে বিনয় ঘুরে দাঁড়াল। চাদরের তলায় শূন্য হাতে এমন ভঙ্গি করল যে তারা ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল পালাল।

সেখান থেকে কখনও মেডিকেল মেসের পায়খানার ছাদ, কখনও অন্যের বাড়ির দেওয়াল ইত্যাদি টপকে সে এসে মিশল আর্মানিটোলা-ময়দানের জনতায়—সেখান থেকে বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটিতে।

আপাতঃভাবে বিপ্লবীরা ভাবলেন যে বিনয় সকলের অজান্তেই কাজটা সেরে আসতে পেরেছে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল ভিন্ন রকম। একটি মেডিকেল-ছাত্র বিনয়কে চিনেছিল। সে নাম বলে দিল। একটি খেলার গ্রুপ ফটো থেকে পাওয়া গেল বিনয়ের ফোটোগ্রাফ। সরকার তার ছবি দিয়ে হুলিয়া বের করে দিলেন।

বিপ্লবীরা বিনয়কে আর ঢাকায় রাখা নিরাপদ বোধ করলেন না। সুপতি রায় দায়িত্ব নিলেন বিনয়কে কলকাতা নিয়ে যাবার। অনেক ঘুর পথে কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও স্টিমারে কখনও রেলে করে ওরা এসে পৌঁছালেন কলকাতায়।

মেটিয়াবুরুজে থাকতেন রাজেন্দ্র গুহ। সংঘের খুব পুরোণ সভ্য। তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিল বিনয়। রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী সরযূদেবী পরম স্নেহে তাকে তুলে নিলেন। সেখানে বিনয় অপেক্ষা করতে থাকল আরও বৃহৎ কর্ম সংঘটনের জন্য।

রাইটার্স-বিল্ডিং আক্রমণের দ্বিতীয় বীর বাদল গুপ্ত বা সুধীর গুপ্ত। তার জন্ম ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। লেখা পড়ার সুবিধা হবে বলে বাদলকে ছেলেবেলাতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাকার কাছে পাটনায়। গর্দানীবাগ মধ্য ইংরাজী স্কুলে পড়তে বাদল হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ

হয়ে যায়। বছর তিনেক পর হঠাৎই একদিন ফিরে আসে সে। তাকে নাকি একজন সন্ন্যাসী নিয়ে গিয়েছিল—আবার সেই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

ভাইপোকে হারিয়ে কাকা যতদূর ব্যস্ত হয়েছিলেন, পেয়েও তার থেকে কম ব্যস্ত হলেন না। এ ছেলে আবার কবে পালায় কে জানে! অতএব দায় এড়াতে কাকা তাকে পাঠিয়ে দিলেন বাবার কাছে। বাবা তাঁকে বানরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন।

সেই সময় ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন নিকুঞ্জ সেন। তিনি বিভিন্ন দলের হয়ে বিক্রমপুরে বিশেষ সংগঠন গড়বার দায়িত্ব নিয়ে ঐ স্কুলে যান। বাদল সহজেই নিকুঞ্জবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি তাকে বিপ্লবকর্মে দীক্ষা দিলেন। বাদল ১৯৩০ সালের অসহযোগের ধারায় টেলিগ্রাফের তার কেটে পুলিশের নজরে পড়ল। নিকুঞ্জবাবু তাকেও পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়।

এই যুদ্ধের তৃতীয় বীর দীনেশ গুপ্ত। এর বাড়িও ছিল ঢাকায় — যশোলং গ্রামে। বাবার নাম সতীশচন্দ্র। জন্ম হয় ১৯১১ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

দীনেশ গুপ্ত মস্ত বড় সংগঠক ছিলেন। তিনি ঢাকায় এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ঢাকার শ্রীসংঘের কর্মী ছিলেন তিনি। এ সংঘ গড়েছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। দীনেশ গুপ্তের সময়ে ঐ দলে ছিলেন অনিল রায়, সত্যবক্সী, লীলা রায়, সত্যগুপ্ত ইত্যাদি বিপ্লবীরা।

১৯২৮ সালের কাছাকাছি মেদিনীপুরে যুবসংঘ নামে একটি দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে স্থানীয় উকিল যতীশ গুপ্তের বাড়িতে এলেন তার ভাই দীনেশ গুপ্ত। অচিরে দীনেশ মেদিনীপুর যুবসংঘের প্রাণ পুরুষ হয়ে উঠলেন।

পরের বছর স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এলেন সংঘের প্রকাশ্য অধিবেশনে। তার পর থেকেই দীনেশ প্রয়োজনে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে

থাকলেন স্থানীয় যুবকদের। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল—তারা প্রায় সকলেই ছিলেন দীনেশ গুপ্তের ছাত্র।

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মধ্য রাত্রে যখন স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করা হয়, তখন জওহরলালজীর পাশে মেদিনীপুর দীনেশ-শিষ্যেরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উপস্থিত ছিলেন—পুলিশ আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করবার জন্য।

দীনেশ গুপ্তের শিষ্য যতিজীবন ঘোষ এবং বিমল দাশগুপ্ত ১লা এপ্রিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করল অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডিকে। পরের বছর ত্রিশে এপ্রিল শনিবার বিকেলে জেলাবোর্ডের মিটিং-এ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে হত্যা করল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। তার পরের বছর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জকে হত্যা করল অনাথবন্ধু পাঁজা আর মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। তখন মৃগেন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আর অনাথ পড়ে স্কুলে।

এই বিপ্লবী সংগঠকের নামও খুব সহজেই পুলিশের জানা হয়ে যায়। দীনেশ গুপ্তকেও পলাতক জীবন কাটাতে হয়। এই অবস্থাতেই বিনয় বাদল দীনেশ মিলিত হলেন কলকাতায়।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর। রসময় সুর নামে এক ভদ্রলোক রাজেনবাবুর মেটিয়াবুরুজের বাড়ি থেকে একটি ট্যাকসি করে নিয়ে এলেন বিনয়কে। ট্যাক্সি এসে থামল খিদিরপুরের পাইপ রোডে। ঠিক তখনই আর একটি গাড়িতে করে পার্কসার্কাসের এক গুপ্ত আশ্রয় থেকে দীনেশ আর বাদলকে নিয়ে এলেন নিকুঞ্জ সেন। ওরা তিনজন এবার একত্রে এক ট্যাক্সিতে করে রওনা হলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে।

ওদের লক্ষ্য রাইটার্স বিল্ডিং এর মত সরকারী দুর্গে উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের হত্যা করে ইংরেজ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলা। এজন্য প্রফুল্ল দত্ত নামের এক কর্মচারী বহুদিনের পরিশ্রমে রাইটার্স-

বিল্ডিং-এর দোতলার একটা পরিপূর্ণ নক্সা তৈরী করে দিয়েছেন। তাতে সিঁড়ির কোন দিকে কোন ঘরে কোন অফিসার বসেন, ঘরে প্রধান আসবাব পত্র কি কি, কোথায় কি আছে, তার সব সংকেত দেওয়া ছিল। নক্সাটি এত নিখুঁত যে তা দেখে দেখে রাইটার্স-বিল্ডিং-এর সব চেনা হয়ে গেল বিপ্লবীদের। তার ওপরে নিকুঞ্জ সেন কৌশলে একদিন রাইটার্স ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন বিনয়কে। বিপ্লবীরা সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে চলল রাইটার্স বিল্ডিং।

তিনজনে নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরেছেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে নির্দ্বিধ ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন ওরা। ওরা প্রথমেই উপস্থিত হলেন কারা বিভাগের সর্বাধিনায়ক কর্নেল সিম্পসনের ঘরে। এঁর নির্দেশেই বন্দী বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। অতএব সিম্পসনই তাদের প্রথম লক্ষ্য।

বিনয়-বাদল দীনেশ বিনা বাধায় তার ঘরে ঢুকল। সিম্পসন তখন কাজ করছিলেন চেয়ারে বসে। তাঁর পি. এ. ফাইল পত্র এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তিন বিপ্লবী ঘরে ঢুকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় হুকুম দিলেন, ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে দুটি গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল সিম্পসনকে। সিম্পসন লুটিয়ে পড়ল। তারপর তারা একে একে হানা দিতে থাকল প্রতি ঘরে। গুলির শব্দে রাইটার্সে পালাবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। শ্বেতাঙ্গেরা (বিপ্লবীদের ভাষায় সাদা পাঁঠা) আতঙ্কিত হয়ে পালাতে থাকলেন। জুডিশিয়াল সেক্রেটারি নেলসন, সেক্রেটারি টয়নাম প্রভৃতি জাঁদরেল অফিসার হুড়মুড় করে পালালেন সিঁড়ি দিয়ে। এক পাদ্রী সাহেব এসেছিলেন কাজে। তিনি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জলের পাইপ ধরে নামলেন নীচে। মুহূর্তে পুরো কর্মব্যস্ত রাইটার্স বিল্ডিং একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

সাফল্যের আনন্দে তিন বিপ্লবী জয়ধ্বনি দিলেন—বন্দে-মাতরম্। সে চিৎকারে পাশের লালবাজারে পুলিশ দপ্তর বুঝি বা কেঁপে উঠল।

কিন্তু তাদের কাঁপাবার জন্য এ জয়ধ্বনি নয়। এ ধ্বনিও সংকেত। অদূরে অপেক্ষা করছে জিতেন সেন নামে এক বিপ্লবী। সে সংকেত শুনে গিয়ে সংবাদ দেবে রসময়বাবুর কাছে—চিড়িয়াখানার মোড়ে। রসময়বাবু সেখান থেকে যাবেন নেতাদের কাছে।

ততক্ষণে লালবাজার থেকে পুলিশ আই. জি. মিঃ ক্রেগ, পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডনের নেতৃত্বে এক বিশাল রাইফেল ধারী পুলিশ বাহিনী রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে ফেলেছে। বিপ্লবী তিনজন তখন পাসপোর্ট অফিস আক্রমণে ব্যস্ত। এমন সময় ধীরে ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে পুলিশ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনজনে পুলিশ বাহিনীকে দেখতে পেলেন। মেজর বিনয়ের নির্দেশে শুয়ে পড়লেন তিন জন। তিনটি পিস্তল গুলি বর্ষণ করে চলল। পুলিশ বাহিনী সিঁড়িতে অচল। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ছে তারা। তারই একটি দীনেশ গুপ্তের পিঠের বাঁ দিকটা ভেদ করে গেল। কিন্তু সেসব দিকে নজর নেই বিপ্লবীদের। তারা মুহুর্মুহু ধ্বনি দিচ্ছেন বন্দে-মাতরম্। তিন-কণ্ঠ ফাঁকা অলিন্দে কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তিন শত কণ্ঠ হয়ে। পুলিশেরও ধারণা কয়েক শত বিপ্লবী ঢুকে পড়েছে। আতঙ্কিত পলাতকেরাও একটা ধারণা গড়ে দিয়েছে। পুলিশ ইতস্তত করছে এগুতে।

বিপ্লবীরা দেখলেন তাদের গুলি ফুরিয়ে আসছে। আসবেই এটা জানা কথা। সব তো ভেবেই এসেছেন ওরা। ওরা তো প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার জন্য আসেন নি—প্রাণ দেবার জন্যই এসেছেন। নেতার নির্দেশের অপেক্ষা।

বিনয় নির্দেশ দিলেন। তিনজনে ছুটে গিয়ে ঢুকলেন একটি ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিলেন। শ্রান্ত বাদল একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দীনেশ এবং বিনয় সামনে দাঁড়িয়ে। বিনয় বলা মাত্র

তিনজন মুখে পুড়ে দিলেন পটাসিয়াম সায়নাইডের এম্পুল। চিবিয়ে গুড়ো করলেন বাদল। ঢলে পড়লেন চেয়ারে।

দীনেশ আর বিনয় বুঝি আরও দ্রুত মুক্তি চাইলেন। ওরা সায়নাইড এম্পুল মুখে দিয়েও নিজ নিজ মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন। তুজনেই ঢলে পড়লেন—কিন্তু ভুল হয়ে গেল এ্যাম্পুল চিবুতে।

পুলিশ ততক্ষণে দরজার সামনে এসে গেছে। কিন্তু দরজা খুলবার সাহস নেই কারো। ভিতরেও সাড়া শব্দ নেই। বিপ্লবীদের কি পরিকল্পনা কে জানে! সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন টেগার্ট। দরজাটা ফাঁদ কিনা কে জানে! তবু এক সময় ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দিলেন টেগার্ট। না, তবু গুলি আসছে না। ওরা সাহস করে ঢুকে পড়লেন।

সামনে চেয়ারে মৃত এক যুবক। মেঝেতে লুটিয়ে আর তু'জন। মাত্র তিন। আর নেই! বিপুল বিস্ময়ে বিশাল বাহিনী ভাবল মাত্র তিনজনেই এত বড় বিভীষিকা!

পুলিশ দেখল একজন মৃত হলেও বাকী তু'জনের দেহে তখনও প্রাণ রয়েছে। অতএব দ্রুত তাদের পাঠান হ'ল মেডিকেল কলেজে। ওদের বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। তারপর নিপীড়ন করে বের করতে হবে ওদের সমগ্র দলকে। অতএব সর্বপ্রকার যত্নে আত্মদানে ব্যস্ত তুই বীরকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হ'ল।

কিন্তু কি এদের পরিচয়! বহু চেষ্টায় ক্ষীণভাবে অনুমান করা গেল বাদলের পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে আনা হ'ল বাদলের কাকাকে। তিনি ভাইপোকে সনাক্ত করলেন। পুলিশের হেফাজতে নিমতলা শ্মশানে দাহ করা হ'ল তাকে। সর্ব রকম যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও পর দিন কাগজে কাগজে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়ে গেল।

এদিকে বিনয়কে নিয়ে চিকিৎসকদের তুশ্চিন্তার প্রায় অবসান হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে জ্ঞান ফিরে এসেছে তার। এবার বেঁচে

উঠবে বিনয়। তারা সরকারকে আশ্বাস দিলেন—বিনয়কে ফিরিয়ে আনা যাবে।

কিন্তু বিপ্লবীর সঙ্কল্প বড় তীব্র। জ্ঞান ফিরতেই অবস্থাটা বুঝল বিনয়। তার মাথায় গুলির ঘা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ খুলে ঘা-এর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে সব ঘুঁটে দিল বিনয়। অসহ্য যন্ত্রণায় আবার তার জ্ঞান লুপ্ত হ'ল। হে ঈশ্বর! এই যেন তার শেষবারের মত লুপ্ত হয় জ্ঞান।

ডাক্তারেরা এবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিনয়কে রক্ষা করতে পারলেন না। ১৩ই ডিসেম্বর শেষ রাতে বিনয় ইহলোক ত্যাগ করে গেল। নগরের সমস্ত লোক এবং পুলিশ সবিস্ময়ে দেখল কলকাতার রাস্তায়, দেওয়ালে দেওয়ালে লাল রং-এ লেখা Benoy's Blood Beckons More Blood বিনয়ের রক্ত আরও রক্ত আহ্বান করছে।

দীনেশ গুপ্ত কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর পিঠের গুলিটি মারাত্মক ছিল না। নিজের গুলিটি থুথনি দিয়ে ঢুকে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হলেও ডাক্তারদের তৎপরতায় তিন সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন দীনেশ। তাঁকে বিচারের আয়োজন করা হ'ল এক ট্রাইবুনাল বসিয়ে। তারা ফাঁসির হুকুম দিলেন। ১৯৩০ সালের ৭ই জুলাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হ'ল তাঁর। কিন্তু বিচারপতি গার্লিকের নাম বিপ্লবীদের খাতায় লেখা হয়ে গেল।

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির মাত্র কুড়ি দিনের ব্যবধানে আলিপুর সেসন-কোর্টের মধ্যেই গার্লিককে নিহত করল কানাই ভট্টাচার্য নামে এক তরুণ। গুলি করেই সে খেল সায়নাইড। পুলিশ গার্ডরাও তাকে গুলি করল। তার পকেটে একটা কাগজ পাওয়া গেল। তার থেকে পুলিশ ধারণা করল তার নাম বিমল দাশগুপ্ত—বি. ভি. দলের দুর্দ্ধর্ষ সংগঠক। বিমলকে মারতে পেরেছে ভেবে তারা

উল্লসিত হ'ল। কিন্তু কাগজের উল্টো পিঠে কি সাংঘাতিক কথা।

ধ্বংস হও গার্লিক।

দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার নাও।

বিপ্লবীরা ছাড়া আর কেউ জানলেনই না যে কানাই নিজের জীবন দিয়ে শুধু গার্লিককেই সরিয়ে দিয়ে গেলেন না, বিপ্লবী সংগঠক বিমল দাশগুপ্তকেও বিপদ মুক্ত করে আরও কাজের সুযোগ করে দিলেন।

আঠাশ

লবণ সত্যাগ্রহ

১৯৩০ সাল।

প্রমত্ত তিরিশ। এ তিরিশের সূচনা করেছিলেন জওহরলাল। ইরাবতী নদীর তীরে বাঙলার বি. ভি. দলের স্বেচ্ছাসেবকদের আগ্নেয়াস্ত্র সহ রচিত বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশাল জনতার সামনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা মেলে ধরে তিনি বল্‌লেন, আর যদি আমরা ব্রিটিশ শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে চলি, তাহলে মানুষ এবং ঈশ্বর উভয়ের কাছেই আমরা অপরাধী।

উত্তেজনায় এবং আশায় নতুন ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠল ভারতবর্ষ। চারিদিকে সংগ্রামের উন্মাদনা। দায়িত্ব দেওয়া হ'ল গান্ধীজির ওপর নতুন সংগ্রাম-সূচী তৈরী করবার।

এ বছরের ২৬শে জানুয়ারী প্রতিপালিত হ'ল 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করল।

এগুলি সবই ছিল আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব। '২৯ সালের লাহোর কনফারেন্সে এই আইন অমান্যর কর্মধারা প্রস্তুতির দায়িত্ব গান্ধীজির ওপর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পার

হলেও তিনি প্রকৃত কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। গান্ধীজি জানালেন, আমি দিনরাত ধরে ভাবছি, কিন্তু অন্ধকারের ভেতর থেকে কোন আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে সরকারের কাছে এগার-দফা শাসন সংস্কারের দাবী রাখলেন। যখন কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতা দাবী করেছে তখন গান্ধীজির এই এগার দফা দাবীর প্রস্তাবের অর্থ অন্যে ত' দূরের কথা স্বয়ং জওহরলালও বুঝে উঠলেন না। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক থমথমে আবহাওয়া বিরাজ করতে থাকল।

ভারতের বড়লাট আরউইন গান্ধীজির প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তখন গান্ধীজি সহসা তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। তখন সরকার এক আইন বলে সমুদ্রের ওপর সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রচার করে লবণ তৈরী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীজি নিজে সেই লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলে স্থির করলেন। এজন্য তিনি ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ ৭৮ জন সুযোগ্য অনুচর সহ সবরমতি আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হলেন। স্থির হ'ল সমুদ্রের ধার দিয়ে প্রায় দু'শ মাইল হেঁটে তিনি যাবেন দণ্ডী নামক লবণ তৈরীর বিখ্যাত গ্রামে। যেখানে তিনি নিজে হাতে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন।

গান্ধীজির নির্বাচন সঠিক ছিল। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সমান প্রয়োজনে লাগে। ঐ বস্তুটিও সরকার তার হাতে তুলে নেওয়ায় বিক্ষুব্ধ ছিল সবাই। সেই লবণ আইনকে আঘাত করবার সংকল্পে সাধারণ লোকের কাছে বিষয়টা এমন তাৎপর্যে পৌঁছাল যে, কত সমবেদনায় ভরা মন নিয়ে গান্ধীজির মত মানুষ দীনতম লোকের লবণ হারাবার বেদনাকে বোঝে। মুহূর্তে গান্ধীজি আবার সকলের হৃদয়ের মানুষ হয়ে

উঠলেন। চৌরিচোরার ঘটনা বা ঐ বছরের প্রথম দুই মাসের দ্বিধা গান্ধীজি সম্পর্কে যেটুকু অনাস্থা এনেছিল তার শতগুণ আস্থা ফিরে এল।

ঠেঙ্গো কাপড় পরা, শীর্ণদেহ গান্ধীজি যখন লাঠি হাতে হেঁটে চললেন, সবাই ভাবতে থাকল যেন তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝি বিমুর্ত হয়ে উঠেছে ঐ মানুষটির মধ্যে। যারাই তাঁর সেই মূর্তি দেখলেন, তারাই যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মন্ত্রবলে চলতে থাকলেন গান্ধীজির পিছনে পিছনে। প্রতিদিন তার অনুগামী সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকল।

মে মাসের প্রচণ্ড গরমের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছেন গান্ধীজি। চলেছেন তাঁর অনুগামী দল। নীরব পদযাত্রায় উদ্দীপ্ত হচ্ছে এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। এক অলৌকিক আত্মদান আকাঙ্ক্ষায় ভরে উঠছে সবার মন। কিন্তু সরকারী লবণের ডিপো ধরসনাতে পৌঁছাতে পারলেন না গান্ধীজি। মাঝ পথে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্থানে নেতৃত্বের দায় নিলেন বোম্বাই-এর এক জাতীয়তাবাদী মুসলমান পরিবারের সন্তান—আব্বাস তায়বজী। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হ'ল না। তৃতীয় নেতৃত্ব নিলেন সরোজিনী নাইডু।

যাত্রার আগে তিনি প্রার্থনা সভা আহ্বান করলেন। সেচ্ছাসেবকেরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়ল। তিনি সামান্য বক্তৃতা দিলেন। বললেন, প্রিয় সাথীরা। ভুলবেন না, আজ ভারতের সম্মান আমাদের হাতে। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ থেকে বিচলিত হব না। আমরা উৎসর্গিত প্রাণ। আত্মপীড়নের ভিতর দিয়ে আমরা জয়ী হতে চাই। ওরা আমাদের মারবে। আমরা মরব। আমরা বেদনায় চিৎকারও করব না এমন কি মার আটকাবার জন্য হাত পর্যন্ত তুলব না। সাথীরা মনে রাখুন ঈশ্বর আমাদের সহায়। গান্ধীজি আমাদের নেতা।

সকলে চিৎকার করে গান্ধীজির জয়ধ্বনি দিল। তারপর সকলে হাঁটতে শুরু করল।

লবণ ডিপোতে পৌঁছাতে গেলে প্রায় আধ মাইল হেঁটে যেতে হবে। লবণ যেখানে জমে তার চারদিকে জলভর্তি গর্ত। একটু এগুতেই দেখা গেল সুরাটের প্রায় চারশ' পুলিশ সেগুলি পাহারা দিচ্ছে। জনা ছয়েক ইংরেজ অফিসার। প্রত্যেক পুলিশের হাতে পাঁচফুট লম্বা লাঠি। তার মাথা লোহা দিয়ে মোড়া। তাদের পিছনে তারের বেড়া। সেখানে বন্দুকধারী পুলিশ।

আরও খানিকটা এগুতেই পুলিশ ঘোষণা করল যে, সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করা আছে। অতএব সেখানে পাঁচজন বা তার বেশি লোক একত্রে সমবেত হতে পারবে না।

সত্যাগ্রহীরা থামলেন না। সাদা পোষাক পরিহিত সত্যাগ্রহীর প্রথম দল এগিয়ে গেল। পুলিশ এগিয়ে এসে লাঠি দিয়ে মারল তাদের। নৈশব্দের মাঝে লাঠির আঘাতে মাথার খুলি ফাটার আওয়াজ শোনা যেতে থাকল। একজন সত্যাগ্রহীও হাত তুললেন না। কাতোরক্তি করলেন না। আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাদের সাদা জামা রক্তে ভিজে লাল হয়ে যেতে থাকল।

প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে দর্শকদের বুক ফেটে যেতে থাকল। ইংরেজ সাংবাদিক ওয়েব মিলার বহু কষ্টে চোখের জল সামলে রাখলেন। বর্বরতার সামনে মনুষ্যত্বের এতবড় আত্ম-ঘোষণায় তার নিজেকেই ছোট লাগতে লাগল। লুটিয়ে পড়া সত্যাগ্রহীদের তাড়াতাড়ি স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল। এগিয়ে গেল দ্বিতীয় সারির সত্যাগ্রহীরা।

এমনি করে প্রায় তিনশ কুড়ি জন সত্যাগ্রহী আহত হল। দুজন মারা গেলেন। দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠল। ইংরেজ অফিসার বন্দুকধারী পুলিশদের টিলার ওপরে তুলে প্রস্তুত করে রাখলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা বারংবার গান্ধীজির নির্দেশের কথা বলে দর্শকদের

সংযত রাখল। সরকার সাংবাদিকদের রিপোর্ট পরীক্ষা করে নিজেদের মত ছাঁটকাট করে ছাড়লেন।

এদিকে গান্ধীজিকে বন্দী করার সংবাদে সারা দেশে উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। বোম্বাই আর মাদ্রাজে পুলিশ লাঠি চালাল। বাঙলা দেশে উত্তাল হয়ে উঠল মেদিনীপুর। কিন্তু তবু বস্তুত পক্ষে এ আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু ভারতের নানা অঞ্চলে দেখা দিল কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ।

উনত্রিশ

পেশোয়ারের অভ্যুত্থান

১৯৩০ সালের সূচনায় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়ে যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল পেশোয়ারে। পেশোয়ারের কংগ্রেস কমিটি ঐ সালের ৩০শে এপ্রিল আন্দোলন শুরু করবার দিন স্থির করেছিল।

সে বছর ঐ সময়েই ছিল 'বকর ঈদ্' উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে হয় বিখ্যাত বাসন্তী মেলা। এই দুই উপলক্ষ্যে তখন পেশোয়ারে নেমে এসেছিল বহু উপজাতীয় কৃষক। এমন সময়েই ঘটনাচক্রে ঘটল পেশোয়ারের অভ্যুত্থান।

২০শে এপ্রিল পেশোয়ারে হ'ল বিশাল জন সমাবেশ। যেখানে কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা

করলেন—ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারের সূত্র ধরে এই আন্দোলন সূচনা করতে আহ্বান জানালেন। সর্বত্র বিক্ষোভ জমানই ছিল। এবার তা সংহত ভাবে ফেটে পড়ল। সরকার সর্বপ্রকার অসহযোগের মাঝে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকল।

২২শে এপ্রিল রাতে বহু জায়গায় হানা দিয়ে পেশোয়ারের প্রায় সব জননেতাকে গ্রেপ্তার করল। ভোর হতে না হতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত। স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হ'ল। পথে নেমে এলো উত্তেজিত অথচ উদ্‌ভ্রান্ত জনতা। কিন্তু কে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে? কে দেবে পথের নির্দেশ! কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকেরা শুধু তাদের শান্ত থাকতে এবং গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণ করতে বলতে থাকলেন। জনতার উত্তেজনার মুখে সে নির্দেশ প্রায় অর্থহীন মনে হতে থাকল।

এই পরিস্থিতিতে বেলা দশটা নাগাদ পুলিশের গাড়ি করে বন্দী জননেতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আদালতে। নেতারা ঢাকা গাড়ির ভেতর থেকে ধ্বনি দিচ্ছিলেন। তাদের কণ্ঠস্বর জনতাকে প্রায় মাতাল করে তুলল। তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল বন্দীদের গাড়ি। তখন ভেতর বাইরে মিলে শুধু ভারতমাতা, স্বাধীন ভারত আর গান্ধীজির নামে জয়ধ্বনি উঠছে। মুহুর্মুহু বন্দে-মাতরম্ বলে চিৎকার। এ সব ধ্বনি যেন আরও তপ্ত করে ফেলল জনতাকে। তারা ঐ সামান্য কজন পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল। খানিকটা মার-ধরও করল তাদের। ছিনিয়ে মুক্ত করল জননেতাদের। তারপর তারা ছুটে গেল থানায় এবং জেলখানায়। ঘিরে ফেলল সব।

মুক্ত জননেতা এবং কংগ্রেস কর্মীরা জনতাকে বার বার বোঝাতে থাকলেন যে, এভাবে পুলিশকে আক্রমণ করা গান্ধীজির আদর্শের পরিপন্থী। এটা সঠিক পথ নয়। কিন্তু কে শোনে সেই কথা। নেতাদের মুক্ত করবার প্রাথমিক জয়ের আনন্দে তারা উদ্‌ভ্রান্ত।

এখন তারা চায় জেল ভেঙ্গে সব বন্দীদের মুক্ত করে আনতে।

সময় পেলে নেতারা হয় ত' জনতাকে শান্ত করতে পারত। কিন্তু পুলিশ উত্তেজিত হয়ে জেলখানা ঘিরে রাখা জনতার ওপর আক্রমণ চালাল। মারা গেল কয়েক জন। আহত হ'ল বহু। এবার আর জনতাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তারা জেলখানা ভেঙ্গে ফেলল। চল্‌ল থানা আক্রমণ করতে।

অন্য জায়গা থেকে পেশোয়ারের জনতার সুযোগ ছিল কিছু বেশি। জনতার মধ্যে পাঠান উপজাতীয় বহুলোক ছিল। তারা সর্বদাই বন্দুক বহন করত আত্মরক্ষার জন্য। ব্রিটিশ সরকার ওদের ওপর প্রবলভাবে অস্ত্র আইন প্রয়োগ করে নি। তাই বাসন্তী মেলা উপলক্ষ্যে আগত পাঠানদের কাছেও ছিল বন্দুক। এ কারণে পেশোয়ারের জনতা পরিপূর্ণ নিরস্ত্র ছিল না। পুলিশের গুলির উত্তরে তারাও গুলি বর্ষণ শুরু করল। সারা শহরে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশে জনতার খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এ জনযুদ্ধ শান্তিকামী অভিজাতদের অভিপ্রেত ছিল না। বিশেষতঃ কংগ্রেসী গান্ধীবাদীরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছিলেন জনতাকে এ সর্বনাশা পথে না যেতে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এদের ওপর নজর রাখছিল। কিন্তু উত্তেজনার মুখে কে যাবে জনতাকে শান্ত হবার উপদেশ দিতে!

পেশোয়ার পৌরসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন সাহসী লোক। তিনি গান্ধীবাদীও বটে। তিনি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে উপস্থিত হলেন জনতার সামনে। জনতা উল্লসিত হয়ে তাকে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাল। কিন্তু নেতাটি উঠে যেই উল্টো কথা বলতে শুরু করলেন অমনি জনতা দ্বিগুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রথমে ধিক্কার ঠেলাঠেলি পরে মুহুর্মুহু ইঁট পড়তে থাকল। ডেপুটি চেয়ারম্যান অনুচর সহ আহত হলেন। কিন্তু তিনিও গান্ধীনীতি

অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেলেন না। পালালেন। উত্তেজনা এবং খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে ২৩শে এপ্রিলের পেশোয়ার রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।

শহর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কর্তৃপক্ষ রাতারাতি সৈন্য-বাহিনী আহ্বান করলেন। পরদিন ভোরে সাঁজোয়া বাহিনী প্রবেশ করল পেশোয়ারে। কিন্তু পেশোয়ারী জনতা তাতে ভয় না পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁজোয়া বহর গুলিবর্ষণ শুরু করল। কিন্তু তখন পেশোয়ারীদের মৃত্যুভয় কেটে গেছে। মারা পড়ল বহুজন কিন্তু তবু তারা থামল না। সেই বিষম আক্রমণে একটি গাড়ি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। জনতা গাড়িটি দখল করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। অন্য গাড়ি গুলিও অবস্থা আয়ত্তের বাইরে দেখে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাল।

জনতা এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তাদের জঙ্গী নেতা আবিষ্কার করে ফেলল। তার নির্দেশে শহরের সবকটি প্রবেশ পথে পরপর অনেকগুলি ব্যারিকেড তৈরী হ'ল। শহরের সব ইংরেজ কর্মচারী এবং সরকারী কর্মচারী, যারা নিজেদের সরকার পক্ষের লোক ভাবতেন, তারা গিয়ে আশ্রয় নিল ক্যান্টনমেণ্ট নামক সরকারী ব্যারাকে। আর বিদ্রোহী জনতা একের পর এক থানা, পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে গোটা শহর দখল করে নিল। শহর পেশোয়ার এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হ'ল। বিদ্রোহীরা সুশৃঙ্খলভাবে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা চালু রাখল।

পেশোয়ারের এই অভ্যুত্থানের খবর ইংরেজ সরকার চেপে রাখতে চেষ্টা করলেও পাঞ্জাবের কাগজগুলিতে প্রথম এ সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। সাধারণভাবে পাঞ্জাবী আকালীরা এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আকালীদের মধ্যে যে অংশ রাশিয়ার বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল, তাদের মুখপত্র 'আজাদ আকালী' এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখল। প্রবন্ধের শেষে সৈন্যদলের পাঞ্জাবীদের কাছে আবেদন রাখল, আপনারা এ সব আন্দোলন দমন করতে সরকারী

নির্দেশে গুলি চালাবেন না। বরং আপনারাও দেশী মানুষের এ যুদ্ধে যোগ দিন।

রাসবিহারীর আমল থেকেই শচীন সান্যাল ইত্যাদি নেতার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা চলত। এ সময়ে নতুন সাম্যবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ভকৎ সিংদের প্রভাব ছিল প্রবল। আর আত্মীয়-পরিজন ও পারিবারিক সূত্র স্বদেশীয় সৈন্যেরাও যে দেশের এই নতুন জাগরণের সংবাদ রাখত না, নতুন ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না, এমন নয়। পেশোয়ারে সৈন্যদলের সেই মানসিকতা প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশ করল।

১৯৩০ সালের ২০মে। এক ইংরেজ সেনাপতি একদল গাড়োয়ালী সৈন্য নিয়ে মার্চ করে এলেন পেশোয়ারে। ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে এবং ডিঙ্গিয়ে তারা শহরে প্রবেশ করল। অদূরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহীরা। সেনাপতি চিৎকার করে উঠলেন ফায়ার।

কিন্তু কেন জানিনা সৈন্যরা ইতস্ততঃ করতে থাকল। হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে সৈন্যদের সামনে এসে দাঁড়াল হাবিলদার চন্দ্র সিং। বলল, ভাই সব! কে ঐ ইংরেজ সেনাপতি যে তার কথা শুনে দেশের মানুষের বুকে গুলি মারবে। কি তাদের অপরাধ! ইংরেজরা আমাদের এতদিন খেতে পরতে দিয়েছে। এস, আমরা নিজেরা ওদের বিরুদ্ধে গুলি না ছুঁড়লেও আমাদের অস্ত্রগুলি তুলে দি আমাদের ভাইদের হাতে।

বলতে না বলতে চন্দ্র সিং ছুটে গেল অপেক্ষমান জনতার দিকে। ছুঁড়ে দিল তার বন্দুক। আর একজন লুফে নিল। আনন্দে চিৎকার করে উঠল জনতা। নেতা এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল চন্দ্র সিংকে।

এ আলিঙ্গন আর উল্লাস ধ্বনি গাড়োয়ালী সৈন্যদের সব দ্বিধা ভাসিয়ে দিল। তারা বন্দুক উঁচু করে ধরে ছুটে এলে এদের দিকে।

হাতে হাতে তুলে দিল বন্দুক। একজন অন্যজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যুদ্ধের মরণ ক্ষেত্র মুহূর্তে মহা-মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। সেনাপতি কাল বিলম্ব না করে পালালেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি সৈন্য পাঠালেন না। গাড়োয়াল সৈন্যদের বিদ্রোহ তাদের চক্ষু খুলে দিল। তারা প্রথমে পেশোয়ারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এমন কি পাঞ্জাব থেকেও দেশী সৈন্যদের সরিয়ে দিলেন। তারপর শুধু ইংরেজ সৈন্যের দল পাঠালেন পেশোয়ার ঘিরে ফেলতে। ব্রিটিশ-ভারতের ইংরেজ সৈন্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সৈন্য সেখানে জমায়েত হ'ল।

এ সব করতে প্রায় দশ দিন কেটে গেল। স্বাধীন পেশোয়ারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আগে থেকেই পাঞ্জাবী আকালীরা এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এখন প্রায় দুই শত আকালী মার্চ করে চল্‌ল পেশোয়ারের দিকে।

অন্যদিকে মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, আফ্রিদি, মোগস্থ ইত্যাদি উপজাতির অধিবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারাও অগ্রসর হতে থাকল পেশোয়ারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

কিন্তু এ দুই বাহিনীর কোন বাহিনীই পেশোয়ারের স্বাধীন-জনতার সঙ্গে মিলিত হতে পারল না। আকালীর দলকে ব্রিটিশ সৈন্য ঝিলাম নদীর তীরে ঘিরে ফেল্‌ল। দু'শ আকালীকে গ্রেপ্তার করে পাঠাল জেলখানায়।

এদিকে পেশোয়ারকে ব্রিটিশ সৈন্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে প্রথমেই গাড়োয়ালী বাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল। তারা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত ফিরে গেল ইংরেজ পক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হ'ল তাদের। নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে সামরিক আদালতে বিচার হ'ল তাদের। চন্দ্র সিং-এর হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অন্যদের তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হ'ল। কিন্তু সারাদেশ

তাদের 'জাতীয় বীর' বলে গ্রহণ করল। নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হলে ১৯৩৭ সালে এদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

যা হোক, গাড়োয়ালী সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার যে ধৈর্য্য ধরে ছিল তা যে ঝড়ের আগের স্তব্ধতা তা বোঝা গেল এবার। ব্রিটিশ সৈন্য চারদিক থেকে একত্রে পেশোয়ার আক্রমণ করল, কামান আর মেসিনগান নিয়ে। ওপর থেকে বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করতে থাকল। তবু বিদ্রোহী পেশোয়ার তার সামান্য কটি বন্দুক নিয়ে প্রায় চারদিন বাধা দিল ব্রিটিশ বাহিনীকে। তারপর আত্মসমর্পণ করল।

ব্রিটিশ বাহিনী নির্বিচারে হত্যা করল বিদ্রোহীদের। বহুজনকে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখল। পেশোয়ারের পরাজয়ের পর উপজাতীয় বিদ্রোহীদের আর সেখানে প্রবেশ করার প্রয়োজন রইল না।

ত্রিশ

শোলাপুর ও সীমান্ত অভ্যুত্থান

গান্ধীজির ডাকে অন্যান্য শহরের মত মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে শোলাপুরেও শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বস্ত্র-শিল্পে সমৃদ্ধ শোলাপুর। এখানকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক গান্ধীজির আদর্শকে মেনে অসহযোগ শুরু করে। ইংরেজী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ছিল এ অসহযোগের প্রথম ধাপ। পেশোয়ারের বিরুদ্ধে সৈন্য নামানর বিরুদ্ধে ৮ই মে তারিখে শোলাপুরের শ্রমিকেরা এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। প্রায় সব শ্রমিক এতে যোগ দেয়। মলোপ্পা ধানসেট্ট, জগন্নাথ সিন্ধে, শ্রীকিয়েন সর্দা, আবদুল্লা রসুল, কোরবান হোসেন ইত্যাদি শ্রমিক নেতা সেদিন ঐ মিছিলের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছিল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা।

সহসাই পুলিশ গতিরোধ করল মিছিলের। তারা মিছিল ভেঙ্গে সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে বলল। কিন্তু শ্রমিকরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা সারা শহর পরিক্রমা করবে। শ্রমিকেরা পথে বসে পড়ল। পুলিশ লাঠি চালাল। আহত জনতা ভুলে গেল গান্ধী-নীতি। মারের বদলে মার দিতে থাকল তারা। লাঠির বদলে ইঁট। এক দিকে শতশত শ্রমিক আহত হ'ল। পুলিশের আহত হ'ল প্রায়

সবাই। মারা গেল আটজন। সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাইফেল ধারী পুলিশ পাঠাল। তারা নির্বিচারে গুলি চালালেও আড়াল থেকে জনতা শুধু ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে গুলির বিরুদ্ধে লড়ল প্রায় চার ঘণ্টা। শ্রমিক মারা গেল পাঁচজন। আহত অনেক। কিন্তু তবু জনতাকে হটে যেতে হল।

সারারাত শোলাপুরে চলল প্রবল উত্তেজনা। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সাধ্যমত চেষ্টা করলেন সকলকে শান্ত করতে। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হল না। বরং প্রতি পাড়ায় একটি করে সংগ্রাম-কমিটি তৈরী হ'ল। তারা পরবর্তী পর্যায়ের কর্ম পদ্ধতি স্থির করল।

বিক্ষুব্ধ শোলাপুরে শুরু হল ৯ই মের সকাল। জনতা এগারোটা নাগাদ সরকারী দস্তাবেজখানা আক্রমণ করে দখল করে নিল। বহু অফিস, ইংরেজদের দোকান, মদের দোকান আগুনে পুড়ে গেল। মিল মালিকেরা, ইংরেজ কর্মচারী, থানা পুলিশের লোক—সব গিয়ে জমায়েত হ'ল রেল স্টেশনে। সেখানে ছিল একদল ডোগরা সৈন্য আর কয়েকটি মেশিনগান। তাই দিয়ে তারা স্টেশনটাকে সুরক্ষিত করে রাখল। শোলাপুর শহর রইল তাদের তত্ত্বাবধানে। শ্রমিকেরা সকল সরকারী অফিসের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল।

রাতারাতি শোলাপুরের বিদ্রোহীরা প্রত্যেক পথে শক্ত ব্যারিকেড তৈরী করে ফেলে। এতে ওরা ব্যবহার করল বড় বড় ড্রেনের পাইপ ? গাছের গুঁড়ি, গরুর গাড়ি, ঠেলা গাড়ি, বড় বড় পাথরের টুকরো। বিদ্রোহীরা জানত বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে এ শহর দখলে রাখা যাবে না। অতএব তারা একটি প্রচারক দল তৈরী করল এবং রাতারাতি পাঠিয়ে দিল শহরের বাইরে।

বিদ্রোহীদের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হ'ল পরদিনই। বড়লাট শোলাপুরের সংবাদের ওপর সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি করল। কিন্তু তবু প্রচারকদল তৎপরতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিল সংবাদ।

চারিদিকে শোলাপুরের সংবাদের জন্য দাবী উঠল। শুরু হ'ল প্রতিবাদ সভা। বোম্বাই শহরের শ্রমিকরা ধর্মঘট এবং শোভাযাত্রা করে শোলাপুরের সমর্থন এবং সৈন্য নামাবার প্রতিবাদ করল। শোলাপুরের কাছাকাছি কতকগুলি গ্রাম-গঞ্জে বিদ্রোহী মানুষ থানা আক্রমণ করল। পুলিশ এত আতঙ্কগ্রস্থ ছিল যে তারা থানা ফেলে পালাল। জনতা থানা পুড়িয়ে দিল।

ব্রিটিশ সরকার পেশোয়ারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন এখানে। কোন ভারতীয় সেনাদল এলনা এখানে। এলো ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কসায়ার রাইফেলস্ বাহিনীর এক রেজিমেণ্ট এবং কিংস্ আলস্টার রাইফেল বাহিনীর এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য। এরা শোলাপুর ঘিরে ফেলল।

এ সংবাদ ইংল্যাণ্ডেও আলোড়ন তুলল। যেহেতু এ অভ্যুত্থান মূলতঃ শ্রমিকদের অভ্যুত্থান, তাই ইয়র্কসায়ারের শ্রমিকেরা তুলল প্রতিবাদ। তারা ইংলণ্ডের সমস্ত শ্রমিককে এই শ্রমিকদলনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে আহ্বান জানাল।

ইতঃমধ্যে ভারতের বড়লাট ১২ মে তারিখে শোলাপুরে সামরিক আইন জারি করল। এবার সৈন্যরা শহরে ঢুকে পড়ল। শুরু হ'ল সম্মুখযুদ্ধ। মেসিনগান, হাতবোমা ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হ'ল নিরস্ত্র শ্রমিকদের বিষম লড়াই। তবু তারা ১৫ তারিখ পর্যন্ত লড়ে গেল। অবশেষে মৃতের স্তূপের মধ্যে শোলাপুর পুনরুদ্ধার করল ইংরেজ সরকার।

বন্দীদের মধ্যে যাদেরকে গুপ্তচরেরা নেতা বলে চিহ্নিত করল সেই ত্রিশ জনকে তৎক্ষণাৎ বিনা বিচারে প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। অবশিষ্ট প্রায় দু'শ জনকে দেওয়া হল দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড।

শোলাপুর বিদ্রোহের অবসান ঘটল।

* * *

আমরা পেশোয়ার-অভ্যুত্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় বিদ্রোহের উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু এ বিদ্রোহের গল্প আরও একটু আগে থেকে শুরু করা দরকার।

পাঠানদের গণজাগরণের মূলে ছিল আবদুল গফ্‌ফর খান নামে এক পাঠান সর্দারের অবদান। তিনি তার কৈশোর থেকেই এক জঙ্গী বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রথমে তাদের পোষাক ছিল সাদা রংয়ের। কিন্তু সাদা পোষাক পরিষ্কার রাখা কষ্টকর বলে তিনি তাদের পোষাকের রং বদলে দেন। তখন রং হয় লাল। এ জন্য তার দলেরও নাম হয়ে যায় রেড-সার্ট স্কোয়াড।

আবদুল গফ্‌ফর এবং তার দল সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে ইংরেজ বিরোধিতাও করত। পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গফ্‌ফর সাহেব অনেক স্কুল খোলেন আবার সরকারী বিরোধী কাজের জন্য তাঁকে বারংবার কারাবরণও করতে হয়। কখনও তিনি নিজস্থান থেকে নির্বাসন দণ্ডও ভোগ করেন। কিন্তু এগুলির জন্য তিনি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে রেড-সার্ট দলের সভ্য সংখ্যা আশি হাজার ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু উনিশশ' কুড়ি থেকেই আবদুল গফ্‌ফর গান্ধী নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। রেড-শার্ট দলও ক্রমে অহিংসা সত্যাগ্রহে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

ইতঃমধ্যে পেশোয়ারে গণ বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা হয়েছে। এ সংবাদ সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনার সঞ্চার করে। প্রিয় নেতার নিষেধ সেদিন উত্তেজিত জনতার কানে ঢুকল না। ১০ মে তারিখে প্রায় দশ হাজার আফ্রেদি উপজাতির লোক নানা রাজনৈতিক দলের পতাকা একত্রিত করে চলল শোভাযাত্রা করে। এদিকে পেশোয়ারের বিদ্রোহীরা তুরনগাজি অঞ্চলের সর্দার হাজি-সাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। হাজি সাহেব এক বিরাট

বাহিনী পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। মিলিত দল যে পথ দিয়ে চল্‌ল, সে পথের দুপাশের গ্রামগুলি থেকে লোক এসে ছুটতে থাকল তাদের সঙ্গে। এরা পেশোয়ারের কুড়ি মাইলের মধ্যে এসে গেল।

এই সময় ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স এদের ওপর প্রবল বোমা বর্ষণ শুরু করল। এতে হাজার হাজার লোক অসহায়ভাবে মারা যায়। এই সংবাদ শুনে ছুটে আসে রেড-সার্ট বাহিনী। তাদের ওপরেও বোমা পড়তে থাকে। তাদের গ্রামগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকার এখানেই থামলেন না। তারা রেড-সার্ট বাহিনী বে আইনী ঘোষণা করলেন। তারা আত্মগোপন করল। বিদ্রোহী আফ্রেদি ও অন্যান্য উপজাতিরা আরও দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে তারা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেল পরের বছর পর্যন্ত। দুবার করল পেশোয়ার আক্রমণ। লাইন তুলে ফেলে, টেলিফোনের তার কেটে ফেলে সর্বপ্রকারে ইংরেজবাহিনীকে যোগাযোগ শূন্য করে আক্রমণ করতে থাকল। এর ফলে কখনও মালাকান্দ অঞ্চল বা সারকান্দা শহর তাদের হাতে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোমা বর্ষণে এবং কামানের গোলায় উপজাতীয় বিদ্রোহীরা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

একাত্রিশ

বিদ্রোহী মেদিনীপুর

চিরবিদ্রোহী মেদিনীপুর।

ইংরেজ-আমলের সূচনা থেকেই মেদিনীপুরের বিদ্রোহ। মীরকাসিম রাজত্ব কিনে যে অঞ্চলগুলি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেন, মেদিনীপুর জেলা ছিল তার একটি। ফলে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ তারা সূচনা পর্ব থেকেই বুঝেছিল। তাই বারংবার বিদ্রোহ ঘটেছে মেদিনীপুরে! ১৭৯৪ তে চুয়ার বিদ্রোহ, ১৮০৬-এ নায়েক-বিদ্রোহ, ১৮১৫ তে বাগড়ী বিদ্রোহ, ১৮৩১ শে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৮৫২ তে খালাসী বিদ্রোহ, ১৮৫৪ তে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ তে সিপাহী বিদ্রোহ—ইত্যাদি কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহে রক্তাক্ত হয়ে আছে মেদিনীপুরের অতীত। ইংরেজ আমলে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষিতজনের নবজাগ্রত স্বাধীনতাবোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারবোধ থেকে যে নতুনতর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হ'ল—সেখানেও মেদিনীপুরের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। ১৮৫১ তেই রাজনারায়ণ বসু এসে দীক্ষিত করেছেন মেদিনীপুরকে। ১৯১৯ এবং ১৯২৫ তে গান্ধীজি দু-দুবার এসেছেন মেদিনীপুরে। ১৯২৮ সালে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এসে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার দলের (সংক্ষেপে বি. ভি. র)

শাখা খুলেছেন মেদিনীপুরে। দীনেশ গুপ্ত, সত্যবক্সী, হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য গুপ্ত, লীলা রায় ইত্যাদি সংগঠকেরা এখানে বিপ্লবীচক্র গড়ে তুলেছেন। মেদিনীপুর, থেকেই এসেছেন ক্ষুদিরাম, সত্যেন বসুর মত মানুষ। বহু সময় মেদিনীপুরই থেকেছে বিপ্লবীদের শিক্ষাকেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়। পাঞ্জাবকে যেমন বলা হ'ত ইংরেজদের সৈন্য সংগ্রহের বড় ঘাঁটি—ঠিক তেমনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী সৃষ্টি ও সংগ্রহের অবাধ ক্ষেত্র ছিল মেদিনীপুর। ভারতের সব বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকে মেদিনীপুর প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছে। আমি এখানে শুধু লবণ সত্যাগ্রহের পরবর্ত্তীকালের কয়েকটি গল্প বলব।

১৯৩০ সালের ১৯ শে মার্চ মেদিনীপুর শহরে এক জনসভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরের মাসে বেশ কয়েক স্থানে লবণ আইন ভেঙ্গে লবণ তৈরীর কারখানা স্থাপিত হ'ল। কাঁথিতে এমন একটি কোম্পানীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি প্রিমিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড'। সাগর-দ্বীপে যে কোম্পানী গড়ে ওঠে তার নাম হয় 'দি ন্যাশানাল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড'। সত্যাগ্রহী দল যে অন্ততঃ তিন জায়গায় আইন ভঙ্গ করেন তার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা সত্যাগ্রহ করেন নরঘাট, পিছাবনী এবং কাঁথিতে। গান্ধীজি যেমন ডাণ্ডি অভিযান পরিচালনা করেন, ঠিক তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বাঁকুড়া থেকে একদল সত্যাগ্রহী নিয়ে কাঁথিতে উপস্থিত হন।

এ সময়ে মেদিনীপুরের ওপর পুলিশ বর্বর-অত্যাচার চালিয়েছে। প্রথম দিকে গান্ধীজির আদর্শে অবিচল থেকেছে মেদিনীপুর। রক্ত ঝরিয়েছে কিন্তু পশু শক্তির কাছে মাথা নত করেনি। কিন্তু অত্যাচারই তাদের সংযমের বাঁধ দিয়েছে ভেঙ্গে। মেদিনীপুর হত্যার বদলে হত্যা, নিষ্ঠুরতার বদলে যোগ্য শাস্তিবিধানের দুর্জয়

সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। নির্ভয় কিশোর মৃত্যু বাজি রেখে মরণজয়ী হাসি হেসে প্রবেশ করেছে সিংহের গুহায়।

প্রথম ঘটনা ঘটল অপরিকল্পিত ভাবে।

১৯৩০ সালের ৩রা জুন। দাসপুর থানার চেচুয়া হাটে বিলিতি জিনিষের দোকানে চলছিল পিকেটিং। থানার দারোগা ভোলানাথ ঘোষ তার সহকর্মী অনিরুদ্ধ সামন্তকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি সত্যাগ্রহীদের সরে যেতে নির্দেশ দিলেন। কয়েকজন সরেও গেল। এতক্ষণ যে জনতা উল্লাস করছিল—তারা সরে গেল। দারোগা বীর দর্পে এগিয়ে গেলেন। একজন সাধারণ কংগ্রেসকর্মী শুয়ে ছিলেন দোকানের দরজা জুড়ে। দারোগা তাকে আবার সরতে বললেন। সে সরল না। ঘোষ মশাই, কষে লাথি চালালেন তার মুখে। চোয়াল কেটে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল। কিন্তু লোকটি দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রইল দোকানের কপাট। ঘোষ মশাই সেপাইদের আদেশ দিলেন। তারা তার হাতের ওপর লাঠির পর লাঠি মারতে থাকল। আঙ্গুলগুলো ফেটে গেল। হাত, হাতের পাতার হাড়, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝুলতে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য শক্তিতে লোকটি চিৎকার করতে থাকল—বন্দেমাতরম্!

তার সে চিৎকার যেন আগুন ধরিয়ে দিল জনতার বুকে। ভীত মানুষগুলো চোখের সামনে ঐ বর্বর অত্যাচার, অথচ মানুষটির সীমাহীন সহ্যশক্তি ও ত্যাগ দেখতে দেখতে তারাও যেন দুর্জয় হয়ে উঠ্‌ল। সহসা তারা ছুটে এসে বাধা দিল পুলিশদের। দারোগা লাঠি চালাতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উৎক্ষিপ্ত জনতা কেড়ে নিল সব লাঠি। পুলিশরা পালাল। ক্রুদ্ধ জনতা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই দারোগার ওপর। তারা গুলি চালাবারও সময় পেলেন না। নিহত হলেন। জনতা সে লাশগুলি গুম করে ফেলল। কোথায় কেউ তা টেরও পেল না।

চারদিন পরে, পরবর্তী হাটবারে আর এক জালিয়ানওয়ালাবাগ

তৈরী করতে ছুটে এলেন ঘাটালের এস. ডি. ও ফজলুল করিম সাহেব। তিনি নিরস্ত্র হাটুরেদের ওপর লাঠি এবং গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। চৌদ্দজন গ্রামবাসী মারা গেল। এতেও খুশি হ'ল না পুলিশ। ১১ই জুন পিংলা থানার ক্ষীরাই গ্রামের হাটে আবার লাঠি আর গুলি চালাল পুলিশ। মারা গেলেন পনের জন। পুলিশ সাতচল্লিশ জনকে দারোগা হত্যার অভিযোগে চালান দিল। যোগ্য প্রমাণ না থাকলেও বারোজনের হ'ল দ্বীপান্তর। তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস প্যাডি, পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ কিড্ এবং অতিরিক্ত সুপার মিঃ নর্টন জোন্স এসব পুলিশ অফিসারকে তারিফ করতে থাকলেন। তাদের হত্যা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বিপ্লবীরা।

জেলাশাসক প্যাডি কড়ামেজাজের লোক ছিলেন। কোন ভারতীয়কে তিনি মানুষ জ্ঞান করতেন না। তিনি ভাবতেন দেশী পুলিশ-গোয়েন্দা ঠিক গা লাগিয়ে কাজ করে না। না হলে বিপ্লবীদের কি ধরা যায় না! এজন্য তিনি গালি না দিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতেন না—সঙ্গে চাবুক বা জুতোর ঠোক্কর থাকত' অনুপান। এ কারণে প্যাডিই হলেন বিপ্লবীদের প্রথম টার্গেট।

১৯৩১ সালের মার্চে পাঁশকুড়া থেকে ট্রেণে মেদিনীপুর আসবেন প্যাডি। সংবাদ পেয়েই রামকৃষ্ণ রায় এবং ফণী কুণ্ডু প্রস্তুত। কলকাতা থেকে পিস্তল আনাবার সময় নেই। অতএব কলেজ ল্যাবরেটরী থেকে পটাসিয়াম সায়নাইড এনে মাখান হ'ল ছোরায়। ওরা গেলেন খড়্গপুর। কিন্তু এত বেশি পুলিশ পাহারা যে ওরা কাছেই যেতে পারলেন না। রামকৃষ্ণ গাড়ির জানালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে শেষ করতে চাইলেন প্যাডিকে। ফণী কুণ্ডু বাধা দিলেন। প্রাণ দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু প্যাডি বেঁচে রইল অথচ ওরা ধরা পড়ে প্রাণ দিলেন—এমন কাণ্ড ঘটান ঠিক হবে না। অতএব

সুযোগের অপেক্ষায় ওরা ঐ ট্রেণে করেই মেদিনীপুর এলেন। কিন্তু সুযোগ মিল্‌ল না। হতাশ রামকৃষ্ণ তিন দিন ক্রমাগত কাঁদলেন তার শহীদ হওয়া হ'ল না বলে।

এবার মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করে কিছুক্ষণের জন্য মেদিনীপুরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু কলকাতার কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করল না।

এমন সময় এক অভাবনীয় সুযোগ এল। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। প্যাডি ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেন্ট। অতএব হেড মাস্টার মশাই-এর বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্যাডি একদিন সেই প্রদর্শনী দেখে যাবেন। প্যাডি কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্য গতিকে তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর জন্য প্রদর্শনী একদিন বেশি খোলা রাখা হ'ল। কিন্তু তাও তাঁর আসবার সময় হ'ল না। বোধহয় ক্ষোভেই প্রধান-শিক্ষক হীরালাল দাশগুপ্ত ৭ তারিখ বিকেলে দেখা করতে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। প্যাডি বললেন, আরও দিন-দুই প্রদর্শনী খোলা রাখুন। নিশ্চয় যাব।

হেড মাস্টার মশাই বললেন, এক সপ্তাহ স্কুলে পড়াশুনা বন্ধ। আরও বন্ধ রাখা কি ভাল হবে!

প্যাডি বললেন, বেশ তবে এখনই চলুন।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন প্যাডি! সঙ্গে কয়েকটি কুকুর এবং ইউরোপীয় অফিসার। দেহ-রক্ষীরাও সঙ্গে আছে। হেড মাস্টার মশাই সঙ্গে থেকে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছেন। আলোর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। হ্যারিকেনের আলো ধরে দেখান হচ্ছিল সব।

প্যাডি এসেছেন সংবাদ পেয়েই এবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত বিমল দাশগুপ্ত এবং যতিজীবন ঘোষ নামে দুজন এদের দলে এসে জুটলেন। এক ঘর থেকে অন্য এক ঘরে প্রবেশ করতেই 'গুড়ুম' করে

আওয়াজ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আলোও গেল পড়ে। হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। অন্ধকারে কি যে হ'ল তা তখনও বোঝা গেল না। আলো আনলে দেখা গেল প্যাডি হাইবেঞ্চে হেলান দেওয়া একটি রিলিফ ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। রক্তে দেহ ভেসে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল। কলকাতা থেকে সার্জেন এলেন। কিন্তু প্যাডি বাঁচলেন না। পরদিন বেলা পাঁচটায় তাঁর মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর আগে প্যাডি ক্ষোভ করে বললেন, এত বড় একটা সাংঘাতিক বিপ্লবীদল সম্পর্কে পুলিশ কোন খবরই রাখত না...

প্যাডির আত্মা ওপরে গিয়েও শান্তি পেল না। কেন না প্রবল অত্যাচার করেও প্যাডি হত্যার আসামীদের মামলা-সাজানর ক্ষমতা হ'ল না পুলিশের। বিমল দাশগুপ্তকে বন্দী করে মামলা তোলা হ'ল বটে, কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটার বললেন, পুলিশ এতদিন যত প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, তাতে এ মামলা চালান যায় না। অতএব বিমল ছাড়া পেল।

বিমল ছাড়া পেয়েও চুপ করে থাকল না। ১৯৩১ এর ২৯ অক্টোবর সকালে সে এসে উপস্থিত হয় ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গিলিয়াণ্ডার হাউসে। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন ইউরোপীয়ান ক্লাবের সভাপতি ভিলিয়ামকে হত্যা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলি চালাবার আগেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল।

মেদিনীপুরে পরবর্তী যে ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন, তার নাম ডগলাস। ইনি নিরীহ ও ভীত মানুষ ছিলেন। ফলে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত পুলিশ ও গোয়েন্দার ওপর। পুলিশ গোয়েন্দারা পূর্ব-রীতিতেই অত্যাচার চালিয়ে যেত। ফলে এমন এমন ঘটনা ঘটতে থাকল যাতে বিপ্লবীরা ডগলাসকেই দায়ী করলেন। এমন সময়ে ঘটল মারাত্মক ঘটনাটি। সেটি হ'ল হিজলী জেলের বন্দী হত্যা।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসনের সুবিধার জন্য মেদিনীপুরকেও দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। উত্তর মেদিনীপুরের সদর হ'ল মেদিনীপুর আর দক্ষিণ মেদিনীপুরের সদর হল হিজলী। এ জন্য হিজলীতে চার হাজার বিঘা জমির ওপর বহু বাড়ি তৈরী হয়। মেদিনীপুর এ বিভাজনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। কর্তারাও উপলব্ধি করেন যে এতে করে খুব লাভ হবে না। তখন ঐ বাড়িগুলিকে একত্রে এক বিশাল জেলখানায় পরিণত করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের কাল থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের হিজলী জেলে পাঠান হ'ত।

বন্দীরা অসম্মানজনক রীতি নীতি কখনই মানত না। এ নিয়ে জেলে অশান্তি লেগেই থাকত। ডগলাসের আমলে তার পর-নির্ভরতার দোষে অন্য অফিসাররা স্বয়ং-সর্বস্ব হয়ে উঠলেন। এর ফলে বন্দীদের ওপর অত্যাচার, অসম্মান বাড়ল। প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯৩১) সন্ধ্যায় বন্দীরা লাইন করে দাঁড়াল না। যে যার সেলে ঢুকে গেল। এর শাস্তি দিতে অকস্মাৎ সাড়ে নটার সময় বন্দীব্যারাকে, খাবার ঘরে এমনকি হাসপাতালেও ঝাঁপিয়ে পড়ল সিপাহিরা। প্রথমে বেপরোয়া লাঠি চালাল। বন্দীরা বাধা দিলে চালাল গুলি। সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। কৃষ্ণনগরের বিপ্লবী গোবিন্দপদ দত্তের একটি হাত কেটে বাদ দিতে হল।

মৃত বন্দীদের দেহ নিয়ে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এক বিশাল শোক মিছিল বের করলেন। অন্য বন্দীরা প্রতিকারের দাবীতে অনশন শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে ডগলাস তদন্তের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যাদের ওপর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল তারা বন্দীদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। পুলিশ বক্তব্য অনুযায়ী জানান হ'ল যে বন্দীরা কোন প্রহরীকে ভয় দেখালে তাদের থামাতে প্রহরীরা ফাঁকা আওয়াজ করে। এতে উত্তেজিত বন্দীরা প্রহরীদের

আক্রমণ করে। ফলে তারা অবস্থা আয়ত্তে আনতে এবং আত্মরক্ষা করতে লাঠি ও গুলি চালায়।

এ তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে বিপ্লবীরা একেও ডগলাসের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বলে গ্রহণ করলেন এবং ডগলাস হত্যার সঙ্কল্প গৃহীত হ'ল।

এ সংবাদ পুলিশের অজানা রইল না। ১৯৩২ এর ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ থেকে মেদিনীপুরের পুলিশ-সুপারকে সমস্ত বিষয়টা জানান হ'ল। পুলিশও দেখল মেদিনীপুরে যত্র তত্র লাল কালিতে লেখা পোস্টার পড়তে থাকল। সে পোষ্টারে ডগলাস হত্যারও ইঙ্গিত ছিল। পুলিশ তৎপর হয়ে পোস্টার লেখককে ধরবার চেষ্টা করতে থাকল। জিজ্ঞাসাবাদ এবং বাড়ি খোঁজার নাম করে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

হঠাৎ ডগলাস একদিন একটা চিঠি পেলেন। তার এক পৃষ্ঠায় তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে. অন্য পৃষ্ঠায় ভারতীয়দের আহ্বান জানান হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে। ডগলাস চিঠিটা পুলিশকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, পত্রে যে সব অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে তা সত্য কিনা। পুলিশ সরাসরি বলে দিল সরডিহা বা মানিক পাড়ায় চিঠির বর্ণনামত কোন অত্যাচার হয়নি। ডগলাস চিঠি নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। বিপ্লবীদের বিচারে ডগলাস শাস্তিযোগ্য বলে নির্দ্ধারিত হ'ল।

১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের অধিবেশন বসেছে। ডগলাস গ্রহণ করেছেন সভাপতির আসন। বোর্ডের সেক্রেটারী তাঁর পাশে বসেছেন কাগজ পত্র নিয়ে। সভাপতির পিছনে একটা বড় বারান্দা। সেখানে পাহারা দিচ্ছে ডগলাসের রক্ষীরা। এরই মধ্যে পৌনে ছটা নাগাদ ডগলাসের পিছনের দরজায় দেখা গেল দুটি মুখ আর দুটি রিভলভার। রিভলভার গর্জে উঠল।

গুলির শব্দে সকলেই হতচকিত হয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীরা লাফিয়ে পালাল। তখন একদলের লক্ষ্য পড়ল ডগলাসের দিকে। তিনি টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। কয়েকজন তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। তমলুক মহকুমার জজ মিঃ জর্জ ছুটলেন আততায়ীদের পিছনে। ডগলাসের দেহ-রক্ষীরাও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটল তাদের পিছনে।

এবার জর্জ এবং রক্ষীরা বুঝল যে আততায়ী দুজন। তারা খানিক দূর একত্রে এসে 'অমরলজ' নামে একটা বাড়ির পাশ থেকে দুদিকে গেল দুজন। একজন জেলা বোর্ডের পূবদিকের রাস্তা দিয়ে ছুটল। জর্জ ছুটলেন তার পিছনে। খানিক দূরে এসে ওরা বুঝলেন আততায়ীর পিস্তলে ফায়ার হচ্ছে না। তাদের জেদ বেড়ে গেল। ইতঃমধ্যে ছেলেটি ঢুকে পড়ল এক ভাঙ্গা বাড়ির এক ঘরে। জর্জ এবং আর যারা অনুসরণ করছিল, তারা ঘিরে ফেলল ঘরটি। এক দেহরক্ষী গুলি করল। ছেলেটি দৌড়ে এসে পালাতে গিয়ে একটা কাঁটা ঝোপে আটকে গেল। এরা সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল তাকে। অন্যজনের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

ধরা-পড়া ছেলেটির পকেটে লাল কালিতে লেখা একটি কাগজ ছিল। তাতে লেখা ছিল।

"হিজলীর অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ।"

সব চেষ্টা সত্ত্বেও সেইরাতে পৌনে দশটায় ডগলাস মারা গেলেন। সেই এক রাতে অন্ততঃ দুশ'জনকে গ্রেপ্তার করা হল। জিজ্ঞাসাবাদের নামে সকলের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল। ফণীভূষণ দাস নামে একজনকে এমন মারা হ'ল যে তার কালঘাম দেখা দিল। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকল। সিভিল-সার্জেন তখন ছিলেন মাইল আষ্টেক দূরে গোদাপিয়াশাল নামে এক গ্রামে। সেখান থেকে তাঁকে তাড়াতাড়ি এনে ফণী দাসের চিকিৎসা শুরু হ'ল। ফণীদাস বেঁচে গেল। এবং আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ করল। কিন্তু

পুলিশ প্রমাণ করে ছাড়ল সে ফণী হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ছিল। যে অবস্থায় সে জেলগেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারই ফলে আহত হয়।

যা হোক দ্বিতীয় ব্যাক্তি প্রভাংশু পালকেও পুলিশ সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু কেউই তাকে সনাক্ত করতে না পারায় সে ছাড়া পেল।

এদিকে প্রচণ্ড পীড়নের ফলে এবং ফণীদাসের মার দেখে এক দুর্বল মুহূর্তে প্রদ্যোৎ স্বীকারোক্তি করে বসল। কিন্তু প্রথম সুযোগেই সে স্বীকারোক্তি তুলে নিল। বল্‌ল, সে ফণীদাসের মার দেখে এবং নিজে আর সহ্য করতে না পেরে পুলিশের সাজান কথায় সই করেছে।

সরকার এক প্রদ্যোতের বিরুদ্ধেই মামলা আনল। প্রমাণ হয়ে গেল যে প্রদ্যোতের রিভলভার খারাপ ছিল। একটিও ফায়ার হয় নি। অতএব তার গুলিতে ডগলাস মারা যাননি। কিন্তু তবু তিনজন বিচারকের দুজন তার ফাঁসি এবং একজন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। হাইকোর্টে প্রদ্যোতের ফাঁসির হুকুমই বহাল রাখল। শুনে প্রদ্যোৎ বলল, মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে আমি অমরার সংগীত শুনতে পাচ্ছি।

বৌদিকে চিঠি লিখতে গিয়ে প্রদ্যোৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করল,

> 'আকাশ হতে প্রভাত আলো
> আমার পানে হাত বাড়ালো,
> ভাঙ্গাকারার দ্বারে আমার
> জয়ধ্বনি উঠলরে, এই উঠল রে।'

বাবা দেখা করতে এলে প্রদ্যোৎ বল্‌ল, গীতা যত পড়ছি ততই আমার জীবনের সকল সমস্যাগুলি দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, যেন আনন্দ-সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।

সত্যিই যেন এক অপার্থিব আনন্দের রসে ডুবে রইল প্রদ্যোৎ। যেন তার রূপলাবণ্য ঝরে পড়তে থাকল। নিত্য পড়াশুনায় ডুবে রইল সে। অবশেষে মৃত্যুর শেষ রাতে সে মাঝে মাঝেই গাইল 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে প্রদ্যোৎ বলল,

> 'মা, আমি যেন আবার তোমার কোলে ফিরে এসে তোমার সেবা করতে পাই। ভারত থেকে অত্যাচারী ইংরেজ উচ্ছেদ হোক, আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে বিপ্লবী সৃষ্টি করুক…'

আর বলতে পেল না প্রদ্যোৎ। পায়ের তলার পাটাতন টেনে নেওয়া হ'ল। প্রদ্যোতের মরদেহ ঝুলতে থাকল ফাঁসির দড়িতে।

পুলিশ তার দেহ দিল না। জেলের মধ্যেই তারা দাহ সারল। বরং সেদিন রইল বিশেষ পুলিশ ও মিলিটারি পাহারা। কিন্তু গোটা শহর সেদিন মৃতের মত পড়ে রইল।

পর পর দুজন ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার মেদিনীপুরকে পিষে মারবার পরিকল্পনা করলেন। শান্তিরক্ষার নামে মেদিনীপুরে সশস্ত্র মিলিটারী-পুলিশ নামান হ'ল। এজন্য যে ব্যয় তা পিউনিটিভ ট্যাক্সের নামে আদায় করা হ'ল। সমস্ত নেতাদের বাড়ি দখল করে সেখানে মিলিটারিদের থাকবার জায়গা করে দেওয়া হ'ল। সাধারণ জীবন বিপর্যস্ত। বহু মানুষ পালাল মেদিনীপুর থেকে। নেহাৎ দায়ে পড়ে যারা রইলেন, তারা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকতে লাগলেন। পথে পথে চলল মিলিটারী পুলিশের রূঢ় পদচারণা। রাত্রি নামতে থাকল বিভীষিকার আবরণে।

সরকার এবার মেদিনীপুরে এক জবরদস্ত ম্যাজিস্ট্রেট পাঠাল মি. বি. ই. জে. বার্জ। বাঙলার গভর্নর স্যার জন অ্যাণ্ডারসন

মেদিনীপুরে এক দরবার ডাকলেন। সেখানে তিনি বললেন মেদিনীপুরের সন্ত্রাসবাদীরা বোধহয় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তারা মেদিনীপুরে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে জীবিত রাখবেন না। সরকার তাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল।'

লাটসাহেবের এ বক্তব্য বিপ্লবীরাও চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করল। মাজুরিয়া ও দাঁতনের প্রতিবাদ সভায় পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাল। কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল করা হ'ল। কেশপুর গ্রামের সর্বজনমান্য অহিংসপন্থী কংগ্রেস নেতা কালিপদ রায়ের পুত্রকে অমানুষিকভাবে মেরে তাদের বাড়ি এবং ধানের গোলায় আগুন ধরিয়ে দিল। বিপ্লবীরা স্থির করলেন বার্জকে হত্যা করে এর শোধ নেবেন।

বার্জ সতর্ক ছিলেন খুব। দুজন ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হওয়ায় সরকারী কড়াকড়িও বেড়েছিল। বার্জের দেহরক্ষীও ছিল প্রচুর। তিনি বেরও হতেন কম। অতএব কয়েকবার চেষ্টা করেও বার্জকে আয়ত্তে পাওয়া গেল না।

এমন সময় শুরু হল ফুটবল খেলার কাল। বার্জ নিজেও খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর টাউন ক্লাবে খেলতেন। অতএব বিপ্লবীরা স্থির করলেন যে ঐ খেলার মাঠেই বার্জকে হত্যা করতে হবে।

অবশ্য খেলার মাঠে বার্জকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগেও কয়েকবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কড়া পুলিশী ব্যবস্থার জন্য কেউ কাছেই এগুতে পারলেন না। এতে বার্জের মনে সাহস বাড়ল। এবার তিনি নিজেই খেলায় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। একেই বিপ্লবীরা সুযোগ বলে গ্রহণ করল।

১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। স্থানীয় টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা। বার্জ টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলবেন। খেলা হবে পুলিশের মাঠে। ব্যারাক শুদ্ধ পুলিশ

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শকের মধ্যে মিশে আছে। কাউকে সন্দেহ হলেই অ্যারেস্ট করছে বা তাড়িয়ে দিচ্ছে।

খেলা শুরু হবার আগেই দেখা গেল কয়েকটি নিরীহ বালক গোলপোস্টের সামনে বল প্র্যাকটিস করছে। পুলিশ দেখল। চোখে চোখে কথা হ'ল। কিন্তু না। ওরা আদৌ সন্দেহভাজন নয়। খেলুকগে।

এমন সময় রক্ষী পরিবৃত হয়ে বার্জ এসে নামলেন। ওপরের কোট খুলে ফেলতেই খেলোয়াড়ের পোষাক বেরিয়ে পড়ল। রক্ষীরা তাকে মাঠের লাইনের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বার্জ দু-এক পা ভেতরে ঢুকতেই গুড়ুম গুড়ুম পিস্তলের শব্দ।

কাছেই খেলোয়াড় বালকদের মধ্যে মিশে ছিলেন তরুণ বালক অনাথ পাঁজা আর মৃগেন দত্ত। ওরা বার্জকে উত্তর আর পশ্চিম দু-দিক থেকে গুলি করলেন। বার্জ পড়ে গেলেন। অনাথ পাঁজা তাতেও থামলেন না। লাফিয়ে তার বুকে চেপে বসে পর পর সবকটা গুলিই চালিয়ে দিলেন।

মিঃ জোন্‌স্‌ রিভলভার উঁচিয়ে এগিয়ে আসতেই ওদের গুলিতে আহত হয়ে পড়ে গেলেন। এতক্ষণে রক্ষীদের খেয়াল হ'ল। তারা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে অনাথ আর মৃগেনকে মেরে ফেলল। খেলার মাঠে পাশাপাশি বার্জ অনাথ আর মৃগেনের দেহ পড়ে রইল। তিন দেহ থেকে রক্তের ত্রিধারা এসে একত্রে মিশতে থাকল। আসলে কোন মানুষই যে শাসক বা শোষিত হয়ে জন্মায় নি—এই মহামানবিক সত্য যেন ঘোষণা করে চল্‌ল সেই ত্রিধারা।

বিক্ষুব্ধ ব্রিটিশ সরকার তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেদিনীপুরের ওপর। মেদিনীপুরে যেন অরণ্যের আইন। কিন্তু তাতে কি আর বশ মানবে মেদিনীপুর! তাতে কি আর বশ মানবে ভারতবর্ষ!

বত্রিশ

চট্টলের বিদ্রোহ

গান্ধিজীর লবণ সত্যাগ্রহ শুরুর ঠিক এক মাস ছ'দিন পর চট্টগ্রামের যুবকেরা এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। অতএব সন্দেহ থাকে না যে এঁরা আগে থেকেই এ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এর নায়ক ছিলেন সূর্য সেন। মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম এবং বহরমপুরে কাটে তাঁর স্কুলজীবন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে নাম ছিল তাঁর। এরপর তিনি এসে যোগ দেন চট্টগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে। সেই থেকে তাঁর পরিচিতি হয়ে গেল মাস্টারদা।

মাস্টারদার মনে বিপ্লবের স্বপ্ন দীর্ঘকালের। আইরিশ বিপ্লবের কথা থেকে মাস্টারদা জেনে ছিলেন somehow, some-where and by somebody a begining must be made. কোনও উপায়ে, কোনখানে কারো দ্বারা একটি সূচনা সংঘটিত করতেই হবে...। মন্ত্রটা তাঁর বুকের মধ্যে জ্বলত অবিরাম।

তবু ১৯২১ সালের অসহযোগে প্রকাশ্য রাজনীতির খোলা আসরে এসে দাঁড়িয়েছেন মাস্টারদা। সহৃদয়তায়, প্রীতিতে, মাধুর্য্যে এবং অনুপম সহানুভূতিগুণে তিনি জয় করে নিয়েছেন জনচিত্ত। নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের জেলা-সম্পাদক। অহিংসা আর সত্যাগ্রহের ব্রত প্রচারে নেমেছেন।

কিন্তু সেই মানুষ ১৯২৩ সালে নাগারখানা পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে এক খণ্ড যুদ্ধে আহত হয়ে ধরা পড়লেন মাস্টারদা। চট্টগ্রামের মানুষ বিশ্বাসই করে উঠতে পারে না। আশ্চর্য, পুলিশও কিছু প্রমাণ করতে না পেরে ছেড়ে দিল মাস্টারদাকে। জনচিত্তে বিশ্বাসটা প্রবল হ'ল যে মাস্টারদার মত নিরীহ ভালমানুষ আর হয় না।

১৯২৪-২৫ সালে এক অর্ডিনান্সের বলে বাঙলাদেশের সব বিপ্লবী এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি বন্দী হন। মাস্টারদাও তাদের ভেতর একজন। জেলখানা তাদের সম্মেলন স্থান হয়ে ওঠে। বিপ্লবীরা দুটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে থাকে। তা হ'ল অতীত বিপ্লবগুলির ব্যর্থতার কারণ এবং পরবর্তী বিপ্লব পরিকল্পনা।

এ-ব্যাপারে বিপ্লবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। বয়স্কেরা বললেন যে, অতীত বিপ্লবগুলি আয়োজনের অভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। তরুণেরা এ কথা মানলেন না। তারা বললেন যে ওগুলি ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ সমিতিগুলির ঐক্যের অভাব। তাই আগামীকালের বিপ্লবে বিপ্লবী দলগুলির বিরোধ ছাড়তে হবে। বিশেষ করে 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' দলকে এক হতে হবে।

দেখা গেল এই এক ব্যাপারেই পুরনো নেতারা পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু সবদলের তরুণেরাই একত্রিত হলেন। নতুন দলকে পুরানো নেতারা বলতে থাকলেন 'রিভোল্ট গ্রুপ' বা 'বিদ্রোহী-দল' আর নূতনেরা নিজেদের বলতে থাকলেন 'অ্যাডভান্স গ্রুপ' বা 'অগ্রদূত গোষ্ঠী'।

অগ্রদূত গোষ্ঠী স্থির করলেন যে তাঁরা পুরানোদের মত গুপ্তহত্যার দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করবেন না। তারা বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবেন। নতুন সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল—

ঢাকা : সতীশ পাকড়াশী।

চট্টগ্রাম : সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী।

কলকাতা : যতীন দাস, বিনয় রায়।

বরিশাল : নিরঞ্জন সেন।

ত্রিপুরা : প্রভাস চক্রবর্তী।

জেলখানার সম্মেলন শেষ করে তরুণেরা যখন ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে, তখন শরৎকালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজবন্দীরা একে একে মুক্তি পায়। এ বিপ্লবীরা বুকের সঙ্কল্প বুকে রেখে পরস্পরের হস্ত-মর্দ্দন করে যে যার অঞ্চলে ফিরে যায়।

চট্টগ্রামের রাজবন্দীরাও একে একে ফিরে আসে। খবরের কাগজ হাতে, ছাতা মাথায় সূর্য সেনকে ঘুরতে দেখা যায় পথে পথে। গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকানে আবার ভীড় জমে। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখ নিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী আর দিব্যি লম্বা নির্মল সেন বসেন কংগ্রেস অফিসে। অনন্ত সিংহের বেবি অস্টিন ছেলের দলে বোঝাই হয়ে দিবারাত্র হল্লা করে ছোটে।

ইতঃমধ্যে শুরু হয় রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। এখানে সুযোগ মত 'অ্যাডভান্স গ্রুপ' আবার মিলিত হয়। স্থির হয় একই দিনে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং বরিশালের অস্ত্রাগার লুঠ করা হবে। ঢাকা এবং কলকাতার ছোটখাট ঘাঁটিগুলিও লুট করা হবে।

এ কাজ সার্থক করতে প্রাথমিক প্রস্তুতির বিভিন্ন কাজও এই সম্মেলনেই ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক অস্ত্র-সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের দায় পড়েছিল যতীন দাসের

ওপর। কর্মতৎপর যতীন দাস কাজ অনেকটা গুছিয়েও এনেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি তিনি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হলেন এবং অনশনে দেহত্যাগ করলেন। যারা কলকাতায় কাজ করছিলেন তারা অল্পদিনের মধ্যে মেছোবাজার অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার হলেন। নভেম্বর মাসে এক লাল-ইস্তাহার বের করে ভারতীয় রিপাবলিকান সৈন্যদলের তরফ থেকে সমস্ত কৃষক এবং যুবককে আসন্ন সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান হলেও ক্রমে সামগ্রিক উত্থানের পরিকল্পনা ছিন্ন হয়ে গেল। মাস্টারদা নিজের পরিকল্পনায় লেগে রইলেন। ভাবতে অবাক লাগে ১৯২৮ সালের শেষ দিকে ছাড়া পেয়ে পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রায় পৌনে একশ ছেলেকে রীতিমত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, বন্দুক চালনা শিখিয়ে কিভাবে এ অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করেছিলেন মাস্টার-দা।

বাহিনী প্রস্তুত করে আক্রমণের ছক তৈরী করলেন মাস্টারদা। মোটামুটি পাঁচটি কেন্দ্রে একই সঙ্গে আক্রমণের ছক তৈরী হ'ল।

১. পুলিশ ফাঁড়ি এবং অস্ত্রাগার দখল করা।
২. সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি ও অস্ত্রাগার দখল করা।
৩. যোগাযোগ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করা।
৪. রেল ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস করা।
৫. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের বন্দী করা।

মাস্টারদা প্রত্যেকটি কাজের জন্য পৃথক নেতা এবং পৃথক দল তৈরী করলেন। প্রত্যেক কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হল। মহড়া হ'ল। প্রস্তুত হ'ল প্রত্যেক দল। মাস্টারদা কুড়ি জন বিশিষ্ট সৈনিককে রিজার্ভ রাখলেন। তারপর আক্রমণের তারিখ ঘোষণা করলেন ১৮ই এপ্রিল। রাত দশটা।

ঐ দিন সন্ধেবেলা 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র নামে একটি ইস্তাহার বিলি করা হ'ল চট্টগ্রামে। তাতে লেখা ছিল, রাত্রি ঠিক দশটায় চট্টগ্রাম কংগ্রেস অফিস এবং গণেশ ঘোষের দোকান থেকে চারটি দল বের হবে। একটি দল উপেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আগেই চলে গেছে চট্টগ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধূম নামক স্থানে রেল লাইন উপড়ে এবং টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ধ্বংস করে দিতে।

ধূমের বাহিনী ঘড়ি মিলিয়ে সাড়ে দশটায় রেল লাইনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। হাতুড়ির আওয়াজ হয় ঘটাং ঘটাং—সরে যায় ফিস্‌প্লেট। ফাঁক হয়ে যায় লাইন—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সব ঠিক আছে কিন্তু সব আলগা। কমাণ্ডার নির্দেশ দেন এবার তার। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা উপড়ে ফেলে টেলিগ্রাফ পোস্ট আর কেটে দেয় তার। কিন্তু কিসের আলো! কমাণ্ডার তাড়াতাড়ি সৈনিকদের পাশের বাগানে লুকোতে নির্দেশ দেন।

একটা মালগাড়ি আসছে। নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবে কি? না। ড্রাইভার সন্দেহও করে নি। সোজা সাজান জায়গায় এলো গাড়িটি। তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে হুড়মুড় করে উল্টে গেল। শেষের দিকের কিছু বগি দাঁড়িয়ে রইল। কমাণ্ডার আনন্দিত। মালগাড়িটা তাদের কাজ এগিয়ে দিয়েছে। লাইন সারিয়ে যোগাযোগ চালু করা সহজ হবে না। কমাণ্ডার সকলকে ফিরতে নির্দেশ দিলেন।

* * *

অক্সিলিবারী ফোর্সের আর্মারি। মূল অস্ত্রাগার। প্রহরী নিষ্ঠার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা গাড়ি ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল হুকুমদার। অর্থাৎ Who comes there—কে আসছ!

গাড়ি থেকে আওয়াজ আসে, ফ্রেণ্ড। বন্ধু।

গাড়ি ভিতরে চলে আসে। প্রহরী তাকিয়ে থাকে গাড়ির দিকে। অদূরে আরও চারজন প্রহরী বিশ্রাম করছে তারাও গাড়ির দিকে তাকায়। সন্দেহের কিছু দেখে না তারা।

গাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে আর্দালি গোছের কেউ নেমে সেলাম করে। সামনে থেকে যিনি নামেন তিনি নিশ্চয় বড় অফিসার। একটু নিশ্চিন্ত হয় প্রহরী। কিন্তু সেই মুহূর্তেই অফিসারবেশী লোকনাথ বলের পিস্তল গর্জে ওঠে। প্রহরী লুটিয়ে পড়ে। অন্যদের দিকে গুলি ছুঁড়তেই তারা হাউ মাউ করে অন্ধকারে ছুটে পালায়। অন্যেরা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যে যার পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

ওদিকে ডিনার খেতে খেতে মেজর ফেরল ছুটে বাইরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি আসে। মেজর পড়ে যান। চিৎকার করে ছুটে আসেন মেম সাহেব। এক খানসামা তাকে মুহূর্তে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

নিশ্চিন্ত। এবার অস্ত্রাগারের দিকে নজর দেয় বিপ্লবীরা। চাবি নেই। কোথায় তা জানা যায় না। তখন লোকনাথ আদেশ দেন গাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধ দরজা। গাড়ি স্টার্ট দাও।

সৌভাগ্যক্রমে তাতেই ভেঙ্গে যায় দরজা। কয়েকজন বড় বড় স্লেজ-হ্যামার দিয়ে ভেতরের গরাদেতে আঘাত করে। তাও ভেঙ্গে যায়। তারা তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে গাড়িতে তুলতে থাকে, তুলতে থাকে গুলি বারুদ।

এদিকে যে পাহারাদারেরা পালিয়ে ছিল তাদের একজন গিয়ে খবর দেয় ম্যাজিস্ট্রেটকে। ম্যাজিস্ট্রেট ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বের করতে বলেন ড্রাইভারকে। ছোটেন আর্মারির দিকে।

আর্মারির কাছাকাছি আসতেই বিপ্লবী প্রহরী চিৎকার করে

ওঠে : হু কামস্ দেয়ার। উচ্চারণ শুনেই ম্যাজিস্ট্রেট বোঝেন এ ভুয়ো সেণ্ট্রী। তিনি গাড়ি চালিয়ে যেতে হুকুম দেন। সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে গুলি ছোটে। গাড়ি থেমে যায়।

বিপ্লবীরা ছুটে গিয়ে চিনতে পারে গাড়িটা। ম্যাজিস্ট্রেটের। ড্রাইভার মৃত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট? নিশ্চয় পলাতক। এদিক ওদিক খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে।

এমন সময় আর একটা গাড়ি। বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়। হেঁকে ওঠে, হু কামস্ দেয়ার!

ও গাড়ি থেকে উত্তর আসে, জেনারেল সিং।

সত্যিই কি জেনারেল অনন্ত সিং এসেছেন? সন্দেহের নিরসন করতে প্রহরী জিজ্ঞাসা করে, পাস ওয়ার্ড!

ইন্ডিপেনডেন্স্।

আর সন্দেহ নেই। অনন্ত সিং-এর গাড়ি ভেতরে চলে আসে। লোকনাথ এগিয়ে এসে বলেন, আমরা অস্ত্রাগার দখল করেছি। অস্ত্র উঠছে গাড়িতে।

অনন্ত সিং-এর কাছে ওরা শোনেন কোতেয়ালী দখলের কাহিনী। দল কোতোয়ালীর কাছে গিয়েই অতর্কিতে প্রহরীকে গুলি করে। তারপর অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ এবং মাস্টারদার সঙ্গে জনা কয়েক ছেলে রিভলভার হাতে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে ব্যারাকের দিকে দৌড়ান। দু-একটা ফায়ার করে তারা চিৎকার করতে থাকেন, বন্দেমাতরম্। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মুহূর্তে সিপাহিরা পালাতে থাকে। ক'মিনিটের মধ্যে ব্যারাক ফাঁকা হয়ে যায়। বিপ্লবীরা চিৎকার করে ওঠে, স্বাধীন ভারত কি জয়। বিপ্লবীরা লাইন করে দাঁড়ায়। মাষ্টারদা অনন্ত সিংকে বলেন, আর্মারির সংবাদ আনো।

সংবাদ এনে আর্মারির বিপ্লবীরাও জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। তারপর কাজ। অস্ত্র অনেক পেলেও বহু অস্ত্রের গুলি পাওয়া যায় না।

ম্যাগাজিন স্টোর জানা নেই। তাই বিপ্লবীরা বাড়তি বা অব্যবহার্য অস্ত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর রওনা হয় পুলিশ ব্যারাকের দিকে। সেটাই তখন বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টার।

অন্য দলগুলিও একে একে ফিরে আসে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জেও বিশেষ ঝামেলা হয়নি। টেলিফোন অপারেটর পিস্তল দেখেই ভয় পেয়ে পালায়। বিপ্লবীরা বড় বড় হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলে কী-বক্স। পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমন সময় বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসেন টেলিগ্রাফ মাস্টার। বন্দুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রিভলবার নিয়ে যুদ্ধ সম্ভব নয়—অতএব তারা চলে আসে। ফলে পুরো টেলিফোন ভবন ধ্বংস করা না গেলেও—টেলি-যোগাযোগ ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু প্রায় ব্যর্থ হয়েছে যে দল, ইউরোপীয়ান ক্লাব দখল করতে গিয়েছিল। অতরাতে দু-একজন বেয়ারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই তারা ক্লাব আক্রমণ না করেই চলে এসেছে।

জেনারেল সিং সকল বিপ্লবীকে পতাকা-দণ্ডের নীচে লাইন করে দাঁড় করান। সেনাপতিরা খোলা তলোয়ার হাতে সূর্য সেনকে বরণ করে আনেন সেখানে। তিনি দণ্ড থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে আনেন। তুলে দেন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। বলেন, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প আজ আমরা বাস্তবে পরিণত করেছি। এই শহরে আমরা করেছি বিদেশী শাসনের অবসান। চট্টগ্রামে আজ থেকে অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বহুদিনের স্বপ্ন আজ হল সার্থক। এই যে ওপরে উড়ছে আমাদের জাতীয় পতাকা —তাও স্বাধীন রাজ্যে তুলবার গৌরব আজ আমাদের। এ পতাকার সম্মান রক্ষা করতে আমরা প্রাণপাত করব প্রতিজ্ঞা করলাম। বন্দে মাতরম্।

সকলে সমস্বরে বলল, বন্দেমাতরম্। স্বাধীন ভারত কি জয়।

এমনি করে প্রতিষ্ঠিত হ'ল চট্টগ্রামের বিদ্রোহী যুবকদের স্বাধীন জাতীয় সরকার।

কিন্তু এ অভ্যুত্থানের বিচ্যুতি থেকে গেল অনেক। ইউরোপীয়ান ক্লাব ধ্বংস করে তারা যে ভিতরের শত্রু বধ করতে চেয়েছিল তা হ'ল না। দিনটা ছিল ইস্টার উৎসবের দিন। তাই সেদিন সকলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলেন। এরা নানাভাবে আধঘণ্টার মধ্যেই সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। অন্য দিকে বিদ্রোহীরা বহু অস্ত্র পেলেও পর্যাপ্ত গোলা বারুদ পেলেন না। বিশেষ করে মেসিনগান জাতীয় অস্ত্রের কোন গুলি-গোলা না পাওয়ায় তাদের শক্তি অর্দ্ধেকের বেশী কমে গেল। প্রাথমিক জয়ের উল্লাসে বিদ্রোহীরা এ-গুলি উপেক্ষা করলেন।

অন্যদিকে ইংরেজ যুদ্ধের তৎপরতায় কাজ শুরু করলেন। দ্রুত স্ত্রী পুত্র নিয়ে তারা গেলেন কর্ণফুলি নদীর বুকে এক স্টিমারে। সেখানেই তাদের মনে পড়ল এক গুদামে আছে মেসিনগান-জাতীয় লুইস-গান। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটি এনে জলকলের ওপরে বসিয়ে বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টারে গুলি চালান শুরু করলেন। বিপ্লবীরাও বন্দুক ফায়ার করে তার জবাব দিলেন, এবং দু-তুবার সাহেবদের স্তব্ধও করে দিলেন বটে, তবু একদিকে যেমন তারা বুঝলেন না, যে সরকারী শক্তি কতখানি সংগঠিত ঠিক তেমনি বুঝলেন যে আড়াল না থাকায় পুলিশ ব্যারাক যুদ্ধ-ঘাঁটির উপযুক্ত স্থান নয়। অতএব বিপ্লবী সংস্থা সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল। এখানেও তারা আর এক মারাত্মক ভুল করলেন। শহর থেকে বিছিন্ন হয়ে চললেন কিন্তু নেপথ্য থেকে আহার্য-পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করে রেখে গেলেন না। এমন কি সেদিন রাত্রে যে হোটেলে সকলের খাওয়ার আয়োজন করে রাখা হয়েছিল, তা খাওয়ার বা সংগ্রহের অবকাশও হ'ল না তাদের। বিদ্রোহীরা শহরের উত্তরের পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন।

যাবার আগে তারা পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন পুলিশ ব্যারাকে। আগ্রহের আতিশয্যে হিমাংশু সেন নেতাদের পূর্ব-নির্দেশ ভুলে নিজেই পেট্রল ছিটিয়ে নিজেই আগুন ধরাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেলেন। অন্যেরা তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বললেও অনন্ত সিং এবং গনেশ ঘোষ তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে গেলেন। পথের ছোটখাট বিপত্তি এড়িয়ে তারা যখন পুলিশ ব্যারাকে ফিরে এলেন তখন সেখানে কেউ নেই। ওরা বৃথাই অস্ত্রাগার ইত্যাদি নানা স্থানে ঘুরলেন—কিন্তু মূল বাহিনীর সঙ্গে আর যুক্ত হতে পারলেন না।

এদিকে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহীরা এসে ওঠেন নাগার-খানা পাহাড়ে। মাঝরাতে তাদের খাবারের কথা মনে পড়ে। দুঃসাহসী টেগরা বল (লোকনাথ বলের ভাই) সেই রাতেই শহরে নেমে গিয়ে কিছু বিস্কুট. আম আর জল এনে সাময়িক ব্যবস্থা করে।

এমনি করে দু দিন কেটে যায়।

এদিকে সরকারী পক্ষ ইতঃমধ্যে সংগঠিত হয়ে উঠেছে। তারা পুলিশ ব্যারাক জ্বলতে দেখে এবং বিপ্লবীদের গুলি-গোলা বন্ধ হতে দেখে অনুমান করে যে বিপ্লবীরা শহর ত্যাগ করেছে। সামান্য দু-একটা বন্দুক হাতেই তারা শহরে নেমে পড়ে এবং শহর দখল নেয়। পলায়িত সিপাইরা ফিরে আসে। অন্যদিকে, হঠাৎ তারা আবিষ্কার করে যে নদীর বুকে একটি জাহাজে বেতার-ব্যবস্থা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মারফৎ বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে দিতে থাকল। কলকাতা ফোর্ট-উইলিয়ামের বেতার যন্ত্রে সে সংবাদ ধরা পড়ল রাত শেষ হবার আগেই। লাট-সাহেব যাচ্ছিলেন দার্জিলিং। তাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক অর্ডিনান্স জারী করে বাঙলা দেশের সব জেলার বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে ফেললেন। আশে-পাশের জেলার সৈন্যদের বললেন চট্টগ্রামকে ঘিরে ফেলতে।

রেঙ্গুন থেকে একটা যুদ্ধ জাহাজ ছুটল চট্টগ্রামের দিকে। আর অন্য দিকে ভাঙ্গা রেল-লাইন মেরামত করে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার-রাইফেলস্, সুর্মা-ভ্যালী-লাইট হর্স এবং রেলওয়ে ফোর্সের হাজার হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে আসা হ'ল। মোটরে, ট্যাক্সিতে, স্পেশাল ট্রেনে সৈন্য আসতে থাকল অবিরাম।

বিপ্লবীরা পাহাড় বদল করলেন। এবার তারা এলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। যুদ্ধের পক্ষে এ পাহাড়টি অনেক সুরক্ষিত। কিন্তু তবু তারা বুঝলেন যে শহর ছেড়ে এসে তারা ভুল করেছেন। ওরা স্থির করলেন যে সর্বশক্তি দিয়ে আবার শহর দখল করবেন।

কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল না। বিপ্লবীদের খাদ্য এবং পানীয়ের অভাব চলছিল আগে থেকেই। সেদিন ক্ষুধার তাড়নায় একজন নেমে যায় পাশের মাঠে। কয়েকটা তরমুজ নিয়ে আসে। সে পড়ে যায় চাষীদের নজরে। চাষীরা সংবাদ দেয় পুলিশকে। ২১শে এপ্রিল দুপুরের আগেই সরকার জেনে ফেলে বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থানের কথা। বিপ্লবীরাও বুঝতে পারে এ অবস্থার কথা। মাস্টারদা লোকনাথ বলের ওপর নেতৃত্বের দায় দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

বিকেলে অদূরে রেললাইনের বুকে একটি ট্রেন দাঁড়ায়। পাহারায় থাকা বিপ্লবী দূরবীণে দেখে দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দেয় সৈন্যবাহিনী আসছে। লোকনাথ বল দূরবীণে চোখ লাগিয়ে চিনতে পারে ক্যাপ্টেন টেট, ক্যাপ্টেন ডগলাস স্মিথ, ডি আই জি ফারমার-এর নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ আর সুর্মা-ভ্যালী-লাইট-হর্স বাহিনীরা এগিয়ে আসছে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওদিকে বন্দুকে বেয়নেট লাগিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসে সৈন্যরা। সেনাপতি বল চেঁচিয়ে ওঠেন, ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় কয়েকজন সৈন্য। তারা থামে না। এবার

গুঁড়ি মেরে এগুতে থাকে। বিপ্লবীরাও গুলি চালায়। পাহাড়ের ওপরে থাকায় তাদের সুবিধে বেশি। সরকারী সৈন্য মুহুর্মুহু আহত হচ্ছে। মাস্টারদা গুঁড়ি মেরে প্রত্যেকের কাছে যান। সাহস দেন। বলেন, একটা গুলিও যেন নষ্ট না হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি সৈন্য আহত হওয়া চাই।

মিলিটারী আলের আড়াল নেয়। গুলিও চালায়। কিন্তু অবশেষে তারা পিছিয়ে যায়। উল্লাসে বিপ্লবীরা চিৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্! ভারত মাতা কি জয়! ওরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রথম জয়ে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। গান আবৃত্তির ধুম পড়ে যায়। টেগরা একটা পতাকা তুলতে যায় গাছে। এমন সময় হঠাৎ আবার গুলির ঝাঁক আসে। বিপ্লবীরা বোঝে পাশের পাহাড়ে উঠে পড়েছে ওরা, মেশিনগান চালাচ্ছে। সেনাপতি চেঁচিয়ে ওঠেন. টেক কভার, টেক কভার। আড়াল নাও।

বিপ্লবীরা আড়াল নিয়ে শুয়ে পড়ে। নির্মল সেন হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বন্দুকগুলি ভরে এগিয়ে দেন।

এমন সময় হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগে টেগরার বুকে। নির্মল সেন এগিয়ে এসে ডাকেন তাকে। টেগরা বলে, তোমরা চালিয়ে যাও। থেমো না। এলিয়ে পড়ে জালালাবাদের প্রথম শহীদ।

ও দিকে যুদ্ধ চলতে থাকে। মিলিটারী অফিসাররা বিস্মিত হন এদের সমর কৌশল দেখে। মেসিনগানের বিরুদ্ধে সামান্য মাস্কেট বন্দুকে লড়াই করছে বিপ্লবীরা। চলছে volley firing-ক্ষয়-ক্ষতির হার সরকারেরই বেশি।

তবু এ পক্ষেও আহত হয় মারা যায়। বিনোদ দত্ত, বিধু ভট্টচার্য আহত হয়। আহত হন অম্বিকা চক্রবর্তী। ত্রিপুরা সেন মারা যান। মতি কানুনগো আহত হয়ে ছটফট করে। বন্ধুর দিকে তাকাবার সময় নেই। কেউ বা মৃত সঙ্গীর দেহকেই আড়াল হিসাবে গ্রহণ করে গুলি চালাতে থাকে।

রাত নটায় হঠাৎ ওদিক থেকে গুলি চালান বন্ধ হয়। এতক্ষণে বিপ্লবীর নিজেদের দিকে তাকাবার অবকাশ পান। মারা গেছেন এগার জন। তাদের পাশাপাশি শোয়ান হয়। টেগরা (হরিগোপাল বল)···প্রভাস বল···বিধু ভট্টাচার্য···অম্বিকা চক্রবর্তী ···বছর তেরর ছেলে নির্মল লালা···পুলিন ঘোষ···ত্রিপুরা সেন··· জিতেন দাশগুপ্ত···মতি কানুনগো ··অর্ধেন্দু দস্তিদার···নরেশ রায়··· [পরে জানা যায় অম্বিকা চক্রবর্তী মরেন নি]

মাস্টারদা সিদ্ধান্ত নেন, জালালাবাদ পাহাড়ে থেকে যুদ্ধ সম্ভব নয়। কাল মিলিটারী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। অতএব পালাতে হবে। এখন থেকে গেরিলা যুদ্ধ। বিপ্লবীরা রাতের অন্ধকারে পাহাড় ছেড়ে চলে যায়। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যে আয়োজন করেছিল তা মূলতঃ এখানেই ধ্বংস হয়। কিন্তু তবু বিচ্ছিন্নভাবে মাস্টারদা এবং তার সঙ্গীরা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

২৩শে এপ্রিল অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্তকে গ্রাম্য চাষীর বেশে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ওদের পুটুলি গুলোর দিকে হাত বাড়ালেই গুলি করে অনন্ত সিং। একজন দারোগা এবং দু'জন কনস্টেবল আহত হয়। বিপ্লবীরা পালায়।

বিপ্লবীদের সন্ধানে চষে বেড়াতে থাকে মিলিটারী আর পুলিশ সমগ্র চট্টগ্রামের ওপরে চলে বর্বর অত্যাচার। কোথাও কোথাও গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বিপ্লবী দল যে কোথায় আত্মগোপন করে থাকে কে জানে।

এ অবস্থার মধ্যে হঠাৎ ৬ই মে তারিখে কর্ণফুলী নদীতীরে ইউরোপীয়ান কলোণী আক্রমণের জন্য চলতে থাকে বিপ্লবীরা রাত্রে নদীতীরে পৌছান মাত্র কয়েকজন মুসলমান চিনে ফেলে তাদের। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠায় পুলিশ-মিলিটারীদের। এদিকে বিপ্লবীরা বোঝেন গ্রামের লোক ঘিরে ফেলেছে তাদের। তারা

বোঝাতে থাকে তাদের। কিন্তু কে শোনে সে কথা। ইতস্ততঃ করে বিপ্লবীরা—তারপর পিস্তল বের করে। ফাঁকা আওয়াজ করে। গ্রামবাসীরা একটু সরে যায়। সেই ফাঁকে সরে পরে বিপ্লবীরা।

বিপ্লবীরা নদী তীরে গিয়ে একটি নৌকা করে পার হতে থাকে। ইতঃমধ্যে পুলিশ এসে সেই গ্রামে বিদ্রোহীদের না পেয়ে নদী পর্যন্ত ছুটে আসে এবং তাৎক্ষণিক সংবাদ সংগ্রহ করে পোর্ট-পুলিশের লঞ্চে করে তাদের তাড়া করে। বিপ্লবীরা প্রমাদ গোনেন। কিন্তু নেতা হাল ছাড়েন না। তিনি রিভলভার চালান শুরু করেন। দেখাদেখি অন্যেরাও। পুলিশও পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু তারই মধ্যে নৌকা ওপাড়ে কালিরপোপে নামক গ্রামে নেমে পড়েন। পুলিশ তবু তেড়ে যায়। তারা আশ্রয় নেন এক কাঠের গাদা ও মাটির ঢিপির আড়ালে। মাত্র ছ'জন বিপ্লবী শুধু রিভলভার দিয়ে বিচিত্র যুদ্ধে আধ ঘণ্টারও বেশিক্ষণ আটকে রাখে।

ক্রমে নিহত হন স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন আর দেবপ্রসাদ গুপ্ত। তখনও সুবোধ চৌধুরী এবং ফণী নন্দী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অসম্ভব সে যুদ্ধ। অতএব ওরা পরামর্শ করে আত্মসমর্পণ করে।

২৮শে জুন একা এসে পুলিশ অফিসে আত্মসমর্পণ করেন অনন্ত সিং। সকলে হত-চকিত হয়ে যায়। নিশ্চয় বিশেষ কোন পরিকল্পনা আছে। কেউ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেও সাহস পায় না। তাকে রাখা হয় ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। বিশেষ পুলিশ পাহাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রামে।

৩১শে আগস্ট হঠাৎ চন্দননগরের এক বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। সেখান থেকে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ইত্যাদি গ্রেপ্তার হন। তাদেরও চট্টগ্রামে আনা হয়।

সেখানে বিশেষ ট্রাইবুনাল বসবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

মামলার। কিন্তু তার আগেই মিলিটারী অধ্যুসিত চট্টগ্রামে আর এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। বিপ্লবীরা ডিনামাইট পেতে ট্রাইবুন্যালের বিচারক, তদন্তকারী পুলিশ দল, থানা জেলখানা ইত্যাদি সব উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করে ছিল। কিন্তু তা ধরা পড়ে যায়।

এবার প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় সরকার। এ বিপ্লবীদের পক্ষে সব কিছু সম্ভব! তারা চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের আতঙ্কের চোখে দেখতে থাকে। শোনা যায় সরকারের তরফ থেকে বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা আপোস আলোচনার আয়োজন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। তবে এ মামলায় কাউকেই তিন বছরের বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হয় নি।

এ সময়ে চট্টগ্রাম আবার আন্দোলিত হয়ে ওঠে এক পুলিশ ইনেস্পেক্টর আমানুল্লা খানের হত্যাকাণ্ডে। এই অফিসারটি চট্টগ্রাম দমনে সবচেয়ে উগ্র ভূমিকা নেন। ছেলে-বুড়ো বা নারী-পুরুষ ভেদ ছিল না তার কাছে। কত পরিবারকে গৃহহীন ভিখারিতে পরিণত করেছিলেন ইনি তার ইয়ত্তা নেই। সন্দেহ-বশে থানায় টেনে এনে মারের চোটে হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া বা কোন অঙ্গ বিকল করে দেওয়া আমানুল্লা সাহেবের নেহাৎ ছেলে খেলা ছিল। বিপ্লবীরা এর পুরস্কার দিতে চাইলেন। ৩০শে আগস্ট আমানুল্লা নিহত হলেন।

খুব পরিকল্পিত ভাবে পুলিশ এবার এ জন্য হরিপদ ভট্টাচার্য বলে একজনকে গ্রেপ্তার করল এবং একে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর আক্রমণ হিসেবে প্রচার করতে থাকল। তারা যা চেয়েছিল হ'ল তাই। মুসলমান গুণ্ডারা চট্টগ্রামে দাঙ্গা শুরু করে। পুলিশ তলা থেকে সাহায্য করে গুণ্ডাদের। চট্টগ্রামে হিন্দুদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

এর মধ্যেই ট্রাইবুন্যালে বিচার শেষ হয়। সকলেরই যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর সাজা হয়। এখনও সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার পলাতক।

১৯৩১ পার হয়ে এল পরের বছর। ১৪ জুন তারিখে ধলঘাটের পটিয়াগ্রাম ঘিরে ফেলল পুলিশ এবং মিলিটারী। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিজে এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সত্যিই সেখানে তখন বাস করছিলেন সূর্য সেন, নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়দ্দেদার, কল্পনা দত্ত ইত্যাদি বিপ্লবীরা। পুলিশের গন্ধ পেয়েই যেন বিপ্লবীরা দোতলায় উঠে যান। সিঁড়ি দিয়ে ক্যামেরন ওপরে উঠবার পথেই বিপ্লবীরা গুলি চালাতে থাকে। ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়ে পড়ে যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ কিন্তু গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। বিপ্লবীরা বোঝেন যে বেশিক্ষণ এ যুদ্ধ চালান যাবে না। অতএব সুযোগ বুঝে তারা পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশে নির্মল সেন আর অপূর্ব সেন এ যুদ্ধে মারা যান। সূর্য সেন তাঁর দুই বিপ্লবী নারী-সহযোগী, প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান।

স্থির হয় প্রীতিলতা এক বৈপ্লবিক কাজ করে আত্মোৎসর্গ করবে। নারীরাও যে পিছিয়ে নেই এটা প্রমাণ করা দরকার। এ কারণে তার নেতৃত্বে 'পাহাড়তলী রেলওয়ে ইন্সটিটিউট' আক্রান্ত হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর। ভারতে ইংরেজরা নিরাপদ নয়—তাহাই প্রমাণ হয় এ আক্রমণে। অন্যেরা পালালেও প্রীতিলতা বিষপান করে ঐ ক্লাব ঘরের কাছেই আত্মত্যাগ করে। এক চিঠিতে এ বৈপ্লবিক কাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা ছিল প্রীতিলতার সঙ্গে। তিনি ভারতের প্রথম নারী শহীদ।

পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে সূর্য সেনের জন্য। ছোট খাট কত আক্রমণ ও যুদ্ধ হয় তার কথা বলে শেষ করা যায় না। বিপ্লবীরা ধরা পড়ে, নিহত হয়—তবু শেষ নেই। অবশেষে ১৯৩৩—

সালে ১লা ফেব্রুয়ারী গৈরালা গ্রামের এক বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। সত্যিই তখন সে বাড়িতে বাস করছিলেন সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত সহ জনা ছয়েক বিপ্লবী। আশ্রয় দিয়েছিলেন বাড়ির কর্তা ব্রজেন সেন। কে না সাহায্য করে এই বিপ্লবীকে। না হলে এত অত্যাচারের মধ্যেও কি করে রক্ষা পান সূর্য সেন। তাকে রক্ষা করে গগন ঘোষের মত দাগী চোর, তারিণী মাঝির মত নিরক্ষর ব্যক্তি। একবার যখন পুলিশ তাড়া করেছে সূর্য সেনকে, তখন এক মুসলমান মহিলা তা বুঝতে পেরে নিজের কাপড় খুলে দেন। নিজে নেমে যান জলে। সূর্য সেন ঐ কাপড় পরে তার বাসন মাজতে থাকেন আর মহিলা গলা জল থেকে যেন বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছেন, এভাবে কথা বলতে থাকেন। পুলিশ তাদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। এমনি করে বাঁচিয়ে রেখেছিল যে প্রদীপ শিখা তাকে নেভানর আয়োজন করল ব্রজেন সেনের এক বৈমাত্রেয় ভাই নেত্র সেন। সে বিপ্লবীদের সংবাদ জানিয়ে দিল পুলিশকে।

রাত সাড়ে নটায় বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে উভয়-পক্ষে গুলি গোলা চলা শুরু হয়। সুযোগ বুঝে পালাতে থাকেন সবাই। কিন্তু হঠাৎ একদল পুলিশের সামনে পড়ে যান মাস্টারদা। তারা চেপে ধরে। ঝলসে ওঠে একটা ম্যাগনেসিয়াম বোমা। চিনে ফেলে সকলে।

১৮ই মে গোহিরা গ্রামে আর এক কুম্বিং অপারেশনে ধরা পড়ে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত।

কিন্তু তার আগেই নেত্র সেনকে হত্যা করে বিপ্লবীরা। বিচারে ফাঁসির হুকুম হয় সূর্য সেনের আর তারকেশ্বর দস্তিদারের।

১২ জানুয়ারী ১৯৩৪ সাল।

সারা চট্টগ্রামে কারফিউ। জেল মিলিটারীর হাতে। জেলের গারদ ধরে মাস্টারদা তার শেষ বাণী দিতে থাকেন। তিনি থামলেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলতে থাকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। বুঝি সব

ভয় ভীতি ভেঙ্গে গেছে সকলের। তারকেশ্বর গান গাইতে থাকেন।

এভাবে সারারাত চলবে নাকি। মিলিটারী নেমে পড়ে বন্দীদের মারতে। তবু থামে না ধ্বনি। গোটা জেলখানা যেন জেগে উঠেছে। মার খায় তবু চেঁচায়। ভয় পেয়ে পুলিশ অর্দ্ধ-অচেতন মাস্টারদা আর তারকেশ্বরের দেহ ধরাধরি করে এনে মাঝ-রাতেই ঝুলিয়ে দেন দড়িতে।

কে জানে! মরেও যদি না মরে এসব মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। অতএব এক জাহাজে করে মৃতদেহ দুটি নিয়ে গিয়ে সকলের অজান্তে ফেলে দিয়ে আসে বঙ্গোপসাগরের জলের তলায়। ইংরেজ সরকার বোঝে-নি যে সে স্পর্শ পেয়ে বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি জলকণা উঠবে জেগে। যে উত্তাল ঢেউ গোটা ব্রিটিশরাজ্য মুছে দেবে ভারত থেকে। সূর্যসেনরা যে অমর।

তেত্রিশ

প্রায় নব্বুই হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করল। বন্দী হলেন গান্ধীজি, জওহরলাল, মতিলাল, জওহরলাল-স্ত্রী কমলা নেহেরু, সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষের প্রায় সব নেতা। শোলাপুর, পেশোয়ার, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, মেদিনীপুরের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করল। তবু প্রকারান্তরে ব্যর্থ হল সব চেষ্টা। ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড অত্যাচার-হত্যা ও পীড়নের ভিতর দিয়ে এ আন্দোলনকে দমন করলেন।

কিন্তু তারা বুঝলেন যে ভারতবর্ষের হাতে কিছু কিছু শাসন ক্ষমতা না ছেড়ে দিলে পূর্ণ-স্বাধীনতার এ দাবীকে দমন করা যাবে না। এ জন্যই তারা সাইমন কমিশন বসিয়েছিলেন।

ইংরেজ সরকার সাইমন কমিশন বসিয়েছিলেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। পার্লামেন্টের সভ্য স্যার জন সাইমনের সঙ্গে ছিলেন আরও সাতান্ন জন সভ্য। ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করে কতখানি এবং কিরূপ শাসন সংস্কার করা যায় তা বিবেচনার দায়িত্ব ছিল এই কমিশনের।

এ কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় ভারতীয়

জাতীয় কংগ্রেস এ কমিশন বর্জন করেছিল। আমরা আগেই বলেছি কমিশনের সভ্যেরা ভারতে পদার্পন করা মাত্র বোম্বাইতে ধর্মঘট হয়েছিল। হয়েছিল বিদেশী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। যে শহরেই কমিশন গেছে, সেখানেই 'সাইমন কমিশন ফিরে যাও' বলে গর্জন করেছে জনতা।

এদিকে ১৯২৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংগঠন কেমন হবে এ প্রশ্ন ওঠে এবং মতিলাল নেহেরুর ওপর গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব পড়ে। মতিলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতবর্ষের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের বদলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেও ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া যে ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করে--যাকে বলা হয় ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস—তাই চাইলেন। সুভাষ, জওহরলালের মত তরুণেরা আপত্তি তুললেন। ১৯২৭ এর অধিবেশনেই যখন পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে স্থির করা হয়েছে, তখন ১৯২৮ শে আবার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস চাওয়া কেন? গান্ধীজি দু'দলের মধ্যে রফা করলেন। স্থির হল যে ১৯২৯ এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিলে ভারত আর আন্দোলন করবে না। কিন্তু তা না দিলে শুরু হবে তীব্র আন্দোলন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর সূচনায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ওড়ে। ১৯৩০ এর ২৬শে জানুয়ারী পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস।

এদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন যতই জোরদার হচ্ছিল ততই ধর্মীয় জিগির বড় হয়ে উঠছিল। এর সর্ব প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি এক সময় কংগ্রেসের সদস্য ও নেতা থাকলেও তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে এক তত্ত্বের আমদানী করে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের পৃথক করে তুলতে থাকেন। ১৯২৮ সালের সর্বদলীয় কনফারেন্স মহম্মদ আলি জিন্নার

দাবী গুলি নাকচ করে দিলেও ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারী তিনি মুসলমান সমাজের •হয়ে সর্বভারতীয় মুসলমান কন্‌ফারেন্সে এক দাবীপত্র প্রচার করলেন। এ দাবীগুলি যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বা নীতিসম্মত ছিল এমন নয়। কিন্তু তবু উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা বোধে জাড়িত মুসলমানরা একে কেন্দ্র করে দলবদ্ধ হতে থাকলেন।

এ সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড আরউইন। তিনি সাইমন কমিশনের পক্ষে এক বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন যে, ভারতকে ক্রমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়াই তো ব্রিটেনের লক্ষ্য। সে জন্যই তো এসেছে সাইমন কমিশন। কমিশন রিপোর্ট পেশ করলেই ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ডাকা হবে গোল-টেবিল বৈঠকে।

১৯৩০ সালের মে মাসে যখন গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে, তখন জন সাইমন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। ঐ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক ডাকলেন। একেই বলা হয় গোল-টেবিল বৈঠক।

আসলে, সাইমন কমিশনে যে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না, এবং যে কারণে কংগ্রেস এ কমিশন বয়কট করেছিল, তার ওপরে প্রলেপ দিতেই গোল-টেবিল বৈঠকের ঘোষণা করা হয়—এই ছিল কংগ্রেসের ব্যাখ্যা। আর তাই কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করে।

প্রথম গোল-টেবিল-বৈঠক বসে ১৬ নভেম্বর ১৯৩০ থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১ পর্যন্ত। সভাপতিত্ব করেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। যারা ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন তেজ বাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌, ডক্টর আম্বেদকর, জয়াকার ইত্যাদি। প্রথম দিকে আলোচনা বেশ অগ্রসর হলেও শেষ দিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য

পৃথক নির্বাচন দাবী করলেন। আম্বেদকরও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী ছাড়লেন না। অতএব খুব চেষ্টা করেও সভাপতি র‍্যামসে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। র‍্যামসে অনুভব করলেন যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি না থাকায় কনফারেন্সের গুরুত্বও যেন কমে যাচ্ছে! অতএব তিনি আর এক অধিবেশন আহ্বান করে প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক ভেঙ্গে দিলেন; প্রত্যাশা করলেন যে পরের গোল-টেবিলে গান্ধীজি যোগ দেবেন।

গোল-টেবিলের প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে এলেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ গান্ধীজি সহ কংগ্রেস নেতাদের ছেড়ে দিলেন। এর পরেই তেজ বাহাদুর সপ্রু এলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। কংগ্রেসের পক্ষ হয়ে গান্ধীজি যদি লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং একটা রফা করতে পারেন—এ জন্য সপ্রু বারবার গান্ধীজিকে অনুরোধ করতে থাকলেন। গান্ধীজি সম্মত হলেন।

তেজ বাহাদুর সপ্রুর মধ্যস্থতায় ভাইসরয় আরউইনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হ'ল। এ আলোচনা চল্‌ল ১৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত। বাইরে থেকে আরউইনকে যতখানি আগ্রহী ও নমনীয় ভাবা হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক তার উল্টো। তিনি কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব বা ২৬ জানুয়ারীর শপথের কোন গুরুত্বই দিলেন না। তার পরেও গান্ধীজি আলোচনা চালাচ্ছেন জেনে সুভাষচন্দ্র, জওহরলালের মত তরুণ নেতারা অখুশী হলেন। তবু গান্ধীজি বললেন যে প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিচার করবার প্রবণতা নিয়ে কংগ্রেস আলোচনায় বসতে পারে, ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনও প্রত্যাহার করা যেতে পারে, তবে কতক-গুলি সর্ত সরকারকেও মানতে হবে।

সর্তগুলি কি কি?

গান্ধীজি বললেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে যারা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। যারা হিংসাত্মক কাজের জন্য বন্দী হয়েছেন তাদেরও মুক্তি দিতে হবে। লবণের ওপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার বন্ধ করতে হবে। ভকৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর মৃত্যু-দণ্ডাদেশ মকুব করতে হবে।

আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা করলেন। শুধু ভকৎ সিংদের বিষয়ে কোন কথাই বললেন না, এমন কি গান্ধীজিকেও এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার কথা বলতে দিলেন না। অন্য বিষয়গুলিতেও যে গান্ধীজি বিশেষ কিছু আদায় করতে পারলেন, এমন মনে হ'ল না। তবু ৫মার্চ তারিখে গান্ধীজি এবং আরউইনের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। গান্ধীজি চুক্তির সর্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন এবং গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিকে স্বীকৃত হলেন।

দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবার আগেই ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগল। বেদনার কথা এই যে তার মাত্র একদিন আগে ২৩শে মার্চ ভকৎ সিংদের ফাঁসি হয়েছে। গোটাদেশ যখন তাদের শোকে আচ্ছন্ন তখন কানপুরে শুরু হল দাঙ্গা। ২৪ এবং ২৫শে মার্চ দাঙ্গায় বহু হিন্দু এবং বহু মুসলমান মারা গেলেন। জিন্নাহ্ এবং তার অনুগামীরা কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। গোটা দেশের নেতৃমণ্ডলী সম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে চঞ্চল হয়ে উঠল।

এই বিতণ্ডার মধ্যে গান্ধীজি বলে বসলেন যে, পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্বের দাবীতে মুসলমানরা যদি সংঘবদ্ধ হয় তবে তাদের দাবী তিনি মেনে নেবেন। এতে সুভাষচন্দ্র দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে যে সমন্বয়বাদী মুসলমান সমাজ ছিল তারাও এর প্রতিবাদ করল। তারা তো এক বিবৃতিই প্রকাশ করলেন যে মুসলমানদের জন্য যদি পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা গান্ধীজি মেনে নেন তবে তারা গান্ধীজির বিরোধিতা করতেও পিছপা

হবেন না। কারণ তা শুধু সমগ্র দেশের পক্ষেই ক্ষতিকারক হবে না, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও ক্ষতিকারক হবে।

এই দৃঢ়তার মুখে গান্ধীজি মত পরিবর্তন করলেন।

এদিকে ইতঃমধ্যে আরউইনের বদলে নতুন ভাইসরয় এলেন লর্ড উইলিংডন। তিনি এলে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর অত্যাচার বাড়ল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অত্যাচারের সীমা রইল না। গান্ধীজি এগুলির প্রতিবাদ করলেন। এর ফলে যে আরউইনের সঙ্গে তাঁর চুক্তিকে খেলাপ করা হচ্ছে তাও জানালেন। কিন্তু উইলিংডন কোন কথাতেই কর্ণপাত করলেন না।

গোলটেবিল বৈঠক এগিয়ে আসছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি যাবে, এটাই সরকার ভেবেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস একমাত্র গান্ধীজিকেই প্রতিনিধি পাঠাতে মনস্থ করল। ডাঃ আনসারী মুসলমান নেতা হিসাবে যাবার জন্য আর্জি পেশ করলেন। কিন্তু উইলিংডন তার আর্জি এই বলে না-মঞ্জুর করলেন যে তিনি কংগ্রেসের সদস্য। আর তাই তিনি মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি নন্। বোঝা গেল উইলিংডন মানুষ সোজা নন্। জল ঘুলিয়ে তোলার আগ্রহই তার বেশি।

কাজেও তাই দেখা গেল। তিনি ডঃ আনসারীর আবেদন অগ্রাহ্য করলেও শিখ-মুসলমান ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বহু বহু প্রতিনিধিকে মেনে নিলেন। জওহরলাল-বল্লভভাই প্যাটেল, প্রভাশঙ্কর পাটকানি ইত্যাদিকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজি একটা শেষ আলোচনার জন্য সিমলায় গেলেন ভাইসরয়ের কাছে। কিন্তু সেখানেও প্রায় কোন আশ্বাস পেলেন না। শুধু সুরাটের গ্রামে জোর করে খাজনা আদায় করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করেছিলেন গান্ধীজি, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস দিলেন তিনি।

১৫ই আগস্ট গান্ধীজি ইংলণ্ডের দিকে রওনা দিলেন। দ্বিতীয়

গোল-টেবিল বৈঠক বসল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এখন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড হলেও ভারত সচিব হচ্ছেন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের স্যামুয়েল বহার। গান্ধীজি প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের মূল কথাকে স্বীকার করে সম্পূর্ণ ভারতীয় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন, গভর্নর জেনারেলের হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা রাখবার দরকার নেই।

দেখা গেল হিন্দু এবং শিখ প্রতিনিধিরা সমবেত ভাবে গান্ধীজিকে সমর্থন করলেও মুসলমান, অনুন্নত হিন্দু-সম্প্রদায়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টান এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে সম্প্রদায় ভিত্তিতে নির্বাচন দাবী করলেন।

গান্ধীজি বললেন, ভারতের জন্য সংবিধান তৈরীই আমাদের কাজ। সে কাজ শেষ হলে, দরকার হলে বিচারপতিদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার জন্য ট্রাইবুন্যাল বসান যাবে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক নেতারা এসব তত্ত্বে মানলেন না। অবশেষে ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাব করলেন যে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। প্রাদেশিক সরকারের থাকবে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার। আর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি থাকবে ভাইসরয়ের হাতে। অর্থাৎ ব্যবস্থাটি হল, সংসার তোমার—চাবি-কাঠি আমার। সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজের নাক কেটে এভাবে জাতির সর্বনাশ করলেন।

দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফিরে এলেন গান্ধীজি।

এদিকে উইলিংডন নিপুন হাতে চালাচ্ছেন দমন নীতি। উত্তর প্রদেশে চলছিল করবন্ধের আন্দোলন। যতদিন সরকারের একটা বোঝাপড়া না হয় ততদিন খাজনা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন নেতারা। এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জওহরলাল এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন। গান্ধীজি দেশে ফিরবার আগেই তাদের বন্দী করা হ'ল।

চাষীদের কাছ থেকে এবার জোর করে কর আদায় চলল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গ্রেপ্তার করা হল আব্দুল গফফর খান এবং তাঁর দাদা ডাঃ খানকে। চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের ঘরবাড়ি গুণ্ডা দিয়ে লুট করান হ'ল দশদিন ধরে। মেদিনীপুরের হিজলি জেলে বন্দীদের ওপর লাঠি আর গুলি চালান হ'ল।

১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর গান্ধীজি ভারতের মাটিতে পা দিয়েই এ সবের প্রতিবাদ করলেন। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের কাছে চিঠি এবং টেলিগ্রাম গেল। তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখাও করতে চাইলেন। কিন্তু ভাইসরয়ের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আরউইন গান্ধীজির সঙ্গে চুক্তি করে ভারতীয় নেতাকে বুঝি বেশি সম্মান দিয়ে ফেলেছিলেন—উইলিংডন অত্যাচারে এবং উপেক্ষায় তার শোধ তুলতে থাকলেন।

বাধ্য হয়ে গান্ধীজি তৃতীয়বার আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। সাথে সাথে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাকে বন্দী করে জেলে পোরা হ'ল। তাদের সঙ্গে সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হতে লাগল। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল। বাজেয়াপ্ত করা হ'ল কংগ্রেসের সম্পত্তি। আইন-অমান্য আন্দোলনকারীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হ'ল। এমন কি নারীদেরও কোন সম্মান দেওয়া হ'ল না।

অন্য দিকে ঐ বছরেই র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সুযোগ বাড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যে সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষ সুযোগ চেয়েছিল, একতরফা সে-গুলি মঞ্জুর করে চিরকালের জন্য ভারতীয় সমাজের সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখবার আয়োজন করলেন।

এই অবস্থায় ১৯৩২ সালের শেষ দিকে লণ্ডনে ডাকা হ'ল তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠক। এ জন্য কংগ্রেসী নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও তাঁরা বৈঠক বর্জন করলেন। তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকও

অর্থহীন আড়ম্বরের মধ্যে শেষ হ'ল। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ভারতবর্ষে দিনকে দিন ছড়িয়ে পড়তে থাকল সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের আঘাতেই গড়ে উঠল হিন্দুমহাসভা, গড়ে উঠল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। গান্ধীজি আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন করলেন, হরিজন আন্দোলন করলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমে তীব্রই হয়ে উঠল। ১৯৩৫ সাল থেকে মুসলিমলীগের প্রচারের ফলে পাকিস্তানের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ এর থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে।

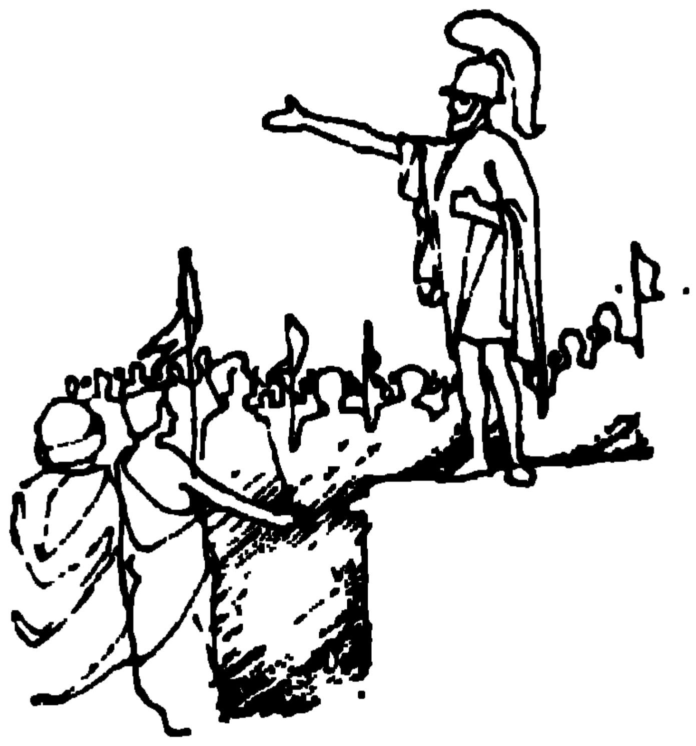

চৌত্রিশ

দিল্লী চলো

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হ'ল।

ভারতবর্ষে তখন কেন্দ্রীয় আইন-সভা আছে, প্রদেশে-প্রদেশে আছে জন সাধারণের নির্বাচিত সরকার, দেশে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলেরও অভাব ছিল না। কিন্তু ইংরেজ ভাইসরয় কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিল। এতে কংগ্রেস বিশেষ ভাবেই ক্ষুব্ধ হ'ল। ১৯৩৯-এর ১৪ সেপ্টেম্বর তারা তাদের মানসিকতা জানিয়ে পত্র দিল ভাইসরয়কে। একমাসেরও পরে তার যে উত্তর এল তাতে ইংরেজদের অনমনীয় মনোভাবই দেখা গেল। ফলে কংগ্রেস স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিল,

> 'বর্তমান অবস্থায় এই কমিটির পক্ষে গ্রেট ব্রিটেনকে সাহায্য দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সাহায্য দেওয়ার অর্থ ই হবে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা।'

যুদ্ধ যতই এগিয়ে চলল, ব্রিটিশ পক্ষ ততই নানাভাবে প্রচার করতে চাইল যে ভারত সর্বতভাবে তাদের সাহায্য করছে। আর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করতে চাইল যে, এ যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি তাঁদের সমর্থন নেই। ১৯৪০-এ গান্ধীজি যুদ্ধ বিরোধী সত্যাগ্রহ করে প্রমাণ করবার কথা ভাবছিলেন যে, যুদ্ধে সব ভারতীয় যোগ দেয়নি। গান্ধীজি ভাইসরয়কে লিখলেন,

'...আপনি এবং সেক্রেটারি-অফ-স্টেট লিখেছেন যে, সারা ভারত স্বতস্ফূর্তভাবে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছে! এ কথা তাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করি যে বেশির ভাগ ভারতীয় এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ বোধ করে না।'

এরপর গান্ধীজির নির্বাচিত নেতা বিনোবা ভাবে এই সত্যাগ্রহ চালাবার দায় গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করল। জার্মানি একে একে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ফ্রান্স দখল করে নিল। জুন মাসে আক্রমণ করে বসল রাশিয়া। ডিসেম্বরে আক্রমণ করল পার্ল হার্বার। এবার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হ'ল। ইংরেজ পক্ষে যোগ দিল আমেরিকা আর রাশিয়া। তবু যেন জার্মান দুর্দ্ধর্ষ—অজেয়।

এই সময় ভারতবর্ষের আন্দোলন-কারীদের মধ্যে ইংরেজরা সবচেয়ে ভয় পেত সুভাষচন্দ্র বসুকে। অদ্ভুত তাঁর সাংগঠনিক শক্তি। সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেও ইংরেজদের চাকরী না নিয়ে তিনি হয়েছেন দেশকর্মী। কংগ্রেসের মধ্যে যুবকেরা যেন গান্ধীজির চেয়েও মান্য করে সুভাষকে। জওহরলালও অত জনপ্রিয় নন। সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যে সামরিক-শৃঙ্খলা আনতে চান। এসব নিয়ে মতভেদ কম নেই। অবশেষে সুভাষকে গড়ে তুলতে হ'ল ফরোয়ার্ড ব্লক। সেখানে সামরিক-শৃঙ্খলা হ'ল প্রথম কর্তব্য।

সুভাষচন্দ্রকে তাই ইংরেজের বড় ভয়। ১৯৩০ সাল থেকে দফে দফে তাই সুভাষ বন্দী। কখনও ভারতের জেলে কখনও আন্দামানে। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সুভাষকে আবার বন্দী করা হ'ল। অসুস্থ হলেন সুভাষ। ডাক্তারদের পরামর্শে সুভাষকে বাড়িতে পাঠান হ'ল। তিনি নজরবন্দী। বাড়ির চার দিকে পুলিশ পাহারা। কাউকে সাক্ষাৎ করতে চাইলে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে-আসতে হয়।

সুভাষ নিজেই পুলিশের কাজ সহজ করে দিলেন। তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। পুলিশ ভাবল, লোকটার মধ্যে বুঝি আবার ধর্মভাব জেগেছে। বিচিত্র এ মানুষটা সেই ছাত্র অবস্থা থেকেই দুর্বোধ্য। একদিকে যেমন স্বদেশবাসী সম্পর্কে কটু মন্তব্য করলে প্রেসিডেন্সী কলেজের দোর্দণ্ড-প্রতাপ ইংরেজ অধ্যাপক ওটন-কেও মেরে বসতে ইতস্তত করেন না, আবার অবকাশে গিয়ে গঙ্গার ধারেও ধ্যানস্থ হন – সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। সে লোক যদি ঘর বন্ধ করে, কারো সঙ্গে দেখা না করে ধ্যান করেন, তবে পুলিশের তাতে খুশি হবারই কথা।

সত্যিই তারা খুশি হ'ল। একটু শিথিলও হ'ল বুঝি কড়াকড়ি। একদিন বাড়ির একজনের সঙ্গে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আলোচনা করতে করতে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এল। সদ্য ডিউটিকে আসা পুলিশের দল ভাবল হয়ত' আগের দলের ডিউটির সময় এ লোকটি ঢুকে ছিল। আর কড়া পাহারা তো সুভাষের বন্ধুদের জন্য। বাড়ির অন্যদের জন্য ত' নয়। অতএব ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহই দেখা গেল না।

১৯৪১ এর জানুয়ারীর শেষ দিকে পুলিশ হঠাৎ আবিষ্কার করল যে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্র আর গৃহে নেই। পালিয়েছেন। ব্রিটিশ পুলিশ হন্যে হয়ে সারাভারত তোলপাড় করে ফেলল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী উপন্যাসের মহাবিপ্লবী সব্যসাচী পালিয়ে-ছিলেন বর্মার পথে। ইংরেজরা ওদিকটাতেই বিশেষ নজর দিল।

সুভাষচন্দ্র তাঁর দূরদর্শী চোখে বুঝেছিলেন ইংরেজরা বর্মার দিকেই নজর দেবে বেশি। অতএব তিনি সম্পূর্ণ উল্টো পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে উপস্থিত হলেন রাশিয়ায়। রাশিয়া অত্যাচারী জারের শাসন মুক্ত হয়ে ১৯১৯ সালে স্বাধীন হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবীরা তখন রাশিয়াকে তীর্থ মনে করে। সুভাষ স্টালিনের সঙ্গে দেখা করে এই সংকটের কালে ব্যস্ত ইংরেজকে আক্রমণ

করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য রাশিয়ার সাহায্য চাইলেন।

রাশিয়া সম্মতি বা অসম্মতি জানাবার আগেই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। বাধ্য হয়েই রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাতে হল। ফলে, রাশিয়ার পক্ষে আর সুভাষকে সাহায্য দেবার পথ রইল না। সুভাষচন্দ্র তখন সাহায্যের আশায় পাড়ি দিলেন জার্মানিতে।

বিশ্বত্রাস হিটলার! অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন সুভাষচন্দ্রকে। তারপর বললেন, আমরা আপনাকে সাহায্য দেব। ইংরেজরা আমারও শত্রু—আপনারও। অতএব তাকে দুর্বল করবার জন্য আপনি জার্মানির সাহায্য পাবেন। তবে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে যে রাশিয়াও আপনার শত্রু।

সুভাষ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, কোন শর্ত মেনে সাহায্য নেব না ফুয়েরার। এ সাহায্য ভাবী স্বাধীন ভারতের কাছে আপনার বন্ধুত্বের ঋণ।

ফুয়েরার হিটলার চমকিত হলেন। বিনা সর্তেই তিনি কিছু কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিটলার সুভাষকে দিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা। সুভাষ এলেন জাপানে।

প্রতিবেশী জাপান। এখান থেকেই মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলবেন সুভাষ। সেখানে রয়েছেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন পরাজিত ভারতীয় ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে গড়া আজাদ্ হিন্দ বাহিনী। মালয় এবং বর্মার থেকে সরে আসবার সময় ব্রিটিশবাহিনী যাদের ফেলে এসেছিল, তাদের সংগ্রহ করে জাপান দিয়েছিল রাসবিহারীর হাতে তুলে। এক মালয়েই এদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাও কম ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে সকলে এক বাক্যে নেতার পদে বরণ করে নিলেন। কলকাতায় মহাজাতি

সদনের উদ্বোধনের দিনে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি বাঙলার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করছি।' কবির স্বপ্নে সেই যুবরাজকে সেদিন সমগ্র এশিয়ার হয়ে সমবেত অভিনন্দন জানালেন 'নেতাজী'। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতা অনেক—কিন্তু নেতাজী একজনই। তিনি সুভাষচন্দ্র।

আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে পূর্ণ সামরিক পোষাকে উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র। বললেন,

'তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের অজাত সন্তান-সন্ততিকে। তাদের আমি স্বাধীনতা দেব। বিনিময়ে আজ চাইছি তোমাদের বুকের রক্ত।...আমি শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে সুখে-দুঃখে, আনন্দে বিষাদে, জয়ে-পরাজয়ে সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের পাশে পাশে থাকব। আপাততঃ আমি তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দৈহিক-যন্ত্রণা, দুঃসহ-অভিযান এবং শহীদের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না—জয় হিন্দ্। দিল্লী চলো, দিল্লী চলো...'

এর আগে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী ফুয়েরার হিটলার অভিবাদন জানিয়ে ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার পতাকাকে। এবার সিঙ্গাপুরে এলেন জাপানের প্রধান মন্ত্রী তাজো। নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসভায় একুশে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্র গঠিত হ'ল। সুভাষচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি সুভাষচন্দ্র ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ আর আটচল্লিশকোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।'

ঐ একই শপথ নিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী এস. এ. আয়েঙ্গার, অর্থমন্ত্রী লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল এ. এস. চ্যাটার্জি,

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্নেল শানওয়াজ, নারী বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন।

এ সরকারকে স্বীকৃতি দিল জার্মান, জাপান, ইতালী, ক্রোটিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়া।

পরের বছর ২৫শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। দেশ আক্রমণের জন্য নয়, স্বদেশকে মুক্ত করতে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আগেই দখলে এসেছিল। এবার তার অধিকার নিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। দুই দ্বীপের নতুন নাম হ'ল শহীদ দ্বীপ আর স্বরাজ দ্বীপ। একদিন ব্রিটিশের কুখ্যাত সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে ওড়ান হ'ল ভারতের জাতীয় পতাকা।

এবার ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে অভিযান শুরু হ'ল। বর্মা সীমান্ত পার হয়েই ভারতের পবিত্র মাটি—সিতাং নদীর পারে। ইংরেজরাও মরণপণ লড়ছে সেখানে। তবু একটু একটু করে জমি আসছে আজাদ্ হিন্দ এবং জাপানী বাহিনীর হাতে। রেঙ্গুনে আক্রমণ করছে সুভাষ ব্রিগেড। ছামোলের ঘাঁটিতে এগিয়ে চলেছে গান্ধী ব্রিগেড। তাদের অনুসরণ করছে বাহাদুর শাহ আত্মঘাতী বাহিনী এবং বাল সেনাবাহিনী।

বিজিত এলাকা নিয়ে আজাদ্-হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে জাপানী ফৌজের বিরোধ দেখা দিল। জাপানী পতাকা তারা ভারতের মাটিতে তুলতে দেবেন না। কোন বিদেশী পতাকা উড়বে না ভারতের মাটিতে। বর্মা পর্যন্ত জাপানের অধিকারে থাকবে তারপর এক ইঞ্চিও নয়। সুভাষচন্দ্র সংবাদ পাঠালেন জাপানী প্রধান-মন্ত্রীর কাছে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোজোর নির্দেশ এল, ভারতবর্ষের প্রতিটি বিজিত ইঞ্চির অধিকার ও শাসন পরিচালনের দায়িত্ব থাকবে

আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্রের। নিপ্পন বাহিনী জয় করলেও ভারত আজাদ হিন্দ বাহিনীর।

আত্মমর্যাদাবোধে অটল দুর্জয় আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল অবরোধ করে বসে রইল কয়েক মাস—তবু তার পতন ঘটল না। এদিকে অসময়ে নামল বর্ষা। নামছে পাহাড়ী ঢল। খাদ্য-রসদ সবই ফুরিয়ে আসছে। তবু আশাবাদী সুভাষ, তার চাইতেও আশাবাদী আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী লড়ে চলেছে।

এমন সময় অকস্মাৎ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটল জাপানে। হিটলার হেরে গেলেন রাশিয়ায়। চার দিকে জার্মানীর পরাজয় ঘটতে থাকল। হঠাৎ সংবাদ শোনা গেল জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।

আজাদ্ হিন্দ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে দেওয়া হবে না। তাকে রক্ষা করতেই হবে। আর আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী লড়ে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত।

কিন্তু সহসাই নেতাজীর নির্দ্দেশনামা পৌছাল মেজর জেনারেল ভোঁসলের হাতে। সুভাষচন্দ্র আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীকেও আত্ম-সমর্পণ করতে বলেছেন। বাইরে থেকে আঘাত আর নয়। এবার ভারতের ভেতর থেকে আগুন জ্বালতে হবে। কৌশল বদল করতে হবে। সুভাষচন্দ্র বললেন, "বিশ্বাস কর, চির অন্ধকার রাত্রি বলে কিছু নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তা হবে অচিরেই।"

কিন্তু নেতাজী! তুমি আমাদের মরতে দিলে না কেন? কেন আত্মসমর্পণ করতে বললে? আমরা যে শেষ বিন্দু রক্ত পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবে?

কে দেবে জবাব! ততক্ষণে সুভাষ রওনা হয়েছেন টোকিওতে জাপান সরকারের সঙ্গে শেষ পরামর্শ ও আলোচনা করা দরকার—তারপর সিদ্ধান্ত।

কিন্তু তার আগেই জাপানী নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করল তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত।

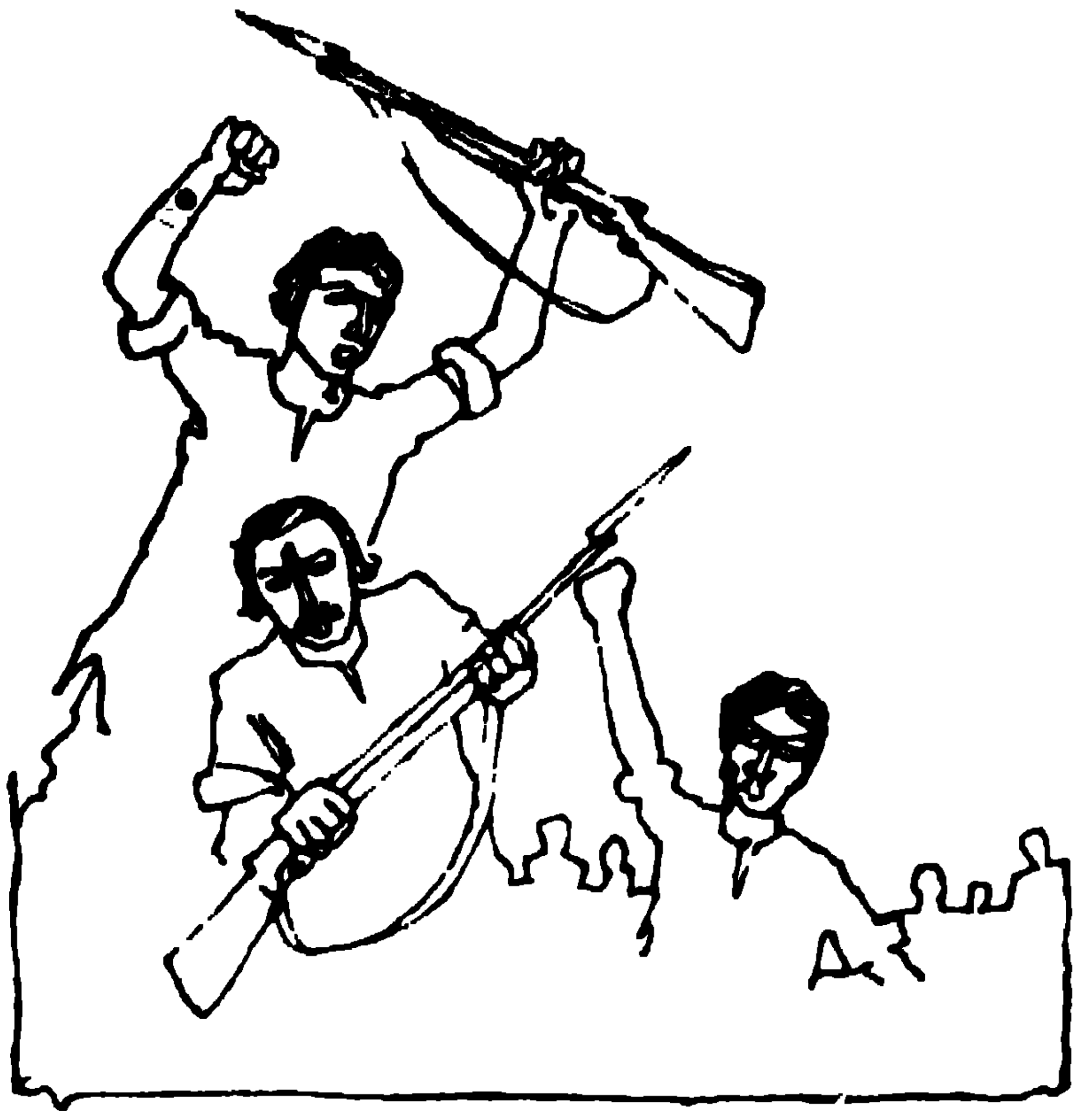

পঁয়ত্রিশ

ভারত ছাড়ো

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের সামনে একটা সুযোগ এনে দেয়। এ যুদ্ধে ভারতীয় নেতারা সাহায্য করতে রাজী ছিলেন, কিন্তু সর্ত ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাবসম্পন্ন ছিল। ১৯৪২ এর মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করে নিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সঙ্গে আপোস করে নিতে আগ্রহী হলেন এবং ১১ই মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠালেন নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

ক্রীপ্‌স যে সব প্রস্তাব রাখলেন তাকে ভারতীয় দলই গ্রহণ করলেন না। প্রকৃতপক্ষে ক্রীপস্‌-এর দৌত্য ব্যর্থ হল। নেতারা বুঝলেন ব্রিটিশ সরকারের ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সদিচ্ছা নেই। অতএব সে বছর কংগ্রেস অধিবেশনে ৮ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশকে ভারত ছাড়ার প্রস্তাব দিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন আছে বলেই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করলে, ভারতবাসীরাই জাপানীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারবে। অতএব ইংরেজ 'ভারত ছাড়ো।'

এ প্রস্তাব গ্রহণের সংবাদে ব্রিটিশ সরকার এত বিচলিত হ'ল যে

রাতারাতি কংগ্রেসের সমস্ত নেতাকে বন্দী করা হ'ল। সবাইকে বোম্বাই থেকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। গান্ধীজিকে রাখা হ'ল পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে, আর বেশিরভাগকে আমেদাবাদ জেলে।

'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাবের কথা এবং নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ একত্রে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল ৯ আগস্টের সকালে। সকলে স্তম্ভিত। কি করতে হবে কেউ জানে না—বোঝেও না। আপনা থেকে হাট বাজার সব বন্ধ হয়ে গেল। এমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল সারা ভারতে আর হয়নি। দুপুর থেকেই শুরু হ'ল প্রতিবাদ সভা আর মিছিল। সর্বত্র এক দাবী—নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দাও।

চারিদিকে বিপুল উত্তেজনা। জনতা তবু শান্ত। গান্ধীজির আত্মসংযমের বাণী তখনও তাদের কানে। কিন্তু সমুদ্র স্তব্ধ হলে যেমন ভয়ঙ্কর—তেমন ভয়ঙ্কর ঐ জনতার দিকে তাকিয়ে সরকার সংযত থাকতে পারল না। ১১ আর ১২ তারিখে শুধু দিল্লীতেই নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাল ৪৭ বার। নিহত হ'ল ৭৬ জন—আহত ১১৪ জন।

নেতৃত্বহীন এই জনবিক্ষোভ অচিরেই বিদ্রোহের আকার নিল। যেখানে যা কিছুকে মনে হ'ল ইংরেজের প্রতীক জনতা তাকেই আক্রমণ করল—ধ্বংস করল। তারা থানা আক্রমণ করল, টেলিগ্রাফের তার কাটল, স্টেশন, ডাকঘর বা সরকারী অফিস পোড়াল—লাইন উপড়ে ফেলল। কোথাও কোথাও জনতা বিকল্প সরকার গড়ে তুলল।

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছিল, তাকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রির অন্ধকার কাটবার সঙ্গে সঙ্গে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা সু-পরিকল্পিত আক্রমণ করল সরকারী থানা, ডাকঘর, অফিস, আদালত।

সরকার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজ সৈন্যে তখন মেদিনীপুর ভরে আছে। প্রতিটি সরকারী অফিস যেন এক একটি দুর্গ। সেদিন নিরস্ত্র জনতার সঙ্গে সৈন্যদের শুরু হ'ল মুখোমুখি সংগ্রাম। এমনই এক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। এবার শহীদের জীবনকথা শুনিয়ে আবার আমরা মেদিনীপুরের কথা শোনাব।

তমলুক থানার হোগলা গ্রামে বাস করতেন ঠাকুরদাস মাইতি নামে এক ভদ্রলোক। ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে তাঁর এক কন্যা জন্মাল। দশমহাবিদ্যার নামের থেকে এক মহাবিদ্যার নামে নাম রাখলেন তার—মাতঙ্গিনী। ডাক নাম মাতু।

অতি সাধারণ ভাবেই শুরু হ'ল মাতু মাইতির জীবন। ঘর-গৃহস্থালীর শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই পেলেন না তিনি। দেশে তখনও গৌরীদান প্রথা চালু। কোথাও কোথাও সতীদাহের কথাও শোনা যায়। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেয় বহু মানুষ। এসব সংস্কারকে মানতেন ঠাকুরদাস মাইতি। অতএব অল্প বয়সে কন্যাকে বিয়ে দিলেন তিনি। বিখ্যাত কাঁকটা গ্রামের পাশেই অলিলান গ্রাম। সেই গ্রামে বরের বাড়ি। নাম ত্রিলোচন হাজরা। মাতঙ্গিনীর নামের পাশে মাইতি বদলে হাজরা হয়ে গেল।

ত্রিলোচন কিন্তু দীর্ঘজীবী হলেন না। মাত্র আঠার বছর বয়সে বিধবা হলেন মাতঙ্গিনী। পতি-পুত্রহীনা—অবীরা।

গ্রামের গৃহস্থ বিধবা। কি করবেন? সময় কাটাবেন কিসে? দুঃখ ভুলতেই হয়ত সমাজ-কল্যাণের কাজে হাত লাগালেন মাতঙ্গিনী। কখনও রোগীর সেবা করেন, কখনও গোপন সংবাদ পৌঁছে দেন

বিপ্লবীদের, কখনও তাঁর বাড়িতে বিপ্লবীরা এসে আত্মগোপন করে থাকে।

ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী প্রাণ দিয়েছেন। তাদের দলের অনেকে ধরা পড়ে দ্বীপান্তরে গিয়েছেন। যে সত্যেন বসু দীক্ষা দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামকে, তিনি নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে ফাঁসি বরণ করেছেন। যে অরবিন্দ এমন করে বিপ্লববাদ ছড়িয়ে দিলেন গোটা দেশে, তিনিই হয়ে গেলেন পণ্ডিচেরীর সন্ন্যাসী। ভারতের স্বাধীনতার কাণ্ডারী তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপাধি দিয়েছেন 'মহাত্মা'।

এই সময় সরকার লবণ তৈরির ওপর নিষেধ জারী করলেন। গান্ধীজি লবণ আইন অমান্য করবার আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তমলুকের লোকেরা মিছিল বের করলেন ঐ আন্দোলনের কথা প্রচার করবার জন্য। মাতঙ্গিনী সে মিছিলের সামনে থাকলেন; নিজের হাতে লবণ তৈরি করে লবণ আইন অমান্য করে বন্দী হলেন। পুলিশ তাকে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। মাতঙ্গিনী সারারাত হেঁটে গ্রামে ফিরে এলেন। কিন্তু এ শাস্তিতে তাঁর জেদই বাড়ল। ভয় ঘুচে গেল।

পরের বছর তমলুকে শুরু হ'ল চৌকিদারী-ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন। মাতঙ্গিনী গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন এই আন্দোলনের প্রচার করে। একদিন এক মিছিলে 'গভর্নর ফিরে যাও' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হল। এবার ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল তাঁর। বহরমপুর জেলে বন্দী থাকলেন তিনি।

ছাড়া পেয়ে আরও ভয়-ডর-হারা তেজে দেশের কাজে মেতে উঠলেন মাতঙ্গিনী। মেদিনীপুরের মেয়েরা তার পাশে এসে জড়ো হতে থাকল। লোকের কাছে তাঁর পরিচয় হল 'গান্ধীবুড়ি'।

এলো ১৯৪০ সাল। সমস্ত ভারত স্বাধীনতার চিন্তায় উদ্বেল—উত্তাল। যদিও গান্ধীজীর অহিংসার নীতিই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তবু ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুবকেরা সব সময় অহিংস থাকছে না। তারা লাইন উপড়ে ফেলছে, টেলিগ্রাফের তার কাটছে, বোমা মারছে, গুলিতে শেষ করে দিচ্ছে ইংরেজদের পা-চাটা দারোগা আর গুপ্তচরদের। চট্টগ্রামের আদর্শে এক একটা থানা দখল করে, ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলে—সেখানে তুলে দিচ্ছে ভারতীয় জাতীয় পতাকা—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা।

১৯৪২ সালের ঘটনা আরও ভীষণ আকার ধরল। একে তো দেশের লোকের ভয়-ভীতি গেছে চুকে, মরিয়া হয়ে উঠেছেন সকলে স্বাধীনতার জন্য, তখন হঠাৎ একত্রে সকল নেতাকে বন্দী করে ইংরেজরা ভাবলেন—দিলেন সব আন্দোলন বন্ধ করে। কিন্তু কাজের বেলা দেখা গেল ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। ইংরেজদের দম্ভ জনসাধারণের মাঝে আনল প্রবল উত্তেজনা। সে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। মেদিনীপুরের ঢেউ বুঝি সবচেয়ে উত্তাল।

সেটা ১৯শে অক্টোবর। তমলুকের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিছিল করে চলেছেন। তাদের লক্ষ্য তমলুক আদালত। তারা আদালতে গিয়ে আইন-অমান্য করবেন। আদালতের চূড়া থেকে নামিয়ে আনবেন ইংরেজ পতাকা, ওড়াবেন ভারতীয় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। আবেগে ফুলে উঠছে তাদের বুক। বারবার বলছেন অভয় মন্ত্র। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। হয় কাজ করব—নয় মরব। চিৎকার করে উঠছেন 'বন্দেমাতরম্।' এ যেন দেশ-মায়ের পূজায় আত্মবলিদানের আহ্বান।

পথ রোধ করে দাঁড়াল ইংরাজ সৈন্য—আদেশ করল, হল্ট্। দাঁড়াও! আর যদি এক পা ও এগিয়ে এস, তবে গুলি ছুঁড়ব। একজনকেও ফিরে যেতে দেব না।

মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ রইল মিছিলের মানুষ। সমস্ত অঞ্চলে এক নিদারুণ স্তব্ধতা। যেন ঝড় উঠবার আগের আকাশ।

সত্যিই ঝড় উঠল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঝড় জাগল তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার বুকে। সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বল্‌লেন, কিসের ভয় রে ভাই! ঐ গুলির? তোমরা না মেদিনীপুরের সন্তান! ক্ষুদিরাম না তোমাদের আদর্শ? একটু থামলেন মাতঙ্গিনী। তারপর আবার ফুঁসে উঠলেন। বললেন, বেশ! তবে ঘরে ফিরে যাও কাপুরুষের দল। ঘরে গিয়ে সুখভোগ কর। যারা আছ বীর্যবান, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ, তারা এসো আমার সঙ্গে। এই বলে পতাকা তুলে নিলেন নিজের হাতে। চিৎকার করে ধ্বনি দিলেন, বন্দেমাতরম্। সমস্ত জনতা যেন মাতঙ্গিনীর প্রাণে প্রাণ পেয়ে সহস্রগুণ গর্জে উঠল, বন্দে মাতরম্। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

সৈন্যদল তাদের জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেনি। ওরা তো জানে না যে, গান্ধীজী মাদকদ্রব্য বর্জন করতে বলছেন বলে বাতের ব্যথায় যন্ত্রণা পেলেও আফিং মুখে তোলেন নি এই মাতঙ্গিনী। ওরা তো জানে না যে, গ্রামশুদ্ধ সবাইকে মাতঙ্গিনী বলতেন, দেখিস, বিছানায় শুয়ে, কেঁদে কঁকিয়ে মরব না আমি। আমি মরব বীরের মত। সেই বীরত্বই জেগে উঠেছে মাতঙ্গিনীর মধ্যে। কে রুখবে তাঁকে?

সৈন্য-প্রধান আর একবার হুঁশিয়ার করে দিলেন মাতঙ্গিনীকে। উত্তরে আরও জোরে ধ্বনি দিলেন মাতঙ্গিনী।

গুলি ছুটল। ডান হাতটা ঝুলে পড়ল মাতঙ্গিনীর। ওরে! পতাকাটা যে নেমে যায়। মাতঙ্গিনী তাড়াতাড়ি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাতে ঝরছে রক্ত। পথের ডানদিকে হচ্ছে রক্তের আলপনা। ও তো তখন বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী নয়—ভারতীয় স্বাধীনতার বিজয়লক্ষ্মী।

আবার গুলি ছুটল। বাঁ হাতটাও ঝুলে পড়ল। মাতঙ্গিনী

দুই ভাঙ্গা হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন পতাকার দণ্ড। সেই রক্তাপ্লুত দেহে উৎকট উল্লাসে হেসে উঠলেন মাতঙ্গিনী। জনতাকে বললেন, ভয় নেই ভাই। এগিয়ে চল। মরণ যদি এসেই থাকে—তবু আমরা মৃত্যুঞ্জয়।

শেষ গুলিটা এসে মাতঙ্গিনীর সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। মাতঙ্গিনী পড়ে গেলেন। কেঁদে-কঁকিয়ে মরলেন না—বীরের মত মরলেন।

সবাই অবাক হয়ে গেল, পতাকাটা তবু মাটিতে পড়েনি। ভাঙ্গা হাতে ছিন্ন বুকের মাঝে তুলে ধরে রেখেছেন। শুধু মাতঙ্গিনীর রক্তে জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে উঠেছে। মাতঙ্গিনীর মুখে মৃত্যুঞ্জয়ী হাসি।

* * * *

এমনি করে সেদিন এক মেদিনীপুরেই প্রাণ দিল একচল্লিশ জন। আহত হ'ল তিনশ জনের ওপর। তার ওপর চল্‌ল অনুসন্ধানের নামে নির্যাতন।

কিন্তু তাতেও থামানো গেল না মেদিনীপুরকে। বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হ'ল। বিপ্লবীরা জাতীয় সরকার ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে তাঁরা গড়ে তুললেন নিজস্ব সব কিছু। তারা তৈরী করলেন জাতীয় পুলিশ, ডাক, তার, খাদ্য, সরবরাহ, অর্থ, যোগাযোগ বিভাগ।

জাতীয় সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিচার বিভাগ। এখানে মামলা দায়ের করতে মোট ব্যয় ছিল এক টাকা। তিনজন বিচারকের ট্রাইবুনাল একে পরিচালনা করত। কখনও ছিল ভ্রাম্যমান বিচারালয়।

শুধু মেদিনীপুর নয় ভারতের বহু শহর-গ্রামে এমনি করে বিকল্প সরকার গড়ে উঠেছিল—যার সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ছিল না মাসের পর মাস। সুতাহাটা, সাতারা, কর্ণাটকে কৃষকরা গেরিলা

আক্রমণ শুরু করেছিল। এসব আন্দোলন চলেছিল দু' বছরেরও বেশি।

সরকার নির্মমভাবে এ বিপ্লব দমন করে। লাঠি-গুলি আর গ্রেপ্তার ছিল সাধারণ ঘটনা। কোথাও বা শূন্য পথে বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। এইসব গুলিবর্ষণে সরকারী হিসাবেই মানুষ মারা গেল দশহাজারের ওপর।

নিষ্ঠুর পীড়নের মধ্য দিয়ে সরকার এ আন্দোলন দমন করে বটে, কিন্তু বোঝা যায় মুক্তির অধিকার অর্জনে গোটা জাত জেগে উঠেছে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বুঝল যে ভারত ছাড়ার দিন তার কাছে ঘনিয়ে এসেছে।

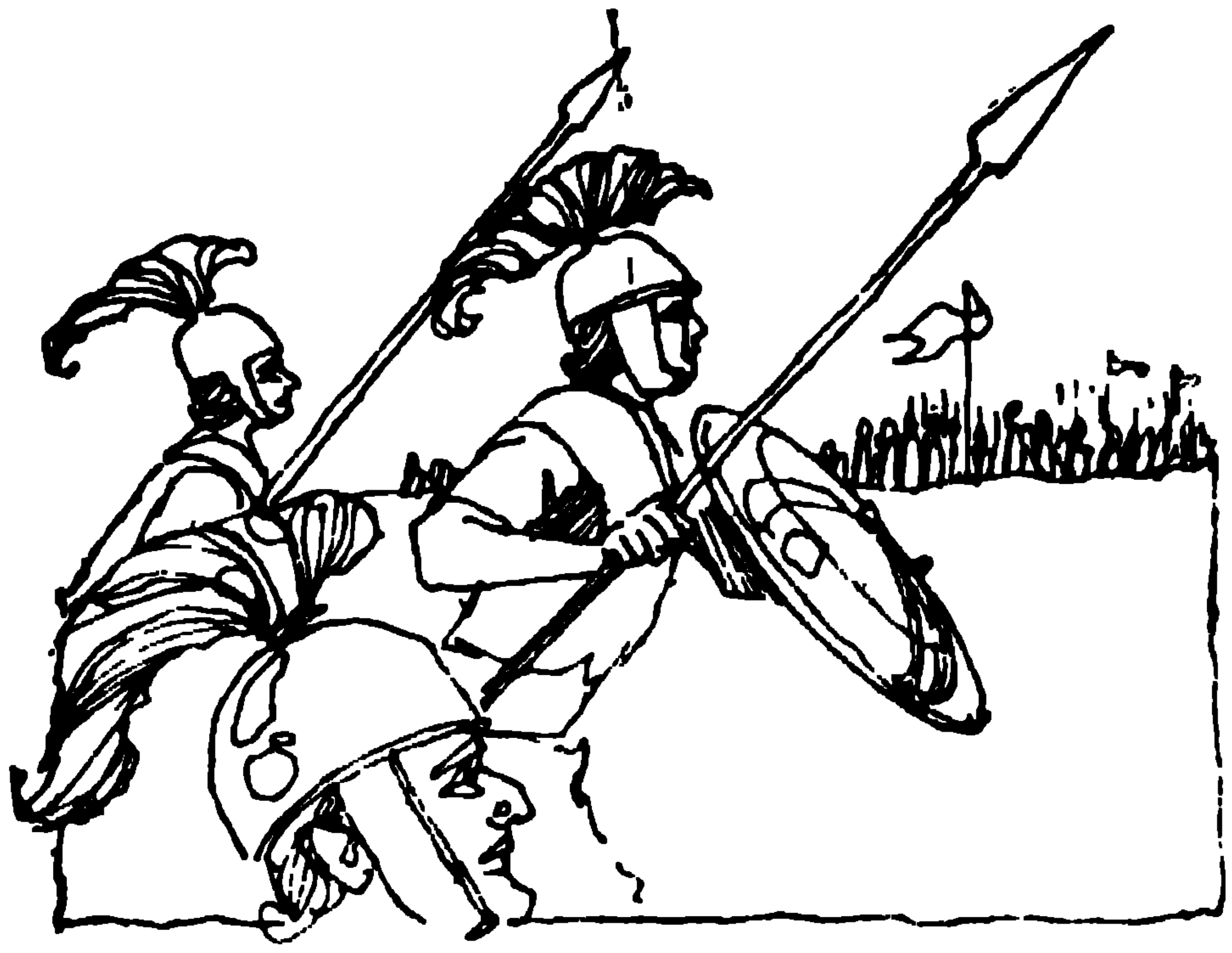

ছত্রিশ

৪২ এর আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল ত্রিপুরায়।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব কোণের এই ছোট দেশীয় রাজ্যটির ইতিহাস অবশ্য বিদ্রোহ-বিপ্লবের কাহিনীতে ভরপুর। এদের অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতীয়। এদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, মগ, চাকমা, কুকি, মণিপুরী, জামাতিয়া, লাওয়াতিয়া, গারো, লুসাই প্রধান। সেই কোন কাল থেকে এই সব স্বাধীনপ্রাণা আদিবাসীরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করে এসেছে।

সেটা ১৮৫০ সাল। ভারতবর্ষে তখনও সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষীণতম আভাস জানা যায় নি। তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিধবা-বিবাহের চিন্তাটা তখন বিদ্যাসাগরের মাথায় পাক খাচ্ছে। মাইকেল তখনও বাঙলা সাহিত্যের জগতে এসে পৌছান-নি। সে সময়ে রাজা চন্দ্রমাণিক্য যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কীর্তি আর পরীক্ষিত নামে দুই ত্রিপুর সর্দার। এই সকল বিদ্রোহে তখনকার মত অত্যাচার বন্ধ হয়।

কিন্তু বছর তেরর মধ্যে রাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজারা আবার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে

বিদ্রোহ করে। রাজা বীরচন্দ্র প্রথম আক্রমণে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। উদয়পুর থেকে রাজকীয় সৈন্যদল ছুটে আসে। কিন্তু পরীক্ষিতের নেতৃত্বে জামাতিয়ারা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। রাজা তখন কুকিরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে জামাতিয়াদের বিদ্রোহ পরাস্ত হয়।

এমনি করে ১৮৬০-৬১ সালে ত্রিপুরাবাসী কুকিদের বিদ্রোহ শুরু হয়। তা চলে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই সারা ভারতব্যাপী অগ্নিযুগের সূত্রপাত হয়। তখন পার্শ্ববর্ত্তী জেলা কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট থেকে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আসামীরা পালিয়ে ত্রিপুরায় আত্মগোপন করে থাকত। চট্টগ্রামের বহু রাজনৈতিক কর্মী ত্রিপুরায় তাদের দ্বিতীয় রাজনৈতিক আশ্রয় তৈরী করে রাখতেন।

১৯৩০ সালে সারা ভারত ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ত্রিপুরাতেও 'পর্ত বর্ত্ত করবন্ধ' আন্দোলন শুরু হয়। মাণিক্য-বংশ শত অত্যাচারেও কর আদায় করতে পারেন নি। এ আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য ত্রিপুরার রাজনৈতিক চিন্তা সম্প্রসারণে বিশেষ সাহায্য করে।

এই সময় ত্রিপুরায় স্টেট কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। এর তখনও সর্ব-মত-সমন্বয়ের ভূমিকা ছিল। ফলে দ্রুত কংগ্রেসের সংগঠন চা-শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও এ কংগ্রেস-এর সেচ্ছাসেবকেরা পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। সে কাজ করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাবিত 'প্রজামণ্ডল'। পরবর্ত্তী কালে ত্রিপুরার রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রজামণ্ডলের অবদান যে বেশি ছিল তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

কুমিল্লা, শ্রীহট্ট এবং নোয়াখালি জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়ে চাকলা রোশনাবাদ নামে মহারাজের নিজস্ব যে জমিদারী ছিল,

সেখানে রাজার নিজস্ব নিয়ম রীতি ছিল আরও প্রবল। ১৯৩০ এর অসহযোগ সেখানে কোন দিনই থামল না। ১৯'৫ এ নতুন রীতিতে মন্ত্রীসভা গঠিত হলেও বাঙলাদেশের মুসলিম-লীগ মন্ত্রীসভা এ আন্দোলন সমর্থন করেন নি। এর ফলে ৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের ঢেউ এসে গভীর ভাবে আছড়ে পড়েছিল ত্রিপুরায়।

বিয়াল্লিশে ইংরেজদের ঘরে বাইরে বিপদ। ভারতের ঘাড়ের কাছে বর্মায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জাপানী সৈন্য। এ সময়ে ত্রিপুরায় আন্দোলন চলতে দিতে রাজী নয় তারা। অতএব সর্বশক্তি দিয়ে নিষ্ঠুর দমন নীতিতে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিলেন রাজবাহিনীর সঙ্গে মিলিত ব্রিটিশ বাহিনী। খুশী রাজা বুঝি বা ইংরেজদের আরও খুশী করতে চাইলেন।

ইংরেজ সরকার তার বাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে বললেন রাজাকে।

কতটুকু শক্তি রাজবাহিনীর! অতএব রাজা আদেশ দিলেন সৈন্যবাহিনী সাজাও। সমস্ত আদিবাসী যুবকদের যোগ দিতে বল রাজবাহিনীতে।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল। সৈন্যদলে যোগ দিলে কত সুযোগ সুবিধা মিলবে তা বুঝিয়ে বক্তৃতা শুরু হল। বহু উপজাতীয় যুবক এসে যোগও দিল। কিন্তু চাহিদা মিটছে কৈ? এর মধ্যে জামাতিয়া এবং রিয়াং সম্প্রদায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করল তারা রাজার বাহিনীতে যোগ দেবে না।

এ ঘোষণায় সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন এক রিয়াং সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরী। চৌধুরী মশাই এমন সাহসের কারণ বুঝলেন না। কিন্তু তাঁর মনে কূট অভিসন্ধি দেখা দিল। চৌধুরীদের প্রধানকে বলে রায়। রাজ সভায় তার অবাধ অধিপত্য হয়। কিন্তু রায় পদটা দেন রাজা নিজে। রাজার নেক নজরে না এলে ত' তা পাওয়া সম্ভব নয়। এই সুযোগে যদি রিয়াংদের সৈন্যদলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া

যায় তবে ও পদটা পাওয়া অসম্ভব না হতেও পারে। অতএব খগেন্দ্র গিয়ে হাজির হলেন রাজার কাছে। রাজার সামনে মনের কথাটা খুলেই বলেন চৌধুরী মশাই।

রাজা হাসলেন। বললেন, কাজটা ত' আগে কর।

খগেন্দ্র উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শুধু বুঝিয়ে নয়, কোথাও কোথাও জোর করেও রিয়াং যুবকদের ধরে এনে ভর্তি করা শুরু হল।

কিন্তু খগেন্দ্রের সর্ব রকম প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে হঠাৎই একদিন দলবদ্ধ সুসংগঠিত রিয়াংরা ঝাঁপিয়ে পড়ল চৌধুরীদের ওপর। গ্রাম থেকে গ্রামে চৌধুরীদের বাসস্থান পুড়িয়ে দিল তারা। কিন্তু আশ্চর্য! তারা এক ফোঁটা ফসল নষ্ট করল না। বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্যের অপচয় করল না। সব নিয়ে চলে গেল তাদের গোপন আড্ডায়। পাহাড় অঞ্চলের থানার দারোগা দীনেশকে ধরে নিয়ে গেল তারা।

খগেন্দ্র প্রাণভয়ে ছুটলেন মহারাজের কাছে। বললেন, মহারাজ। ওরা দীনেশ দারোগাকে ধরে নিয়ে গেছে। ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে বলি দেবে। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল পাঠালেন উদয়পুরের দিকে।

বিদ্রোহীরা সঙ্গে সঙ্গে স্থান বদল করল। খগেন্দ্রের মূল বাড়ি ছিল বিলোনিয়ার দিকে। এবার বিদ্রোহীরা সে দিকে চলল। সংবাদ পেয়ে খগেন্দ্র পালাল। পালাল বিলোনিয়ার সব ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য লোকেরা। সুসমৃদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র মুহূর্তে জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হ'ল। বিদ্রোহীরা প্রথম আগুন ধরাল খগেন্দ্রের বাড়িতে তারপর লুট করল সারা শহর। অকারণ হত্যা করল না বিদ্রোহীরা।

জাপানী শত্রুর মোলাকাতের জন্য কুমিল্লায় এক হেড কোয়ার্টার তৈরী করেছিলেন ইংরেজরা। খগেন্দ্র সেখানে গিয়ে সংবাদ দিলেন জাপানীদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রিয়াংরা বিদ্রোহ করেছে। এখুনি তাদের দমন করা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ফৌজ ছুটল বিলোনিয়ায়। তাদের আসতে দেখে রিয়াংরা পালাল পাশের গ্রাম বাইখুরায়। রাজার বাহিনীর সঙ্গে সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেলল গ্রামটা। বিদ্রোহীরা বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সৈন্যবাহিনী ঢুকে দেখল একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক আর কিছু মৃত রিয়াং পড়ে আছে। কয়েকজন আহত। মনে হল বিদ্রোহীরা খাবার আয়োজন করছিল। সব পালিয়েছে। যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য থেকে সৈন্য-অধিনায়কেরা অনুমান করলেন, জাপানী অস্ত্র ত' দূরের কথা সামান্য গাদা-বন্দুকও দু-একটির বেশি ছিল না বিদ্রোহীদের কাছে।

সৈন্যবাহিনীর নায়কেরা বুঝলেন এটি একেবারেই আদিবাসী বিদ্রোহ। কিন্তু সুসংগঠিত। এ ত' একদিনের কাজ নয়। কে করল তাদের সংগঠিত? এই সীমান্ত অঞ্চলে অসংখ্য গুপ্তচরের চোখ এড়িয়ে কোন যাদুমন্ত্রে কে ঘুম ভাঙ্গাল রিয়াংদের! একেবারে সৈন্যদলের মত সুশিক্ষিত করে তুলল!

আর ভাবনার অবকাশ ছিল না সৈন্য-অধিনায়কদের। বিদ্রোহীরা বিলোনিয়ার অন্যদিকে অমরপুর গ্রামে সমবেত হয়েছে। সামান্য উপকরণে সজ্জিত হলেও তারা বিদ্রোহী। ধ্বংস তাদের করতেই হবে। অতএব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেই বিরাট সৈন্যদল বিদ্রোহীদের কিছুমাত্র সময় না দিয়ে পিছু তাড়া করে চলল।

বিদ্রোহীরাও ভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করল। তারা উঠে পড়ল টিলার ওপর। সেখানে অসংখ্য পাথর জমা করা ছিল। সৈন্যদল উঠলেই গড়িয়ে দেওয়া হবে এই হল পরিকল্পনা। কিন্তু সুশিক্ষিত রণবিজ্ঞানী ইংরেজ সৈন্য নায়কদের কাছে ফন্দিটা না বোঝা রইল না। তারা সামনে একদল সৈন্যকে তাদের ধোঁকা দেবার জন্য রেখে অন্য দলকে পাঠিয়ে দিলেন ঘুরপথে পিছন দিয়ে উঠে টিলা অধিকার করতে। এই পদ্ধতিতে বিনা যুদ্ধে বহু বিদ্রোহী বন্দী হল। কিছু গেল পালিয়ে।

এবার বিদ্রোহীদের বন্দী করা কঠিন হয়ে উঠল। তারা গভীর দুর্গম জঙ্গলে পালিয়ে যেতে থাকল। যে জঙ্গলে ঢুকে বিদ্রোহী খোঁজা সহজ নয়। অতএব সৈন্যদল বিদ্রোহীদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে লাগল। অবশেষে তারা জানতে পারল যে বন থেকে বিদ্রোহীরা রাতে এসে মিলিত হয় মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা রান্না করে নিয়ে যায় খাবার।

সুযোগটাকে ষোলআনা ব্যবহার করল ইংরেজবাহিনী। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাঁরা মেয়েদের পিছু পিছু গিয়ে উপস্থিত হল, যেখানে নেমে এসে অপেক্ষা করছিল বিদ্রোহীরা। এভাবে বহু বিদ্রোহী ধরা পড়ল। মাত্র ন'দিনে প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহী ধরা পড়ল। সৈন্যবাহিনী বিস্মিত হ'ল বিদ্রোহীদের ব্যাপকতা দেখে। কিন্তু বিদ্রোহীরা বুঝে ফেলল ইংরেজদের কৌশল। তারা আরও গভীর অরণ্যে ঢুকে গেল।

সৈন্যদল এবার রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ল। বিদ্রোহীরা আর ধরা পড়ছে না। অথচ তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। কি ভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যায়!

মহারাজের লোক এসে ফন্দি বাতলিয়ে দিলেন। রিয়াংরা মেয়েদের অমর্যাদা সইতে পারে না। অতএব গ্রাম থেকে মেয়েদের বন্দী কর। পুরুষেরা অবশ্যই নেমে এসে আত্মসমর্পণ করবে।

আশ্চর্য ফল দিল এই পথ। সৈন্যরা এক একটা রিয়াং বস্তী উজাড় করে মেয়েদের বন্দী করে এনে রাখতে লাগল এক একটা ক্যাম্পে। আর গ্রামটাকে ধূলিস্যাৎ করে রেখে যেতে থাকল তারা। কৃষিক্ষেত্র, বস্তি, গৃহপালিত জীবজন্তু কিছু রইল না সেখানে। সেই জনশূন্য শ্মশানের মধ্যে এসে আত্মসমর্পণ করতে থাকল বিদ্রোহীরা।

কিন্তু আত্মসমর্পণই শেষ কথা নয়। তারপর যে অমানুষিক অত্যাচার শুরু হতে থাকল বন্দীদের ওপর, তা দুঃসহ। পরবর্তী কালে ঐ যুদ্ধের এক নায়ক স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে বলেছিলেন,

যে আজ ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষ হয়ে মানুষের ওপর সেই অত্যাচার করতে পেরেছিলেন কিভাবে! বোধ করি সৈনিকের পোষাকই মানুষকে অমানুষ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

অত্যাচারে কত রিয়াং-এর যে মৃত্যু ঘটল তার সীমা নেই। তবু প্রায় বাইশ হাজার রিয়াং রাজার কাছে পাঠান হল। রাজা তাদের মাথা মুড়িয়ে গুরুবাড়ি থেকে দীক্ষা দিয়ে আর কখনও বিদ্রোহ করবে না প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিলেন।

এদিকে আত্মসমর্পণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে আরও বিস্ময় বোধ করতে থাকলেন সৈন্য-নায়কেরা। অরণ্যের গভীরে ঢুকে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাদের সামনে যেন এক রূপকথার রাজ্য খুলে গেল।

এ রূপকথার শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালেরও অনেক আগে। হঠাৎই রিয়াং পার্বত্য অঞ্চলে ছোট্ট রোগা একটা মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। অঙ্গে তার সাধুর বেশ। নেয়াপাতিয়া সম্প্রদায়ের লোক সে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। মানুষটি সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় আর বলে, কতদিন পড়ে পড়ে মার খাবি! রিয়াংরা কি মার খাবার জাত!

কথাটা দোলা দেয় সকলের বুকে। মার খাব না ত' কি করব! রাজার কত শক্তি।

লোকটা বলে, তোমাদের শক্তি কম!

আমরা কি করব?

নতুন রাজ্য গড়ে তোল। অরণ্যের গভীরে রিয়াংদের নিজের রাজ্য। যেখানে রিয়াংরা স্বাধীন!

সকলে বিস্ময়ে তাকায়! ব্যাপারটা কি সম্ভব!

এ অবস্থাতেই এলো বিয়াল্লিশ সাল। শুরু হল রাজার সৈন্যদলে লোক সংগ্রহ। এমন সময় আবার তৎপর হয়ে উঠল লোকটা। গ্রাম থেকে গ্রামে প্রচার করে চলল, না। একজন রিয়াংও সৈন্য-

দলে যোগ দেবে না। যে সৈন্যদল দিয়ে রাজা আমাদেরই শাসন করেন, অত্যাচার করেন, সে সৈন্যদলে আমরা কিছুতেই যোগ দেব না।

রিয়াংরা গর্জে ওঠে, কিছুতেই না।

লোকটা বলে, তবে চল রিয়াংদের স্বাধীন রাজ্যে।

কোথায়?

গভীর অরণ্যে!

আজ সেনানায়কেরাও গভীর অরণ্যে ঢুকে বুঝি রিয়াংদের মত কম বিস্মিত হন নি। রিয়াংরা লোকটার পিছু পিছু গভীর অরণ্যে ঢুকে দেখল, যেন যন্ত্র বলে জাদুপুরী বানিয়েছে মানুষটা। বড় বড় রাস্তা, ঘরবাড়ি। সত্যিই রিয়াংদের স্বাধীন রাজ্য। হাজার হাজার রিয়াং সদাব্যস্তভাবে কাজ করছে সেখানে। তাদের দেখে কর্মব্যস্ত রিয়াংরা চিৎকার করে ওঠে।

রাজা রতনমুনির জয়।
স্বাধীন রিয়াংরাজ্যের জয়।

তখন সবাই জানল ঐ রোগা সাধুর নাম রতনমণি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রিয়াংদের দিয়ে গড়েছে সে এ সব। এই স্বাধীন রাজ্যের প্রধান রতনমণি। মন্ত্রী সভায় আছে পাঁচজন রিয়াং। এ ছাড়া আছে সৈন্যাধ্যক্ষ, পুলিশ, এমন কি ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টার পর্যন্ত। একটা স্বাধীন রাজ্যের সব আয়োজন করেছেন রতনমণি।

রিয়াংদের মধ্যে নব উন্মাদনার বান বইল। সকলে এসে মৃত্যু-পণে মিলিত হল রতনমণির পতাকা তলে। বিজয়ী সেনাদল এসে দেখলেন গাছ কেটে ভূমি সমান করে বিশাল প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করেছে রতনমণির ইঞ্জিনিয়াররা। তার নিজের আবাসস্থানটি একটি মস্ত টিলার ওপর। চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ান গভীর বন। বন ঘিরে সুপ্রশস্ত ধান ক্ষেত। টিলার চার দিকে চারটি টং ঘর। সেখানে দিবারাত্র পাহারা দিত রিয়াং যুবকেরা।

এ সবের চেয়েও সেনা বাহিনীর বিস্ময় দুটি। এক, এ অঞ্চলে রতনমণি এতবড় কাজ এত গোপনে করলেন কি করে! সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধাঞ্চলের এত কাছে এত বড় কাজ যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা তাদের অজানা ছিল না। দুই, রতনমণির সাংগঠনিক শক্তি কি বিশাল ছিল। রতনমণির প্রতি তাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার অন্ত থাকল না।

তবু তাকে খুঁজে চলল সৈন্যের দল। সংবাদ পাওয়া গেল, গভীরতর অরণ্যে ঢুকে গেছে রতনমণি। তখন গোটা অঞ্চলে গোয়েন্দা গুপ্তচরে বোঝাই, ফলে বেশি দিন আত্ম-গোপন করে থাকতে পারল না রতনমণি। গভীর জঙ্গল থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হ'ল। সৈন্যবাহিনী গ্রেপ্তার মাত্র তাকে পাঠিয়ে দিল মহারাজের রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে। মাত্র দু-দিন পর এক ভোরে রতনমণি হঠাৎ মারা গেছেন বলে ঘোষণা করা হল।

ত্রিপুরার চিফ মেডিকাল অফিসার রিপোর্ট দিলেন, যক্ষারোগে তার দুটি ফুসফুসই অকেজো হয়ে গেছিল। তাই সহসা তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এ যে সাজান রিপোর্ট, তা সবাই জানত! সামরিক বাহিনীর সেই আত্মজীবনী-লেখক অফিসারটি লিখেছেন, আসলে দুদিন রতনমণির মত মহাবিপ্লবী ও সাংগঠনিকের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, তার ফলে তাঁর ফুসফুস ফেটে মৃত্যু হয়।

রতনমণির মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু তিনি রিয়াংদের মনে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন এঁকে দিয়ে যান তার বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয়নি।

সাইত্রিশ

নৌ-বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বিজয়ী হলেও ইংরেজ-সরকারের নিজের দেশের অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তাদের অফিসারদের মেজাজ এবং অহমিকায় চিড় ধরেনি। কোম্পানীর আমলের উদ্ধত ইংরেজ নীলকরদের মত উগ্র স্বভাবের অনেকে তখনও ভারতীয়দের দেখে ঘৃণার চোখে। তাদের গালি দেয় ব্লাডি-নিগার বলে, কুত্তার বাচ্চা বলে। এমনই সামান্য কারণকে উপলক্ষ্য করে ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে জ্বলে উঠল নৌ-বিদ্রোহের আগুন।

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল জুড়ে অসংখ্য বন্দর আর প্রতি বন্দরেই নৌ-ঘাঁটি। হিন্দু-মুসলমান স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিচারে, বাঙলা থেকে পাঞ্জাব আর হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সকল অঞ্চলের মানুষ আছে নৌ-বাহিনীতে। এদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার।

ভারতীয় নৌ-সেনাদল শুধু সংখ্যায় নয়—গৌরবেও অতুলন ছিল। জার্মানী এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে তারা কৃতিত্ব দেখিয়েছে একাধিকবার। যদিও ইংরেজ সরকার প্রতি যুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে খারাপ জাহাজ ব্যবহার করতে দিয়েছে, দিয়েছে সবচেয়ে খারাপ

অস্ত্রশস্ত্র, ঠেলে দিয়েছে সবচেয়ে বিপদজনক যুদ্ধে, তবুও ভারতীয় বাহিনী প্রতিটি যুদ্ধে অসমকৃতিত্ব ও জয়ের গৌরব অর্জন করে এসেছে।

সেই ভারতীয় সৈন্যের দল যে ভেতরে ভেতরে ধোঁয়াচ্ছিল, একথা নৌ-দপ্তর বুঝেও বোঝেননি। নৌ-দপ্তরের ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ভারতীয় সেনারা এতদিন মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। তারা লক্ষ্য করেছে ইংরেজ সেনাদের যে খাবার দেওয়া হয় তা তাদের খাবারের চেয়ে ভাল। তাদের সমস্ত রকম সুযোগ এবং মাইনে বেশি। এই বৈষম্য তারা এতদিন দেখেছে কিন্তু সহ্যও করেছে।

কিন্তু ১৯৪৬ সালে পরিস্থিতি হয়েছিল ভিন্ন রকম। ১৯৪২ সালে যে আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়, যাতে গান্ধী বুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরার মত মানুষ প্রাণ দিয়ে, তা গোটা দেশের মানুষকে ইংরেজদের সমস্ত পাশবিক অত্যাচার ও দমননীতিকে উপেক্ষা করতে শিখিয়ে ছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল আধ কোটিরও বেশি মানুষ। সমস্ত রকম শিল্পে চলছিল ধর্মঘট। এই অর্থনৈতিক সংকট গোটা দেশে যে বিপর্যয় টেনে এনেছিল তা ভোগ করছিল ত' ঐ সৈন্যদেরই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু প্রতিবেশিরা। স্বভাবতঃ বাইরে শৃঙ্খলার আবরণ থাকলেও প্রত্যেকটি নৌসেনা স্বজাত্যবোধে এবং ইংরেজ বিদ্বেষে ফুঁসছিল।

এ সময়ে আত্মসমর্পণ করা আজাদ্ হিন্দ বাহিনীর বিচার চলছিল দিল্লীর লালকেল্লায়। প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছিল তাদের বীরত্ব, ত্যাগ এবং দেশপ্রেমের কাহিনী। এগুলি গর্বিত করে তুলছিল প্রতিটি ভারতবাসীকে। নৌসেনারাও গর্বিত হচ্ছিলেন তাঁদের জন্য। কিন্তু নিজেরা ইংরেজ দাসত্ব মান্য করে তাদের দেওয়া নিত্য অপমানের মধ্যে কাটাচ্ছেন দেখে ভেতরে ভেতরে কম যন্ত্রণা বোধ করছিলেন না তারা।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই বন্দরে অপেক্ষা করছিল একটি জাহাজ। তার নাম তলোয়ার। জাহাজটা যুদ্ধ-জাহাজ নয়। বরং এ জাহাজে সৈন্যদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ল। ফলে তলোয়ারের সঙ্গে কম বেশি পরিচয় সমস্ত নৌ-সেনারই ছিল। তলোয়ারের নিজস্ব নৌসেনার সংখ্যা প্রচুর। তাতে ভারতীয় সেনাই ছিল প্রায় এগার'শ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী নৌ সেনাপতি কিং পরিদর্শন কালে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে কুত্তির বাচ্চা বলে গালি দিলেন। সৈন্যেরা বাইরে কোন বিদ্রোহ প্রকাশ করল না। পরিদর্শন শেষ হ'লে তারা সমবেত হ'ল। তারপর সেনাপতির দপ্তরে সকলের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র পাঠাল।

১৭ তারিখে থমথমে ভাব কেটে গেল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের প্রতিবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করল না। ১৮ তারিখে প্রাতরাশ টেবিলে সহসা ক্ষোভ জ্বলে উঠল সৈন্যদের। সেই অখাদ্য প্রাতরাশ ছুড়ে ফেলে তারা ধর্মঘট ঘোষণা করল। তারা দাবী করল উৎকৃষ্ট খাদ্য দিতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্য দ্রব্য চাই, বেতনক্রম ব্রিটিশ সৈন্যর সমান হতে হবে। তারা সবচেয়ে বড় করে যে কথা বললেন তা হ'ল সেনাপতি কিং যে দুর্ব্যবহার করেছেন তার জন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে। এ সব তাৎক্ষণিক দাবীর সঙ্গে আরও ব্যাপক দাবী হ'ল আজাদ হিন্দ বাহিনী সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে আর ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

তলোয়ারের এ বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বোম্বাই-এর সব জাহাজে। ঐ দিন তলোয়ার ছাড়া অন্যান্য জাহাজ ধর্মঘটে যোগ না দিলেও কোন জাহাজেই স্বাভাবিক কাজকর্ম হ'ল না। নৌসেনাদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা। উৎসাহীরা তখুনি তলোয়ারের বিদ্রোহে যোগ দিতে চায়। একটু ভীতরা বলেন, বিদ্রোহ অন্যায়।

আঠারো তারিখ বেলা একটায় তলোয়ারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। সেখানে এলেন ফ্যাগ অফিসার অ্যাডমিরাল র‍্যাটলে। তিনি এসে ধর্মঘটী ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে দেখাও করলেন না। উপস্থিত হলেন ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে। ধর্মঘটীরা বিষয়টাকে উপেক্ষাই করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা সংবাদে চমকে উঠল তারা। র‍্যাটলে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যে নাকি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন বি. সি. দত্তকে বন্দী করেছেন।

এ সংবাদ উৎক্ষিপ্ত করে তুলল তলোয়ারের এগারশ' ভারতীয় সৈন্যকে। তারা অ্যাডমিরাল র‍্যাটলে সহ সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য ঘিরে ফেলল। ভয় পেলেন র‍্যাটলে। তিনি ক্যাপ্টেন দত্তকে ছেড়ে দিয়ে পালালেন।

ধর্মঘটী সৈন্যেরা এবার তৎপর হয়ে উঠল। যোগাযোগ চলল সমস্ত জাহাজের সঙ্গে। পরদিন বোম্বাই বন্দরের প্রায় কুড়িটি বড় যুদ্ধ জাহাজ, ১০০টি ছোট যুদ্ধ জাহাজ, ১২টি নৌ ঘাঁটি মিলিয়ে কুড়ি হাজার ভারতীয় সৈন্য ধর্মঘটে যোগ দিল।

ধর্মঘটীরা এবার সুসংহত এবং সুপরিকল্পিত সূচীতে অগ্রসর হতে শুরু করল। প্রথমেই তারা ঐ সব জাহাজ বা ঘাঁটিতে যে সব ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বা সৈন্য বা কর্মচারী ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে জাহাজ থেকে বের করে দিল। তারপর জাহাজ অধিকার করে নিজেরা তা পরিচালনার দায়িত্ব নিল। সেখানে যে ব্রিটিশ পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক্ ছিল তা নামিয়ে তুলে দিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা, মুসলিম লীগের সবুজ পতাকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা। আসলে সৈন্যরা ভারতীয় সব দলের প্রতিই তাদের আনুগত্য দেখাল।

এবার বিদ্রোহীরা নৌ-বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতের অন্যান্য বন্দরের নৌ-সেনাদের ধর্মঘটে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। সংবাদ পেয়ে করাচী, কোচিন থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমস্ত বন্দরের

যুদ্ধ জাহাজগুলি ঐ ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকল।

ধর্মঘটী সৈন্যরা এবার বোম্বাই-এর জনসাধারণকে তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাইলেন। এজন্য জাহাজ ছেড়ে সৈন্যেরা নেমে এলেন আজাদ ময়দানে। সেখানে সকালে জনসভায় সৈন্যরা তাদের সমস্ত দাবীদাওয়ার ব্যাখ্যা করলেন সাধারণ মানুষের কাছে। সে সভায় হাজার হাজার শ্রমিক, সাধারণ দরিদ্র মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সমান আগ্রহে সমর্থন করলেন সৈন্যদের। তারপর বের হ'ল এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ এক বিরাট পুলিশ-বাহিনী পাঠিয়ে আক্রমণ করল শোভাযাত্রাকে। মুহূর্তে আশপাশের বস্তি থেকে শুরু হ'ল পাল্টা আক্রমণ। পুলিশ বাহিনীতো বটেই ইংরেজ পরিচালকও স্বয়ং ভীষণ আহত হয়ে ফিরে গেলেন।

ধর্মঘটী সৈন্যদের বিস্মিত করে দিয়ে সেদিন বিকেলে রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটলে আবার তলোয়ারে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ধর্মঘটীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন। ধর্মঘটীরা বলল, অলোচনায় বসবার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে যারা বসবে, তাদের কাউকে' শাস্তি দেওয়া চলবে না। অ্যাডমিরাল আশ্বাস দিলেন। আলোচনাও হ'ল। র‍্যাটলে ধর্মঘটীদের দাবীপত্র হাতে করে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। বলে গেলেন সন্ধ্যার আগেই তিনি উত্তর পাঠাবেন।

উত্তর এল না। ধর্মঘটীরা বুঝল অবস্থা আরো খারাপ হবে। সন্ধ্যায় সংবাদ এলো আলোচনার পর গিয়ে র‍্যাটলে 'হামলা' নামক জাহাজের তিন 'শ ভারতীয় সৈন্য বন্দী করেছেন। রাতারাতি ধর্মঘটীরা শুধু স্ট্রাইক-কমিটি নয়—পরবর্তী কার্য পদ্ধতিও স্থির করে নিল।

ভোর হতেই দেখা গেল প্রতি জাহাজ ও ঘাঁটির অদূরে কর্তৃপক্ষ

সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে। ওরা অবশ্য জাহাজের কামানের ভয়ে কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। এদিকে জাহাজে জাহাজে ভাল খাবার পাঠান শুরু হয়েছে। যেন অলিখিত ভাবে ধর্মঘটীদের প্রথম দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এতে সেনাদলকে তুষ্ট করা গেল না। তারা দক্ষিণ বোম্বাই অঞ্চলে আবার শোভাযাত্রা বের করল এবং ধর্মঘটের সর্বশেষ অবস্থা সকলকে জানাল। সংগ্রাম আসন্ন। সকলকে প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ দিল নেতারা।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেদিন বিকেলে সমস্ত ধর্মঘটী সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরে যাবার হুকুম জারী করল। সৈন্যরা এ আদেশ উপেক্ষা করল। ইতঃমধ্যে সংবাদ এল যে করাচী, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী ইত্যাদি স্থানেও নৌসেনারা ধর্মঘট করেছে।

এবার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। ২০ তারিখে তীরের কাছের জাহাজগুলি স্থলবাহিনীর মারাঠা সৈন্যদিয়ে ঘিরে ফেলল। রাত্রে ধর্মঘটীরা মারাঠাদের কাছে আবেদন জানাল, 'আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। তোমরা ভারতীয় হয়ে কেন এসেছ আমাদের বিরুদ্ধে?'

এরা উত্তর দিল, ভয় পেও না। আমাদের সব কার্তুজ ফাঁকা।

পরদিন ২১ তারিখে যখন মারাঠা সৈন্যদের 'ক্যাসল-ব্যারাক' আক্রমণ করতে বলা হ'ল, তারা আক্রমণ করল না। বরং অবরোধ তুলে নিয়ে ব্যারাকে ফিরে গেল। এর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এল ইংরেজ সৈন্য দল। ততক্ষণে ক্যাসেল ব্যারাকের সৈন্যদলও প্রস্তুত। তারা ভেঙ্গে ফেলেছে ব্যারাকের ম্যাগাজিন—অস্ত্রাগার। সেখান থেকে বের করেছে প্রয়োজনীয় মেসিনগান, হাত বোমা। ইংরেজ সৈন্য তাই আক্রমণ করে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। দেখা গেল, অন্য জাহাজগুলিও মুখ ঘুরিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের ওপর কামান তাক করছে। তখন এই ব্রিটিশ বাহিনী পালাল।

এবার ব্যাপক আয়োজন করল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ সেনাপতি বেলা আড়াইটের বেতারে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। নইলে তাদের একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা করলেন, মস্ত এক নৌ-বহর ভারতের দিকে যাত্রা করেছে।

এদিকে বোম্বাই এর জনসাধারণ বিপুলভাবে সংবর্দ্ধনা দিতে থাকল ধর্মঘটীদের। তাদের সমর্থনে ২১শে ফেব্রুয়ারী এক অসাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হ'ল। এদিকে ধর্মঘটী জাহাজগুলিকে সত্যিই ঘিরে ফেলল একদল যুদ্ধ জাহাজ। মাথার ওপর টহল দিতে থাকল বোমারু বিমান। জনসাধারণ থেকে ধর্মঘটীদের বিচ্ছিন্ন করতে বোম্বাই এর রাস্তা দিয়ে আসতে থাকল ট্যাঙ্ক-কামান-মেসিনগান সহ সৈন্যের দল।

বোম্বাই-এর সাধারণ মানুষও দুর্জয় প্রতাপে বাধা দিল এই বাহিনীকে। পথে পথে ব্যারিকেড। এই এক দিনে প্রায় তিন'শ নাগরিক প্রাণ দেয়। আর পাঁচ হাজারের ওপর মানুষ হয় আহত।

পরদিনও জনসাধারণের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর এমন যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক এ আন্দোলনের সঙ্গে গোটা দেশের যোগ ঘটল না। সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য অংশের ভারতীয়েরা নৌসেনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও আন্দোলনে যোগ দিল না। এ অবস্থায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ একত্রে সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মুসলিম লীগের তরফ থেকে মহম্মদ আলী জিন্না তাদের আশ্বাস দিলেন যে আত্মসমর্পণ করলেও তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না এবং তাদের দাবীগুলি যোগ্য মর্যাদায় বিচার করা হবে।

বিদ্রোহী ধর্মঘটীরা আত্মসমর্পণ করল।

আটত্রিশ

মুক্তির লগ্ন

সারা বিশ্বে প্রায় একা একা লড়ে জার্মানী যে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারবে না, একথা ইউরোপ যেন ক্রমেই বুঝে উঠতে পারছিল। আর এ জন্য সে উৎসাহভরে তার সম্পদ আরও দ্রুত এবং পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছিল।

ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্যের একটা বড় যোগানদার ভারতবর্ষ। বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে ভারতই ছিল ইংলণ্ডের ঘাঁটি—হেড কোয়ার্টার। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যে বিশেষ রূপ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে ইউরোপ আতঙ্কিত হ'ল। তখন এদেশে সম্পূর্ণ অচল অবস্থা। নেতারা সব জেলে। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ। অত্যাচারেও দমানো যাচ্ছেনা তাদের। অথচ দরকার তাদের সহযোগিতা। ইংলণ্ড স্থির করল ভারতের সঙ্গে ব্যবহারের নীতি বদল করতে হবে। আর এ জন্যই তারা গভর্ণরের

বদল করলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাস কাটতেই লর্ড লিউ লিন্‌লিথগোর বদলে ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড ওয়াভেল।

ওয়াভেল এর আগে সেনাপতি হিসাবে ভারতে ছিলেন। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তার মত অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ছিল। তখনও কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে যুদ্ধ ৪৫ সালের শেষ দিকেই শেষ হয়ে যাবে। তখনও সকলেই ভাবতেন, এমন কি ওয়াভেল নিজেও, যে ১৯৪৬ সালের মাঝ বরাবর জার্মান জাপান পরাজয় বরণ করবে। কিন্তু আণবিক বোমার ব্যবহারই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাল। যুদ্ধ শেষ হল ৪৫-এর শেষ দিকে।

যাই হোক, যুদ্ধ নীতির দিকে নজর রেখে ভারতের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়তে এলেন ওয়াভেল। ক'মাসের মধ্যেই তিনি যেন ভারতের নাড়ীর বেগ ধরে ফেললেন। যদিও তখন জিন্না সাহেব স্বাধীন ভারতের একাংশ বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম মুসলমান রাজত্বের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলছিলেন মুসলমানদের বুকে, তবু তখনও ভারত অখণ্ডতার দিকেই ঝুঁকে আছে। অতএব ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারীতে ওয়াভেল লিন্‌-লিথগোর মুসলমান তোষণ নীতির বিরোধিতা করেই এক বিবৃতি দিলেন ভারতীয় ঐক্যের স্বপক্ষে :—

> "ভূগোলকে সংশোধন করা যায় না। প্রতিরক্ষা আর অর্থ সমস্যার 'তা সে আভ্যন্তরীণই হোক আর বহির্দেশীয়ই হোক) দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ একটি স্বাভাবিক ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড।"

ওয়াভেলের এ ঘোষণায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বেশির ভাগ মানুষ খুশি হলেন। ঐ খুশিকে ওয়াভেল আরও বাড়িয়ে তুললেন ঐ বছরেরই মে মাসে ভারতীয় নেতাদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে।

ইতঃমধ্যে রাজাগোপালচারী জিন্নাসাহেবের ঐ আন্দোলনের সঙ্গে আপোষ রক্ষা করবার জন্য একটা প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে-ছিলেন। প্রস্তাবটা হ'ল,

১. মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন করবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনেও সাহায্য করবে।

২. যুদ্ধ শেষ হলে মুসলমান প্রধান অঞ্চল গণভোট নিয়ে স্থির করবে ঐ অঞ্চল পৃথক রাষ্ট্র হবে কিনা।

৩. যদি গণভোটে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী ওঠে, তবে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থির হবে।

৪. ইংলণ্ড সম্পূর্ণভাবে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই এ সব ভাগ বাটোয়ারা এবং গণভোটের আয়োজন করা হবে।

প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক ছিল। গান্ধীজি প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে উৎসাহ বশে নিজেই এ প্রস্তাব পাঠালেন জিন্নাসাহেবের কাছে। কিন্তু জিন্না-সাহেব আদৌ গ্রহণ করলেন না এ প্রস্তাব। তিনি হস্তান্তরের আগেই চাইলেন গণভোট। সেই সঙ্গে যে দাবী করলেন তা আদৌ কোন রাজনীতিসম্মতঃ প্রস্তাব নয়। তিনি বললেন, মুসলমান প্রধান অঞ্চল কোন দিকে যোগ দেবে তা নির্দ্ধারণ করবে ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরাই। অর্থাৎ ঐ গণভোটে ভোট দেবার অধিকারী থাকবেন শুধু মুসলমানেরাই—অমুসলমানেরা নয়।

এই অবস্থায় ওয়াভেল ইংলণ্ড থেকে মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে ৪২ সালের প্রস্তাবই অপরিবর্তিত ভাবে চালু করা হবে। আর এই উপলক্ষ্যে তিনি সব রাজনৈতিক দলকে ডেকে আলোচনায় বসলেন। কিন্তু এবারেও জিন্নাসাহেবের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হল!

এই রকম থমথমে অবস্থার মধ্যে ৪৪ সাল শেষ হ'ল। পঁয়তাল্লিশ সালে আকস্মিক ভাবে শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। ইংলণ্ডে এর পরেই হল ইলেকশন্। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল হেরে গেলেন। ইংলণ্ডে জিতল শ্রমিকদল। প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্লীমেণ্ট-

এটলী। ভারতবর্ষের মানুষ উল্লসিত হ'ল। শ্রমিক-দলের মতামত উদার—তারা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। অর্থাৎ এবার ভারতবর্ষের ভাগ্যে কিছু সুবিধা জুটতে পারে।

কিন্তু ব্যাপার ঘটল উল্টো। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মন্ত্রীসভা ঘোষণা করল, নেতাজীর 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (I. N. A.)'র বন্দী নেতাদের বিচার করা হবে। তারা ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল। কিন্তু তারা তা পালন করেনি। অতএব তাদের কোর্ট মার্শালের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

এ ঘোষণা ভারতীয় মাত্রকেই বিক্ষুব্ধ করল। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নেতারা তখন জাতির মনে বীরের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মত্যাগী সৈনিক। তাদের বিচারের সংবাদে সমস্ত রাজনৈতিকদল এক যোগে প্রতিবাদ করল। বীর নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করল তারা। কংগ্রেস তাদের মামলা চালাবার জন্য ভারত বিখ্যাত ব্যারিস্টারদের নিয়ে একটা দল তৈরী করল। এতে যোগ দিলেন ভুলাভাই দেশাই, তেজ বাহাদুর সপ্রু, কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি প্রভৃতি।

দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের আয়োজন হ'ল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্নেল ধীলনের মত মানুষ। তাদের সমর্থনে ভারতের সেরা নেতা এবং ব্যারিস্টারেরা। আর গোটা দেশ উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিচারের রায় জানতে।

দেশের সব প্রত্যাশা ভাসিয়ে দিয়ে তাদের ফাঁসির হুকুম জারী হ'ল। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারাদেশ। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার তাদের বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। দেশে রণজয়ের প্রমত্ত উল্লাস।

এই সাফল্যের মুখেই হ'ল ভারতবর্ষের নির্বাচন। নির্বাচনে অসামান্য সাফল্য ঘটল কংগ্রেসের। বাঙলাদেশ আর সিন্ধুপ্রদেশ ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই কংগ্রেসের জয় জয়াকার। এমন কি

মুসলমান আসনেও লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মত মুসলমান প্রধান অঞ্চলেও কংগ্রেসের বিজয় দেখে মুসলিম লীগ স্তব্ধ হয়ে গেল। এ নির্বাচন প্রমাণ করে দিল যে গোটা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার হক কংগ্রেসেরই—মুসলিম লীগ সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি নয়।

ঠিক এই সময়েই বোম্বাইতে ঘটল নৌ-বিদ্রোহ। মুসলিম লীগ সামনে আসবার সুযোগ পেল। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তারা বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পনের পরামর্শ দিলেন। কোনক্রমে এ বিদ্বেষ শান্ত হতে না হতে এদেশে এক কমিশন পাঠাল ইংলণ্ড। কেমনভাবে ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেওয়া যাবে, তা স্থির করবার দায়িত্ব থাকল এই কমিশনের ওপর।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের তিনজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী ছিলেন এই কমিশনে। এঁরা হলেন লর্ড প্যানিফ লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ এবং মিঃ আলেকজাণ্ডার। এ কমিশন ভারতবর্ষের কাছে প্রভূত উৎসাহ সঞ্চার করল। ভারতবর্ষ তবে সত্যিসত্যি স্বাধীন হতে চলেছে!

এই উৎসাহের আরও একটা কারণ ছিল। কমিশন পাঠাবার আগে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী পার্লামেণ্টে একটা ঘোষণা করেছিলেন, 'কোনক্রমেই সংখ্যালঘুদের এমন সুযোগ দেওয়া হবে -'. যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।'

এই ঘোষণা থেকে অনেকেই ধারণা করলেন যে, উদারনৈতিক শ্রমিকদলের মনোভাব আগের মন্ত্রীসভা থেকে নিশ্চিতভাবে পৃথক। এ সরকার তাহ'লে ভারত-বিভাগ চান না। এঁরা বুঝি বা এতদিনের লীগ-তোষণ নীতি ত্যাগ করল!

মিশন প্রায় তিন মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে, তথ্য সংগ্রহ করলেন, শত শত জনের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁরা এসেছিলেন ২০শে মার্চ, ফিরে গেলেন ২৯শে জুন। এর মধ্যে তাঁরা সম্মিলিত

ও পৃথক পৃথকভাবেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা করলেন। জিন্না তাঁর দাবী থেকে এক চুলও নড়লেন না। কোন আপোষেও রাজী হলেন না। পাকিস্থান তার চাই-ই। আলোচনা ব্যর্থ হ'ল।

তবু কেবিনেট-মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করলেন, তাতে মূলতঃ পাকিস্থানের দাবী পরিত্যক্ত হল। তারা দৃঢ় স্বরে বললেন যে, পাকিস্থান হলেই যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটবে এমন নয়—তাই মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কোনই সার্থকতা থাকতে পারে না। বিশেষতঃ এজন্য ডাক-তার, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদিকে যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে হবে, তাতে সমগ্র দেশেরই হবে অমঙ্গল। আর সৈন্যবাহিনী খণ্ডিত হ'লে তাহবে সর্বনাশা। সবচেয়ে বড় কথা সাত শ' মাইল দূরে দূরে দু'টি অংশ নিয়ে কোন একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

কমিশনের এই বক্তব্য এত স্পষ্ট এবং দৃঢ় যে এটুকু পড়লে মনে হবে যে কেবিনেট বুঝিবা জিন্না সাহেবের দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। তাতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা তথা পাকিস্থানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হ'ল না। কমিশন বললেন, ভারতবর্ষ হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের রাষ্ট্র। কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ইত্যাদি সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি। প্রদেশ-গুলির কিন্তু সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থাকবে।

কমিশন এবার প্রদেশগুলিকে কতগুলি দলে ভাগ করলেন। এখানেই টেনে আনা হ'ল জিন্না সাহেবের দ্বি-জাতি তত্ব। তারা বললেন, ভারতীয় প্রদেশগুলি তিনটি গ্রুপে বিভক্ত থাকবে।

ক-গ্রুপ: হিন্দুপ্রধান অঞ্চল: মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা।

খ গ্রুপ: মুসলমান প্রধান অঞ্চল: পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ।

গ-গ্রুপ : বাঙলা ও আসাম (সংযুক্ত ধর্মীয় প্রদেশ)

তখন ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশ ছিল চিফ্ কমিশনার শাসনে। কেবিনেট কমিশন এই রাজ্যগুলিকেও বিভিন্ন গ্রুপে যুক্ত করবার স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। মুসলমান প্রধান বেলুচিস্থান যোগ দেবে খ-গ্রুপে আর হিন্দু প্রধান দিল্লী, আজমীর, মাড়ওয়ার, কুর্গ ইত্যাদি থাকবে ক-গ্রুপে। মোট কথা কেবিনেট কমিশন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই পাকিস্থানকে পুরে রাখলেন।

কমিশন ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরীর জন্য একটি সংস্থা তৈরী করবার নির্দেশ দিলেন। এ সংস্থা নির্ধারণের জন্য একটা জটিল পদ্ধতি স্থির করা হল।

সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে মুসলিম লীগ নিজের সাফল্য খুঁজে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল। অন্যদেরও বুঝতে অসুবিধা হল না যে ধর্মভিত্তিক গ্রুপ তৈরী করে প্রকারান্তরে পাকিস্থানকেই মেনে নেওয়া হয়েছে—তবু কংগ্রেস একে বরণ করে নিল। এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল যে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে, তা হবে ভরাডুবির মুষ্টিযোগ কংগ্রেস বিশ্বাস করত যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকতে থাকতে একদিন এ ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হবে। একদিন ঐ গ্রুপের ভেদ রেখা মুছে যাবে।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে সংবিধান তৈরীর সংস্থা গঠনের জন্য যে নির্বাচন হ'ল, তার ফল দেখে মুসলিম লীগের মাথা গেল ঘুরে। দেখা গেল ২৯৬ জনের গণপরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২১১ জনই কংগ্রেসের প্রার্থী। তারা যে সামান্য ক'জন নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের ভোটের জোরে কোনঠাসা করে কংগ্রেস নিজের মতই সব করে নেবে।

এ কথা ভেবে লীগের নেতারা গণপরিষদ ত্যাগ করলেন, কেবিনেট কমিশনের ওপর থেকে তুলে নিলেন তাদের সমর্থন এবং সংগ্রামের ডাক দিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। কিন্তু প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বলতে মুসলিম লীগ যে কি বোঝাতে চাইছেন, তা সকলের কাছেই ছিল অস্পষ্ট। লীগের নেতারাও তা গোপন রাখলেন। এ সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে, কি ভাবে পরিচালিত হবে তা কিছুই বোঝা গেল না। দেশ-জুড়ে উৎকণ্ঠা।

সব উৎকণ্ঠার মীমাংসা হল। মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সাক্ষাৎ হিন্দু-হত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকায় আত্মপ্রকাশ করল। বাঙলাদেশে লীগের শাসন চলছিল। কলকাতা ঐ দিনে রক্তকর্দমাক্ত কশাইখানায় পরিণত হ'ল।

প্রথম একদিন চলল অবাধ হিন্দু হত্যা। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। দ্বিতীয় দিনে হিন্দুরা আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। নিরীহের অকারণ প্রাণদানে কি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল—কে জানে।

কলকাতার হাঙ্গামা খানিকটা কাটতে না কাটতে হাঙ্গামা শুরু হল মুসলমান প্রধান নোয়াখালি আর ত্রিপুরায়। এর প্রতিক্রিয়ায় বিহার, যুক্ত-প্রদেশ এবং বোম্বাইতে দাঙ্গা বেধে গেল। সাধারণ মানুষ যেন ক্রমেই 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় এসে দাঁড়াতে থাকল। দেশ ভাগ করে দিয়ে যদি শান্তিলাভ করা যায়, তবে ছেড়ে দাও মুসলমানদের এক অংশ। দেশে শান্তি আসুক।

ইতঃমধ্যে ওয়াভেল কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরী করলেন। আগের মতই ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন তার সভাপতি। জওহরলাল নেহেরু হলেন সহ-সভাপতি। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ এরা কার্যভার গ্রহণ করলেন। মুসলিম লীগ এতে যোগ দিল না। ওয়াভেল আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং প্রায় দুমাস পরে ২৬শে অক্টোবর তারা ঐ সরকারে যোগ দিলেন। অনেকেই ভাবলেন যে আকাশের কালো মেঘ বুঝিবা ওয়াভেলের চেষ্টায় দূর হল।

কিন্তু দেখা গেল মুসলিম লীগ যোগ দেওয়ায় ফল হ'ল উল্টো। ব্রিটিশ পক্ষ এবং লীগ এক হয়ে কংগ্রেসের প্রতিটি প্রস্তাবে তীব্র বাধা সৃষ্টি করতে থাকল।

১৯৪৬ সাল শেষ হয়ে এলো। মুসলিম লীগ অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিলেও শাসনতন্ত্র তৈরী করবার জন্য যে গণপরিষদ তাতে তখনও যোগ দেয়নি। গণপরিষদ সেই অবস্থাতেই ১৯৪৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধ প্রস্তুত করল। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু মুসলিম লীগ অবিচল।

এমন সময় এর মাত্র দু'দিন আগে ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারতের শাসনভার দেশের দায়িত্বশীল সরকারের হাতে তুলে দেবেন। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে না চায় তবে কোন কোন প্রাদেশিক সরকার কিভাবে কি করবে তা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব থাকবে ব্রিটিশ সরকারের। ভারতীয় জনগণের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ব্রিটিশ সরকার নিজেই বিবেচনা করবে।

সরকারী এই ঘোষণা স্পষ্টতঃ ভারত বিভাগের ইঙ্গিত। কেবিনেট মিশন যে জোরালো ভাষায় অবিভক্ত ভারতের সুপারিশ করেছিল, এই ঘোষণায় তা সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হল। মুসলিম লীগ এতদিন একটা দম বন্ধ উৎকণ্ঠায় কাল কাটিয়ে এবার উল্লসিত হয়ে উঠল। তাদের উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল কলকাতা, আসাম, পশ্চিম-পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে দাঙ্গায়। বাঙলাদেশ আগেই শান্তির জন্য দেশভাগ স্বীকার করে নিয়েছিল, পাঞ্জাবের শিখ এবং হিন্দুরাও নিরাপত্তার স্বার্থে দেশবিভাগকে স্বীকার করে নিল। বোঝা গেল লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফল।

এমন সময় মার্চ মাসে ওয়াভেলের বদলে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন স্পষ্টভাবে। তাঁর পরিকল্পনা মতে বঙ্গদেশ, আসাম এবং

পাঞ্জাব ভাগ হবে। শ্রীহট্ট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গণভোট স্থির করবে তারা কোন দিকে যোগ দেবে—ভারতে না পাকিস্থানে।

কংগ্রেস, লীগ উভয় দলই এ প্রস্তাব মেনে নিল। স্থির হল বঙ্গদেশের পূর্বখণ্ড আর পাঞ্জাবের পশ্চিম খণ্ড যোগ দেবে পাকিস্থানে। শ্রীহট্ট পাকিস্থানে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভোটে স্থির হল, সে দেশ হবে পাকিস্থানভুক্ত। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে এক বিচার বিভাগীয় কমিশন সীমানা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব পেলেন। দেশের বুকে কোথায় কিভাবে করাত চলবে তা স্থির হতে থাকল।

চারিদিকে সাজ-সাজ রব। বহু প্রতীক্ষিত যে স্বাধীনতার জন্য একদিন শত শত শহীদ প্রাণ দিয়েছে, যার জন্য চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে—স্বাধীনতা নয়, এ কি সেই স্বাধীনতা।

না হোক! যে বেশেই আসুক, স্বাধীনতা—স্বাধীনতাই। সরকারী কর্মচারীরা কে কোন রাষ্ট্রে থাকবেন, তার জন্য তাদের নিজস্ব মত নেওয়া হতে থাকল। ইতঃমধ্যে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন (India Independence Act) পাশ হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেল, ১৫ই আগস্ট সার্বিক ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে এলো স্বাধীনতা। কিন্তু তবু যে আশা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে তা আসতে পারত তা এল কৈ? এক দিকে আনন্দ অন্যদিকে বিচ্ছেদ। একদিকে হাসি আর অন্য দিকে শত-শত গৃহহারা উদ্বাস্তুর অসহায় দেশত্যাগ। এরই মধ্যে চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা এবং চাঁদ তারা লাঞ্ছিত সবুজ পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতার শপথ পাঠ করল ভারত এবং পাকিস্থান।

তারপর আরও প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেল। আজও একদল চেঁচিয়ে বলছেন—পুরো স্বাধীনতার আস্বাদ আমরা আজও পাইনি।

আজও আমাদের চারিদিকে অশিক্ষা আর অসাম্যের বীজ। আজও নানা রকম ভেদবুদ্ধি আমাদের কুরে-কুরে খাচ্ছে। পরাধীনতার পাঁচশ বছরের যাদু আজও আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি।

কে মুছে দেবে এই গ্লানি? কে ছোঁয়াবে সোনার পরশ! সে শক্তি আছে আমাদের তরুণ আর কিশোরদের মধ্যে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমাদের সমস্ত স্বপ্ন লালিত হচ্ছে। তাদের সামর্থ্যে আর ত্যাগে, তাদের সাধনায় আর সিদ্ধিতে সোনার দেশ গড়ে উঠুক। জয়হিন্দ্॥

———

● বিশেষ সংযোজন ●

সর্বভারতীয় শহীদ ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্ণানুক্রমিক ব্যক্তি-পরিচয়

অজয়কুমার ঘোষ॥ ১৯০৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী জন্ম হয়। বাবার নাম শচীন্দ্রমোহন ঘোষ। তিনি ছিলেন ডাক্তার। থাকতেন কানপুরে। সেই সূত্রে কানপুরেই অজয়কুমারের পড়াশুনা শুরু হয়। ছাত্র অবস্থা থেকে পড়াশুনা এবং খেলাধুলায় তার গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মুখে ভকৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে বিপ্লবী কর্মে যুক্ত হন। ১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। তখন তিনি রসায়নে অনার্স সহ বি. এস. সি. পাশ করে এম. এস. সি পড়ছিলেন। ভকৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম হলেও অজয় ঘোষ প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান। এসময়ে ফিরে এসে তিনি কানপুর মজদুর সভার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়েই তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিয়মিত পড়তে থাকেন। ১৯৩১ সালে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। বছর দুয়েক পর মুক্তি পেয়ে তিনি পুরোপুরি কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। পরের বছর তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ক্রমে পলিট-ব্যুরো এবং পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশানাল ফ্রন্ট' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আবার তাঁকে বন্দী করা হয়। এ সময়ে তিনি যক্ষা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন নেহেরু প্রভৃতির আবেদনে তাঁকে মুক্ত করা হয়। তিনি রাঁচী বসবাস করতে থাকেন। সাঁওতালদের নানা সমস্যা এসময়ে তাঁকে বিচলিত করে। তিনি এ বিষয়ে Notes on Chotonagpur and its people নামে একটি বিশদ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তা Marxist Miscell-any Vol-6-এ প্রকাশিত হয়।

দেশ স্বাধীন হলে অখণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পদ লাভ করেন ১৯৫১ সালে। প্রায় বারবছর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে প্রায় ৮১ টি কমিউনিস্ট দল যোগ দেয়। তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে মূলনীতি নির্ধারণে তাঁর প্রবন্ধ গুরুত্ব পায়। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'Bhagat Singh and his Comrades থেকে এ গ্রন্থে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। ১৯৬২ সালের ১৩ই জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

অনাথবন্ধু পাঁজা ॥ মেদিনীপুরের অন্তর্গত জলবিন্দু নামক গ্রামে ১৯১১ সালের কোন সময়ে অনাথবন্ধুর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ। স্কুলে পড়তে পড়তেই বিপ্লবীদলে যোগ দেন। অনাথের দৃঢ়তাও বৈপ্লবিক আদর্শে তুষ্ট হয়ে দলনেতা তাঁকে কলকাতায় পাঠান পিস্তল ছোঁড়া শিখতে। শিক্ষান্তে ফিরে আসেন মেদিনীপুরে। এসময়ে ইংরেজসরকার মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড চূর্ণ করতে নিদারুণ অত্যাচার চালাচ্ছিল। তার প্রতিশোধ নিতে বিপ্লবী সমিতিও একের পর এক ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। পেডি এবং ডগলাসের পর তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন বার্জ। তাকে রক্ষার সব রকম আয়োজনই সরকার করেছিলেন। একমাত্র অবকাশ ছিল খেলার মাঠ। বার্জ নিজে খেলতে ভালবাসতেন। সেখানেই আক্রমণ করা হ'ল তাকে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর গাড়ি থেকে নেমে খেলোয়াড় বেশে বার্জ মাঠে ঢুকতেই অনাথবন্ধু এবং মৃগেন্দ্র দত্ত গুলি করলেন বার্জকে। বার্জ সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন। তার রক্ষীরাও গুলি করল অনাথ ও মৃগেনকে। অনাথ সেই মাঠেই মারা যান।

অবোধ বিহারী ॥ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে দিল্লীতে জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীগোবিন্দলাল। তিনি শিক্ষক ছিলেন। বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে অবোধ বিহারী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাসবিহারী বসুর সহযোগী ছিলেন তিনি। হার্ডিঞ্জের মিছিলে বোমা ফেলবার ষড়যন্ত্রে তিনি অংশীদার ছিলেন। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার উদ্বোধন উৎসবে চাঁদনীচকে বোমা ছোড়া হয় ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। তাঁকে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ হত্যা এবং ১৯১৩ সালের ১৭ মে লাহোর লরেন্স গার্ডেন হত্যা চেষ্টার ষড়যন্ত্রের অংশীদার রূপে মামলা দায়ের করা হয়। ঐ একই মামলার আসামী ছিলেন আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ এবং বসন্ত বিশ্বাস। সকলেরই ফাঁকির হুকুম হয়। দিল্লী জেলা জেলে ১৯১৫ সালের ৮ই মে তারিখে তাঁর ফাঁসি হয়।

অমৃতলাল হাজরা ॥ ঢাকার শ্রীনগরে জন্ম (১৮৮৬ সাল)। পিতার নাম কালীচরণ। ১৯০৫ সালে অনুশীলন দলে যোগ দেন। পুলিন দাসের কাছে লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখেন। দলের ডাক নাম ছিল শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক এক কামারশালা খোলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে অকেজো পিস্তল

সারান হ'ত। ব্রাহ্মা গ্রামের ডাকাতিতে তিনি নেতা ছিলেন। কিন্তু এ সব কোন কাজে পুলিশ তার ধরা ছোঁয়া পায়নি।

অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হলে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর চেষ্টায় মতিলাল রায়ের দলের সঙ্গে তাদের যোগ হয়। এ সময়ে রাসবিহারী. শচীন সান্যাল ইত্যাদির সঙ্গেও তাঁর যোগ হয়। গর্ডন হত্যা ও মৌলবী বাজার বোমার মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার করতে এসে রাজাবাজারে একবাড়িতে তাকে সহ পুলিশ এক বোমার ফ্যাক্টরী আবিষ্কার করে। 'রাজাবাজার বোমার মামলা'য় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

মুক্তির পর তিনি নারায়ণগঞ্জে এক সামান্য ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। দেশ বিভাগের পর এ দেশে আসেন। ১৯৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ॥ চট্টগ্রামের অন্তর্গত বর্মা গ্রামে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে জন্ম হয়। পিতার নাম নন্দকুমার। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি কালে তিনি বিপ্লবীদলের সঙ্গে ধরা পড়েন। বছর দুই পরে ছাড়া পেয়ে তিনি বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবীদল গড়ে তুলতে থাকেন। এ সব কাজকর্ম চালাবার টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁরা ১৯২৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর এক রেল-ডাকাতি করেন। পুলিশ তাদের গোপন ঘাঁটি ঘিরে ফেলে। ওরা অবরোধ ভেদ করে পালাবার পর নাগর-খানা পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আহত হয়ে দু-জনেই বিষ-খান। কিন্তু আশ্চর্যভাবে বেঁচে যান। বিচারে ওরা মুক্তি পান। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত তাঁকে আবার কারারুদ্ধ থাকতে হয়।

এবার মুক্ত হয়ে সকলে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যও প্রস্তুত হন। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল আক্রমণের দিন তাঁর ওপর টেলিফোন টেলিগ্রাফ অফিস বিধ্বস্ত করে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। তিনি তার দল নিয়ে সে কাজ যথাযথ পালন করেন। জলালাবাদের যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। সঙ্গীরা তাকে মৃত বলে ফেলে যায়। তিনি কোনক্রমে পুলিশ-মিলিটারির হাত থেকে বাঁচেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয় কিন্তু পুর্ণবিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান। দেশবিভাগের পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে তৎপর হন। সমবায় আন্দোলনে তাঁর

আগ্রহ ছিল। এ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন এবং পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। প্রথম নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়ে বিধানসভার সদস্য হন। এমন সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। তিনি আত্মগোপন করেন। পরে ধরা পড়ে তাঁকে দীর্ঘ কারাবাস করতে হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অরবিন্দ ঘোষ ॥ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কলকাতায় অরবিন্দের জন্ম হয়। প্রখ্যাত ব্রাহ্মসংস্কারক রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর মাতামহ এবং খ্যাতনামা আই. সি. এস. ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তাঁর বাবা। পুত্রকে সম্পূর্ণ ইংরাজী আদর্শে শিক্ষিত করা ছিল তার লক্ষ্য। তাই বছর চারেক বয়সে তিনি তাঁকে দার্জিলিং সেণ্ট পলস্ স্কুলে পড়তে পাঠান। সাত বছর বয়সে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। বালক ম্যাঞ্চেস্টারে এক শিক্ষকের কাছে কিছুদিন শিখে সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হন এবং লণ্ডনে থাকেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি-এস পরীক্ষা দেন। সামান্য ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে অমনোনীত ঘোষণা করা হয়। তিনি কেম্ব্রিজে বৃত্তি পেয়ে কিংস কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যাসিক্যাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরই বরদার মহারাজা তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বরদায় নিয়ে আসেন। সেখানে রাজা তাকে নানা কাজে পরীক্ষা করে অবশেষে কলেজের উপ-অধ্যক্ষের পদ দান করেন। এ সময়ে বাঙলাদেশে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। অরবিন্দ চলে এলেন বাঙলাদেশে। ঐ সময় ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি তার অধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক মশাই 'বন্দেমাতরম্' নামে দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করলে তিনি তার অন্যতম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। অরবিন্দের প্রবন্ধ পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। তার ওজস্বিনী ভাষা, যুক্তিজাল এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষে প্রবাদে পরিণত হয়। তিনি ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা বলে পরিচিত হন।

এ সময়ে অরবিন্দের আর এক পরিচয় প্রকাশিত হয়। বরোদায় থাকা কালে তিনি মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাই বারীন ঘোষকে পাঠান বাঙালাদেশে বিপ্লবীদের সংগঠনের জন্য। বাঙলাদেশে এসে সে কাজে বিশেষ সুযোগ ঘটে। বিপ্লবীরা সংগঠিত হতে থাকে। মানিকতলায় এবং রাজাবাজারে বোমার ফ্যাক্টরী গঠিত হয়।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য সরকার তাহাকে

গ্রেপ্তার করে। সাক্ষীর অভাবে মামলা টেঁকে নি। এ সময়ে ক্ষুদিরামের বোমা মারার সূত্রে ব্যাপক ধর পাকড়ে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাসের সওয়ালের বলে তিনি বেকসুর খালাস পান। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ইতঃ মধ্যে উঠে গিয়েছিল। তিনি নতুন পত্রিকা বের করেন ইংরাজীতে কর্মযোগিন বাঙলায় ধর্ম। হঠাৎ তিনি সব ছেড়ে ফরাসী চন্দননগরে চলে যান, সেখান থেকে পণ্ডিচেরী। সেখানে নির্জনে ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন মাদাম পল রিশার। পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ সাধনা এবং সমাজ-সেবা চর্চ্চা চলে। এখান থেকে তিনি আর্য নামে একটি পত্রিকা বের করতে থাকেন। বলা হয় তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাঁর মধ্যে The Life Devine, Essays on Gita, Saivtri কারা কাহিনী, ধর্ম ও জাতীয়তা ইত্যাদি নামে গ্রন্থগুলি বিখ্যাত। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

অশ্বিনী কুমার দত্ত ॥ বরিশাল জেলার বাটাজোড়ে তাঁর আদি বাড়ি। বাবা ব্রজমোহন ছিলেন পটুয়াটোলার সাব জজ। সেখানে ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারী তারিখে তাঁর জন্ম হয়। বাবার বদলির চাকরীর জন্য ১৮৭০ সালে রংপুর থেকে প্রবেশিকা, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ ও বি.এল পাশ করেন। বরিশালে ওকালতি করতে গিয়ে বাবার নামে এক স্কুল স্থাপন করে তার শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভাবে বরিশালে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার মধ্যে পিপিলস এসোসিয়েশন, বাখরগঞ্জহিতৈষণী সভা, বালিকা বিদ্যালয় প্রধান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেন। দু বছর পর বাবার নামে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন এবং পঁচিশ বছর সেখানে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। পরের বছর ব্রজমোহন কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

অমরাবতী কংগ্রেসে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির বার্ষিক তামাশা বলে ব্যঙ্গ করেন এবং গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সংগ্রহের প্রস্তাব রাখেন। বয়কট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ বান্ধব সমিতি গঠন করেন। বরিশালে তাঁর নেতৃত্বে প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসে। কিন্তু পুলিশের লাঠি চালনায় এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে

অধিবেশন ব্যর্থ হয়। ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন নরম ও চরম পন্থীদের বিবাদে পণ্ড হলে তিনি মিলন চেষ্টায় সর্বভারতীয় নেতৃত্বে উপনীত হন। কিন্তু মিলন চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯০৮ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯১০ সালে মুক্তির পর প্রথমেই বিদ্যালয় ও কলেজের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন। পৃথক পৃথক ট্রাষ্টির হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেন। ক্রমে আবার কংগ্রেসী আন্দোলনে যুক্ত হন। নানা অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। ১৯২০ সালে তিনি কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগকে সমর্থন করেন এবং ব্রজমোহন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মহাত্মাগান্ধী বরিশালে এসে এই নেতাকে শ্রদ্ধা জানান। ১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষে এবং ১৯১৯ সালের ঝড়ে আর্তত্রাণে তাঁর ভূমিকা বরিশালের মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

অশ্বিনী দত্তের প্রভাবে চারণকবি মুকুন্দ দাসের জন্ম হয়েছিল। বরিশালের কবি হেমেন্দ্রকেও তিনি স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসব তত্ত্ব, লিটিল ব্রাদার্স অফ দি পুওর ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

অকরাম খাঁ, মওলানা মহম্মদ ॥ ১৮৬৮ সালে চব্বিশ পরগণায় হাকিমপুরে জন্ম। পিতার নাম আলহাজ্জ গাজী মওলানা আবদুল বারী। মক্তবে বাল্য-শিক্ষা সেরে কলকাতা এবং পাটনায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। কলেরায় একই সঙ্গে বাপ মাকে হারিয়ে মাতামহের আশ্রয়ে আসেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন তাঁকে প্রথম রাজনৈতিক চেতনায় আবিষ্ট হতে দেখা যায়। এর আগে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁকে অংশ নিতে দেখা যায়। পরের বছরেই তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হন। তখন থেকে তিনি আজীবন মুসলীম লীগের সদস্য ছিলেন। বহু সময়ে তিনি ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি।

তিনি সারা জীবনে নানা পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেছেন। ১৯১০ সালে 'মহম্মদী' পত্রিকায় তাঁর ইংরাজী মুন্সীয়ানা প্রকাশ পায়। পরে তিনি উর্দুতে 'জামানা' এবং বাঙলায় 'সেবক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেবকের মতামতের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় থাকতেন। সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য

তিনি পাকিস্থান সরকারের গৌরব পদক লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা মোস্তাফা চরিত, মোস্তাফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মুসলীম বাঙলার সামাজিক ইতিহাস তহসীরুল কোরআন (৩৫ খণ্ড) বিখ্যাত।

প্রায় একশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজাদ, চন্দ্রশেখর ॥ মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলার ভাওরা গ্রামে ২৩ জুলাই, ১৯০৬ সালে চন্দ্রশেখরের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম সীতারাম তেওয়ারী। চন্দ্রশেখর প্রথমে বেনারস সংস্কৃত কলেজের এবং পরে কাশী বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন এবং পনের ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। কোর্টে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নিজের নাম বলেন আজাদ, বাবার নাম স্বরাজ এবং ঠিকানা জেলখানা। সেই থেকে তিনি আজাদ নামেই পরিচিত হন। মুক্তি পেয়ে তিনি সর্বত্র তরুণ বীরের সম্মান পান। ১৯২২ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দেন। কাকোরী মেল ডাকাতির মত কয়েকটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁকে পুলিশ ফেরারী ঘোষণা করে কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকেন। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এই অবস্থাতেই তিনি রেভুলিউশনারী পার্টির অধিবেশনে দিল্লীতে আসেন ১৯২৮ এর ৮ সেপ্টেম্বর। সেখানে হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের সামরিক বিভাগের কমেণ্ডার নিযুক্ত করা হয় আজাদকে। লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি সর্দার ভকৎ সিং এবং রাজগুরুর সঙ্গে লাহোরের পুলিশ সুপারিটেণ্ড জে. এ. স্কটকে গুলি করে হত্যা করেন। কিন্তু ভুল করে যিনি প্রাণ দেন তিনি সহ পুলিশ সুপার মিঃ স্যাণ্ডার্স। তাঁরা কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেন এবং ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল সেই বোমা ফাটে।

এর পরেও আজাদ প্রায় দুবছর আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু কোন সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে। আজাদ একা যুদ্ধ করতে থাকেন। কয়েকজন পুলিশ মারা যায়। ব্রিটিশ পুলিশ সুপার নট-বাওয়ার এবং ভারতীয় পুলিশ অফিসার বিশ্বেশ্বর সিং আহত হন। আজাদকেও প্রাণ দিতে হয়। জীবনে মরণে আজাদ আজাদই থেকে যান।

আনন্দমোহন বসু ॥ ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধিতে ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম পদ্মলোচন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম স্থান পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসেন এবং এম. এ. গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে `০ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম 'ভারতীয় র‍্যাঙলার হন। সেখান থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

এম. এ. পরীক্ষার আগেই জগদীশ চন্দ্রের বোন স্বর্ণপ্রভাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৬৯ সালে তিনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন কেশব সেনের কাছে। কিন্তু কেশব সেনের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ মে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মোট তের বছর এই সমাজের সভাপতি ছিলেন। সমাজভবন নির্মাণের একটি বড় অংশ তিনি বহন করেন।

এ সময় থেকে তিনি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় আগ্রহী হন। তাঁর প্রচেষ্টায় সিটি কলেজ এবং সিটি স্কুল গড়ে ওঠে। ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশবোধ জাগরণের অভিপ্রায়ে তিনি স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন এবং নীতি শিক্ষার জন্য 'ছাত্র সমাজ' নামে আর এক প্রতিষ্ঠান গড়েন। প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলায় তাঁর উদ্যোগ ছিল। তিনি প্রায় কুড়ি বছর এর সম্পাদক বা সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। এই শ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অতি আবেগে তিনি শায়িত অবস্থাতেই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা দিবসে ১৬ই অক্টোবর জনসভায় সভাপতি হিসাবে ভাষণ দেন এবং ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন যে প্রতিজ্ঞাপত্র রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে শোনান, সেটিও তাঁর রচনা।

কংগ্রেসের জন্মের সূচনা থেকে আনন্দমোহন ছিলেন নেতৃস্থানীয়। মাদ্রাজে কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি ১৮৮২ র শিক্ষা কমিশনের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সদস্য। ১৯০৬ সালের ২০ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

(ডাঃ) আনসারী, মুখতার আহম্মদ ॥ ১৮৮০ সালে গাজীপুরে যুসুফপুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ হাকিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হন। ইতঃপূর্বে আর কোন ভারতীয়

এ সুযোগ পায়নি। ১৯১২ সালে তিনি বলকান যুদ্ধে রেডক্রসের হয়ে কাজ করবার জন্য তুরস্কে যান।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ডাঃ আনসারী রাজনীতিতে যোগ দেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর ভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাই প্রধান হয়ে ওঠে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বদল সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালে স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবনে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালের ১০ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবদুল গফ্ফর খান॥ আবদুল গফ্ফর খান সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে এক যোদ্ধা মানসিকতার দল গঠন করেন। তার নাম ছিল 'আল্লার দল।' তখন এদের পোষাক ছিল সাদা। পরে তাদের পোষাক হয় লাল। এ জন্য এ বাহিনীকে পরে 'লাল-সার্টে'র দল বলা হত। গান্ধীজির আবির্ভাবের পর গফ্ফর খান অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী হন। ১৯৩১ সালের অসহযোগ আন্দোলন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁর প্রভাব প্রবল হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তাঁর প্রভাবেই কংগ্রেস ঐ অঞ্চলে মন্ত্রীসভা গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেব।

দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানেই বাস করতেন। তিনি সেখানে পাকতুনিস্থানের আন্দোলন শুরু করেন। এ জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল বন্দী দশায় কাটাতে হয়। মুক্তির পর তিনি আফগানিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আবদুল হালিম গজনভী, স্যার॥ ময়মন সিংহের অন্তর্গত দেলদুয়ার-এর জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে। প্রথমে কংগ্রেসের সমর্থক হলেও ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে সরে আসেন। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক মত নিয়ে তার দাদা করিম গজনীর মত বিরোধ ছিল। এ নিয়ে ইংরেজরা তাকে ভ্রান্ত গজনভী (Wrong-Ghaznavi) নাম দেয়।

বিদেশের সঙ্গে তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল। শোনা যায় একবার কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচান। ১৯২৬ সাল থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার প্রায় পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে এবং জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটিতে

তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার অনড় সমর্থক। আজীবন অবিবাহিত এই ব্যক্তি ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলায় মারা যান।

আবুল কালাম আজাদ ॥ ১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর মক্কায় জন্ম। পিতা শেখ মহম্মদ খয়েরুদ্দিন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন এবং শিষ্যদের অনুরোধে সেখানে থেকে যান। পিতা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিরোধী ছিলেন। অসাধারণ মেধাবী পুত্র মাত্র ষোল বছরে ফারসী, আরবী ভাষায় দর্শন, জ্যামিতি ও গণিত, মুসলান তত্ত্ব কথা, ধর্মশাস্ত্র সব পাঠ শেষ করেন। তখনই নতুন উর্দু গদ্য রীতির প্রবর্তক হিসাবে আবুল কালামের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময়েই তিনি পিতার চিন্তার পরিবর্তে সৈয়দ আহম্মদের চিন্তায় বিশ্বাসী হন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নিজেই ইংরেজী শিখলেন। কিন্তু সৈয়দ ইংরেজের সহায়তায় মুসলমান সমাজের পুনরুজ্জীবনের যে তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন আজাদ তাকেও স্বীকার করতে পারলেন না। স্বাধীনতা ভিন্ন ব্যক্তি সত্তার উন্মোচন অসম্ভব—এই চিন্তা তাঁর আরও পুষ্ট হল পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ভ্রমনের ফলে।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থেকেই আবুল কালাম রাজনীতিতে যুক্ত। গুপ্ত সমিতিগুলিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'আল্‌হিলাল' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের মুসলমান সমাজে আলোড়ন ওঠে। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে নিবদ্ধ জীবনও নয় ভক্তিমূলক রাজনীতিও নয়, সক্রিয় যুক্তি বাদী ও বিদ্রোহমূলক জীবনবোধের প্রচারক হ'ল আল-হিলাল। হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও স্বাধীনতা ছিল তার বীজ মন্ত্র।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আজাদকে অন্তরীণ বন্দী হিসাবে রাঁচীতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি তরমাসুল কোরান রচনা শুরু করেন। কোরানের শিক্ষার আলোতে নবধর্মের সত্যতা স্বীকার মূলক অনুবাদ ও ভাষ্য হিসাবে গ্রন্থটি বিশ্বে সমাদৃত হয়।

মুক্তি লাভের পর তিনি গান্ধীজির মতানুবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন পর্যন্ত এত অল্প বয়সে আর কেউ কংগ্রে সভাপতি হন নি। পরে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ তিনি ঐ পদে ছিলেন।

মুসলীম লীগের দেশ বিভাগের দাবীর তীব্র বিরোধিতা করেন আজাদ। এজন্য গোঁড়া মুসলমান সমাজে তিনি ধিক্কৃত হন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৫৮ সালের ২২ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর চাঁদ ॥ ১৮৬৯ সালে দিল্লীতে জন্ম। পিতার নাম হুকুমচাঁদ বৈশ্য। তিনি একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সামাজিক সংস্কার দিয়ে তাঁর পরিচিতি শুরু হয়। ঐ অঞ্চলের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমীর চাঁদ জনমত গড়তে থাকেন। স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের এই উদ্যোগী কর্মীকে বিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়াল বৈপ্লবিক কাজকর্মে নিয়ে আসেন এবং অচিরেই তিনি গদর পার্টির নেতায় পরিণত হন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি কাজকর্ম করতে থাকেন এবং সমগ্র উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কর্ম ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার দিন হার্ডিঞ্জ যে মিছিল করে ছিলেন , তাতে বোমা মারার ঘটনাকে পুলিশ দিল্লী ষড়যন্ত্র নামে যে মামলা রুজু করে, তারই সূত্রে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমীর চাঁদকে বন্দী করা হয়। ১৯১৪ সালের ৫ অক্টোবর তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। পরের বছর ৮ মে তারিখে দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

আম্বেদকর. ডঃ ভীমরাও রামজি ॥ আম্বেদকর হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রথম অবিসংবাদী নেতা। তিনি আমেরিকা থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। তিনি কোন সরকারী অফিসে সাধারণ কেরানীর চাকরী দিয়ে জীবন শুরু করেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ বর্ণ হিন্দু কেরানীদের আক্রমণে তাঁকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়। এবার তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের সংগঠিত করে ভারতীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে তিনি অনুন্নত ও অস্পৃশ্য বলে অবহেলিত সম্প্রদায়ের জন্য জীবনপাত করেন। ১৯৩০-৩২ সালে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি যোগ দেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবী করেন। স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধানে খসড়া রচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তিনি তার সভাপতি ছিলেন। সংবিধান রচনায় তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলীবর্দ্দী খাঁ ॥ ১৬৭৬-এ জন্ম। পিতার নাম মীর্জা মহম্মদ। আলীবর্দ্দীর প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ আলী। দিল্লী থেকে বাঙলায় এসে মুরশিদ কুলী খাঁর কাছে কর্ম চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। ওড়িষ্যার নায়েব সুজাউদ্দিন খাঁ তাকে আশ্রয় দেন। ১৭২৭ সালে মুরশিদকুলীর মৃত্যুতে তার এবং তার দাদা হাজী আহম্মদের বুদ্ধিতে সুজাউদ্দিন বাঙলার নবাব হন। সুজাউদ্দিন তাঁকে আলীবর্দ্দী উপাধি দেন এবং পরে বিহারের নায়েব সুবা পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ সালে

সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। সিংহাসনে বসেন তার পুত্র সরফরাজ খাঁ। দুই আলীভাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে সরফরাজকে হত্যা করে। তখন মহম্মদ আলী 'সুজা-উল-মুলুক হেসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্ বাহাদুর' নাম গ্রহণ করে বাঙলা-বিহার উড়িষ্যার মসনদ গ্রহণ করেন।

আলীবর্দ্দীর রাজত্বকালে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ বিপর্যস্ত হয়। আলীবর্দ্দী কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে বর্গী হাঙ্গামা রোধ করতে চান। কিন্তু তাতে বর্গীরা দমিত হয় না। তখন তিনি বাধ্য হয়ে অর্থের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁর আমলে ইংরেজেরা বিশেষ শাসিত ছিল। আলীবার্দ্দী মুসলমান হয়েও রাজকার্য্যে যোগ্য হিন্দুদেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পুর্বেই অপুত্রক আলীবর্দ্দী তার কন্যার পুত্র সিরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আসফকাউল্লা খান ॥ উত্তরপ্রদেশের শাজাহান পুরে ১৯০০ সালের অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সফিকুল্লাহ। অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মাতৃদেবীর সন্তান নামে এক বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১৯২৫ সালের আগষ্ট কাকোরী রেল ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এরপর আরও বহু বৈপ্লবিক অভিযানে যোগ দেন। বিচারে তাঁর মৃত্যু দণ্ডাদেশ হয়। ফৈজাবাদ জেলে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়।

অ্যাণ্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র, দীনবন্ধু ॥ ইংলণ্ডের নিউক্যাসেল-অন্-টাইনে ১৮৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম জন এডুইন। চার্লস কেম্ব্রিজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি ভারতে আসেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের সহায়তায় ভারত চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে তিনি মিশনারীদের ভেদবুদ্ধি অসাম্য চিন্তার নিন্দা করেন। ফলে স্বদেশে তিনি নিন্দিত হন। ভারতীয়েরা তাঁকে বরণ করেন। এ্যাণ্ড্রুজ গান্ধীজির সঙ্গে আফ্রিকায় সত্যাগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন আবার ইংলণ্ডে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পাঠের কাল থেকে তিনি রবীন্দ্র অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

এ সময়ে তাঁকে সর্বদা উৎপীড়িত মানুষের পাশে দেখা গেছে। তিনি ফিজি-দ্বীপে ভারতীয়দের উপর থেকে 'ইণ্ডেন্টার' প্রথার রদ আন্দোলন করেন। রাজপুতনায় বেগার প্রথা উচ্ছেদে তিনি ব্রতী হন। ১৯২১ এর আসামের চা বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ

'অপ্রেসন অফ্ দি পুওর' প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

তিনি বহুবার বিদেশ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। কখনও বা রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি কয়েকবার ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

.৯৪০ সালের ৫ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যানি বেসান্ত॥ ১৮৪৭ সালের ১ অক্টোবর লণ্ডনে জন্ম হয়। বাবার নাম উইলিয়াম পেজ উড। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক বেসান্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বছর ছয়েকের মধ্যে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। অ্যানি বেসান্ত চার্লস ব্রাডলের সহযোগিতায় অ্যাজাক্স ছদ্মনামে পত্রিকার খৃষ্টধর্মের প্রতি অবিশ্বাস প্রচার করতে থাকেন। অ্যানি বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লে চার্লস তার সমর্থন তুলে নেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে থিওসফি আন্দোলনে যোগ দিয়ে সারা পৃথিবী পর্যটন উপলক্ষ্যে ভারতে আসেন। কাশী সেণ্টাল হিন্দু কলেজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৬)।

১৯১৪ সাল থেকে তিনি মাদ্রাজে নিউ ইণ্ডিয়া নামে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এ পত্রিকায় ভারতের স্বায়ত্ব শাসন (হোমরুল) বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় তার দুহাজার টাকা জরিমানা হয়। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশ সরকার নিজ নিজ অঞ্চলে নিউ ইণ্ডিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কাল থেকে শ্রীমতী বেসান্ত ভারতীয় স্বায়ত্ব শাসনের একনিষ্ঠ প্রচারক। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, পুস্তিকায় তিনি যে ব্যাপক প্রচার শুরু করেন তাতে ক্ষিপ্ত সরকার তাকে কয়েকজন সঙ্গী সহ ১৯১৭ সালে অন্তরীণ করে। এতে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়। সরকার বাধ্য হয়ে তাকে মুক্তি দেন।

এই বন্দীত্বের ঠিক আগে তিনি কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী পদে বৃত হন। যেখানে তাঁর ভাষণে সরকারের দমন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বেসান্ত গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের সমর্থক ছিলেন না। এজন্যই তিনি কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করেন। এবং ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশনে যোগ দেন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রকাশিত হলে তিনি 'কমনওয়েলথ অব

ইণ্ডিয়া বিল' নামে এক আইনের খসড়া পেশ করেন। তাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব ছিল। ব্রিটিশ শ্রমিকদল বিলটি সমর্থন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলটি পরিত্যক্ত হয়। বেসান্ত এরপর রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৯৩৩ সালে বেসান্তের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত ॥ কাঁচড়াপাড়ার কাছে শিয়ালডাঙ্গা নীলকুঠিতে তাঁর জন্ম হয়। বাবা হরিনারায়ণ গুপ্ত। ছেলেবেলা থেকে কবিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখতে সিদ্ধহস্ত। ১৮৩১ সালে ২৮ জানুয়ারী থেকে তিনি সংবাদ প্রভাকর নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। পরে এ পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তিনি প্রধানতঃ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমর্থক হলেও শেষদিকে সামাজিক আন্দোলনে নব্যদের সাথী হন। তাঁর স্বদেশবোধ সেকালে বহুজনের আগ্রহের বস্তু ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর মত সাহিত্যিক ও নাট্যকার তাঁকে গুরুর মর্যাদা দিতেন। ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অস্বচ্ছল পরিবার। গ্রাম্য শিক্ষা শেষ করে ন'বছর বয়সে কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৩৯ সালে হিন্দু-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পান।

এরপর শুরু হয় তাঁর কর্ম জীবন। চাকরী জীবনে তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ ছিল নিয়ত। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক উচ্চ আদর্শের জন্য সরকার তাকে সম্মান করতেন। বহুক্ষেত্রে তাঁর মত শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। শিক্ষা সংস্কারের জন্য তিনি গ্রন্থ রচনা ও নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে প্রধান বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন। বহু বিবাহ ও মদ্যপানের বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযান ছিল। নারী মুক্তি ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি কলকাতায় মেট্রপলিটান স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল পরে কলেজেও প্রবর্দ্ধিত হয়। মধুসূদন লিখেছেন, The genius and wisdom of an ancient sage, the erergy of an English man and the hart of a Bengali Mother. মোট কথা নব জাগ্রত মানবতাবোধ, সামাজিক কল্যাণ, যুক্তিবাদী চিন্তা ও সমুন্নত চরিত্র সংগঠনের মহৎ প্রেরণা সৃষ্টি করেন বিদ্যাসাগর। সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম, করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। প্রবল স্বাজাত্যবোধে সর্বপ্রকার

পরাণুকুমণকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে সাঁওতালদের মধ্যে কার্মাটারে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়॥

উধম সিং॥ পাঞ্জাবের পাতিয়ালা জেলায় ১৮৯৮ সালে ২৬ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। অমৃতসরে বাস করতেন। বাবার নাম থেহাল সিং মায়ের নাম হরনাম কাউর। অল্প বয়সে বাপ-মা হারিয়ে উধম এক অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হন। অমৃতসরে তার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তার কোমল মনে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে। সেই বয়সেই উধম প্রতিজ্ঞা করে স্বদেশবাসীর প্রতি ও-ডায়ারের এই নৃশংস কাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে সে।

এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে ইংলণ্ডে যায় এবং ১৯৩৩ সালে লণ্ডন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়। ছ ঘড়ার এক রিভলবার সংগ্রহ করে উধম। ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ সে এক সভায় মাইকেল ও ডায়ারকে হত্যা করে। বিচারে তাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। লণ্ডনে ১২ জুন ১৯৪০ তাঁর ফাঁসি হয়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাবলিউ. সি. ব্যানার্জি)। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর খিদিরপুরে জন্ম। পিতামহ পিতাম্বর এবং পিতা গিরিশচন্দ্র এটর্নী অফিসের কেরানী করে দেন কিন্তু আইনে তার অনুরাগ দেখা দেয়। ১৯৬৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং বার বছর পরে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। এবং ব্যবসা শুরু করেন।

তাঁর লণ্ডন বাস কালে সেখানে ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয় তিনি হন তার প্রথম সম্পাদক। স্বদেশে তাঁর আইন বোধের খ্যাতি প্রচারিত। সরকার তাঁকে চাব বার স্ট্যানডিং কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৭১ সালে 'হিন্দু উইলস্ অ্যাক্ট ১৮৭০' প্রকাশিত ছিলেন। অষ্টম অধিবেশনেও তিনি ছিলেন সভাপতি।

তাঁর স্ত্রী ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তিনি ছিলেন হিন্দু। স্বজাতিত্ববোধ তাঁর প্রবল ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবল সাহেবীভাবাপন্ন। ১৯০২ সালে তিনি লণ্ডনের ক্রয়ডেনে বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস এবং প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসা শুরু করেন। সেখানেই খিদিরপুর হাউস, নামক সেই বাড়িতে তাঁর ১৯০৬ সালের ২১শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

উল্লাসকর দত্ত॥ ত্রিপুরার কালীকচ্ছে ১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল তার জন্ম হয়। বাবা দ্বিজদাস ব্রাহ্ম এবং বিলেত ফেরৎ ছিলেন। ১৯০৩ সালে

এণ্ট্রান্স পাশ করে উল্লাসকর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তখনও তিনি বাবার মতই সাহেবীয়ানায় অভ্যস্থ। এ সময়ে কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেল এর এক অপমানজনক উক্তির প্রতিবাদে স্বদেশী পোষাক পরা শুরু করেন।

উল্লাসকর খুব আমোদ প্রিয় ছিলেন। ভাল গান গাইতে পারতেন।- করতে পারতেন ক্যারিকেচার। অথচ তখন থেকেই তলায় তলায় বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর যোগ। গোপনে বোমা তৈরী করেন উল্লাস। কিন্তু অসাবধানতায় ছোট ভাই-এর হাতে পড়ে বোমা। সে বাগানে ছুঁড়ে মারে। সশব্দে ফাটে বোমা। উল্লাসকর বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন। ১৯০৮ সালের ২ মে তারিখে মুরারি-পুকুরের বাগানে অনেকের সঙ্গে ধরা পড়েন। ১৯০৯ সালে বোমার মামলায় তাঁর আর বারীন ঘোষের ফাঁসির হুকুম হয়। শুনে তিনি 'সার্থক জনক আমার' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে থাকেন। আপীলে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

১৯২০ সালে তিনি দণ্ডভোগ করে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু আর প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি। ১৯৪৮ সালে ৬৩ বছর বয়সে বিপিন পাল মশাই এর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি কোনদিনই অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করতেন না। ১৯৬৫ সালের ১৭ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

কানাইলাল দত্ত ॥ ১৮৮৮ সালের ৩১ আগস্ট চন্দননগরে জন্ম হয়। বাবার নাম চুণিলাল। শৈশবে বোম্বাইতে পরে চন্দননগরে তার শিক্ষা হয়েছে। চন্দননগরে যে স্কুলে তিনি পড়তেন, সেই ডুপ্লে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান নাম কানাইলাল বিদ্যালয় রাখা হয়েছে। পরে তিনি হুগলী মহসীন কলেজ থেকে উচ্চ-শিক্ষালাভ করেন।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিলিতি বস্ত্র বর্জনের ব্যাপারে কানাইলালের মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা যায় তাতে বিপ্লব গুরু চারু রায় আকৃষ্ট হন এবং তাকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁর কাছেই তিনি অস্ত্র শিক্ষা করেন।

১৯০৮ সালের ২রা মে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিচারের সময় কানাইলাল সব দায় তাঁর বলে বিবৃতি দেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। তিনি আপীল করেননি। ১৯০৮ সালের ১৯ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়। সেদিন কলকাতায় অরন্ধন পালিত হয়। তার মৃতদেহ নিয়ে বিশাল শোকস্তব্ধ মিছিল হয়।

কানাইলাল ভট্টাচার্য ॥ চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুরে ১৯০৯ সালের কোনসময়ে তাঁর জন্ম। পিতার নাম নগেন্দ্রনাথ। দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ দেন যে বিচারক, গার্লিককে তিনি ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই তিনি গুলি করে হত্যা করেন। পুলিশের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর পকেটের কাগজপত্র থেকে মনে করা হয় যে তিনি বিমল গুপ্ত। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডী হত্যার ব্যাপারে পুলিশ বিমল গুপ্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পুলিশের ধারণা হয় সেই বিমল অবশেষে নিহত হ'ল। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সহচর বিপ্লবীকে বাঁচবার সুযোগ করে দেবার এ দৃষ্টান্ত বিরল।

দীর্ঘকাল পুলিশ এই ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা চালিত হয়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ॥ ১৮৬১ সালে ৯ জুন কলকাতায় কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত শিক্ষার শেষে কাব্যবিশারদ উপাধি পান। সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর জীবিকা। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তিনি গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করেন (১৮৭৮)। নানা সময়ে কবিতা লেখার জন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পেনেল প্রসঙ্গ (১৯০১) ও 'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৯০৬) তাঁর জলন্ত দেশপ্রেমের পরিচায়ক। তিনি পুলিশী নির্দেশ উপেক্ষা করে নানা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর বহু গান স্বদেশী আমলে জনপ্রিয় ছিল। ১৯০৭ সালের ৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশিম আলী খাঁ, (নবাব) মীর ॥ মীর কাশিম নামে খ্যাত বাঙলার নবাব। তিনি মীর জাফরের জামাতা। ১৭৬০ সালে ইংরেজদের সঙ্গে শ্বশুরকে সরিয়ে নবাব হন। নবাব হয়েই তিনি আয় বাড়াবার এবং ব্যয় কমাবার নানা ব্যবস্থা করেন। ইংরেজদের তাঁবেদারী করবার আশঙ্কা তাঁর ছিল না। এজন্য তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান। দিল্লীর বাদশাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা কর দিয়ে নিজের নামে নবাবী পরোয়ানা আনেন। বাদশাহ তাঁকে 'আলীশাহ নাসীর-উল-মুলুক এমতাজদ্দৌলা কাশেম আলী খাঁ নশরৎ জঙ্গ' উপাধি দান করেন।

এ সময়ে বাণিজ্য কর নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। ইংরেজদের কাছ থেকে কর না পেয়ে তিনি গোটা দেশ থেকে বাণিজ্য কর তুলে দেন। ফলে ক্রুদ্ধ ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করে তাঁর

নামে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ব্যক্তিগত শক্তিতে ইংরেজদের পরাজিত করতে না পেরে নবাব পালান। অযোধ্যার নবাব এবং মোগল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৩ সালে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হন। তারপর তাঁর আর হদিশ পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলেন জুম্মা মসজিদের সামনে একদিন যে এক ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তা-ই হতভাগ্য নবাবের।

কিচলু, ডঃ সৈফুদ্দিন ॥ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও আইনে উপাধি পান। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি পান।

দেশে ফিরেই তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি পাঞ্জাবের জনপ্রিয়তম নেতা। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে সভায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে সে সভায় সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল তাঁর। সভাস্থলে যাবার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্যোক্তারা অন্য কাউকে সভাপতির পদে বরণ না করে প্রিয় নেতার ছবি বরণ করে সভা শুরু করে।

১৯২১ সালের অসযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন ডাঃ কিচলু। ১৯২৯ সালে জওহরলালের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবও তিনি সমর্থন করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি একই সঙ্গে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। তিনি দীর্ঘকাল পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন।

১৯৫১ সালে ভারতে বিশ্বশান্তি আন্দোলন শুরু হলে তিনি শান্তি সংসদের সভাপতি হন। তিনি বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েৎ রাশিয়া তাঁকে স্তালিন শান্তিপুরস্কার (এখন নাম লেনিন পুরস্কার) দিয়ে সম্মানিত করেন। ডাঃ কিচলু সমস্ত অর্থ ভারতীয় শান্তি সংসদে দান করেন। ১৯৬৩ সালের ৯ অক্টোবর নয়াদিল্লীর বাসভবনে তার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র ॥ ময়মনসিংহ জেলার বাঘিল গ্রামে ১৮৫২ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা গুরুবরণ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নিজ গ্রামে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। কৃষ্ণকুমার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন রাজনারায়ণ বসুর এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এদিক থেকে তিনি

শ্রীঅরবিন্দের মেশোমশাই। তিনি সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি 'ভারত সভা'র যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। সিভিল-সার্ভিস রুলের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে তিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সারা দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেন। শ্রমিক আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। আসামে চা-মালিকদের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে ইমিগ্রেশন আইনের কিছু সংশোধন হয়। নীল বিদ্রোহেও তার সমর্থন ছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন কিন্তু গান্ধীজির অহিংসা নীতিকে সমর্থন করতেন না। নারীর আত্মরক্ষা ও নারী প্রগতি তাঁর আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল। নারীরক্ষা সমিতি নামে তিনি একটি সমিতিও গড়েন। ১৯৩৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণবর্মা শ্যামজী : ১৮৫৭ সালে কচ্ছ রাজ্যের মান্দভি শহরে ভাঁসলি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে তাঁর সঙ্গে স্বামী দয়ানন্দ ও অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্ এর পরিচয় হয়। দয়ানন্দের প্রভাবে আর্য-সমাজ ভুক্ত হন আর অধ্যাপক উইলিয়ামের নিমন্ত্রণে অক্সফোর্ডে গিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এদেশে ফিরে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানি পদে কাজ করেন। ১৮৯৭ সালে সপরিবারে বিলেতে যান। সেখানে লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জন্মাবার জন্য তিনি লণ্ডনে এক ছাত্রাবাস খোলেন। নাম দেন ইণ্ডিয়া হাউস। তিনি হার্বাস্পলারের নামে কয়েকটি বৃত্তি দেন। বৃত্তির সর্ত হল, যে এ বৃত্তি গ্রহণ করবে, সে পরে কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৬ সালে বিনায়ক সাভারকার তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাদের প্রচেষ্টায় 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক সময়ে তিমি মদনলাল ধিংড়া, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু ও কানাইলালের নামে স্মৃতি বৃত্তি দান করেন। কৃষ্ণবর্মকে তাঁর মতামতের জন্য ইংলণ্ড থেকে প্যারিস, সেখান থেকে জেনেভায় চলে যান। ১৯৩০ সালে জেনেভায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কেশব সেন ॥ ১৮৩৮ সালের ১৯নভেম্বর কলকাতা কলুটোলার বাস ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। আদিনিবাস নৈহাটির নিকটবর্তী গরিফা। পিতার নাম প্যারীমোহন। তিনি ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন। পরের বছর ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হন। বছর দেড়েক এক ব্যাঙ্কে চাকরী করে চাকরী ত্যাগ করে সর্বান্তকরণে ধর্ম কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

উনিশ বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদ পান এবং ব্রাহ্ম বিদ্যালয় গঠন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, নীতি শিক্ষা ইত্যাদি নানা সামাজিক কাজে ব্রাহ্মসমাজকে সক্রিয় করে তোলেন। ১৮৬১ থেকে তিনি কলকাতার বাইরে ধর্ম-প্রচারে নামেন। পয়লা আগস্ট থেকে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামে এক পত্রিকা প্রচাশ করতে থাকেন। তিনি ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত ভারত পরিভ্রমণ করে এক সর্ব ভারতীয় ধর্মীয় মৈত্রী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এ জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কেশব সেন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন।

একেশ্বরেবাদীদের আমন্ত্রণে ১৮৭০ সালে কেশব সেন বিলেত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি জনসভায় ভারতীয়দের সমস্যা ও ইংরেজ শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি-গুলির সমালোচনা করেন। বিভিন্ন গীর্জায় খ্রীষ্টের মতাদর্শের নব ব্যাখ্যা এবং উহার ধর্ম সম্মেলনের উপদেশ দেন। ভিক্টোরিয়ার আহ্বানে তাঁর সামনে উপস্থিত হন কিন্তু স্বদেশীয় পোষাকে গ্রহণ করেন স্বদেশীয় আহার। ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকা থেকেও তাঁকে অমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু কেশব সেন ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ফিরে আসেন।

এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি ধর্ম সমন্বয় চিন্তার অনুবর্তক। শেষ জীবনে যোগ সাধনার জন্য হিমালয়ে যাত্রা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, He was the first great all-India figure symbolising the unity of Indian calture.

ক্ষুদিরাম বসু ॥ মেদিনীপুরের অন্তর্গত মৌবনী বা হবিবপুরে ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম ত্রৈলক্যনাথ। জ্যেষ্ঠা দিদির ঘরে প্রতিপালিত। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কাজে মনোনিবেশ করেন। মেদিনীপুর কৃষি প্রদর্শনীতে পুস্তক বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বয়স কম বলে মামলা টেকে না। এই বছরেই বন্যাত্রাণে ক্ষুদিরামের সাহায্যের কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। গুপ্ত সমিতির অর্থের প্রয়োজন মেটাতে কয়েকটি ডাকাতিতেও ক্ষুদিরাম সাহায্য করে। অবশেষে মজফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে মিস. ও মিসেস কেনেডিকে হত্যা করে ১লা মে ক্ষুধিরাম ধরা পড়ে। ঐ বছরেই ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

গান্ধী, মোহন দাস করমচাঁদ ॥ ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দর বা সুদামাপুরীতে মোহন চাঁদের জন্ম হয়। পিতা রাজ দরবারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর শিক্ষা শুরু হয় রাজকোটে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই কস্তুরবা নামে এক বালিকার সঙ্গে বিয়ে হয়। আঠারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে ভাবনগর কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়া শেষ করবার আগেই ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিলেতে যান ব্যারিস্টারী পড়তে। ১৮৯১ সালের ১২ জুন তিনি ডিগ্রি নিয়ে স্বদেশে যাত্রা করেন

দেশে ফিরে কিছুদিন বোম্বাইতে আইন ব্যবসার চেষ্টা করে রাজকোটে চলে যান। সেখান থেকে দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানীর মামলা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে আফ্রিকায় রওনা হন। সেখানে মূল মামলা আপোসে মিটে যায়। কিন্তু স্থানীয় ভারতীয় নাগরিকদের উপর সরকার অধিকার সংকোচনের যে নীতি প্রয়োগ করেছিলেন তার প্রতিকার করবার অনুরোধ করে ভারতীয়রা। ফলে গান্ধীজি সেখানে থেকে যান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২আগস্ট নাটালে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা শুধু সরকারী নীতির প্রতিবাদ নয়, নানা সামাজিক দরকারি কার্যেও নেমে পড়ে। স্বল্প সময়ের জন্য একবার দেশে এলেও গান্ধীজিকে দীর্ঘকাল নাটালে থাকতে হয়।

এখানে সম সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি ফীনিক্স সহরের উপকণ্ঠে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপেনিয়ন' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বন্ধুর দেওয়া জমিতে টলস্টয় ফার্ম নামে দ্বিতীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। সরকার নির্যাতন ও আক্রমণ শুরু করে। এই দমন মূলক কার্যের ভিতর থেকেই তাঁর সত্যাগ্রহের নীতির উদ্ভব হয়। প্রবল আক্রমণের সামনে নিজ বীর্যে আঘাত সহ্য করা এবং তিতিক্ষা গ্রহণের দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষের সম্ভ্রম উৎপন্ন করাই সত্যাগ্রহের নীতি। ১৯০৯ সালে 'হিন্দু-স্বরাজ' অর 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল' নামে এক পুস্তিকায় নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। আট বছর সত্যাগ্রহ চলবার পর ভারতীয় নাগরিকগণ তাদের অধিকার ফিরে পায়। একুশ বছর আফ্রিকায় কাটিয়ে গান্ধীজি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী ভারতে ফিরে আসেন।

ফেব্রুয়ারীতেই তিনি আসেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে নানা বিষয়ে মতবিনিময়ের পর ঐ বছরেই আমেদাবাদের কাছে কোচবারে প্রথম

সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তা সবরমতী নদীর তীরে স্থানান্তরিত হয়।

১৯১৬ সালে গান্ধীজি কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম চম্পারণের নীলচাষের কথা শোনেন। তিনি ঐ চাষ বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন এবং জয়ী হন। এই জয় তাকে ভারতের রাজনীতিবিদদের কাছে আগ্রহান্বিত করে তোলে। গান্ধীজি আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলনে এবং খেড়া জেলায় চাষীদের করবন্দ আন্দোলন শুরু করেন এবং আংশিক সাফল্য লাভ করেন।

প্রথম বিশ্বমহযুদ্ধের শেষে একদিকে রাওলাট বিলের মারফৎ ভারতীয়দের দমন চেষ্টা হয় অন্যদিকে সরকারের তুরস্ক নীতির ফলে মুসলমানদের হতাশ করেন। মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজি মুসলমান সমাজকে কাছে টানবার জন্য খেলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং রাওলাট বিলের প্রতিবাদের সঙ্গে একত্রে এক অসহযোগের ডাক দেন। আন্দোলনের সূচনাতেই সরকার পাঞ্জাবে নির্মম অত্যাচার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এই আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তুলতে সহায়তা করেন।

ইতঃমধ্যে গান্ধীজি হোমরুল লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবর থেকে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদনার দায়িত্ব পান। তিনি ঐ সঙ্গে গুজরাটি ও হিন্দীতে নবজীবন নামে দুটি সংস্করণও জুড়ে দেন। এ পত্রিকাগুলি অসহযোগ আন্দোলনের প্রসারে সাহায্য করে।

এ সময়ে ১৯২২ সালে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হন। দু'বছরের জন্য দণ্ডিত হলেও অসুস্থতার জন্য তাকে ১৯২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী মুক্তি দেওয়া।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রধানতঃ খাদির মাধ্যমে গ্রামে গঠনকর্ম বিস্তারের চেষ্টা করেন। নানা সংঘাতের ভেতর দিয়ে ১৯২৯ সালের শেষে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে এবং গান্ধীজির উপর কর্মনীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রমে থেকে পায়ে হেঁটে তিনি যাত্রা করলেন সমুদ্র অভিমুখে। ডাণ্ডিতে লবণ-আইন ভঙ্গের দ্বারা সূচীত হবে সত্যাগ্রহ। মে মাসে ধরসনায় সরকারী নুনের গোলা অহিংস উপায়ে অধিকার করা হবে। গান্ধীজিকে ডাণ্ডি পৌঁছাবার আগেই গ্রেপ্তার করা হল। সারাদেশে আইন অমান্য ছড়িয়ে পড়ল দাবাগ্নির মত।

১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেতার সঙ্গে গান্ধীজিকেও

মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩১ এর ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান। বৈঠক ব্যর্থ হয়। তিনি দেশে ফিরতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতঃমধ্যে সরকার হিন্দুদের ভেদ বাড়াতে উন্নত অনুন্নত পৃথক ভোটাধিকারের প্রস্তাব রাখেন। এতে বিক্ষুব্ধ গান্ধীজি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়ে ১৯৩২-এর ২০ সেপ্টেম্বর অনশন শুরু করবেন ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাব তুলে নেয়।

১৯৩৩ সালে গান্ধীজি কারামুক্ত হন। সহিংস পথে চালিত দেখে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ব্যাপক পরিবর্তিত অভিনব বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রচার করেন। প্রায় সব প্রাদেশিক সরকার তা নীতিগতভাবে মেনে নেয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হ'ল। কংগ্রেস নেতারা সর্ত্তাধীনে ইংরেজদের যুদ্ধকে সাহায্য করতে চাইলেন। সরকার মানলে না। ১৯৪২ সালে শুরু হ'ল ভারত ছাড় আন্দোলন। আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজিসহ সমস্ত নেতাকে বন্দী করা হল। নেতাহীন উত্তেজিত জনগণ রেললাইন উপড়ে, টেলিফোনের তার কেটে, সরকারী অফিস পুড়িয়ে সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

১৯৪৩ সালের ৩ মে গান্ধীজি মুক্তি পেলেন। ১৯৪৫-এ কংগ্রেসের বহু নেতা ছাড়া পেলেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হলে দেশ স্বাধীন হবে একথা ঘোষণা করল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র দেশের দাবীতে অনড়। ১৯৪৩-এ লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতায় ব্যাপক হিন্দু হত্যা করল। নোয়াখালিতে শুরু হল দাঙ্গা। গান্ধীজি ছুটে বেড়ালেন আর্তদের ত্রাণে। এ অবস্থায় কংগ্রেস মেনে নিল দেশবিভাগ।

এ সময়ে ভারত সরকার পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য টাকা সব মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করায় গান্ধীজি শেষবারের মত অনশন করেন। ভারত সরকার বাধ্য হয়ে টাকা মিটিয়ে দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়।

পরের বছর ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় যাবার সময় এক যুবক তাকে গুলি করে। ৫-১৫ মিনিট তার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ ॥ ১৮৭৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় তাঁর জন্ম। এলাহাবাদ ম্যুইর সেণ্ট্রাল কলেজে স্নাতক হন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন উপাধি লাভ করেন। তিনি নৈনিতালে

আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন কিন্তু স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তিনি ঐ দলে চলে আসেন। যুক্ত প্রদেশে বিধানসভায় তিনি স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব করেন ১৯২০ থেকে ১৯৩০। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি ১৯৩২ এবং ১৯৩১ সালে কারাবরণ করেন। আবার ১৯৪০ ও ৪২ সালে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৭-১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি যুক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীপদে থাকা কালে ১৯৩০ সালে তার মৃত্যু হয়।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী॥ জন্ম সাল তারিখ জানা যায় না। ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সহযোগী হিসাবে ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পাঁচমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেকশনে পুলিশ ইনেসপেক্টর সুরেশ মুখুজ্জেকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে পালান। যতীন মুখুজ্জের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। বিদেশী অস্ত্র নামাতে বুড়ি বালামের তীরে তিনি যতীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। সেখানে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। সেটা ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টম্বরের কথা।

চৈত সিং॥ বেনারসের রাজা বলবন্ত সিং- ১৭৭০ সালে ২২আগস্ট মারা যান। পুত্র চৈত্র সিং বেনারসের রাজা বলে ঘোষিত হন। রাজা হয়েই চৈত সিং অযোধ্যার নবাবের অধীনতা স্বীকার করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এক চুক্তি করেন যে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্তে তারা বেনারসের রাজসীমা রক্ষা করবে। বহিঃশত্রু বা তারা রাজ্যের শান্তি নষ্ট করবে না। বার্ষিক দেয় টাকা বাড়াবার কথাও বলবেন। কিন্তু ১৮৭৮ সালে কোম্পানী দক্ষিণ ভারতে ফরাসী, মারাঠা এবং মহীশূরদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অর্থের প্রয়োজনে চৈত সিং এর কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা বাড়তি দাবী করে। রাজা প্রথমবার অন্যায় জেনেও এ টাকা দেন। দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসরেও অনুরূপ দাবী ওঠে। এবার চৈত সিং টাকা দিতে পারেন না। হেস্টিংস্ তার ওপর জরিমানা চাপান এবং তা আদায়ের জন্য রাজাকে বন্দী করতে যান। এর ফলে গণ বিদ্রোহ ঘটে।

চৈত সিং প্রথমে বিদ্রোহের সমর্থন না করলেও পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। হেস্টিংস অন্য একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে চৈত সিং এর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। চৈত সিং গোয়ালিয়রে পালিয়ে যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

জওহরলাল নেহরু॥ ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। মতিলাল নেহেরু ও স্বরূপ রানীর একমাত্র পুত্র। ১৫ বছর বয়সে

বিলেতে যান। ন বছর হ্যারোস্কুলে, এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে তিন বছর পড়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে ভর্তি হন ইনার টেম্পলে। ১৯২২ সালে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন।

ছাত্রাবস্থায় জওহর তিলকের চরম পন্থাকে মনে মনে সমর্থন করতেন। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ কালে তিনি তিলক ও অ্যানি বেসান্তের দুটি হোমরুল প্রতিষ্ঠানেই যোগ দেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। চৌরিচৌরার ঘটনায় (৫।২।১৯২২) গান্ধীজি আন্দোলন তুললে জওহর বিস্মিত হন। ১৯২৩শে কারামুক্ত হয়ে তিনি এলাহাবাদে পৌরসভার সভাপতি ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত হন। কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিল বর্জন-গ্রহণের বিবাদে তিনি নীরব ছিলেন।

১৯২৬এ পত্নীর চিকিৎসার জন্য ইউরোপে গিয়ে 'লীগ এগেন্স্টে ইম্পিরিয়ালিজম' এ যোগ দেন। ১৯২৭ এ মতিলাল মস্কো গেলে পুত্র মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯২৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললে গান্ধীজি অখুশী হন। পরবছর সাইমন কমিশন বর্জন মিছিলে জওহরলাল আহত হন। ১৯২৮ এ কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজি এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অন্যথায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন। প্রকাশ্য সভায় এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল সমর্থন করেন।

১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল প্রথম সভাপতি পদে মনোনীত হন। ঐ অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ওঠে। আন্দোলন শুরু হলে জওহরলাল গ্রেপ্তার হন। পর বছর জানুয়ারীতে মুক্তি পান। এ সময়ে মতিলালের মৃত্যু হয়। গান্ধী আরউইন চুক্তি তাঁকে ব্যাথিত করে। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৩-এর ৩০ আগস্ট মায়ের অসুস্থতার জন্য মুক্তি পান। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। মাস ছয়েকের মধ্যে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতা আলিপুর জেলে থাকতে থাকতেই শুনতে পান, গান্ধীজি আন্দোলন তুলে নিয়েছেন।

পত্নী কমলা নেহরুর অসুস্থতার জন্য ১৯৩৫-এর শেষ দিকে ছাড়া পেয়ে তিনি পত্নীকে নিয়ে আবার বিদেশে যান। পত্নীর মৃত্যু ঘটে। জওহর দেশে ফিরে

নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩৬ এর লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সের পর তাঁর সঙ্গে অন্যদের মতভেদ এত তীব্র হয় যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজগোপাল আচারী প্রভৃতি সাতজন পদত্যাগ করেন। গান্ধীজি বিরোধ মিটিয়ে দেন।

এই সময় জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস মোট আটটি মন্ত্রীসভা গঠন করে। যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রী সভায় দুজন লীগ সভ্য নেওয়ার প্রস্তাব জওহরলাল প্রত্যাখ্যান করায় জিন্নাহ ক্ষুব্ধ হয়ে যে বিরোধিতা শুরু করেন, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ প্রধান।

১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে জহরলাল ইউরোপ ও চীন ঘুরে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্যাগ করে। এই সময় গান্ধীজি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলে দ্বিতীয় সৈনিক হিসাবে জওহরলাল কারাবরণ করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে সরকার তাদের মুক্তি দেন এবং ক্রিপ্‌স মিশন ভারতে আসে। তাদের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধে সহযোগিতা। যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব ছিল তা যুদ্ধ শেষের পর কার্যকর হবে। জওহরলাল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগও প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

১৯৪২ এ জওহরলালের আগ্রহেই ভারত ছাড় প্রস্তাব গৃহীত হয় (৮ আগস্ট, ১৯৪২)। পরদিনই প্রায় সকল নেতা গ্রেপ্তার হন।

১৯৪৫-এর ১৬ জুন নেহরু ও অন্য নেতারা একত্রে ছাড়া পান। কেবিনেট মিশন এদেশে এসে কংগ্রেস মুসলীম লীগ ঐক্য চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা করে, তা মোটামুটি সকল রাজনৈতিক দল গ্রহণ করে। কিন্তু নেহরুজী চান যে আদি গ্রুপিং স্বেচ্ছামুলক হবে। এই নিয়ে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তারই ফলে জিন্নাহ ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শনের ডাক দেন। ভারত বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্টের সূচনায় জওহরলাল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু ॥ ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলকাতাতেই জন্ম হয় চিত্তরঞ্জনের। পিতা ভুবনমোহন দাস। আদি নিবাস ছিল ঢাকার

তেলিরবাগে। তিনি ১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে যান বিলেতে। ১৮৯৩তে দেশে ফিরে ব্যারিস্টারি শুরু করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিল। কিন্তু আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা করতে করতে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্র-বিন্দুতে চলে আসেন। এই সময় তাঁর প্রভূত অর্থ হয়। তিনি পিতৃবন্ধুর ঋণ শোধ করে দেউলিয়া নাম ঘোচান। ১৯০৩ থেকে তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে থাকেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আইন সভা বর্জনের বিরুদ্ধে ছিলেন। এ মত বর্জিত হলেও নেতার আহ্বানে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও ভগ্নী উর্ম্মিলাদেবী কারাবরণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি নিজেও কারাবরণ করেন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে তিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়ে আবার তিনি পুরোণ প্রস্তাব রাখেন। গান্ধীজি অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর শিষ্যেরা এ মত সমর্থন করলেন না। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করে স্বরাজ্য দল গঠন করলেন। মতিলাল নেহেরু তাঁর সমর্থক ছিলেন। এই দল ক্রমে সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে কংগ্রেস ১৯২৩ সালে কংগ্রেস নীতি বদল করতে বাধ্য হয়। তারাও আইন সভায় প্রবেশ করবে স্থির করে। কিন্তু স্বরাজ্য দল মুসলিম লীগের সঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্ট করে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতার মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্মচারী হন। কিন্তু সরকার বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করে সুভাষচন্দ্র ইত্যাদিকে গ্রেপ্তার করলে চিত্তরঞ্জন নিজ বাড়িতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকেন। এবার গান্ধীজি তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেন।

স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়েছে। তবু নিজ পৈত্রিক বাড়িটি দান করলেন জনসেবায়। তখনও অবসরে সাহিত্য সেবা করেন। তাঁর নারায়ণ পত্রিকা তখনও জনপ্রিয়। এ সময়ে সহসা ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও যেন নাড়া দিল। দার্জিলিং-এ গেলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারে। আর ফিরে এলেন না। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন তাঁর আত্মা লোকান্তরিত হ'ল।

জয়াকর, মকুন্দ রামরাও॥ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বোম্বাই-এর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৯৫ সালে বি. এ. পাশ করে ১৯০৫ সালে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে বোম্বাইতে আইন ব্যবসা শুরু

করেন। অল্প সময়ে প্রাদেশিক জেলা গুলিতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রাণাডে, তিলক, গোখলে, কার্বে প্রভৃতি নেতার সংস্পর্শে এসে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৩৯ সালে প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য পদে যুক্ত হন।

বস্তুতঃ ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগে যোগদান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি পর বৎসরই ঐ লীগের বোম্বাই শাখার সহ সভাপতি হন। পরবৎসর নাসিকে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র সোসাল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কংগ্রেসের অনুসন্ধান সমিতির সভ্য ছিলেন তিনি। ১৯২৩ সালে তিনি স্বরাজ্য দলে যোগ দেন এবং ১৯২৫ সালে বোম্বাই এর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আইন সভায় দলের নেতৃত্ব দেন। নানা সময়ে সরকারের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের সন্তোষজনক মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত। তিনি ভারতের শাসনতন্ত্র নিয়ামক সভারও সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১০ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

(মীর) জাফর খাঁ ॥ প্রথম জীবনে আলিবর্দ্দী খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা ষড়যন্ত্রের অংশীদার। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ আমলেও তিনি সেনাপতি ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের প্রধান কারণ তিনি। পূর্ব ষড়যন্ত্র মত বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন, অধিকন্তু ইংরেজদের পরাজয় সম্ভাবনা দেখে তিনি সিরাজকে যুদ্ধ বন্ধ করবার ভুল পরামর্শ দিয়ে তার পরাজয় নিশ্চিন্ত করেন। এর বিনিময়ে সিংহাসন পান কিন্তু রাজকোষ শূন্য করে ইংরেজদের উপহার ও চুক্তির টাকা দিতে হয়। ১৭৬০ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৭৬৩ সালে তিনি পুনঃ সিংহাসনে স্থাপিত হন। তার উত্তরাধিকারীরাই নবাব বলে স্বীকৃত হয়। ১৭৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জিন্না, মহম্মদ আলি ॥ ধনী গৃহে ১৮৭৬ সালে জিন্নার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ভারতেই লেখা পড়া শেখেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে যান। ইতঃপূর্বে তিনি গোখলে, তিলক ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী নেতার সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিলেতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরজির একান্ত সচিব হন। ঐ সময় থেকে মূলতঃ গান্ধী যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। হিন্দু মুসলমান ঐক্য তাঁর লক্ষ্য। ১৯১০ সালে তিনি বোম্বাই

প্রেসিডেন্সী থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের লক্ষ্মৌ-প্যাক্টের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চিন্তায় তৎপর হন।

কংগ্রেসের সভ্য হলেও অনেকের মতই তখনও তিনি মুসলিম লীগের কর্মী। ১৯২০ সাল থেকে তিনি লীগের সভাপতি পদে বৃত হন। তখনও তাঁর মধ্যে দ্বিজাতি তত্ব দানা বেঁধে ওঠে নি। তিনি ১৯২৭-এ যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৯২৮-এ তাঁর নেতৃত্বে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের অধিবেশনে মুসলমান সমাজের পক্ষে চৌদ্দ দফা দাবি উপস্থিত করা হয়। ১৯২৯ সালে ঐ দাবির উপর ভিত্তি করেই মুসলিম অল পার্টিজ কনফারেন্স ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, আসন সংরক্ষণ, ভারতে যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, ও প্রদেশের স্বয়ং সম্পূর্ণতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। মোটকথা তখনও তার লক্ষ্য অখণ্ড ভারতবর্ষ।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনেই প্রথম পাকিস্থান প্রস্তাব গৃহীত হয়। দু বৎসর পরে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থনে সঙ্গে ভারত বিভাগের প্রস্তাব যুক্ত করেন। সেই প্রস্তাব জনপ্রিয় করে তোলার মূল কৃতিত্ব তাঁর। সব কটি গোল টেবিল বৈঠক মূলতঃ তাঁর অনমনীয় মানসিকতার জন্য অর্থহীন হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার দায় লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফল। মূলতঃ জিন্নাহর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই ভারত বিভাগ ও পাকিস্থানের জন্ম ঘটে। তিনি ১৩ই আগস্ট মধ্যরাত্রের শেষে পাকিস্থান ডোমেনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। মুসলমান সমাজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে 'কায়েদ-ই-আজম' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৪৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর করাচিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ পরলোক গমন করেন।

ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ ॥ পেশোয়া গঙ্গাধর রাও অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর লর্ড ডালহৌসী স্বত্ব-বিলোপ নীতি অনুসারে ঝাঁসিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন। ঝাঁসির রাণী একে অস্বীকার করে নিজ দত্তক পুত্র দাবী তুললেও গভর্নর তা বাতিল করে দেন। বরং পেশোয়ার পেন্সান থেকে বকেয়া ঋণ বলে টাকা কেটে নেওয়া হতে থাকে। ক্ষুব্ধ চিত্ত রাণী নিরুপায় হয়েই চুপ করে থাকেন।

১৮৫৭ সালে গণ বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরেজরা ঝাঁন্সি অরক্ষিত রেখে পালায়। বরং পত্রদ্বারা রাণীকেই ঝাঁন্সি রক্ষার দায় নিতে বলেন। রাণী এই সুযোগে সৈন্য-বাহিনী সুগঠিত, দুর্গ সংরক্ষণ ইত্যাদি করে নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেন। ঝাঁসিতে

চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তেজস্বিতা ও সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণ পরিচালিত করলেও মূলতঃ আগ্নেয়াস্ত্রের কমতিতেই ঝাঁসির পতন ঘটে ১৮৫৮ সালের ৫ এপ্রিল। রাণী কল্পিতে পালিয়ে যান এবং তাঁতিয়া টোপী ইত্যাদি বিদ্রোহী নেতার সঙ্গে যোগ দেন।

কল্পির পতন হলে বিদ্রোহীরা রাণীর পরামর্শে গোয়ালিয়র দখল করে। ১৭ই জুন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু ঘটে।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ॥ ১৮৫২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জন্ম হয় মানপুরে। পিতা চন্দ্রকীর্তি। টিকেন্দ্র নানা বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরচন্দ্র সিংহাসন পান। টিকেন্দ্রজিৎ হন সেনাপতি। এতে ইংরেজরা অখুশি হয়। তাকে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনায় আসামের কমিশনার যে দরবার ডাকেন তাতে টিকেন্দ্র অনুপস্থিত হন। ফলে ক্রুদ্ধ ইংরেজরা প্রাসাদ আক্রমণ করে কিন্তু কাউকেই খুঁজে পায় না। এদিকে কেল্লা থেকে ইংরেজদের কুঠির প্রতি গোলা বর্ষণ হতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজরা সন্ধির প্রস্তাব করে। ইংরেজরা টিকেন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে উত্তেজিত জনতার হাতে ইংরেজরা নিহত হয়। ফলে ইংরেজ বাহিনী আবার মণিপুর আক্রমণ করে। টিকেন্দ্র পরাজিত হয়ে পালান। অবশেষে ১৮৯১ সালের ২৫ মে তিনি আত্মসমর্পন করেন। ১লা জুন থেকে তাঁর বিচার শুরু হয় ১৩ জুন তা শেষ হয় এবং তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। দু মাস পরে ১৩ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়। স্বয়ং মহারাণীও এই দণ্ডে আপত্তি জানান। কিন্তু সংবাদ আসবার আগেই ফাঁসির দিন পার হয়ে যায়।

টিপু সুলতান॥ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর টিপুর জন্ম হয়। তিনি সামরিক ও বেসামরিক দ্বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত। ১৭৮২খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন হায়দার আলি। তখন পুত্র টিপু মহীশূরে সুলতান হয়েই তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত হতে হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঙ্গালোর চুক্তির দ্বারা ঐ যুদ্ধের অবসান হয়। উভয়পক্ষ যুদ্ধ পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

এ সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক হারান। চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন (১৭৯৯)।

টিপু বীর সৈনিক, অক্লান্ত পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন

ছিলেন। স্বাধীনতা-প্রিয় এই নরপতি নিজাম ও অন্যান্য রাজার মত অধীনতা-মূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিয়ে শান্তিতে বাস করতে চান নি। টিপু ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ধর্মভীরু সুন্নি মুসলমান। তিনি ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া উর্দু ও কানাড়ী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থাগারে আরবী ফরাসী-তুর্কী, উর্দু ও হিন্দু গ্রন্থ ছিল।

শাসক হিসাবে স্বৈরাচারী হলেও মোটামুটি শাসন ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কালে মহীশূরের উন্নতিও হয়েছিল। তিনি কৃষি ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থা করেন। তাঁর কালে যে হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব কতখানি সুলতানের ওপর দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত নন।

ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান॥ ১৮০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় জন্ম হয় হেনরীর। স্কচ প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ইতিহাস ও ইংরাজীসাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তার চিন্তা হয় সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ভাগলপুরে যান এক সওদাগরী অফিসে কেরানীর পদ নিয়ে। এখানে তাঁর কাব্যস্ফূরণ হয়। ইণ্ডিয়া গেজেটে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ সাল থেকে তাঁকে হিন্দু কলেজে ইতিহাস এবং ইংরাজী সাহিত্য পড়াতে হলেও কলেজের বাইরে তিনি ছাত্রদের মধ্যে সেকালের সমস্ত বিখ্যাত যুক্তিবাদী দার্শনিকের চিন্তাধারার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করাতেন। এই কবি প্রকৃতির মানুষটি নিজেকে ভারতীয় ভাবতেন। স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁর থেকে তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবব্রত দত্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সেকালের সমস্ত প্রগতি মূলক আন্দোলনে সংযুক্ত ছিলেন। ডিরোজিওর প্রেরণায় যে সব ছাত্রসংগঠন গড়ে ওঠে, সেখানে পৌত্তলিকতা জাতিভেদ, আস্তিকতা-নাস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হ'ত। ডেভিড হেয়ার থেকে মিল সাহেব পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিতেন। এগুলি ছাত্রদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। যুক্তিনিষ্ঠ বিচার ও সর্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জন ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। এখান থেকেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিরোধ জেগে ওঠে। বিশেষতঃ ভারতকে ইউরোপের উপনিবেশ করে তুলবার বিরোধিতার মানসিকতা তাদের বিশেষভাবে

চিহ্নিত করে অতএব কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে অভিযুক্ত করে কৈফিয়ৎ চাইলেন। ডিরোজিও প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করে প্রতিবাদ পত্রের সঙ্গে পদত্যাগ পত্রও পাঠিয়ে দেন। এরপর সাংবাদিকতাই তাঁর প্রধান জীবিকা হয়। দারিদ্রে ও রোগে মাত্র একুশ বছর বয়সে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কবি, শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকের জীবন শেষ হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রেরণা। ডিরোজিওর ছাত্রেরা ঊনবিংশ শতককে নবভাবনায় সঞ্জীবিত করে তোলে।

তারকেশ্বর দস্তিদার ॥ চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রামের তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম চন্দ্রমোহন। তিনি সূর্য সেনের দলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তারকেশ্বর যুক্ত ছিলেন। জালালবাদের পাহাড় থেকে তিনি পালাতে সক্ষম হন। পলাতক জীবনে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্ব ছিল তাঁর হাতে। ১৯৩০ সালের ১৯ মে গহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এর সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯৪৪ সালের ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

তিতুমীর ॥ চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দারপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। পেশাদার পালোয়ান হিসাবে তাঁর জীবন শুরু হয়। জমিদারের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে তাঁর কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভ করে তিনি মক্কায় যান এবং ওয়াহবি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে গিয়ে জমিদারদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির কুঠিয়াল ডেভিস তিতুকে আক্রমণ করতে এসে পরাজিত হন। গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবানন্দ রায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। বারাসতের কালেক্টর আলেকজাণ্ডারও তিতুর কাছে পরাজিত হন। বসিরহাটের দারোগা নিহত হন। এই সব জয়ে তিতুর প্রভাব বেড়ে যায়। তিতু নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরী করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি নিজের ভাগনে মাসুল খাঁকে সৈন্যাপত্যের দায়িত্ব দেন। এ সময়ে নদীয়ার কলেক্টর তাঁকে বাধা দিতে আসেন। তাকেও পরাজিত হতে হয়। তখন গভর্নর বেন্টিঙ্ক বিশাল একদল ইংরেজ ও দেশীয় লোকের মিশ্র বাহিনী পাঠান। ১৯৩১ সালে গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে পড়ে। তিতু নিহত হন।

প্রায় ৫৫০ জন ধরা পড়ে। এদের মধ্যে ১৪০ জনের সাজা হয়। তাঁর ভাগনে মাসুম খাঁর ফাঁসি হয়। তিতুর নেতৃত্বে গণবিক্ষোভের অবসান হয়।

থঙ্গাল (সেনাপতি) ॥ ১৮০৬ সালে মণিপুরের অন্তর্গত ইম্ফলে জন্ম হয়। পিতার নাম ক্ষেত্রী সিং। থঙ্গাল মণিপুরের সেনাপতি ছিলেন। মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করলে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বীর্যবত্তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন। মণিপুর মহারাজ বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের সঙ্গে বন্দী হন। ১৮৯১ সালের ১৩ আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

দামোদর চাপেকার ॥ মহারাষ্ট্রের পুনা জেলায় চিনচয়াদ গ্রামে ১৮৬৯ সালের ২৫ জুন তারিখে দামোদরের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীহরি চাপেকর। মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। স্বাদেশিক যুবকদের শারীব শিক্ষা দেবার জন্য তিনি এক সংগঠন গড়েন। ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করবার জন্য তাদের গোপনে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হত। ১৮৯৭ সালে পুনায় প্লেগ দেখা দিলে প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডে যে অত্যাচার শুরু করেন, তার থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি র‍্যাণ্ডে হত্যার পরিকল্পনা করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য গ্রহণের ষাট বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সেরে ফিরবার পথে র‍্যাণ্ডে আক্রান্ত হন—২২ জুন, ১৮৯৭ সঙ্গে ল্যা, আয়াস্টও মারা যান। বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা ধৃত হন। পুনার যারবেদা জেলে ১৮৯৮ এর ১৮ এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়।

দীনবন্ধু মিত্র ॥ ১৮৩০ সালের কোন সময়ে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয়। বাবার নাম কালাচাঁদ। তাঁর পিতৃ'র নাম গন্ধর্ব-নারায়ণ। দরিদ্র পরিবারে পড়বার সুযোগ না থাকায় দীনবন্ধু কলকাতায় পালিয়ে আসেন। ১৮৫০ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে কলেজে ভর্ত্তি হন। প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে স্নাতক হয়ে আর পড়াশুনা করেন নি। ডাক বিভাগে চাকরী নেন। লুসাই যুদ্ধে ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দিলেও তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে সমাদর পান নি।

ঈশ্বরগুপ্তের কাছে তাঁর সাহিত্যিক দীক্ষা। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে নাট্যকার হিসাবেই তিনি খ্যাত। তাঁর নাটক দিয়ে জাতীয় সাধারণ মঞ্চের উদ্বোধন হয়। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখলেও এক 'নীলদর্পন'ই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

একটি নাটক সামাজিক আন্দোলনে কতবড় ভূমিকা নিতে পারে, নীলদর্পনই তার প্রমাণ। ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

দীনেশ গুপ্ত ॥ ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার যশোলং এ দীনেশের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সতীশচন্দ্র। তিনি ঢাকা এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠনই সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং সর্বপ্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ করে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেন।

১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর বিনয় বসুর নেতৃত্বে তিনি এবং বাদল (সুধীর গুপ্ত) রাইটার্স বিল্ডিং এ আক্রমণ চালান। কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিহত হন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গুরুতর ভাবে আহত হন। শেষে বিষ খেয়ে ও নিজেদের মাথায় গুলি চালিয়ে তিন জনই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

বিনয় এবং বাদল মারা যান। দীনেশকে বহু যত্নে বাঁচিয়ে তোলা হয়। কোন রকমেই দীনেশের কাছ থেকে পুলিশ কোন খবর আদায় করতে পারেনি। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই তাঁর ফাঁসি হয়।

দুদু মিঞা ॥ ১৮১৯ সালে ফরিদপুরে জন্ম। তাঁর বাবা শরিয়তুল্লা ছিলেন ফরাজী মতের প্রবর্তক। তরুণ বয়সে দুদু মক্কা যান এবং ফিরে এসে পিতার সংগঠনকে দৃঢ় করে তোলেন। ১৮৪৭ সালে ওয়াহেবী আদর্শে বিশ্বাসী ফরাজীদের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। দুদু পাঁচচরের নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়। জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করে প্রজাকর রেয়াদ করে। একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়। সাধারণ মানুষ দুদুর সমর্থক হয়। ইংরেজরা তাঁকে যুদ্ধ দাঙ্গা লুণ্ঠনের অভিযোগ গ্রেপ্তার করে কিন্তু প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কালে তাঁকে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখা হয়। মুক্তি পাওয়ার পর ১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

নবগোপাল মিত্র ॥ স্বদেশী চিন্তায় আজীবন অপব্যয় করে যাঁরা আদর্শ রেখে গেছেন, নবগোপাল তাদের অন্যতম। ১৮৪০ সালের কোন সময়ে তাঁর জন্ম। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। তিমি তরুণদের ব্যায়ামচর্চা ও অশ্ব-চালনা শিক্ষার এক ব্যয় বহুল আয়োজন করেন। তাঁর অর্থানুকৌল্যে ন্যাশানাল পেপার নামে এক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলার

পত্তন তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত এই মেলাকে কেউ কেউ স্বদেশী মেলাও বলতেন। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পিছনেও তাঁর চিন্তা ও সমর্থন ছিল। তিনি একটি ন্যাশনাল সার্কাসও খোলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নানাসাহেব ॥ সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেব। তিনি শেষ স্বাধীন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র। প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। ১৮৫৩ সালে বাজিরাও-এর মৃত্যু হলে লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসারে পেন্সন লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এ আপীল করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু তখনও তিনি ইংরেজদেরই অনুগত। তাদের খানাপিনা করিয়ে তোয়াজ করছেন। মীরাটে বিদ্রোহ হলে, কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট নানাকে কোষাগার রক্ষার দায়িত্ব দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা এসে কানপুরের কোষাগার ও অস্ত্রাগার দখল করে। ৫জুন বিদ্রোহীরা দিল্লীর পথে কল্যাণগড় পর্যন্ত গিয়ে আবার কানপুরে ফিরে আসে। এবার নানাসাহেব তাদের সঙ্গে যোগ দেন। তখন ইংরেজরা একটা কাঁচা গড়খাই তৈরী করে সেখানে আশ্রয় নেয়। নানাসাহেব কুড়ি দিনেও তা দখল করতে পারেননি। তখন ইংরেজরা নানার কাছে এলাহাবাদ যাবার অনুমতি চায়। নানা সম্মতি দেন। সতীচৌরা ঘাটে ইংরেজরা নৌকায় উঠলে সিপাহীরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে তাদের প্রায় সকলকে হত্যা করে। ঘটনাটি নানার সম্মতিক্রমে কিনা বোঝা যায় না। তবে ৩০ জুন নানা নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে।

হ্যাভলক কানপুর উদ্ধার করতে এলে কানপুর বিবিঘরে আটক ইংরেজ নারী-পুরুষ-শিশুদের হত্যা করে সিপাহীরা। এটিও নানার অনুমতি সা[illegible] কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ১৭ জুলাই হ্যাভলক কানপুর পুনরুদ্ধার করেন। এর পর থেকে ইংরেজ বাহিনী তাকে ক্রমেই উত্তর-পূর্ব দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। প্রতিযুদ্ধেই তাঁর পরাজয় হয়। কলিন ক্যাম্পবেলের সৈন্যদের সঙ্গে বাঁকির যুদ্ধের পরাজয়ের পর তিনি নেপালে পালিয়ে যান এবং আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজরা তাঁর ওপর একলক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

বিদ্রোহ থামলে ১৮৫৯-র এপ্রিলে নানা মহারানী ভিক্টোরিয়া, পার্লামেন্ট, কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্, গভর্ণর জেনারেল, ইত্যাদির কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। তাঁর জীবনের সব চেষ্টার মত ঐ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এরপর তাঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যু অজ্ঞাত।

নিবেদিতা ॥ ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের ডানগ্যানন-এ নিবেদিতার জন্ম হয়। বাবা স্যামুয়েল নোবল তাঁর নাম রাখেন মার্গারেট নোবল। পড়াশুনা শেষ করে মার্গারেট হয় স্কুল শিক্ষিকা। স্বদেশের স্বাধীনতার বাণী তাঁকে আকুল করে। ধর্ম সমাজ ও জীবন সম্পর্কে গতানুগতিক চিন্তায় মার্গারেট যখন বিচলিত তখন ১৮৯৫ সালে এক আলোচনা চক্রে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর প্রভাবে যেন 'জীবন-সত্যের দর্শন পান। ১৮৯৮ খ্রীঃ তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন। ঐ বছরেই ২৫ মার্চ তিনি দীক্ষিত হন। তাঁর নতুন নাম 'ভগ্নী নিবেদিতা'।

এ সময়ে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতাও সেবাকার্যে ব্রতী হন। ঐ বছরেই তিনি বাগবাজারে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

স্বামীজির দেহত্যাগের পর থেকে নিবেদিতা ভারতীয় রাষ্ট্রের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ভারতীয় জাতীয় চেতনার অখণ্ডতা তাঁর স্বপ্ন ছিল। এ কারণেই তিনি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ইত্যাদি শিল্পীর মনে প্রেরণা সঞ্চার করেন। সতীশ মিত্রের 'ডন্ সোসাইটিতে' বক্তৃতা দিতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

১৯০২ সালে তিনি বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগায়োগের জন্য যারা দায়িত্ব নেন, নিবেদিতা ও প্রমথ মিত্র তাদের মধ্যে প্রধান। ১৯০৩ থেকে বিপ্লবকর্মে তাঁর লিপ্ততা এত বেড়ে যায় যে তিনি মিশন ত্যাগ করেন। ১৯০৫ সালে বারানসীর জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি বিলাতি দ্রব্য বর্জনের পক্ষে জালাময়ী ভাষণ দেন। উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী—দুই দলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

অত্যাধিক পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙ্গে আসে। ১৯১৩ সালের সূচনায় জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসুর আমন্ত্রণে তিনি দার্জিলিং রায়ভিলায় বিশ্রাম করতে যান। ১৩ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

নির্মলজীবন ঘোষ ॥ হুগলী জেলার ধামাসনে নির্মলজীবনের জন্ম হয় ১৯১৬ সালের জানুয়ারী। বাবার নাম যামিনীজীবন। মেদিনীপুর কলেজে আই. ই. পড়তে পড়তে জীবন উৎসর্গ করেন। গুপ্তবিপ্লবীদলের নির্দেশে জেলা শাসক বার্জকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ১৯৩৪ সালের ২৬ অক্টোবর তাঁর ফাঁসি হয়।

নুরুলুদ্দিন ॥ সন্ন্যাস বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। রংপুর অঞ্চলের কৃষকেরা তাকে নবাব বলে ডাকত। তিনি রংপুর অঞ্চলের বিদ্রোহের পরিচালনভার গ্রহণ করে দয়াশীল নামে এক বৃদ্ধ কৃষককে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তিনি এক ঘোষণায় ইংরেজদের দেওয়ান দেবী সিংহকে কর না দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহের জন্য ডিং-খরচা নামে এক চাঁদা ধার্য করেন। মূলতঃ ইংরেজ শাসন রংপুর অঞ্চল থেকে লুপ্ত হয়।

ইংরেজদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি মোঘলহাটের কাছে এক যুদ্ধে নুরুলুদ্দিন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হন। তিনি গুরুতর আহত রূপে বন্দী হন। অল্প কয়েকদিন পরে তাঁর মৃত্যু (১৭৮৩) ঘটে।

প্রভাসচন্দ্র বল ॥ চট্টগ্রামের ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মনোমোহন বল। ১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল জালালবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে মারা যান।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ॥ ১৯১১ সালের ৫মে তারিখে চট্টগ্রামে প্রীতিলতার জন্ম হয়। পিতা জগবন্ধু, মাতা প্রতিভাময়ী। ছাত্রীজীবনে ঢাকার দীপালীসংঘ এবং কলকাতার ছাত্রী সংঘের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই তিনি অল্প স্বল্প বৈপ্লবিক কাজের ভার পেতে থাকেন। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তার বোনের পরিচয়ে। রামকৃষ্ণের কথাবার্তা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। জীবন সম্পর্কে নির্মোহ ও আত্ম-ত্যাগে অভিপ্সু করে তোলে। ইতঃমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করে এসে তিনি চট্টগ্রাম নন্দন কানন নামক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করেন। পলাতক সূর্যসেন যখন ধলঘাটে সাবিত্রীদেবীর আশ্রয়ে ছিলেন, তখন প্রীতিলতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব পান। ১৯৩১-এর ১২ জুন রাত আটটার কাছাকাছি মিলটারী সে আশ্রয় ঘিরে ফেললে নির্মল সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হন। গুর্খাদের গুলিতে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনও মারা যান। সূর্যসেন প্রীতিলতাকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এরপর প্রীতিলতারও পলাতক জীবন শুরু হয়। সরকার তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। প্রতিশোধকল্পে কয়েকজন কর্মী ও বোমা পিস্তল সহ প্রীতিলতার নেতৃত্বে ঐ বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয়ন ক্লাব আক্রান্ত হয়। বিনা ক্ষতিতে অভিযান সফল হলেও প্রীতিলতা সমগ্র নারী সমাজকে পত্র লিখে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে পটাশিয়াম সায়নায়েড খেয়ে আত্মদান করেন।

প্রীতিলতা ভারতের প্রথম নারী শহীদ।

ফজলুল হক, আবুল কাশেম॥ বরিশালের চাখারের সাঁতরিয়া গ্রামে জন্ম হয় ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর। বাবা মওলানা মহম্মদ ওয়াজেদ বরিশালে ওকালতি করতেন। ফজলুল হক এম. এ. পাশ করবার পর কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ছেড়ে দিয়ে চাকরি করেন কিছুদিন। ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হন। দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। মাঝে ১৯৩৪-১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হন।

১৯০৬ সালে মুসলিম প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৯১০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ এ কংগ্রেস ত্যাগ করে হন বাঙলার শিক্ষা মন্ত্রী। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকেই তিনি ভারতীয় মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। লীগ নেতাদের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় তিনি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীতে 'কৃষক'-প্রজা-সমিতি' নামে একদল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ থেকে তিনি নানা দল বদল করেন কিন্তু মন্ত্রিসভা তাঁর হাতে থাকে। ১৯৪৩ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের সময় তিনি বাঙলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্থানে যান। সেখানে পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ ১৮৩৮ সালের ২৮ জুন চব্বিশ পরগণার কাঁঠাল পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.। তিনি পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও নীতিবোধসম্পন্ন মানুষটিকে সর্বদা সমুন্নত রেখেছে। ইংরেজ এবং পুলিশ কর্মচারীরাও তাঁর কাছে সংযত আচরণ করত। প্রবল স্বদেশবোধ ও সমদর্শীতা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়। নীলকরের বিরুদ্ধে হাতী নিয়ে তাড়া করা তার ন্যায় বিচারের প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রবন্ধাবলী এবং আনন্দমঠ সেকালে স্বদেশমন্ত্রীদের প্রেরণা। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' গান সেকালে বিপ্লবীদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা দিয়েছে। নিজে রাজনীতিতে যুক্ত না থেকেও বঙ্কিম গোটা ভারতের জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা নেন। ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

বদরুদ্দিন তায়েবজি ॥ ১৮৪৪ এ জন্ম। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রথম ব্যারিস্টার। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৫ সালের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম। এই সম্মিলিত দলের তৃতীয় সভাপতি। জাতীয়তাবাদী নেতা হয়েও মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারও কুসংস্কার দূর করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি হন।

(সর্দ্দার) বল্লভভাই প্যাটেল ॥ ১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর নাদিয়াদের কাছে করমসাদে জন্ম। তিনি গোধরা জেলা কোর্টে ফরিয়াদী উকিল ছিলেন। পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে আহমেদাবাদে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ সালে তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। এই সময় থেকে তিনিগান্ধীজির প্রতি অনুরক্ত। তাঁর আদর্শে ১৯২৭-২৮ সালে বরদৌলি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে জাতির কাছ থেকে 'সর্দার' আখ্যা পান। পরবর্ত্তী কালে গান্ধীজির ভারত ছাড় আন্দোলনের সমর্থনে নেহেরুজির সঙ্গে একত্রে জেলে যান। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রী হন। বেশির ভাগ দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বসন্তকুমার বিশ্বাস ॥ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে জন্ম হয়। জন্মসাল বা তারিখে জানা যায় না। বসন্তকুমার লাহোরে একটা ডিসপেন্সারীতে কাজ করতেন। সেখানেই রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। রাসবিহারীর সকচেয়ে দক্ষ অনুচর হয়ে ওঠেন। তিনিই হার্ডিঞ্জের দিকে বোমা ছোঁড়েন ১৯২২ সালের ২০ ডিসেম্বর। সেদিন নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে বোমা ফাটলে যে চাপরাশিটি মারা যায়, সে উপলক্ষ্যে বহুজন গ্রেপ্তার হন। বসন্ত তখনও গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। অবশেষে ১৮১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি ধরা পড়েন। অবোধ বিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ ইত্যাদির সঙ্গে তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়। আম্বালা সেণ্ট্রাল জেলে ১১ই মে, ১৯১৫ সালে তাঁর ফাঁসি হয়।

বারীন্দ্র কুমার (বারীন) ঘোষ ॥ লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে ১৮৮০ সালের ৫ জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি। এক বছর বয়সে মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আসেন। ১৯০১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর অগ্রজের কাছে বরোদায় গিয়ে বিপ্লবী

কর্মে দীক্ষিত হয়। ১৯০২ সালে কলকাতায় আসেন। কিন্তু প্রধান সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের (পর নিরালম্ব স্বামী) সঙ্গে সমঝোতার অভাব হয়। ১৯০৬ সালে তাঁর জন্যই যতীন্দ্রনাথকে দলত্যাগ করতে হয়।

প্রথম দিকে ফরাসী-চন্দননগরের ভিতর দিয়ে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন। পরে মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমার ফ্যাক্টরি বসে। পূর্ববঙ্গে কিন্তু ফুলারের হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯০৬ সাল থেকে এক বছর যুগান্তর পত্রিকা চালান। এইসময় ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের বোমা ফাটে মজঃফরপুরে। সেই প্রসঙ্গে ২জুন ১৯০৮ অনেকের সঙ্গে তিনিও ধরা পড়েন। তিনি নিজে স্বীকারোক্তি দেন এবং অন্যদের স্বীকারোক্তি দিতে প্ররোচিত করেন। বিচারে প্রথমে ফাঁসির আদেশ হয়। পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯২০ সালে মুক্তি পেয়ে কিছুদিন পণ্ডীচেরিতে ছিলেন। তিনি 'বিজলি' 'ডন্ অব ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। ১৯৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

বালকৃষ্ণ চাপেকার॥ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পুনা জেলার চিনচয়াদ গ্রামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বালকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম শ্রীহরি চাপেকার। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। আঞ্চলিক যুবকদের সংগঠিত ও বৃটিশ-বিরোধী মানসিকতার প্রস্তুতিতে ভাইদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। পুনার প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডে-হত্যার দায়ে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং পুনার যারবেদা জেলে ১৮৯৯ সালের ১২মে তাঁর ফাঁসি হয়।

বালগঙ্গাধর তিলক॥ ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশে বালগঙ্গাধরের জন্ম হয়। পুনা থেকে বি. এ এবং বোম্বাই থেকে আইনে ডিগ্রি লাভ করে বিখ্যাত লেখক বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলংকরের সহযোগী হিসাবে ১৮৮০ সালে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ সংস্কারক আগরকার তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষ এ বিদ্যালয়ের লক্ষ ছিল।

১০৮০ সাল থেকে তিলক মারাঠীতে কেশরী এবং ইংরাজীতে মারাঠা নামে দুটি পত্রিকা একা চালাতে থাকেন। তিনি ১০৮৫ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য। ১৮৮৯-এর বোম্বাই ও ১৮৮০-র কলকাতা অধিবেশনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রবীন ধর্মীয় উৎসবের ভিতর দিয়ে জাতীয় গৌরববোধ জাগরিত করা এবং নিম্নতম স্তর পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ঢুকবার উদ্দেশ্যে তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসব প্রবর্তন

করেন। তাঁরই বাক্যে উৎসাহিত হয়ে চাপেকার ভায়েরা র‍্যাণ্ডে এবং আয়ার্স্টকে হত্যা করেছে, এই অভিযোগে তাঁকে আঠার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ম্যাক্সমূলার, উইলিয়াম হাণ্টার প্রভৃতি ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করলে তিনি অবিলম্বে মুক্তি পান।

এই সময়েই তিলকের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ ঘটে। কংগ্রেসের আবেদন-মূলক কর্মনীতি ত্যাগ করে সাধারণ মানুষকে স্বরাজ্যের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করবার নীতি গ্রহন করেন তাঁরা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন উপলক্ষ্যে সারা ভারতে যে ব্যাপক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়, তিলকের দল সেই সুযোগে নিজেদের মত এতদুর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেন যে, পরবৎসর নরমপন্থীদের প্রবল বাধার মধ্যেও বয়কট, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও স্বদেশী শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। পরবৎসর সুরাটে কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯০৮ সালে বাংলাদেশে বিপ্লবাত্মক ডাকাতি ও হত্যা শুরু হয়। তিলক তার সমর্থনে 'কেশরী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলে, সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং মান্দালয় জেলে নির্বাসিত করেন। ১৯১৪ সালে মুক্তি পেয়ে এসে তিনি হোমরুল আন্দোলনে যুক্ত হন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রস্তাবকে তিনি চিত্তরঞ্জনের মতই কাজে লাগাবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৯১৯ সালে এক মামলা উপলক্ষে তিনি বিলেতে যান। সেখানে ভারতীয় স্বায়ত্বশাসন বিষয়ে জনমত সংগঠিত করেন। স্বদেশে ফিরবার পর ১৯২০ সালের ১ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

বাল মুকুন্দ ॥ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত, এখনকার পাঞ্জাবে ঝিলাম জেলার খরিয়ালা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম শ্রীভাই মথুরা দাস। তিনি সাহিত্যে-স্নাতক ছিলেন। বৃত্তিতে শিক্ষক। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি উত্তেজিত ও প্রেরণাময় প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। এই সময় তিনি বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি নিজে বন্দুক চালান এবং বোমা ছোঁড়া শেখাবার কাজও করতেন। তাঁকে দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী করা হয়। ৫ অক্টোবর, ১৯১৪ তারিখে বিচারক তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। দিল্লী জেল। জেলে ১৯১৫ সালের ৮মে তারিখে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বাসুদেব চাপেকার ॥ মহারাষ্ট্রের পুণা শহরে বাসুদেবের জন্ম হয়। বাবা শ্রীহরি চাপেকার।

১৮৯৯ সালের, ৮মে যারবেদা জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বাহাদুর শাহ ॥ দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট। মোগল সম্রাট তখন ক্ষমতা-শূন্য। ইংরেজদের পেন্সন ভোগী। তবুও বাহাদুর শাহের অনুমোদন ভিন্ন জনসাধারণ কারো অধিকার মেনে নিত না। এজন্য নাম-সার হলেই ব্রিটিশ কোম্পানী মাথার ওপর বাদশাহকে অস্বীকার করতে সাহস পেত না। বাদশাহ দিল্লীর প্রাসাদে আপন খুশিতে শায়ের লিখতেন এবং পাখী পুষতেন।

সিপাহী বিদ্রোহে তিনি অনিচ্ছা সত্বেও জড়িয়ে পড়েন। সিপাহীরা তাঁকে স্বাধীন বাদশা বলে ঘোষণা করে। সিপাহীদের পতনে তিনি বন্দী হন। অবশ্য অসম্মান ও নির্যাতনের মধ্যে তাঁর বন্দী জীবনের সূচনা হয়। পুত্রেরা সকলেই ইংরেজদের দ্বারা নিহত হয়। বিচারে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। ভারতের বাদশার বদলে ইংলণ্ডের রাণী ভারতবর্ষের দায়ভার গ্রহণ করেন।

১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৫৭ তাঁর রাজত্বকাল। ১৮৬২ সালে রেঙ্গুনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিনয়কৃষ্ণ বসু ॥ ১৯০৮ সালে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা রাউতভোগে জন্ম হয়। পিতার নাম রেবতীমোহন। বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের প্রভাবে তাঁর গুপ্তদল মুক্তি সংঘে যোগ দেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স দলে যোগ দেন। ঢাকা মিডফোর্ড কলেজে ডাক্তারী পড়বার সময় ২৯ আগস্ট কুখ্যাত পুলিশ অফিসার লোম্যানকে হত্যা করে আত্মগোপন করেন। পরে দলের নির্দেশে রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযান করেন। কর্ত্তব্য সম্পাদনের পরে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু মৃত্যু না হওয়ায় পুলিশ বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একটু সুস্থ হয়েই বিনয় মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানে আঙ্গুল চালিয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এবার ক্ষত বিষাক্ত হয়ে পাঁচদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয় (১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০)।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর শ্রীহট্টের পৈল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম রামচন্দ্র। হিন্দু কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেন। নানা স্থানে শিক্ষকতা করেন। এই দৃঢ়চেতা মানুষটি কোথাও স্থায়ী হতে পারেন নি। ১৮৮১ তে বোম্বাই-এর

এক বাল্য-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন। এই সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে যোগ ঘটে। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৮৭) তিনি প্রতিনিধি ছিলেন। এবং অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবীতে বক্তৃতা দেন। তুলনামূলক ধর্ম-তত্ত্ব পড়তে বিলেত যান বৃত্তি পেয়ে। ইংলণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকায় বক্তৃতা করে যশ কুড়িয়ে দেশে ফেরেন।

এবার নিউ ইণ্ডিয়া নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২ আগস্ট ১৯০১)। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হিসাবে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ ভারত বিপিন পালের নামে সবচেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। এ সময়ে আসামের চা বাগানের কুলিদের উপর সাহেবদের অত্যাচারের কথা লিখে তিনি ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। সাহেবদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৯০২ সালে আসাম থেকে বিতাড়িত হন।

১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট তাঁর সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় আদালত অবমাননার দায়ে প্রথম কারারুদ্ধ হন। ১৯০৮-এ দ্বিতীয় বার বিলেত গিয়ে স্বরাজ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বোমার মামলার বিষয়ে লিখে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ভারতে সেকালে লাজপৎ রায়, লোকমান্য তিলক এবং তাঁকে একত্রে 'লাল-বাল-পাল' বলা হ'ত। তিলকের 'স্বায়ত্ত শাসন' আন্দোলনের তিনি সবচেয়ে বড় প্রচারক ও সমর্থক ছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগের বিরোধিতা করে ধিকৃত হন এবং রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন।

অথচ বিপিন পাল ছিলেন জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রধান ঋত্বিক, ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি, 'হোমরুল' আন্দোলনের প্রধান প্রচারক। এজন্য মারাঠী জাতীয়তাবাদী নেতা চিদাম্বরম্ পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ' নামে অভিহিত করেন। অনাপোষী মানসিকতার এই বীর নিদারুণ অর্থ কষ্টে ১৯৩২ সালের ২০ মে মারা যান।

বিবেকানন্দ (স্বামী) ॥ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী কলকাতায় জন্ম। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম বীরেশ্বর দত্ত। ডাক নাম বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালে বি. এ. পাশ করেন। আইন পড়বার সময় বাবা মারা যান এবং এবং তীব্র অর্থকষ্টে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান শুরু হয়। রামমোহন-গ্রন্থ পড়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। এফ. এ. পড়বার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পান। তাঁর কাছ থেকেই মানব সেবায় দীক্ষা তাঁর। ১৮৮৬ সালের ৬ আগস্ট রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুতে গুরুভাইদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম নেন বিবেকানন্দ। তিন বছর পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমন করেন। এ সময়ে তাঁর তত্ত্বশিক্ষাও চলে নানা পণ্ডিতের কাছে। মাদ্রাজে থাকা-কালে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি শিকাগো ধর্মসভায় যোগ দিতে ১৮৯৩ সালের ১৩ মে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে হিন্দুধর্মের বিষয় বক্তৃতা করে সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলেন। এরপর তাঁকে আমেরিকার বহু স্থানে বক্তৃতা করতে হয়। বহু জ্ঞানী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরে তিনি অসামান্য সংবর্দ্ধনা পান। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন এবং ১৮৯৯তে বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। ১৮৯৯ সালে আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দ্বিতীয়বার আমেরিকা যান। ফেরার পথে ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তাঁর দেহান্তর ঘটে।

বিবেকানন্দ প্রকৃত রাজনীতিতে নামেন নি। কিন্তু তাঁর উদাত্ত আহ্বান যুবকদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ, স্বাদেশিকতা প্রদীপ্ত করে। তিনি কখনই আত্মনিমগ্ন সন্ন্যাসী চান নি। ধর্ম ও কর্মের এক বিচিত্র সমন্বয়ে তিনি মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলবার আহ্বান জানান। ধর্মপ্রাণ জাতি এ আহ্বানে বাঁধন ছিঁড়বার আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বীরেন চট্টোপাধ্যায় ॥ ভারতের বাইরে থেকে যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন, বীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। বাবা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অঘোরনাথ। পিতার কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। আদি নিবাস ঢাকার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গাঁ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ স্নাতক হয়ে বিলেত যাত্রা করেন আই. সি. এস পরীক্ষা দেবার জন্য। সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকারের মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন। বিলেতে ব্যারিস্টারী করতে করতে ১৯০৬ নবীন তুর্কীর অবিসংবাদী নেতা কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য চান। এ সময়ে শ্যামজীকে বিদেশে যেতে হয়। বীরেন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' এর পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় ইংলণ্ডের ভারতীয়

রাজনৈতিক দলের সভ্যদের শিক্ষার দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপরে। মদনলালের হাতে কার্জন ওয়ালির মৃত্যুর পর তাঁর ওকালতি ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে প্যারিসে চলে আসেন। এখান থেকে তিনি তলোয়ার ও বন্দেমাতরম পত্রিকা দুটির পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯১০ সালে তিনি ফরাসী সোসালিস্ট পার্টির সভ্য হন এবং সম্ভবতঃ এক ফরাসী মহিলাকে বিয়ে করেন, যিনি পরে নান্ হয়ে যান।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর আগে তিনি জার্মানীতে চলে যান। সেখানে কাইজারের সঙ্গে তাঁর ভারতবর্ষ স্বাধীন করবার লক্ষ্যে সাহায্য করবার জন্য এক চুক্তি হয়। তাতে স্থির হয় ভারতে এক সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাতে অষ্ট্রে-জার্মান শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই উপলক্ষ্যেই গড়ে ওঠে বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স কমিটি যা ভারতের ইতিহাসে 'বার্লিন কমিটি' নামে খ্যাত। এদের সঙ্গে যোগ দিতেই বাঘা যতীনের দলের নরেন ভট্টাচার্য ১৯১৫ সালে গোড়ার দিকে বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের আমলে বার্লিন কমিটি সারা বিশ্বে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধের সমর্থনে সর্বপ্রকার সাহায্য চেয়ে বেড়ায়। তবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে বার্লিন কমিটির কাজও শেষ হয়।

১৯২০ সালে তিনি মস্কো যান। ১৯৩২ সালে হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বে তিনি লেনিনগ্রাদের 'ইন্‌স্টিটিউট অব এথনোগ্রাফি'র ভারতীয় বিভাগের প্রধান-রূপে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে স্টালিনের আদেশে গ্রেপ্তার হন। তারপর তাঁর আর হদিশ মেলে নি। তবে সোভিয়েতের ২০তম কংগ্রেসের পুনর্বিচারে তিনি সাচ্চা কমিউনিস্টরূপে সম্মানিত হন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়॥ ১৮৬১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার খানানে জন্ম হয়। পিতার নাম দেবীচরণ বন্দোপাধ্যায়। পিতা পুত্রের নাম রাখেন ভবানীচরণ। ভবানী হুগলী কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে জেনারেল ইন্‌সটিটিউশনে ভর্তি হন। ক্ষাত্রতেজে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্নে ভবানী পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। ১৮৮৭ সালে কেশব সেনের কাছ থেকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সিন্ধু প্রদেশে যান ধর্ম-প্রচার করতে। সেখানে প্রথমে রোমান ক্যাথলিক পরে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান হন। এ সময়ে তিনি পর পর অনেকগুলি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রচার করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে পুনরায় হিন্দুধর্ম প্রচারে বিলেতে যান। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে বক্তৃতা করে প্রসিদ্ধ হন।

১৯০১ সালে দেশে ফিরে তিনি কলকাতার সিমলা অঞ্চলে 'সারস্বত আয়তন' নামে বৈদিক আদর্শে এক বিদ্যালয় খোলেন। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে মিল থাকায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ব্রহ্মবান্ধব বলতেন সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'গোলদিঘীর গোলাম খানা'।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব (নাম দীক্ষাকালে স্বামীজির দেওয়া) স্বদেশ মুক্তির স্বপ্নে তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকা আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানায়। সরকার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন। তিনি ঘোষণা করেন, ইংরেজের আইন তিনি মানেন না, আর ইংরেজের কারাগারেও তাঁকে বন্দী রাখা যাবে না। মামলা চলাকালেই তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। এর তিনদিন পরে ১৯০৭ সালে ২৭ অক্টোবর ধনুষ্টংকার হয়ে তিনি মারা যান।

ভবানী পাঠক॥ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। তাঁর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৮৭ এর জুন মাসে। ঐ সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী এসে ঢাকার কাস্টমস্ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করেন যে ভবানী পাঠক নামে একজন দুঃসাহসী তাদের নৌকা লুট করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং বরকন্দাজ পাঠালেও তাঁকে বন্দী করা সম্ভব হল না। বরং ভবানী পাঠক ইংরেজ শাসন অস্বীকার করে দেবী চৌধুরানী নামে এক দলনেত্রীর সহায়তায় ময়মনসিংহ ও বগুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন অচল করে দেন। অবশেষে লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনণ্ডের নেতৃত্বে এক বিশাল ইংরেজ বাহিনী তাকে বেষ্টন করে ফেলে। ভবানী পাঠক স্বল্প অনুচর সহ ধরা পড়ে যান। পালাতে গিয়ে শেষ জলযুদ্ধে ভবানী নিহত হন।

রংপুর জেলা বিবরণে তাঁকে রংপুরের রাজপুরবাসী বলা হয়েছে। মূল নায়ক মজনু সাহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

ভুলাভাই জীবনজী দেশাই॥ (১৮৭৭-১৯৪৬) বোম্বাই হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা করে শেষে ঐ হাইকোর্টের অ্যাভভোকেট জেনারেল হন। কর্মজীবনের সূচনা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮১তে তিনি বারদৌলির কৃষকদের সমর্থন করেন। ১৯৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সালে আজাদ্ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি অন্যতম প্রধান আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ভাষণগুলি তাঁর দেশপ্রেমের জলন্ত উদাহরণ।

মজনু শাহ ॥ মজনু শাহের পরিচয় নিয়ে দ্বিধা আছে। কারো মতে বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে তার বাড়ি। কেউ বলেন ওখানে বসবাসের আগে তিনি বিহার ও অযোধ্যার মধ্যবর্তী মাখনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১০৭২ সালে নাটোর অঞ্চলে মজনুর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সক্রিয় হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মজনু ছত্রভঙ্গ দলের পুর্ণগঠন শুরু করে। মজনু দিনাজপুর জেলায় এলে ঐ বছরের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী গোপন পথে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ত াঁর ঘাটি আক্রমণ করে। মজনু গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যান এবং অতর্কিতে পাল্টা আক্রমণ করেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মজনুকে ধরা যায় না। বরং তারা বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহের বহু অঞ্চলে কর আদায় করতে থাকে। তারা সাধারণ মানুষের কাছে স্বেচ্ছাদান ছাড়া গ্রহণ করত না। এ জন্য জন সমর্থন ছিল প্রবল।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর মজনু শাহ অল্প অনুচর নিয়ে বগুড়া জেলার পুব দিকে যাত্রা করলে কালেশ্বরের কাছে ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে মজনু ভীষণভাবে আহত হন। অনুচরেরা তাকে নিয়ে পালায়। মাখনপুর গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়।

মতিলাল নেহরু ॥ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৬ মে আগ্রায় জন্ম। বাবা গঙ্গাধর কাউল। মতিলাল কানপুর হাইস্কুলে এলাহাবাদ মুইর কলেজে পড়াশুনা করে 'ভকিল' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি শীর্ষ-স্থানীয় ব্যবহারজীবীরূপে সম্মানিত হন এবং প্রচুর ধন ও যশ উপার্জন করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে ১ চার্চ রোডে তিনি যে বাসভবন তৈরী করেন আজ তা 'আনন্দভবন' নামে যাদুঘর।

১০৮৫ সালেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু তখন সংযোগ ছিল ক্ষীণ। বস্তুত: তিনি তখনও নরমপন্থীদের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি এলাহাবাদ থেকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস যে সমিতি গঠন করে মতিলাল তার সদস্য মনোনীত হন। এই সূত্রে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা ঘটে। ঐ বছরই তিনি কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। গান্ধীজির অসহযোগের সমর্থনে তিনি হাইকোর্টের আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলের সভ্যপদও ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে এলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পরিচালন করতে গিয়ে

তিনি প্রথমবার গ্রেপ্তার হন। এরপর থেকে তিনি ক্রমেই চরমপন্থীদের দলভুক্ত হয়ে পড়েন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা গেলে তিনি চিত্তরঞ্জনের মত সমর্থন করেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় স্বরাজ্য দল গড়ে ওঠে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। ১৯২৬ সালে সাঁইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কালে সর্বদলীয় সম্মেলন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য যে কমিটি গঠন করে মতিলাল তার সভাপতি হন। ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনে মতিলাল সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল বন্দী হন। তিনি পিতাকে অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত করেন। ঐ সময় তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হত। জুন মাসে তিনিও কারারুদ্ধ হন। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় ফলে সেপ্টেম্বরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবৎসর ৬ ফেব্রুয়ারী তাঁর দেহান্তর ঘটে।

মদনমোহন মালব্য ॥ ১৯৬১ সালের ২৫ অক্টোবর জন্ম। পিতা ব্রজনাথ, জন্ম এলাহাবাদ। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে এলাহাবাদ মুইর কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে আইন পাশ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি নানা পত্র পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন।

১৮৮৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৯ সালের লাহোর, ১৯১৮ ও ১৯৩২ সালের দিল্লী অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। দিল্লী অধিবেশনে যোগ দেবার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩১ সালে তিনি দ্বিতীয় গোল বৈঠকে যোগ দেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ১৯৪৬ সালের ১২ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মদনলাল ধিংড়া ॥ মদনলাল পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পড়াশুনা হয় অমৃতসরে এবং লাহোরে। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। ১৯০৬ সালে তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। আগ্নেয়াস্ত্র চালনার শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়া অফিসের রাজনৈতিক এ. ডি. সি. উইলিয়াম কার্জন

উইলিকে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউসনের এক সমাবেশে গুলি করে হত্যা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর এ কাজ 'স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় যুবকদের ওপর অমানবিক ফাঁসি ও দীপান্তর করণের দীন প্রতিবাদ'। তিনি আত্মসমর্পণ করেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট পেন্টনভিল জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মহাদেব দেশাই॥ গুজরাটের সুরাটে ১৮৯২ সালে জন্ম। তাঁর পিতার নাম হরি ভাই দেশাই। তিনি সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক হয়ে আইনে ডিগ্রী লাভ করেন। বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন আইন ব্যবসা। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আকর্ষণে রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি গান্ধীজির দিবারাত্রের সঙ্গী এবং একান্ত সচিব হন। ১৯২৯ সালের অসহযোগ, ১৯৩০ এর আইন-অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট অন্যান্য সকল নেতার সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং পুনা আগা খান প্রাসাদে বন্দী থাকেন। বন্দী অবস্থায় ১৯৪২ সালের ১৫ই আগস্ট মারা যান।

মাতঙ্গিনী হাজরা॥ সম্ভবতঃ ১৮৭০ সালে মেদিনীপুরের হোগলা গ্রামে মাতঙ্গিনী মাইতির জন্ম হয়। পিতা ঠাকুরদাস। স্বামীর নাম ত্রিলোচন হাজরা। আঠার বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। ১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারী স্থানীয় কর্মীরা জাতীয় পতাকা নিয়ে যে শোভাযাত্রা করে, মাতঙ্গিনীকে তাতে দেখা যায়। এই বছরেই আলিনান কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করেন। পুলিশ গ্রেপ্তার করে বহুদূর হাটিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

এরপর চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা করেন এবং 'গভর্নর ফিরে যাও' ধ্বনি দিয়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি বহরমপুর জেলে ছিলেন। রোগাদিতে তিনি সর্বত্র সেবা করে বেড়াতেন বলে তাকে 'গান্ধীবুড়ি' বলা হত।

২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২) তিনি বিশাল সেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে থানা দখল করতে যান। পুলিশ গুলির ভয় দেখালে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়। বীর মাতঙ্গিনী একা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলে এগিয়ে যান। পুলিশের গুলিতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মানবেন্দ্র রায় ॥ প্রকৃত নাম নরেন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ জন্ম। পিতার নাম দীনবন্ধু। বাড়ি ২৪ পরগণার আড়বেলিয়া। বিপ্লবী কাজে নানা সময়ে সি. মার্টিন, হরি সিং, মিঃ হোয়াইন্‌, মানবেন্দ্র রায়, ডি. গার্সিয়া, মিঃ ব্যানার্জি, ডাঃ মাহমুদ ইত্যাদি নানা নাম গ্রহণ করলেও মানবেন্দ্র রায় নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। ১৯০৫ সালে গুপ্ত বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা মিছিলে যোগ দেওয়ায় হরিনাভি অ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ১৯০৬ সালে পাশ করে যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্‌টিটিউটে যোগ দেন। পর বৎসর চাংড়িপোতা (বর্তমান সুভাষ নগর) রেল স্টেশনে ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান। আলিপুর বোমার মামলার পর বিপ্লব কর্মে ভাটা পড়লে বাঘা যতীনের সহকর্মী রূপে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যোগ দেন। ১৯১০ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। কিন্তু এবারেও প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৃটিশের শত্রু জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করবার এক বিশদ পরিকল্পনা করেন। এ সব প্রস্তুতির খরচ চালাবার জন্য ১৯১৫ সালের ১২ জানুয়ারী এবং ২২ ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় দুটি ডাকাতি করে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করে। কিন্তু বাঘা যতীন ও পূর্ণদাসের নির্দেশে রাধারমণ সরকার নামে এক বিপ্লবী নিজে সব দায় গ্রহণ করে এক স্বীকারোক্তি দিয়ে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা নিয়ে জেলেই মৃত্যুবরণ করেন। আর নরেন্দ্রনাথ সি. মার্টিন নাম নিয়ে বাটাভিয়া যাত্রা করেন। মাত্র দু' মাসের মধ্যে যোগাযোগ সম্পন্ন করে মার্টিন ফিরে আসে। কি ভাবে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। মার্টিন আবার বিদেশ যাত্রা করে। তাঁর সঙ্গী ধরা পড়ে কিন্তু তিনি হরি সিং নামে ফিলিপাইনে নামেন। সেখান থেকে মিঃ হোয়াইট নামে জাপানে পৌঁছে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ সময় সান্‌-ইয়েৎ-সেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

এরপর নানা প্রতিকূল অবস্থায় দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিতে হয় তাঁকে। নিরাপদ ভেবে আমারিকায় গিয়েও স্পাই সন্দেহে পড়েন। চলে যান মেক্সিকো। সেখানে সোসালিস্টদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে পরিণত করেন এবং রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তক রূপে তাঁর নাম সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময় তিনি লেনিনের কাছ থেকে মস্কো যাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। ভি-গাসিয়া নামে তিনি মেক্সিকো ত্যাগ করেন এবং ১৯২০ সালে মস্কো পৌঁছে মে দিবসের সমাবেশে বক্তৃতা দেন। লেনিন তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান করতেন। ১৯২০ সালের মস্কো কংগ্রেসে তাঁর থিসিস্ লেনিনের থিসিসের পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় তাঁর মতামত, কার্য প্রণালী সোভিয়েতে উচ্চ সম্মান লাভ করে। তিনি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নানা কমিটিতে মনোনীত হতে থাকেন।

১৯২৪ সালে তিনি (লেনিনের মৃত্যুর পর) চীনে প্রেরিত হন। কিন্তু এখানে পার্টির সঙ্গে মত পার্থক্য দেখা দেওয়ায় তিনি চীন থেকে বহিষ্কৃত হন। কমিউনিস্ট জগতে ত‍াঁর মতামত নিন্দিত হতে থাকে।

১৯৩০ সালে তিনি ডাঃ মাহ্‌মুদ নামে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৩১ সালে তিনি বোম্বাইতে ধরা পড়েন। ছ'বছর কারাবাসে কাটে। এর পর তিনি নানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। নানা দল গড়েন। তাত্ত্বিকদের নিকট তিনি অভিনন্দিত এবং ধিকৃত। তিনি সতেরটি ভাষা জানতেন। তার মধ্যে পাঁচ ছ'টি ভাষায় ত‍াঁর গ্রন্থ আছে। তিনি ১৯৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারী মারা যান। দেরাদুন ইণ্ডিয়ান রেনেশাঁ ইন্‌স্টিটিউট তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের চেষ্টা করছে।

মালাপ্পা ধানসাট্টি ॥ মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে ১৮৯৮ সালে জন্ম। বাবার নাম রেবনসিদ্ধাপ্পা। ষষ্ঠ মান পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে শোলাপুরের প্রভাবশালী নেতা হিসাবে ত‍াঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ৮মে গান্ধীজির গ্রেপ্তার সংবাদে যে প্রতিবাদ মিছিল বের হয় তা পরিচালনা করেছিলেন তিনি। ঐ মিছিলে পুলিশের গুলিতে বহুজন আহত হয় ও মারা যায়। ফলে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে আক্রমণ করে। একজন পুলিশ মরে। একজন জীবন্ত দগ্ধ হয়। শোলাপুরে মার্শাল-ল জারি হয়। কয় জনের সঙ্গে মালাপ্পাও ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ২০০০ টাকা জরিমানা ও প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১২ জানুয়ারী ১৯৩১ মারবেদা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

যতীশচন্দ্র পাল ॥ নদীয়া জেলার কমলাপুরে জন্ম। বাবার নাম মাধব চন্দ্র। বাঘাযতীনের বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। মেভারিক জাহাজ থেকে উড়িষ্যার বালেশ্বরের উপকূলে অস্ত্র নামাবার দায়িত্বে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যান

১৯১৫-র সেপ্টেম্বর মাসে। কপ্তিপোদার সম্মুখ-সমরে তাঁকে পুলিশ বন্দী করে। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পুলিশের অত্যাচারে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। অবশেষে ১৯২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর বহরমপুরের পাগলা গারদে তাঁর মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রনাথ দাস॥ ১৯০৪ সালের ২৭ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম। পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী॥ ১৯২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পর বৎসর বন্যার্তদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ১৯২৩ সালে শচীন সান্যাল ভবানীপুরে দল গঠন করতে থাকলে তিনি ঐ দলে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে লাহোর জেলে পাঠান হয়। সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ৬৩ দিন অনশন করে দেহত্যাগ করেন। (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (বাঘা যতীন)॥ ১০৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার কয়াগ্রামে জন্ম। কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। এফ. এ. পড়া ছেড়ে সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শেখেন। এবং ক্রমে বাঙলা সরকারের দুই সেক্রেটারী লুইলার ও হুমালীর স্টেনোগ্রাফার হন। এই কালে কুষ্টিয়ার কাছে সামান্য এক ছোরা হাতে বাঘ মেরে বাঘা যতীন নামে পরিচিত হন।

১৯০৩ সালে অরবিন্দ ও যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বোমার মামলার পর থেকে বিপ্লবী দলগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। যতীন্দ্রনাথ তাদের একত্রিত করতে থাকেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুগান্তর দলের দায়িত্ব পান। তিনি সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর নির্দেশে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য সি. মার্টিন নামে বিদেশে যান। বিদেশ থেকে অস্ত্র আনবার আয়োজন করে তিনি ফেরেন। সেই অস্ত্রের এক অংশ বালেশ্বরের কাছে বুড়ি গঙ্গা নদীর তীরে গ্রহণ করতে গেলে পুলিশ গোপন সংবাদ পেয়ে ঘিরে ফেলে। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ ট্রেঞ্চ খুঁড়ে যুদ্ধ করলে তাঁর তিন সঙ্গী নিহত হয়। তিনি নিজে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হন। পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।। ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। নানা বিদ্যালয়ে পড়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের কৃত্রিমতা রবির ভাল লাগেনি। বাড়িতে টাসবুনাট শিক্ষায় বালক নানা বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে। বছর দশেক বয়সে কবিতা লেখার হাতেখড়ি। ১৭ বছরে বিলেতে যান ব্যারিস্টারি পড়তে। দেড় বছর পরে ফিরে আসেন পাশ্চাত্য গানের শিক্ষায় মন ভরিয়ে। দেড় বছরের মাথায় স্বদেশে ফিরে সাহিত্য-চর্চা নিয়ে মেতে ওঠেন। এ সময়ে পত্রিকা-সম্পাদনা, অভিনয় নাট্যরচনাও তাঁর আনন্দ ও আকর্ষণের বিষয়।

১৮৮৪ থেকে বিষয়কর্ম পরিচালনের দায়িত্ব পান। এ সময়ে তাঁর প্রকৃত সমাজ সন্দর্শন ঘটে। তার ফলে আমরা পাই ছোট গল্পের মালা। ১০৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর রবির বিয়ে হয়। পুত্র কন্যার লেখা পড়ার কথা ভাবতে গিয়ে তিনি শিক্ষা সমস্যার প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন (২২. ১২. ১৯০১)। এ বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে সহায়তা করেন ও শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ঐ বিদ্যালয়ই আজ ক্রমে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে যে ঝড় ওঠে কবি রবীন্দ্রনাথ তাতে জড়িয়ে পড়েন। শুধু কবিতা প্রবন্ধ ও গান লিখে নয়, কবি প্রত্যক্ষ পথে নামেন ১৬ই অক্টোবর। বয়কট আন্দোলন উপলক্ষ্যে কবির সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় তিনি সরে দাঁড়ান। সন্ত্রাসবাদের সমর্থন না করলেও তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম মানুষ যিনি প্রকাশ্য সভায় ক্ষুদিরামের বীরত্ব ও নির্ভীকতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করেন।

১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাবার পর তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে সম্মাণিত হতে থাকেন। গান্ধীজি ভারতে ফিরেই দেখা করতে আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' নাম তাঁরই দেওয়া। গান্ধীজি তাঁকে সসম্মানে আহ্বান করেন 'কবিগুরু'।

প্রকৃত রাজনীতিতে না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতিকে যে মর্যাদায় দেখেছেন, তা আর কারো পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। তিনিই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জড়িত করায় তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করে। ব্রিটিশ শক্তিকে দেশ ছেড়ে যেতেই হবে, একথা তিনি বারংবার

ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক উদ্বেলতা যখন হানাহানির পথ নিয়েছে, তখনই তিনি ঘোষণা করেছেন, মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান হারানো পাপ। প্রত্যেক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচিত প্রবন্ধ ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর যে ত্রিকালদর্শী মানসিকতা প্রকাশ করে, তা সেকালে উপেক্ষিত হলেও আজ আমাদের কাছে দিশারী।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিশ্বভ্রমণ করেছেন। শেষ বয়সে তিনি যান সোভিয়েত দেশে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে তিনি বলেন মানবতার তীর্থভূমি। ওখান থেকে ফিরে তিনি শ্রীনিকেতনে কৃষি শিল্প শিক্ষা গড়ে তোলেন। বাঙলা শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই যা তাঁর স্পর্শে সমৃদ্ধ না হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ—এই দুটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের গান। এ দুর্লভ সম্মান পৃথিবীর অন্য কোন কবির নেই।

রহিমুল্লা ॥ সুন্দরবন অঞ্চলের বারুইখালি গ্রামে কৃষক মোড়ল ও নেতা। মরেল সাহেবের জমিদারীতে ম্যানেজার ডেনিস হেলির উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজকে জাগিয়ে তোলেন এবং ১৮৬১ সালে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং প্রাণ দেন।

রাজগোপাল আচারী, চক্রবর্ত্তী ॥ ১৮৭৯ সালে জন্ম। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল। আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। জন্ম দিনেই সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও গান্ধীজীর আহ্বানে ব্যবসা ত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালে রাওলাট বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করেন এবং বন্দী হন। পরবৎসরেও অসহযোগেও যোগ দেন। দু বারেই কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য ও ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। ভারত ছাড় আন্দোলন ও মুসলীম লীগ সম্পর্কে কংগ্রেসী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। পরে ১৯৪৫ সালে আবার কংগ্রেসে যোগ দেন।

১৯২২ থেকে'৪২ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য। তিনি কয়েকবার মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, ভারতের গভর্ণর জেনারেল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্বের দায় তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯৫১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদে তিনি স্বতন্ত্রদল গঠন করেন। রাজাগোপাল ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রসাশনিক দক্ষতার জন্য খ্যাত। ১৯৫০ সালে তিনি 'ভারত রত্ন' উপাধি পান। ১৯৭২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী। ১৯০১ সালে পাবনা জেলার মোহনপুরে জন্ম। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ আমলের রাজনৈতিক কর্মী। পিতার কাছ থেকেই রাজেনের দেশপ্রেমের দীক্ষা। উচ্চশিক্ষার জন্য কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন তিনি। ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে বি. এ পাশ করে এম এ পড়তে পড়তে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট কাকোরী রেল ডাকাতিতে যে যোল জন অংশ নেন, রাজেন লাহিড়ী তাদের অন্যতম। এই সময়ে সাংগঠনিক প্রয়োজনে রাজেনকে পাঠান হয় কলকাতায় বোমা তৈরীর কৌশল শিখে আসতে।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে রাজেন লাহিড়ীকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে বোমা তৈরীর কারখানায় ধরা হয়েছিল বলে এক বিশেষ মামলায় দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র এবং আরও কয়েকটি মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রাজেন দণ্ড মকুবের জন্য দরখাস্ত করেন নি। ১৯২৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। রাজেন হাসিমুখে মঞ্চে ওঠেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর সে হাসি মেলায়নি।

(ডঃ) **রাজেন্দ্র প্রসাদ॥** ১৮৮৪ সালে জন্ম। তিনি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সুলেখক, জাতীয়তাবাদী নেতা ও স্বাধীনভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

রাজেন্দ্র প্রসাদ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে। তিনি তাতে সক্রিয় অংশ নেন। সেই অসহযোগেও তিনি অংশীদার ছিলেন। আইন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি কলকাতা এবং পরে পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং প্রভূত বিত্তের অধিকা হন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সে সব ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি বহুবার কারা-বরণ করেন। তিনি বহুবার কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী থেকে সাধারণতন্ত্রী ভারত গঠিত হলে তিনি রাষ্ট্রপতি হন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। পরবৎসর তাঁর মৃত্যু হয়।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস॥ চট্টগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম দুর্গাকৃপা। গুপ্ত বিপ্লবীদের সভ্য হন ছাত্রাবস্থায়। ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিজ জেলায় প্রথম হন। ১৯৩০ সালে বোমা তৈরী করতে গিয়ে ভীষণ ভাবে আহত হন। মাস্টার দা (সূর্যসেন)-র নির্দেশে পুলিশ

ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগকে হত্যা করতে চাঁদপুরষ্টেশনে ভুল করে পুলিশ অফিসার তারিনী মুখার্জিকে হত্যা করেন। ২২ মাইল দূরে গিয়ে ধরা পড়েন। প্রীতিলতা বোনের পরিচয়ে এঁর সঙ্গেই দেখা করতে যেতেন। মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে এতদূর অনুপ্রাণিত করে যে সে আত্মদানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

রামকৃষ্ণ রায়॥ মেদিনীপুর জেলার চিরিমাতসাই-এ ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারী জন্ম। বাবার নাম কেনারাম। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করেন। এই অভিযোগে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর তাঁর ফাঁসি হয়।

রামপ্রসাদ বিশমিল॥ উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত শাজাহানপুরে জন্ম। পিতার নাম মুরলীধর তেওয়ারী। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। কাকোরী মেল ডাকাতি থেকে সেই সময়ের বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত ছিলেন। বন্দী হলে তাঁকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গোরক্ষপুর জেলে ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়।

রাসবিহারী বসু॥ ১৮৮৫ সালের ২৫মে তারিখে বর্ধমান জেলার সুবলদহে রাসবিহারী বসুর জন্ম হয়। বাবা বিনোদবিহারী চন্দননগরে থাকতেন। সেই সূত্রে সেখানেই পড়াশুনা করতেন। ডুপ্লে কলেজে পড়াকালে চারু রায় তাঁকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে প্রথম ও শেষবারের মত গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান।

এবার রাসবিহারী চলে যান দেরাদুনে। সেখানে তিনি ছিলেন ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউশনের হেডক্লার্ক। এখান থেকে তিনি সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তোলেন। আমীরচাঁদ, অবোধ বিহারী, বালমুকুন্দ ইত্যাদি বিপ্লবীরা তাঁর হাতে গড়া। যুদ্ধের সুযোগে তিনি সর্বাত্মক বিদ্রোহের আয়োজন করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনিই হার্ডিঞ্জ হত্যা পরিকল্পনা করেন। লাহোরে লরেন্স গার্ডেন হত্যা চেষ্টা তাঁরই কল্পিত। এ সব ষড়যন্ত্রের সূত্রে পুলিশ তাঁকে খুঁজতে থাকে। প্রচুর অর্থ পুরস্কার ঘোষিত হয়। কিন্তু তিনি সে সব উপেক্ষা করে শচীন সান্যালের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেনারসে সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করতে থাকেন। কিন্তু ভারত তাঁর পক্ষে তখন বিপদজনক

হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পি. এ. পরিচয়ে পি. এন. ঠাকুর নাম নিয়ে জাপান পালিয়ে যাবার সুযোগ করে নেন।

জাপান থেকে তিনি ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সেখানে 'টোকিও ইণ্ডিয়ান লীগ' তাঁর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪১ সালে তাঁরই উদ্যোগে পূর্ব এশিয়ার বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠিত হয়। পরে সুভাষচন্দ্রের হাতে সব দায়িত্ব তুলে দেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীর কোন সময়ে জাপানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লাজপৎ রায়, লালা ॥ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত জাগরাঁও গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধাকিশন শিক্ষকতা করতেন। লাহোর কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৭-এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হংস রাজগুরু দত্ত বিদ্যারথী ও তাঁর চেষ্টায় পাঞ্জাবে আর্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হিসার জেলায় ওকালতি শুরু করেন। ১৮৮৫ সালের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের আগে থেকেই তিনি সর্বভারতীয় নেতা রূপে স্বীকৃত। ১৯০৮ সালের ১০ মে তিনি এবং তার সহযোগী অজিত সিং ধৃত হন এবং মান্দালয়ে বন্দী হিসাবে প্রেরিত হন। ১৮১৩-র বর্ধমানে বন্যার জন্য তিনি হাজার টাকা দান করেন। পর বৎসর আর্য সমাজ কলেজের জন্য দেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভারতের উৎপশ্চিত জাতির উন্নতি কল্পে দেন ত্রিশ হাজার টাকা। নিজ জন্মভূমিতে স্বর্গতঃ পিতার নামে এক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেন দশ হাজার টাকা।

মান্দালয় থেকে মুক্তি পেয়ে আমেরিকায় যান।' সেখান থেকে ১৯১৯ সালে ভারতে ফিরে আবার রাজনীতিতে যোগ দেন। সে বছর কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। ১৯২১-২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে-এ কারারুদ্ধ থাকেন। ১৮২৮ মে সাইমন বিরোধী আন্দোলনে এক মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে আহত হন। এর কদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম দিকে লালা লাজপৎ রায়, বিপিন পাল, তিলকের মতাদর্শে চরমপন্থী ছিলেন। এ জন্যই সেকালে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা হত 'লাল-বাল-পাল' পরে তিনি গান্ধী অনুবর্তী হন।

লোকনাথ বল ॥ ১৯০৭ সালে জন্ম বলে অনুমান করা হয়। চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ায় জন্ম। পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ। সূর্য সেনের দলভুক্ত ছিলেন ৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে তার নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে

পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে বিপ্লবীদের যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়, তারও অধিনায়ক ছিলেন লোকনাথ। এই যুদ্ধে তাঁর অনুজ হরিগোপাল (টেগরা) ও আরও বহুজন নিহত হন। যারা পালাতে সক্ষম হন, তিনি তাদের মধ্যে একজন। চন্দননগরে তাঁর আশ্রয় মেলে। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তাঁর আস্তানা ঘিরে ফেলে টেগার্ট। তারা গুলি চালিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। জীবন (মাখন) ঘোষাল নিহত হন। লোকনাথ ধরা পড়েন। এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হন।

১৯৪৬ সালে মুক্তির পর কিছুদিন মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিক্যালি পার্টিতে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন কংগ্রেসেও ছিলেন। পরে রাজনীতির সংশ্রব ছেড়ে দেন। ১৯৬৪ সালে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান।

শচীন সান্যাল ॥ ১৯১৩-তে বারানসীতে জন্ম। ১৯০৭ সালে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। দু'বছরের মধ্যে বারাণসীতে 'ইয়ং ম্যানস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সময় প্রতুল গাঙ্গুলী, রাসবিহারী বসু ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে একান্তভাবে রাসবিহারীর অনুবর্ত্তী। রাসবিহারী সেনাদলে বিদ্রোহ ঘটাবার যে পরিকল্পনা করেন, তাতে ৭ম রেজিমেণ্টের বিদ্রোহের দায়িত্ব ছিল শচীন সান্যালের। রাসবিহারী পলায়নের পর শচীন সান্যাল ধরা পড়েন এবং লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২০ সালে তিনি মুক্তি পান। তিনি আবার বিপ্লবী দল গড়েন। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী আবার গ্রেপ্তার হন এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে মুক্তি পান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ১৯৪১ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। সন্দেহ ছিল যে তিনি জাপানের কাছ থেকে অস্ত্র এনে দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টা করছেন। জেলের মধ্যে যক্ষা হয়। ফলে মুক্তি দেওয়া হয়। গোরক্ষপুরে অন্তরীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সিধু মাঝি ॥ সাঁওতাল পরগণার ভাগ্‌নাডিহি গ্রামে জন্ম হয়। গ্রাম-প্রধানের সন্তান। ভাই কানুসহ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। বিশ্বাস ঘাতকতায় ধরা পড়েন। পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ॥ মুর্শিদাবাদে জন্ম। ১৭৩০ সাল। পিতার নাম জইমুদ্দিন। আলীবর্দী খাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র। ১৭৫৬ সালে অপুত্রক আলীবর্দীর

মৃত্যুতে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পান। সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধীতা শুরু হয়। কাশিমবাজার কুঠি দখল করে ১৭৫৬-র ২০ জুন কলকাতা অধিকার করেন। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে এসে লর্ড ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়। কিন্তু নবাব ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইংরেজদের বিতাড়নের আয়োজন করছেন জেনে ক্লাইভ চন্দননগর দখল করেন এবং সিরাজের বিশিষ্ট সভাসদ ও সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নবাবকে পলাশীর মাঠে আক্রমণ করেন। সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নাম মাত্র যুদ্ধে ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে নবাব পরাজিত হন। বন্দী সিরাজকে হত্যা করা হয়।

শিবরাম রাজগুরু ॥ উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে জন্ম। বাবার নাম হরি রাজগুরু। বৈপ্লবিক সংস্থায় যোগ দেন প্রথম যৌবনে। ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ইনিও স্যাণ্ডার্স হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। অনেকদিন পলাতক জীবন যাপনের পর পুনার এক মোটর গ্যারেজ থেকে তাঁকে ১৯২৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩০ সালের 'লাহোর ষড়যন্ত্র' মামলার তিনি প্রধান আসামী। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়।

শুকদেব (অন্যনাম দয়াল) ॥ বর্তমান পাকিস্থানের অন্তর্গত লয়ালপুর-এ জন্ম। বাবার নান রামলাল। তিনি বিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বৈপ্লবিক সংস্থাকে দৃঢ় করবার দায়িত্ব পান। তিনি ভকৎ সিং-এর ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন।

লাহোরের সহকারি পুলিশ সুপার মিঃ স্যাণ্ডার্স হত্যার তিনি সহযোগী ছিলেন, ভকৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা ফেল্‌লে ১৯২৯ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি গ্রেপ্তার হন। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁর বিচার হয় এবং ফাঁসির হুকুম হয়। লাহোর জেলে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়।

সরোজিনী নাইডু ॥ ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী পিতা অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে জন্ম। ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করেন। নাটিকা লেখার জন্য নিজামের বৃত্তিতে ইংলণ্ডে যান। ইংরেজীতে কাব্য লেখার জন্য খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৯৮ সালে ডাঃ মোতিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯১৫-তে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন, ১৯১৯-এ ভারতীয় নারীর অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৯২৫-এর কানপুর কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী। ১৯২৮ এ আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতার তাৎপর্য বিষয়ে

বক্তৃতার জন্য যান। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারা বরণ করেন। লবণ সত্যাগ্রহের নেত্রী। ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যান।

স্বাধীনতার পর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন। ১৯৪৯ সালের পয়লা মার্চ মারা যান। চট্টোপাধ্যায় তাঁর দাদা।

সাভারকার, বিনায়ক দামোদর ॥ ১৮৮৩ সালে জন্ম। জন্মস্থান নাসিক জেলার ভাঙ্গুর গ্রাম। পিতা ছিলেন কবি দামোদর কণ্ঠ সাভারকার। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে যান ব্যারিস্টারি পড়তে।

দক্ষিণ ভারতের স্বাদেশিক মন্ত্র প্রচারক মিত্রমেলা ও অভিনবভারত সংস্থা তাঁর স্থাপিত। লণ্ডনে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট' সস্থার মদনলাল ধিংড়া কার্জন উইলিকে হত্যা এবং নাসিক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাথান নির্ধন তাঁর প্রেরণা ও পরিকল্পনায় ঘটেছে, এই অপরাধে ১৯১০ সালের মার্চে ধৃত হন। ভারতে আনবার সময় যুদ্ধ জাহাজ থেকে পালাতে গিয়েও ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নাসিকের রত্নগিরি জেলে ২৬ বৎসর অবরুদ্ধ থেকে ১৯৩৭ সালেব মে মাসে মুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দেয়। জাতি তাকে সসম্মানে বীর সাভারকার বলে অভিহিত করে।

মুসলিম লীগের পাল্টা তিনি হিন্দু-মহাসভা গঠন করেন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৫০-এ আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৩ সালে তার মৃত্যু হয়।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার ॥ ১৮৫৬-১৯১৬) মাদ্রাজের ভুবিখ্যাত দেশপ্রেমিক। স্কুল শিক্ষক হিসাবে জীবন শুরু করেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে সাংবাদিক হন। ইনি মাদ্রাজের 'হিন্দু' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। পরে 'স্বদেশ মিত্রম্' পত্রিকাও তিনিই প্রবর্তন করেন। বঙ্গভঙ্গ জনিত অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে সম্মিলিত করে সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ গড়তে তার প্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য।

ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ওয়াবা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে বিলেতে যান ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। নানা কারণে তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। তিনি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

সুভাষচন্দ্র বসু ॥ ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারী পিতা জানকীনাথের কর্মস্থল কটকে জন্ম হয়। আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার চাংড়িপোতা (বর্তমান

সুভাষনগর)। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের প্রভাবে স্বাদেশিক বোধে উদ্দীপ্ত হন। ১৯১১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। অধ্যাপক ওটনের বিদ্বেষী প্রচারের প্রতিবাদে তাকে প্রহার করে, কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। স্যার আশুতোষের আগ্রহে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর বি. এ. অনার্স পান। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত সামরিক শিক্ষা পান।

১৯১৯-এ তাঁকে বিলেতে পাঠান হয়। মাত্র ৬ মাস পড়েই তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থস্থান লাভ করেন। এরপর ময়্যাল সায়েন্সে কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপোস পান। কিন্তু দেশে ফিরে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে যুবরাজের ভারত দর্শনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশ মুহূর্তে তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে নেয়। ১৯২৪ সালে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন এবং মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। অসুস্থতার জন্য ১৯২৭ সালে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরেন। এ সময়ে তিনি যুব সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সংযুক্ত হন। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বাহিনী এ সময়েই গড়ে ওঠে। তাঁর প্রভাব সারা ভারতে যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক হারে সামরিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে মতিলাল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবী জানালেও সুভাষচন্দ্র পূর্ণস্বাধীনতার দাবী তোলেন। জওহরলাল তাকে সমর্থন করেন। সে বছর হেরে গেলেও এ দাবী ক্রমে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং দু' বছর পর স্বয়ং গান্ধীজি এ প্রস্তাব আনতে বাধ্য হন। ১৯২৯ এ তিনিই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩১-এ গান্ধী আরউইন চুক্তিতে মুক্ত হন কিন্তু এ চুক্তির বিরোধিতা করেন। ১৯২৯ সালে তিনি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ও ১৯৩০ সালে কলকাতার মেয়র হন। এ সময়ে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। এক বছরের মধ্যে মুক্ত হন কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপে প্রেরিত হন। এই ভ্রমণে তিনি সারা বিশ্বে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থির করে ১৯৩৬-এ দেশে ফেরেন। তাঁর ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাই ভারতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। এক বছর পর মুক্ত হয়ে ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হন। এখানে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবক্রমে এক পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। জওহরলাল তার চেয়ারম্যান পদ পান। কংগ্রেসের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়

তাতে গান্ধীজি সমর্থিত পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র পুনর্বার কংগ্রেস সভাপতি হন। এ সময় তিনি ছ' মাসের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দানের চরমপত্র দিয়ে আন্দোলন শুরু করবার চেষ্টা করলে দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে যে প্রবল বাধা দিতে থাকেন, তাতে সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ মনে ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করেন।

এ সময়ে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে সুভাচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতার কাল। তিনি সারা ভারতে বিপ্লব মনোভাবীদের পৃথক ভাবে সম্মিলিত করতে থাকেন। এই বছরই ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়। তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অবসারণের আন্দোলন শুরু করেন। সরকার দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কালে এই বিপজ্জনক মানুষটিকে বাইরে রাখা সমীচিন মনে না করে গ্রেপ্তার করেন। কারাগারে অনশন করে সে বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পান এবং গৃহে অন্তরীণ থাকেন। ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে দেশত্যাগ করেন। প্রথম যান রাশিয়ায়। পনের দিনেও মার্শাল স্ট্যালিনের দেখা না পেয়ে জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার গঠিত হয় এবং শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। ওদিকে জাপানে অস্থায়ী ভারতীয় সরকার গড়ে রাসবিহারী। সুভাষচন্দ্রকে আরব্ধ কাজের দায়িত্ব দেন।

১৯৪৩ সালের ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌছান। জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সৈনিকরা সুভাষচন্দ্রকে নেতৃপদে পেয়ে যেন নবপ্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। রাসবিহারী আগে থেকেই তাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে রেখেছিলেন। মাত্র দু দিনের মধ্যে তিনি এই বাহিনীও সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। তার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে এ বাহিনী শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়।

এই বাহিনী প্রথমেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। তার নাম রাখে শহীদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ। এরপর তারা ইম্ফল ও কোহিমা দখল করে ভারত ভূখণ্ডে ভারতীয় জাতীয় সরকারকে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আকস্মিক ভাবে জাপান আত্মসমর্পন করলে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করেন। তাই হকুর কাছে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলা হলেও সকলে একথা বিশ্বাস করেন না।

সূর্যসেন ১৮৯৩ সালের ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের নোয়া পাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রমণীরঞ্জন। প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে বহরমপুর কলেজে পড়াশুনা করেন। বহরমপুর কলেজে পড়তে পড়তেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

বি. এ. পাশ করে নিজ গ্রামে ফিরে উমাতারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। সংগঠনিক কর্মে তাঁর সহযোগী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন ইত্যাদি।

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্য বিপ্লবীদের মত সূর্য সেন সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে যোগ দেন। কিন্তু এ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে এলে তার ভেতর দিয়েই বিপ্লবীরা সংগঠিত হয়ে ওঠে। সূর্যসেনের সঙ্গে এ সময়ে সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের যোগ হয়। তিনি চট্টগ্রামে এক অসাধারণ দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন।

এ দল ১৯২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর রেলের টাকা লুট করে। এতে অনন্ত সিং, দেবেন দে, নির্মল সেন প্রত্যেকে অংশ নেন। কয়েক দিন পর পুলিশ অকস্মাৎ তাদের গুপ্ত ঘাঁটি ঘিরে ফেললে এক খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীদল পালাবার সুযোগ করে নেয়। এই সঙ্গে সূর্যসেনও পালাতে বাধ্য হন। আসামে সংগঠন গড়তে গড়তে তিনি ধরা পড়েন। কিন্তু প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান।

১৯২৪ সালে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৮ সালে মুক্ত হয়ে চট্টগ্রামে আসেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাত্র ৬৫ জন কর্মী নিয়ে মাস্টারদা (সূর্য সেন) দুটি অস্ত্রাগার সহ চট্টগ্রাম দখল করে নেন। দখলের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শেখান হয়। প্রায় চারদিন শহর স্বাধীন থাকে। পরে ব্রিটিশ সৈন্য শহর ঘিরে ফেলতে থাকে। বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। সম্মুখ যুদ্ধে অনেকে মারা যায়। রাতারাতি অন্যদের আত্মগোপনের নির্দেশ দেন। পলাতক অবস্থাতেই তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন এবং আসামুল্লা হত্যা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হন। এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী গৈরালা গ্রামে ধরা পড়েন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুচরেরা বিশ্বাসঘাতক নেত্রসেন ও গ্রেপ্তারকারী দারোগাকে হত্যা করে। সারা চট্টগ্রামে নিদারুণ নিষ্পেষণ চালিয়েও একজনকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সংগ্রহ করতে পারে নি। ১৯৩৪ সালের ১১ জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে তার ফাঁসি হয়।

সেনকোট্টা ওয়াঞ্চি আয়ার॥ কন্যাকুমারিকা অঞ্চলের সেনকোট্টা গ্রামে ওয়াঞ্চি আয়ারের জন্ম। পিতা রঘুপতি আয়ার। ত্রিবাঙ্কুরের বন-বিভাগের সামান্য কেরাণী। এন. নাগস্বামী তাকে অস্ত্রচালনা শেখান। ১৯১১ সালে ১৭

জুন মানিয়াচি স্টেশনে ব্রিটিশ সাব কালেক্টর এস. ভন্নু অ্যাশকে হত্যা করে আত্মবিলয়ন ঘটান।

হরিগোপাল বল ॥ চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ায় জন্ম। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করে। ২২শে এপ্রিল জালালবাদ যুদ্ধে প্রাণ দেন।

হিমাংশু সেন ॥ ১৯১৫ সালের কোন সময়ে চট্টগ্রামের হাতিয়াতে জন্ম। বাবার নাম চন্দ্রকুমার। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত বিপ্লবীদলে যোগ দেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন (১৮. ৪. ১৯৩০) তিনি এক দুর্ঘনায় অগ্নিদগ্ধ হন। পরে চন্দনপুর গ্রাম থেকে তাকে বন্দী করা হয়। '৯৩০-এর ১ মে তার মৃত্যু হয়।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ॥ মেদিনীপুরের রাধানগর গ্রামে ১৯৭১ সালে জন্ম। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কোন পড়াশুনাই শেষ করেন নি। ১৯০২ সালে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯০৬ সালে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে প্যারিসে যান। অর্থকষ্টে পড়ে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরী নেন। সেখানে বোমা তৈরীর পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি পুলিশের নজরে পড়েন। পালিয়ে আসেন প্যারিসে। সেখানে মাদাম কামা তাকে ফরাসী সোশালিষ্ট গুপ্ত সমিতির সঙ্গে পরিচিতি করান। তারাই তাকে মারাত্মক বোমা তৈরীর ফরমুলা দেন। বিপ্লবের প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯০৭ সালে তিনি দেশে ফেরেন। সে সময়ে বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ মানুষ সারা দেশে আর ছিল না। তাঁর ফরমুলাই নানা ভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর ছোঁড়া বোমা থেকে আলিপুর বোমার মামলার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত বোমা তাঁর নিজের হাতে তৈরী ছিল। ঐ মামলায় একমাত্র তিনিই কোন বিবৃতি দেন নি। নরেন গোঁসাই হত্যা পরিকল্পনা তার। কার্যকর করেন সত্যেন বসু এবং কানাই দত্ত। ১৯২১ সালে তিনি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসেন। এরপর তার উল্লেখ্য রাজনৈতিক জীবন ছিলনা। ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল তার মৃত্যু হয়।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

[এখানে শুধুমাত্র সেই গ্রন্থগুলিরই নাম উল্লেখ করা হল,
যাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।]

1. History of Portuguese in India. Danvers.
2. The Early annals of the English in Bengal : Vol.-I, Vol-II—C. R. Wilson.
3. History of Military Transactions of the British in Indostan. Vol. I, II, III,—Robert-Orme.
4. The Roll of Honour—Kalicharan Ghose.
5. Bhagat Singh and this Comrades : Ajay Ghose.
6. Annals of Rural Bengal : W. W. Hunter.
7. White Shahibs in India : Reginald Reynolds.
8. Sanayasi & Fakir Raiders of Bengal— Jaminimohan Ghose.
9. The Wahabis in India : Okenlly.
10. History of the Santhal Hool of 1855— Digambar Chakravarty.
11. History of the Indian Mutiny. Vol, I., II— —G.W. Forrest.
12. History of the Sepoy war in India (Vol. I & II) —John Kaye.
13. History of the Indian National Movement— Lovett.

14. Evolution of Indian Natianal Congress.

A. C. Mazumder.

15. Indian Natianal Evolution. —A. C. Mazumdeı.

16. Rise and Grouth of the Congress in India.

C. F. Andrews & Girija Mukherje.

17. The Mopla Rebellion : Gapalan Nayer.

18. Autobiography : Jawharlal Nehru.

19. Sidition Committee Report.

20. Indian Polities Since the Mutiny—

C. Y. Chintamanni.

21. The Source material of the revolutionary movement in Bombay province from 1885—1923.—Govt. of Maharastra Publicaton.

22. Who's who of Indian Martyrs (Vol. I & II)

Ministry of Education and Social welfare.

23. The Springing Tiger—H. Toye.

১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ

ডঃ ভূপেনন্দ্রনাথ দত্ত

১. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩. নীলবিদ্রোহ : প্রমোদ সেনগুপ্ত

৪. নীলবিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ : প্রমোদ সেনগুপ্ত

৫. যশোহর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র

৬. তিতুমীর‘ঃ বিহারীলাল সরকার

৭. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত

৮. ভারতের বিপ্লব কাহিনী : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

৮. অগ্নিদিনের কথা : সতীশ পাকড়াশী

১০. ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস : মন্মথনাথ গুপ্ত

১১. বাংলায় বিপ্লববাদ : নলিনীকিশোর গুহ

•১২. সবার অলক্ষ্যে : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

১৩. চট্টোগ্রাম যুববিদ্রোহ : অনন্ত সিং

১৪. চন্দ্রশেখর আজাদ : বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন

১৫. জাগরণ ও বিস্ফোরণ : কালীচরণ ঘোষ

১৬. ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : সুপ্রকাশ রায়

১৭. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়

১৮. স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর : তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য

[বহুবিধ অভিধান, সমকালীন নানা পত্রপত্রিকা বিশেষত প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও অমৃতবাজার]